প্রথম প্রকাশ

অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮

ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রকাশক ঃ

প্রাণেশ মণ্ডল

মুক্তধারা

৭৪ ফরাশগঞ্জ

ঢাকা—১

বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ

চিত্তরঞ্জন সাহা

মুদ্রাকর ঃ

প্রভাংশুরঞ্জন সাহা

ঢাকা প্রেস

৭৪ ফরাশগঞ্জ

ঢাকা—১

বাংলাদেশ

কথামুখ

জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে একদিন যে আমাকেই আমার অতীত জীবনের কথা লিখতে হবে, তা কোনদিন কল্পনা করিনি। কিন্তু আজ অনুরোধের ডাকে আমাকে সে কাজ করতে হচ্ছে। ৮৩ বৎসর বয়সকালের মধ্যে যা দেখলাম, যা শুনলাম, যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম, তার ভিত্তিতে যে উপলব্ধি হল, তা দিয়েই এ কাহিনী শুরু করছি। এককালে খুবই আশাবাদী ছিলাম। এখন ঘোর বিষাদবাদী হয়েছি। মানুষ হিসাবে মানুষকে বিশ্বাস করতাম। আজ আর তা করি না। উপলব্ধি করেছি ইহজগতে মানুষের মত শঠ, প্রতারক ও প্রবঞ্চক জীব আর দ্বিতীয় নেই। সততার কোন মূল্যই নেই। সততার বশবর্তী হয়ে মানুষকে বিশ্বাস করা মানেই আত্মঘাতী হওয়া। ছেলে বলুন, মেয়ে বলুন, স্ত্রী বলুন কারুকেই আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না। কোনদিনই কল্পনা করিনি যে জীবনের পরিণতিতে এমন একটা যুগে এসে পৌঁছাব, যে সময় সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের যে সব সদ্‌গুণ থাকা উচিত তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। চতুর্দিকেই দেখছি যে মানুষ কেবল সাধুতা ও ভণ্ডামীর মুখোস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখোস খুলে দিলেই তার সত্যিকারের স্বরূপটা প্রকাশ পাবে। তবে তার এই স্বরূপটা প্রত্যক্ষ করতে হলে, তার আঁতে ঘা দিতে হবে। আঁতে ঘা না পড়লে, মানুষ কখনও তার স্বরূপ প্রকাশ করে না। মনে মনে কেবল ভাবি, এমনটা কেন হল? এমনটা তো হবার কথা নয়। এমনটা তো ছিল না, আমাদের ছেলেবেলায়!

এই তো মাত্র ক'দিন আগের কথা। তারিখটা হচ্ছে ২৬ জানুয়ারী ১৯৮৬। 'বর্তমান' পত্রিকার একেবারে মাথায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল এক শিরোনামা। শিরোনামার ভাষা—'অতুল সুর স্বপ্নেও ভাবেন নি দেশ এমন দুর্নীতিতে ভরে যাবে।' সেটা আমার স্বাধীনতা যুগের উপলব্ধি। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের দেশসেবকদের দেখেছি। বালগংগাধর তিলককে দেখেছি। শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষকে দেখেছি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পালকে দেখেছি। অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর ভাই বারীনকে দেখেছি। উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমন্তকুমার বসুকে দেখেছি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, আশু মুখুজ্যে, যতীন সেনগুপ্ত, সুভাষ বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখদেরও দেখেছি। স্বাধীনতা লাভের পরও দেখেছি নিকুঞ্জ মাইতিকে। কই তাঁরা তো কেউ আজকের দেশসেবকদের মতো দুর্নীতিপরায়ণ দেশসেবক ছিলেন না। আজকের দেশসেবকের প্রতীক হচ্ছে শিবপ্রসাদ গুপ্ত। 'কলকাতার নামজাদা লোক, প্রখ্যাত দেশভক্ত।

এককালের পলিটিক্যাল সাফারার।' কথাগুলো আমার নয়। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বিমল মিত্রের। তিনি তাঁর 'একক দশক শতক' উপন্যাসে এই বিখ্যাত দেশসেবকের কাহিনী বিবৃত করেছেন। শিবপ্রসাদ গুপ্ত দিনরাত দেশের কথাই ভাবেন, দেশের দরিদ্রজনগণের কথা। দেশ নিয়ে তাঁর এত ভাবনা-চিন্তা যে বাড়িতে খাবার সময় পর্যন্ত পান না। কেবল মিটিং, মিটিং, আর মিটিং। কোথায় পর্তুগীজরা গোয়া ছেড়ে যেতে চাইছে না, তাই নিয়ে মিটিং। কোথায় দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তাই নিয়ে মিটিং। কোথায় দেশের প্রান্ত-উপান্ত বন্যার জলে ভেসে গেল, তাই নিয়ে মিটিং। নেহেরুর বিশ্বাসী লোক। নেহেরু ডেকে পাঠিয়েছেন জয়পুরে মিটিং করবার জন্য। ছুটে চলেছেন সেখানে। আবার মাঝে মাঝে জয়পুর থেকে ট্রাঙ্ক কলও আসে। জিজ্ঞাসা করেন, কে বলছ ?

—আমি সুন্দরিয়া বাই বলছি।

কে এই সুন্দরিয়া বাই, তা কেউই জানে না। ওঁদের মধ্যে কথাবার্তাই বা কি হয়, তা-ও কেউ জানে না।

এই প্রখ্যাত দেশসেবক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল জমি-কেনাবেচার 'বিজনেস' করে। থাকতেন বৌবাজারের মধুগুপ্ত লেনের এক কয়লার ধোঁয়ায়-ঢাকা সামান্য বাসায়। আজ মস্ত বাড়ি করেছেন হিন্দুস্থান পার্কের নীল আকাশের সমারোহের নীচে। সবই হয়েছে—বাড়ি, গাড়ি, চাকর-বাকর, রেডিও, রেফরিজে-রেটর সবকিছু। সবই হয়েছে জমি কেনা-বেচার দৌলতে। এই ব্যবসার শিলান্যাস করেছিলেন স্বাধীনতার শর্ত হিসাবে পার্টিশনের সময়। জলের দামে জমি কিনেছেন, আর অগ্নিমূল্যে বেচেছেন। নিজের দূরদৃষ্টির জন্য বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন। কথায় কথায় বলতেন, বৃহত্তর কলকাতা তো আমার নিজের হাতে গড়া। তাঁরই কল্যাণে নাকি দুর্গাপুর হয়েছে, কল্যাণী হয়েছে ! যাদবপুর, গড়িয়া, নরেন্দ্রপুর সবই নাকি তাঁর প্লান-মত হয়েছে। একখানা খবরের কাগজ বের করবার প্লানও তিনি করেছিলেন। কেননা শিবপ্রসাদবাবু বুঝে নিয়েছিলেন যে খবরের কাগজই হচ্ছে মুখোস-খোলার সবচেয়ে বড় রঙ্গমঞ্চ।

আর তাঁরই প্লানের কারসাজিতে কুন্তীদের সর্বনাশ হয়েছিল। সে আবার কে ? পার্টিশনের পর দেশ ছেড়ে আসা এক উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়ে। শিয়ালদহ স্টেশনের প্লাটফরমের ওপর আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর ঠাঁই পেয়েছিল যাদবপুর কলোনীতে। কিন্তু শিবপ্রসাদ বাবুর প্লান-মত ওই কলোনী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শিবপ্রসাদবাবুর গুণ্ডাদের হাতে কুন্তীর বাবা নিহত হয়। টগবগ করে ফুটে ওঠে কুন্তীর শিরা-উপশিরায় প্রতিহিংসার আগুন। শিবপ্রসাদবাবুর ভাবী পুত্রবধূর মুখে ছুঁড়ে মারে অ্যাসিড বাল্ব। মেয়েটা মাংসপিণ্ডে পরিণত

হয়। কুন্তী ধরা পড়ে। আদালতে দোষ স্বীকার করে। কুন্তীর নির্ঘাত ফাঁসি হবার কথা। শিবপ্রসাদ গুপ্তের দল উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু সব মাটি করে দেয় জয়পুরের সেই সুন্দরিয়া বাই। প্রকাশ্য আদালতে সে খুলে দেয় শিবপ্রসাদ গুপ্তের মুখোস। সুন্দরিয়া বাই বলে, শিবপ্রসাদ গুপ্তের বাড়ি, গাড়ি, জমির কারবার, কংগ্রেস, দিল্লী, খদ্দর, ওই সব কিছুরই পিছনে চিৎপুর-সোনাগাছির পদ্মরানীর রতিচক্রের মালিকানা স্বত্ব।

সমস্ত হাইকোর্ট সেদিন চমকে উঠেছিল। বিমল মিত্রের ভাষায় বলি, 'সমস্ত হাইকোর্ট যেন ভিতশুদ্ধ নড়ে উঠল, হাইকোর্টের ভেতরে যত লোকান্তরিত আত্মা আজ বিচার শুনতে এসেছিল, তারাও সবাই যেন চমকে উঠল। ওয়ারেন হেস্টিংস, মহারাজ নন্দকুমার, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু, জে. এম. সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম, গোপীনাথ সবাই নিঃশব্দে আর্তনাদ করে উঠল একসংগে।'

সেদিন তথাকথিত দেশসেবকদের মুখোস খুলে গেল। এরাই দেশসেবার ভণ্ডামী করে। এদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় চোরাকারবারী, মুনাফাখোর, ভ্রষ্টাচারী, মেয়েমানুষের কারবারী, সমাজবিরোধী সবাই বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এরাই রোগীর জন্য বরাদ্দ ওষুধ হাসপাতালের বাইরে পাচার করে।

একদিন শিবপ্রসাদ গুপ্তের বৈঠকখানাতেই বঙ্কুবাবু বলেছিল, 'কী-সব দিন কাল ছিল মশাই! কোথায় গেল সেই সোনার দেশ! তখন লেখাপড়ার কদর-ছিল, দেব-দ্বিজে ভক্তি ছিল। আর এখন সব উলটে গেছে। মেয়েরা অফিসে ঢুকেছে চাকরি নিয়ে। রাস্তায় পার্কে একা-একাই সব বেড়াচ্ছে। পুরুষ মানুষকে ভ্রুক্ষেপই নেই।'

এরাই ঘটিয়েছে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মধ্যে বিরোধ। সরস্বতীকে আজ পিছু হটতে হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা কোন প্রকৃত শিক্ষা পাচ্ছে না। ফলে, চরিত্রের অবনতি ঘটছে। বঙ্কুবাবু দেব-দ্বিজে ভক্তির অভাবের কথাই বলেছিলেন। কিন্তু আজ নিজ গুরুজনদেরই কেউ তোয়াক্কা করছে না। গুরুজনদের ঠকাচ্ছে। তাদের মারধোর করছে। তাদের গৃহহারা করছে। আজ সেই সব গুরুজনদের দীর্ঘশ্বাস আকাশ-বাতাস বিষময় হয়ে উঠছে।

কথা

আমার ছেলেবেলার কথাই বলি। যাদের বয়স আজ আমার মতো আশি পেরিয়ে গেছে, তাদের নিশ্চয় মনে পড়বে, আমাদের শ্যামবাজারের সেই পুরোনো বাড়িটা। অত পুরোনো বাড়ি শ্যামবাজারে আর দ্বিতীয় ছিল না। কোন্ মান্ধাতার আমলে যে বাড়িটা তৈরী হয়েছিল, তা কেউ জানত না। ছোট ছোট পাতলা ইট দিয়ে বাড়িটা তৈরী। গাঁথবার জন্য চুন-শুরকির দরকার হয়নি। সেরেফ কাঁচা মাটি দিয়ে গাঁথা। দেওয়ালগুলো ঢাকা ছিল পঙ্খের কাজ করা পলেস্তরা দিয়ে।

সেকালের রীতি অনুযায়ী বাড়িটা ছিল দু' মহল। একটা অন্দর মহল, আর একটা বাহির মহল। দুই মহলের মাঝখানে ছিল একটা উঠোন। ওই উঠোনে ছিল একটা পেয়ারা গাছ। বাড়ির ভিতরটা মাঝে মাঝে কলিচুনের প্রলেপ দিয়ে চুনকাম করা হত। কিন্তু বাড়ির রাস্তার দিকটার কোন দিনই সংস্কার হয় নি। দেওয়ালের সমস্ত পলেস্তরা খসে পড়ে গিয়েছিল। ছোট ছোট ইটগুলো বেরিয়ে পড়েছিল। মনে হত যেন দাঁত বের করে পথচারীদের মুখ ভ্যাঙচাচ্ছে, যেন বলছে, তোমরা আমাকে দেখে হাসছ কি, তোমাদেরও একদিন এই দশা হবে।

ওই বাড়িটাতেই আমি জন্মেছি, ওখানেই মানুষ হয়েছি, ওখানেই লেখাপড়া করেছি, ওখানেই আমার বিয়ে হয়েছে। আমার জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর ওখানেই কেটেছে। তারপর বাড়িটা একদিন ছেড়ে দিতে হল। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট শ্যামবাজার স্ট্রীটকে আরও চওড়া করল। বাড়িখানা নতুন রাস্তার গর্ভে চলে গেল। সে রাস্তার নাম এখন ভূপেন বোস অ্যাভেন্যু।

ওই বাড়িটাকে আমি বরাবরই পীঠস্থান বলে মনে করতাম। আমার জন্ম-ভিটে বলে নয়। ওটাকে পীঠস্থান বলে মনে করতাম এই কারণে যে এক মহামানবের পদবিক্ষেপে ওই বাড়িটা পূত ছিল বলে। এক সময় ওই বাড়িটাতে বিদ্যাসাগর মশাই প্রতিদিন বিকালে আসতেন ও দু-এক ঘণ্টা কাটিয়ে যেতেন। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের তখন শ্যামপুকুরে একটা ব্রাঞ্চ স্কুল ছিল। শ্যামপুকুর স্ট্রীটের যে বাড়িটায় ওই স্কুলটা ছিল, সে বাড়িটা আমি দেখেছি। কেননা, আমার ছেলেবেলায় ওই বাড়িটাতেই ছিল শ্যামপুকুর থানা।

বিদ্যাসাগর মশাই প্রতিদিন অপরাহ্ণে দুটো-তিনটার সময় ওই স্কুল পরিদর্শন করতে আসতেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর চরিতকার 'শ্রীম' তখন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

স্কুলের এক পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ছিল বিশেষ সম্প্রীতি। স্কুলের ছুটির পর প্রতিদিন বিদ্যাসাগর মশাই পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে আমাদের বাড়ি আসতেন। কেননা পণ্ডিত মশাই আমাদের বাড়িরই নীচের তলার দু'খানা ঘরে ভাড়া থাকতেন। ঘর দু'খানার কোলে ছিল একটা বড় দালান। ওই দালানেরই এক জায়গায় আসন পেতে বসে বিদ্যাসাগর মশাই পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন। ওঁরা যে ঠিক কোন্ জায়গায় বসতেন, তা আমি জানতাম না। পরে জেনেছিলাম। তবে বিদ্যাসাগর মশাই যে ওই বাড়িতে আসতেন, সেটা আমি জানতাম। কেননা, বাড়ির মেয়েরা বিদ্যাসাগর মশাই সম্বন্ধে একটা ভারী হাসির গল্প বলত। গল্পটা বলছি।

একদিন বিদ্যাসাগর মশাই পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে এসে দেখেন যে ঘরদোর সব ধোয়া-মোছা হয়েছে। সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বিদ্যাসাগর মশাই পণ্ডিত মশাইকে শুধালেন, আজ বুঝি গৃহিণীর কোন ব্রত ছিল ? পণ্ডিত মশাই হেসে বললেন, হ্যাঁ, ব্রতই বটে ! তারপর পণ্ডিতমশাই বলতে শুরু করলেন।

—আজ সকালে বাজারে গিয়ে দেখি, বেশ ডিম-ভরা পেট-মোটা ট্যাংরামাছ এসেছে। দেখে লোভ হল, কিনে ফেললাম। বাড়িতে আনবার পর, গৃহিণী আর মাছগুলোর পেট কাটল না, পাছে ডিম বেরিয়ে পড়ে। তারপর খোলায় চাপাবার পর দুমদাম আওয়াজ। মাছগুলোর পেট ফেটে রান্নার সমস্ত কড়াটা ভরে গেল দুর্গন্ধময় মানুষের মলে। পশ্চাৎ আর কি ? হাঁড়িকুড়ি ফেলে দেওয়া, ঘর-দোর ধোওয়া-মোছা ও গঙ্গাস্নান করা। আজ তো নিরাহারেই স্কুলে গিয়েছি। এ তো ব্রত উদ্‌যাপনেরই সামিল !

সব শুনে বিদ্যাসাগর মশাই তো হেসে গড়াগড়ি। বলে উঠলেন, তোফা ! তোফা ! তোমার গৃহিণী তোমার সাধের মাছগুলো সব নষ্ট করল, ওটা তো ঘেঁটে দিলেই পারত ! উত্তম তরকারী হত !

বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ওই রসিকতার কথা যতবার বাড়ির মেয়েদের মুখে শুনেছি, ততবার আমিও হেসে গড়িয়ে পড়েছি।

হ্যাঁ, এবার বলি, বিদ্যাসাগর মশাই দালানের যে জায়গাটায় বসতেন, সে জায়গাটা পরবর্তীকালে আমি কি করে জানলাম। সেটা আমার এম. এ. পাশ করবার পর। আমি তো এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম। সেজন্য কনভোকেশনের দিন একটা সোনার মেডেল পেয়েছিলাম। কনভোকেশনের দিন বাড়ি ফিরে যখন সকলকে ওই চার ভরি ওজনের সোনার মেডেলটা দেখাচ্ছিলাম, তখন বাড়ির এক প্রাচীনা পরিচারিকা (তখনকার রীতি অনুযায়ী আমরা তাকে 'মাসী' বলতাম) বলে উঠল, এ ছেলে মেডেল পাবে না

তো, কে পাবে ? মাদুর পেতে বসে সারা জীবন ও লেখাপড়া করেছে, কোন্ জায়গায় ? ওই তো ওই জায়গাটাতেই বসে প্রতিদিন বিদ্যাসাগর মশাই পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে গল্প করত। স্থানমাহাত্ম্য যাবে কোথায় ?

পণ্ডিত মশাই যে দুখানা ঘরে ভাড়া থাকতেন, পরবর্তীকালে তারই একখানা ঘরে আমার জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর কেটেছে। শুনলে অনেকে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে আমায় জ্ঞান হবার পর থেকে পঁচিশ বছর বয়সকাল পর্যন্ত আমি রাত্রে একটা ঘটনার অপেক্ষায় থাকতাম, কখনও ঘুমাতাম না। দুই ব্রহ্মদৈত্যের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতাম ! গভীর রাতে নীচের ঘরে শুয়ে শুনতে পেতাম একটা ভারী গোলক ছাদের একধার থেকে অপর ধারে গড়িয়ে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। আমার এক প্রাচীনা দিদিমার মুখে শুনেছি আমাদের বাড়ির পিছনে পালেদের যে বাগানটা ছিল, ওই বাগানটার একটা বেলগাছ আমাদের বাড়ির ছাদ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল এবং ওই বেলগাছে দু'জন ব্রহ্মদৈত্য থাকত। তারাই রোজ রাতে আমাদের ছাদে এসে এক মর্মর গোলক নিয়ে খেলা করত। শাদা ধবধবে কাপড় পরা, এই দু'জন ব্রহ্মদৈত্যকে আমার দিদিমা বহুদিন দেখেছেন।

১১১

আজকের শ্যামবাজার দেখে কেউই কল্পনা করতে পারবে না, আমার ছেলেবেলায় শ্যামবাজার কি ছিল। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে আজ যেখানে নেতাজী সুভাষের মূর্তি স্থাপিত হয়েছে, ঠিক ওই জায়গায় ছিল সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটা প্রস্রাবাগার। ওরই কোল ঘেঁষে চলে গিয়েছিল মিউনিসিপালিটির রেল লাইন। রেল লাইনটা বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাট থেকে শুরু হয়ে বাগবাজার স্ট্রীটের উত্তরাংশ দিয়ে এসে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট 'ক্রস' করে সারকুলার রোড ধরে ধাপা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল।

পূর্বদিকে আজ যেখান দিয়ে চলে গিয়েছে আর. জি. কর রোড, সেটা ছিল একটা সরু রাস্তা। নাম ছিল শ্যামবাজার ব্রিজ রোড। ওর দুধারে ছিল কাঁচা নর্দমা। নর্দমার ওপারে ছিল জামা-কাপড় ও জুতার দোকান। নর্দমার ওপর বাঁশের মাচা অতিক্রম করে সে সকল দোকানে ঢুকতে হত। আমার বাবার মুখে শুনেছি যে আমার বাবা যখন (১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে) বর্তমান শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর সামনে তাঁর ডিসপেনসারী স্থাপন করেন, তখন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটেরও (এখন বিধান সরণী) অনুরূপ অবস্থা ছিল। কাঁচা নর্দমা ছিল ও বাবার

ডাক্তারখানায় প্রবেশ করতে হলে বাঁশের মাচার ওপর দিয়ে যেতে হত। শ্যামবাজারের ট্রাম ডিপোর পাশে, আজ যেখানে মল্লিকদের বিশাল প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে, সেটা ছিল এক বিরাট বস্তি। ওই বস্তির ভিতরের রাস্তা দিয়ে এক মুহূর্তেই আমাদের শ্যামবাজারের বাড়ী থেকে বাবার ডাক্তারখানায় যাওয়া যেত।

আমি ঘোড়ায় টানা ট্রাম দেখিনি। কেননা, আমি জন্মাবার দু-এক বছর আগেই ঘোড়ায় টানা ট্রাম উঠে গিয়েছিল। শুধু আস্তাবলটাই পড়েছিল। ছেলেবেলায় আমি আমার সঙ্গীদের সঙ্গে ওই বিরাট আস্তাবলের ভিতর লুকোচুরি খেলতাম।

এখন আমার নাতি-নাতনীরা শুনে হাসে যে আমার লেখাপড়া শেখবার জন্য প্রথম বছর আমার পিতামাতার খরচ হয়েছিল মাত্র চোদ্দ আনা পয়সা। আমাদের বাড়ির পাশেই পালেদের বাড়িতে ছিল এক পুরোনো মিশনারী স্কুল। ওই স্কুলে যে শুধু আমি পড়েছিলাম তা' নয়। ওই স্কুলে আমার বোনেরাও পড়েছিল। ওই স্কুলে আরও পড়েছিল আমার স্ত্রী ও আমার শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ। এবার চোদ্দ আনার হিসাবটার কথা বলি। স্কুলের মাহিনা ছিল মাসিক এক আনা। পাঠ্যপুস্তক ছিল বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বর্ণপরিচয় ও ধারাপাত। এ দুখানা বইয়ের দাম ছিল এক আনা। একখানা শ্লেটের দাম ছিল তিন পয়সা। আর জারমানীতে তৈরী এক গ্রোস্ শ্লেট পেনসিল পাওয়া যেত চার পয়সায়। এক বছরে এক পয়সার বেশী শ্লেট পেনসিল খরচ হত না। মোট খরচ চোদ্দ আনা পয়সা। অবশ্য, মিশনারী স্কুলে ভর্তি হবার পূর্বে কিছুদিন আমাদের বাড়ির সামনে মল্লিকদের বস্তির ভিতর অবস্থিত এক পাঠশালায় পড়েছিলাম। তবে সেখানে মাহিনা লাগত না। কেবল গুরুমশাইকে মাঝে মাঝে 'সিধে' দিতে হত।

এক কথায় আমাদের ছেলেবেলায় লেখাপড়া করা যেত খুব সস্তায়। আজকাল তো ছেলেমেয়েদের কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে ভর্তি করাতে গেলে বাপ-মাকে প্রথম দফাতেই আক্কেলসেলামী দিতে হয় পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা। তা' ছাড়া, ভর্তি করাবারও ঝামেলা আছে। এ ছাড়া, আজকাল বাসে চেপে ছাড়া ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে চায় না। আমাদের সময় ওসব বালাই ছিল না। আমরা সেরেফ পায়ে হেঁটেই স্কুল-কলেজে যেতাম। চার বছর পড়েছি স্কটিশ চার্চেস্ কলেজে। আর দু'বছর ইউনিভারসিটিতে। এ ছ'বছরই আমরা পায়ে হেঁটেই শ্যামবাজার থেকে প্রথম হেদুয়া ও পরে গোলদিঘিতে গিয়েছি। পয়সার অভাবের জন্য নয়। পায়ে হেঁটে স্কুল-কলেজে যাওয়া, এটাই ছিল সেকালের ছাত্রদের রীতি।

তখন কলকাতা শহরে বাস ছিল না। ছিল ট্রাম। ট্রামে করে ছেলেরা কখনও স্কুলে যেত না। আর ছিল ছ্যাকড়া গাড়ি ও পালকি। রিকশার চলন তখন কলকাতা শহরে হয়নি। রিকশা কলকাতায় প্রথম চলে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ।

আমার মুখে এসব কথা শুনে আমার ছেলেমেয়েরা হাসত। তাদের বলতাম, তোরা এই শুনেই হাসছিস্। তবে তোদের দাদুর কথা শোন্।

আমাদের আদি বাড়ি ছিল কইখালি-গোপালপুরে। আজ সে জায়গাটা গ্রাস করেছে দমদম বিমান বন্দর। আমার বাবা প্রতিদিন গোপালপুর থেকে পায়ে হেঁটে ডাফ্ সাহেবের স্কুলে, ও পরে মেডিকেল কলেজে পড়তে আসতেন। প্রত্যহ আবার পায়ে হেঁটেই ফিরে যেতেন।



আমার বাবা ছিলেন একজন যোগসিদ্ধ পুরুষ। তিনি যখন প্রথম গোপালপুর থেকে এসে শ্যামবাজারে ডাক্তারি প্র্যাক্টিস্ শুরু করেন, তখন যাদের যাদের বাড়ি তিনি চিকিৎসা করতেন, তার মধ্যে ছিল বাগবাজারের রামকালী মুখুজ্যের পরিবার। ওই পরিবারে তিনি যখনই চিকিৎসা করতে যেতেন, তখনই তিনি একটি মেয়েকে বিষণ্ণবদনে বসে থাকতে দেখতেন। একদিন মেয়েটি সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল হয়। তিনি রামকালীবাবুকে ওই মেয়েটির ওরকম ভাবে বিষণ্ণবদনে বসে থাকবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

রামকালীবাবু বললেন, মেয়েটি তাঁরই মেয়ে। মেয়েটির বিয়ে হয়েছে ভাগলপুরে এক জমিদার-বাড়িতে। কিন্তু তাঁর জামাই আজ কয়েক বছর হল নিরুদ্দেশ। নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে, তাঁরা আর তার বিশেষ কোন খবর পান নি। তবে লোকের মুখে শুনেছেন যে, তারা নাকি তাঁর জামাইকে সাধু অবস্থায় হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় স্নান করতে আসতে দেখেছে। বাবা মেয়েটির বিষয় শুনে খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েন ও ডাক্তারখানায় ফিরে আসেন।

সেদিন বাবা ডাক্তারখানায় ফিরে আসবার কিছু পরেই একজন সাধু এসে উপস্থিত হয়। সে বাবাকে বলে, বাবা জিন্দা রহ, তোমহারা কপাল বহুত আচ্ছা হ্যায়।

সাধুরা সাধারণত ভিক্ষা করতে এসে এরূপ কথাই বলে। তাই বাবা তাকে ভাগাবার জন্য বললেন, মাফ্ কিজিয়ে, আপ্ লম্বা হো যাইয়ে।

সাধু কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন্। বাবাকে সাধু বললেন, তিনি যেন ভুল না করেন ; তিনি ভিক্ষার জন্য আসেন নি।

সাধু বাবাকে অনেক তত্ত্বকথা শোনালেন ও বললেন, তিনি বাবাকে দীক্ষা দেবেন। বাবা এতক্ষণে সাধুর কথায় প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছেন ও তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে সম্মত হয়েছেন।

স্নান করে দীক্ষা নিতে হবে। বাবা সাধুকে বললেন যে, বেলা এগারটার সময় বাড়ি থেকে তাঁর লোক এলে, তিনি বাড়ি যাবেন। তখন বাড়ি গিয়ে স্নান করে তিনি দীক্ষা নেবেন। সাধু যেন ঠিক এগারটার সময় আসেন।

সেদিন বাড়িতে কি একটা কাজ ছিল। সেজন্য, যে লোক প্রতিদিন ডাক্তারখানায় এসে বাবাকে ছেড়ে দিত, সে সেদিন এক ঘন্টা আগে দশটার সময় এসে হাজির হয়। বাবা মহা সমস্যার মধ্যে পড়লেন। তিনি নিজের আসন থেকে উঠে এসে ডাক্তারখানার বাহিরে মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন, সাধুকে যদি কোথাও দেখা যায়। কোথাও সাধুকে দেখতে পাওয়া গেল না। অবশেষে হতাশ হয়ে, যেমনই তিনি দোকানের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিজের আসনে বসতে যাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি পিছন থেকে সাধুর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন। সাধু জিজ্ঞাসা করছে, বেটা তৈয়ার হো গয়া হ্যায়।

বাবার মনে ভীষণ খটকা লাগল। তিনি চমৎকৃত হলেন। সাধুকে নিয়ে তিনি বাড়ি চললেন। বাড়িতে পৌঁছে, তিনি সাবধানতা অবলম্বন করে সদর দরজায় খিল দিলেন। তারপর সাধুকে বাড়ির ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালেন ও নিজে স্নান করতে গেলেন। স্নান করে ফিরে এসে তিনি সাধুর কাছ থেকে দীক্ষা নিলেন। বাবা তখন ভাবাবেশে এমন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছেন যে, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

সাধু বাবাকে বলল, বেটা, রোঁতা কাঁ্যাউ, আঁখ মুছো।

বাবা দুহাত দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন। তারপর চোখ খুলে দেখেন, সাধু সামনে নেই। বাবা ছুটে সদর দরজার দিকে রওনা হলেন। দেখলেন তিনি যেমনভাবে খিল দিয়েছিলেন, সদর দরজা ঠিক তেমন ভাবেই বন্ধ আছে।

তখনই বাবার জীবনে ঘটল এক পরিবর্তন। দু'তিনদিন পরে বাবাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। বাবা নিরুদ্দিষ্ট। পরে বাবার মুখে শুনেছিলাম যে, তিনি সরাসরি হরিদ্বার যান। সেখান থেকে হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করেন। হিমালয়ের গুহায় গুহায় তিনি বহু সাধু সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসেন ও তাঁদের চেলাগিরি করে যোগসাধনা আরম্ভ করেন। তখন বাবার পরনে কৌপিন, সঙ্গে একগাছা লম্বা চিমটা, একটা লোটা ও কম্বল। (বাবার সেই লম্বা চিমটা এখনও আমাদের বাড়িতে আছে)। দশবছর হিমালয়ের গুহায় গুহায় পরিভ্রমণ করে তিনি অবশেষে রামকালীবাবুর জামাইয়ের সংস্পর্শে আসেন। তাঁকে সংসারে

প্রত্যাবর্তন করবার জন্য বাবা অনেক চেষ্টা করেন। প্রথমে তাঁর সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়। পরিশেষে তিনি তাঁকে রাজী করাতে সক্ষম হন। দশবছর পরে বাবা রামকালীবাবুর জামাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন।

আমার বাবার সম্বন্ধে এবার একটা অদ্ভুত কথা শোনাই। বাবার কোষ্ঠী অনুযায়ী তাঁর অনিবার্য মৃত্যু ছিল চল্লিশ বছর বয়সে। কিন্তু বাবা হিমালয়ে থাকাকালীন যোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি যে সব সাধনা শিখেছিলেন, সেগুলি তিনি প্রত্যহ অভ্যাস করতেন। এগুলো অভ্যাস করার ফলে বাবা তাঁর মৃত্যুযোগ এড়াতে পেরেছিলেন।

চল্লিশ বছর বয়স পার হবার পর, নিজের কোষ্ঠী সঠিক কিনা, সে সম্বন্ধে জানবার বাবার কৌতূহল হয়। বাবা তখন নিজেই জ্যোতিষ বিদ্যা আরম্ভ করেন এবং দেখেন যে তাঁর কোষ্ঠী সঠিক।

পরের বছর তিনি কাশী যান। কাশীর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ভৃগু জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে তিনি তাঁর কোষ্ঠীখানা বিচার করতে দেন। ভৃগুজ্যোতিষী বাবার কোষ্ঠীর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কোষ্ঠীটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং বাবাকে ভীষণ গালিগালাজ করতে থাকে। বলে মৃত ব্যক্তির কোষ্ঠী নিয়ে এসে তুমি আমার সংগে পরিহাস করতে এসেছ? বাবা হাত জোড় করে তাঁর কাছে নিবেদন করেন যে তিনি তাঁর সংগে পরিহাস করতে আসেন নি, বা তাঁকে পরীক্ষা করতেও আসেন নি। তিনি তাঁর নিজ কোষ্ঠীখানার সঠিকতা পরীক্ষা করাতে এসেছেন, কোষ্ঠীটা তাঁর নিজেরই।

তখন ভৃগুজ্যোতিষীর কৌতূহল হয় এবং বাবার কাছ থেকে তিনি বাবার অতীত জীবনের সবকথা শোনেন। ভৃগুজ্যোতিষী বাবাকে বলেন যে, তিনি যোগসাধনার দ্বারাই তাঁর আয়ু দীর্ঘ করতে সক্ষম হয়েছেন।

আমার বাবা ৯৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কর্মঠ ছিলেন ও ডাক্তারখানায় উপস্থিত থেকে রোগী দেখেছেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যোগ ও প্রাণায়াম অভ্যাস করে গিয়েছেন।

ঌ ঌ ঌ

আমার ছেলেবেলায় কলকাতা শহর দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। সাহেবপাড়া ও নেটিভপাড়া। এখানে বলা দরকার তখনকার দিনে ভারতীয়দের 'ইণ্ডিয়ান' বলা হত না। তাদের বলা হত 'নেটিভ'। সাহেবপাড়া ও নেটিভপাড়ার মধ্যে সীমান্তরেখা ছিল—ধর্মতলা স্ট্রীট। সাহেবদের কাছে নেটিভপাড়া রাত্রিকালে

খুব ভয়াভয় জায়গা ছিল। যাঁরা কিপলিং-এর "সিটি অভ্ ডেডফুল নাইটস্" পড়েছেন, তাঁরা এটা উপলব্ধি করবেন। যদিও কিপলিং বিশ-পঁচিশ বছর আগে বইটা লিখেছিলেন, তা হলেও বর্ণিত পরিস্থিতিটা আমার ছেলেবেলাতে একই রকম ছিল। শহরের দুটো ভাগের রাস্তাঘাটের আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল। শহরের সাহেবপাড়ায় এখনকার মতোই বাঁধানো ফুটপাত ও পীচ দিয়ে মোড়া রাস্তা ছিল। আর নেটিভপাড়ার ফুটপাতগুলো ছিল কাঁচা মাটির। বৃষ্টির দিনে ফুটপাতে বেশ কাদা জমত। পায়ের গোছ পর্যন্ত কাদায় ডুবে যেত। আমার ছেলেবেলায় দেশী পাড়ার একমাত্র জায়গা যেখানে ফুটপাত বড় বড় চৌকো পাথরের 'স্লাব' দিয়ে ঢাকা ছিল সে জায়গাটা হচ্ছে বেথুন কলেজের সামনে। প্রথম মহাযুদ্ধের মুখেই কলকাতার ফুটপাতসমূহ সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। পীচের রাস্তা আরও পরে হয়েছিল।

আমার ছেলেবেলায় সাহেব-সুবো ও ধনী-লোকেরা ঘোড়ার গাড়ি করেই যাতায়াত করত, মেয়েরা পালকি ব্যবহার করত। মোটর গাড়ি তখন শহরে মাত্র দু-চারখানা ছিল। দমকলের গাড়িও ঘোড়ায় টানত। মেয়েস্কুলের গাড়ী ও পোস্ট অফিসের ডাক-গাড়িও তাই। তবে মেয়েস্কুলের গাড়িগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। গাড়িগুলোর খড়খড়ি সব বন্ধ থাকত এবং তার বাইরে নীলরঙের কাপড় ঝুলানো থাকত।

সাহেব-সুবো ও ধনী সম্প্রদায় যে ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করত, সেগুলো হয় তাদের নিজস্ব, আর তা নয়তো হার্ট ব্রাদারস্-এর কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া। হার্ট ব্রাদারস্-এর আস্তাবল ছিল ধর্মতলায়, পরে যেখানে স্থাপিত হয়েছিল 'কমলালয় স্টোরস্'। এরা যে মাত্র গাড়ি ভাড়া দিত, তা নয়। এরা ঘোড়ার রসদও বেচত।

সাধারণ লোক ব্যবহার করত ছ্যাকড়া গাড়ি। ছ্যাকড়া গাড়িগুলোর আড্ডা ছিল বড় রাস্তাসমূহের মোড়ে। উত্তর কলকাতায় ছ্যাকড়া গাড়ির দুটো বড় আড্ডা ছিল, একটা শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে ও আর একটা হেদুয়ার মোড়ে। যেখানে ছ্যাকড়া গাড়িগুলো ভাড়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকত, সেখানে দুটো বৈশিষ্ট্য ছিল। একটা হচ্ছে, ঘোড়ার জল খাবার জন্য ফুটপাতের ধারে লৌহ নির্মিত জলাধার। আর দ্বিতীয় গাড়োয়ানদের খাবার জন্য তার সামনে মুসলমানদের একটা হোটেল। শ্যামবাজারের মোড় ও হেদুয়া, এ দু জায়গাতেই এই দুই বৈশিষ্ট্য ছিল। সেকালে ছ্যাকড়া গাড়িগুলোর ভাড়া খুবই কম ছিল। মাত্র দু'টাকা ভাড়ায় একখানা গাড়ি সকাল বেলায় বাড়ির মেয়েদের তুলে নিয়ে শ্যামবাজার থেকে কালিঘাট, জু গার্ডেনস্, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ইত্যাদি

ঘুরিয়ে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরত। একটা কথা এখানে বলে নিই, সেকালের লোক জু গার্ডেনস্‌কে 'জ্যান্ত চিড়িয়াখানা' ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামকে 'মরা সোসাইটি' বলত।

১৯৩০ সাল পর্যন্ত ছ্যাকড়া গাড়ির ভাড়া সস্তাই ছিল। কলকাতা থেকে বারাকপুর পর্যন্ত ভাড়া ছিল আড়াই টাকা থেকে তিন টাকা। মেয়েরা যখন ছ্যাকড়াগাড়িতে যাতায়াত করত, তখন গাড়ির সমস্ত 'পাখি' (খড়খড়ি) গুলো তুলে দিত। আর তারা সামনের দিকের সীটে কখনও বসত না। ঘোড়ার বায়ু-নিঃসরণের দুর্গন্ধের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই তারা সামনের দিকের 'সীট' পরিহার করত।

আর এপাড়া থেকে ওপাড়ায় সিকি মাইল দূরত্বের মধ্যে যাতায়াতের জন্য পালকির ভাড়া ছিল এক আনা বা দু-আনা। পালকিরও আড্ডা ছিল। একটা আড্ডা ছিল, আমাদের বাড়ির ঠিক বিপরীত দিকে ঘোষেদের বাড়ির পরিত্যক্ত নহবতখানায়।

ঘোষেদের বাড়িটাই ছিল শ্যামবাজার স্ট্রীটের ওপর সবচেয়ে বড় বাড়ি। এদের বাড়ি দেখলেই বুঝতে পারা যেত যে এক সময় এদের বেশ সমৃদ্ধি ছিল। আমার ছেলেবেলায় শুনতাম যে এঁদের পূর্বপুরুষরা ওয়ারেন হেস্টিংসকে দুধ সরবরাহ করেই পয়সা করেছিল।

হ্যাঁ, যেকথা বলছিলাম, ওই ঘোষেদের বাড়ির পরিত্যক্ত নহবতখানাতেই ছিল পালকির আড্ডা। ওই আড্ডার সামনে ফুটপাতের ওপর এক এক খণ্ড ছোট কাঠ বা পিঁড়ির ওপর পালকির বাহকরা সার দিয়ে বসে থাকত। মুখে থাকত শালপাতা দিয়ে জড়ানো দোক্তার চুরুট। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে দু-চারজন হঠাৎ বিকট চীৎকার করে উঠত। চীৎকার করবার কারণ, কারুকে পালকির আড্ডার দিকে আসতে দেখলে, যারা প্রথম চীৎকার করবে, তারাই সেই খরিদ্দারকে বহন করবে। পালকির বেহারারা ছিল ওড়িষার লোক। পালকি বহন করবার সময় তারা সকলেই 'ঐকতানে' উড়িয়া ভাষায় গান করত। পালকির সামনের দিকে যে দুজন পালকি বহন করত, তারাই এ গানের মহড়া দিত। প্রধানত এ গানের সাহায্যে তারা পিছনের দুজন বহনকারীকে পথের নির্দেশ দিত। রাস্তা এবড়ো-খেবড়ো কিনা, সামনের রাস্তায় গর্ত আছে কিনা, সামনে গাড়ি আসছে কিনা, ডাইনে যেতে হবে, কি বাঁয়ে যেতে হবে ইত্যাদি। অনেক সময় আরোহীকে উপলক্ষ করেও গান গাহিত। প্রায়ই তাদের বলতে শোনা যেত, 'শঁড়া বড় ভারী' মানে 'শালা বড় ভারী'।

আগেই বলেছি মোটরগাড়ি তখন শহরে মাত্র দু-চারখানা ছিল। লোকে

মোটর গাড়িকে 'হাওয়া গাড়ি' বলত। শহরে যে দু-চারখানা মোটর গাড়ি ছিল, তার মধ্যে একখানা ছিল লাটসাহেবের, আর একখানা পাইকপাড়ার রাজাদের। পাইকপাড়ার রাজাদের যে মোটরগাড়িখানা ছিল, তার নম্বর ছিল ১000। কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী ছিল বলে, সারা ভারতের মোটরগাড়ির নম্বর একই ক্রমিক সংখ্যায় দেওয়া হত। পাইকপাড়ার রাজাদের যে মোটরগাড়িখানা ছিল, তাতে করে মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ (পরবর্তীকালের মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহের পিতা) প্রতিদিন বিকালে গড়ের মাঠ পর্যন্ত বেড়াতে যেতেন। কিন্তু শীঘ্রই শহরে মোটরগাড়ির সংখ্যা বাড়তে থাকে। তবে ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত মোটর-গাড়ির নম্বর ৪000 ছাড়িয়ে যায়নি।

আমার ছেলেবেলাতে এরোপ্লেনের কথা শুনতাম। তবে এরোপ্লেন তখন মাত্র আবিষ্কার হচ্ছে। লোকে শুনে আশ্চর্য হয়ে যেত যে আকাশ দিয়ে কি করে মোটরগাড়ি উড়ে যাবে!

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে যখন একখানা 'হ্যাণ্ডলী পেজ' প্লেন প্রথম কলকাতায় এসে রেস্-কোর্সের সামনে পোলো গ্রাউণ্ডে নামল, তখন লক্ষ লক্ষ লোক তা দেখতে গেল। প্লেনখানা তার পরের দিনই চলে যাবার কথা ছিল। কিন্তু নামবার সময় তার একটা ডানা ভেঙে যাওয়ায়, মেরামতের জন্য সেটাকে কয়েকদিন কলকাতায় থেকে যেতে হল। এই অবকাশে ওটাকে ভাল করে নিরীক্ষণ করার সুযোগ অনেকে পেল।

তবে এরোপ্লেনের চলনটা শহরে খুব তাড়াতাড়ি আরম্ভ হল। কেননা, এর দশ-বারো বছর পরেই আমাদের শ্যামবাজার পাড়ার বিখ্যাত পাট ব্যবসায়ী ভবদেব মুখুজ্যে মশাই (সাহিত্যিকা অনুরূপা দেবীর ভাই) তাঁর নিজের প্লেনে করে সকালে মাকে পুরীতে সমুদ্রস্নান করিয়ে আনতেন। পরে তিনি আর পুরী পর্যন্ত যেতেন না। যেতেন দীঘা পর্যন্ত। ওই দীঘাতেই বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

আমাদের ছেলেবেলায় রেডিও সিনেমা কিছুই ছিল না। লোকে আনন্দ উপভোগ করত থিয়েটার দেখে ও যাত্রা শুনে। এ ছাড়া ছিল পুতুল নাচ ও সন্ধ্যার পর কথকতা ও রামায়ণী গান।

রেডিও প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ। যখন 'ক্যালকাটা ব্রডকাস্টিং কোম্পানি' স্থাপিত হল, তখন আমি ছিলাম প্রথম দশজন গ্রাহকের অন্যতম। এছাড়া, আমার বন্ধু ও সহপাঠী বিজ্ঞান রক্ষিত ('শ্রী' ঘৃতের মালিক) বেতারে কথোপকথনের জন্য রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে নিজ বাড়িতে একটা বেতারবার্তা স্টেশন স্থাপন করেছিল। সাধারণত কথাবার্তা হত এচ· বোসের ('কুন্তলীন'

কেশতৈলের মালিক) ছেলের সঙ্গে। সে-ও অনুরূপ একটা স্টেশন স্থাপন করেছিল। বিজ্ঞান রক্ষিতের বাড়ি উপস্থিত থেকে এসব কথাবার্তা শুনে আমি বেশ আনন্দ উপভোগ করতাম।

ছেলেবেলার এসব কথা স্মরণ করে অনেক সময় ভাবি শহরের কি অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছে।

আমরা ছেলেবেলায় লেখাপড়া করতাম রেড়ির তেলের প্রদীপের আলোতে। কাজকর্ম বা উৎসবের সময় রেড়ির তেল বা বাতির ঝাড়-লণ্ঠন টাঙানো হত। রেড়ির তেলের ব্যাপক ব্যবহার ছিল বলে. শহরের এখানে সেখানে অনেকগুলো রেড়ির তেলের কল ছিল। উত্তর কলকাতায় একটা রেড়ির তেলের কল ছিল, বাগবাজার স্ট্রীট ও গিরিশ অ্যাভেন্যুর (তখন নাম ছিল গ্যালিফ স্ট্রীট) ঠিক সংযোগস্থলে। আর একটা ছিল বিধান সরণীতে, এখন যেখানে 'চিত্রা' সিনেমা রয়েছে।

ইলেকট্রিকের আলো তখন কোন বাড়িতেই ছিল না। কেননা, আমি জন্মাবার মাত্র তিন-চার বছর আগে 'কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন' গঠিত হয়। কাজ আরম্ভ হয়েছিল তিন-চার বছর পরে। তারপর অনেক বছর লেগেছিল শহরের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি ব্যবহারের প্রচলন হতে। তবে শহরের অনেক অভিজাত পরিবারের বাড়িতে গ্যাসের আলোর ব্যবহারের প্রচলন ছিল। গ্যাস সরবরাহ করত 'ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী'। ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানি স্থাপিত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে। আর কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়াতে।

আমাদের ছেলেবেলায় কেরোসিনের ব্যবহার অবশ্য ছিল, কিন্তু তা ঘরের ভেতর জ্বালাবার জন্য কেউ ব্যবহার করত না। প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু আগে ইলিয়ট কোম্পানি (ইলিয়ট কোম্পানির অফিস ছিল এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো) যখন ডিটজ্-এর তৈরি 'হারিকেন' লাণ্টারন্-এর এজেন্সী নিয়ে এদেশে 'হারিকেন' লাণ্টারন্ আমদানী করল, তখন থেকে 'হারিকেন' লাণ্টারনের চলন হল। প্রসংগত বলি, 'হারিকেন' শব্দটি ডিটজ্ কোম্পানির উদ্ভাবিত নাম। ওটার স্বত্ব ডিটজ্ কোম্পানি কর্তৃক সংরক্ষিত।

আমাদের ছেলেবেলায় সিগারেটের প্রচলন অবশ্য হয়েছিল, তবে তা নব্য যুবকেরাই খেত। বয়স্করা তামাক খেত। সেই কারণে প্রতি পাড়ায় অনেকগুলো করে তামাকের দোকান ছিল। তা'ছাড়া, শ্যামবাজারের মোড়ে যেখানে ছ্যাকড়া-গাড়ির স্ট্যাণ্ড ছিল, তার সামনেই ছিল টিকা ও গুল তৈরীর একটা কারবার। তামাকের মধ্যে বালাখানার তামাকই প্রসিদ্ধ ছিল। তা ছাড়া ছিল কড়া তামাক

'গয়ার' তামাক। আনারপুরের তামাকেরও প্রসিদ্ধি ছিল।

প্রথম যে সিগারেট এদেশে আমদানী করা হয়েছিল, তার মার্কা ছিল 'বার্ডস্ আই'। সেজন্য মেয়েমহলে সিগারেটের নাম ছিল 'বাটসাই'। আমার ছেলেবেলায় চার রকমের সিগারেটের প্রচলন ছিল। 'রাম রাম' এক পয়সায় দশটা। 'কলম্বিয়া' দু' পয়সায় দশটা, 'হাওয়া গাড়ি' তিন পয়সায় দশটা, আর 'অগডেনস্' চার পয়সায় দশটা। 'অগডেনস্ ট্যাবস্' অভিজাত সম্প্রদায়ই খেত। যারা আরও বেশী বিলাসিতা পছন্দ করত, তারা খেত '৫৫৫' মার্কা সিগারেট।

১১১

তখনকার দিনের মেয়েরা ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীলা ও অসূর্যম্পশ্যা। মাত্র খ্রীস্টান ও ব্রাহ্ম মেয়েদেরই পথে-ঘাটে দেখা যেত। আর দেখা যেত একেবারে নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েদের। ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের হিন্দু মেয়েদের পথে বের হওয়া কল্পনার বাইরে ছিল। প্রাচীনারা অবশ্য গঙ্গাস্নানে যেতেন, কিন্তু ভোর চারটের সময় বের হয়ে সূর্য ওঠবার আগেই বাড়ি ফিরতেন। ছেলেবেলায় পালপার্বণে আমরাও ওঁদের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যেতাম। স্নান করে ফেরবার সময় গঙ্গার ঘাটে উড়িয়াদের কাছ থেকে কপালে ও গালে গেরিমাটির নানা রকম ছাপ পরে আসতাম। অনেক ধনী পরিবারের প্রাচীনারা আবার পাল্‌কি করে গঙ্গাস্নানে যেতেন, এবং গঙ্গার ঘাটে গিয়েও তাঁরা পাল্‌কি থেকে নামতেন না। পাল্‌কি জলে চুবিয়ে দেওয়া হত এবং তাঁরা পাল্‌কির ভেতরেই স্নান ও বস্ত্র পরিবর্তন করতেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা প্রথম পথে-ঘাটে বেরুতে শুরু করে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে পার্ক সার্কাস কংগ্রেস অধিবেশনের পর থেকে। ওই কংগ্রেসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সামরিক কায়দায় সজ্জিত একটি সুশৃঙ্খল মেয়ে সেচ্ছাসেবিকাবাহিনী গঠন করেন। মেয়েরা সেই প্রথম প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করল। এর পর এই সব মেয়েদের মা-মাসীরাও প্রকাশ্য রাজপথে বেরুতে আরম্ভ করল। তবে মেয়েদের জুতা পায়ে দিয়ে পথে হাঁটা অনেক পরে আরম্ভ হয়েছিল।

বিবাহের পর থেকেই সেকালের মেয়েদের ধর্মীয় জীবন শুরু হত। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কুলগুরুর কাছ থেকে 'মন্তর' নিতেন। কেননা, সে কালের মেয়েদের বিশ্বাস ছিল যে 'মন্তর' না হলে দেহ পবিত্র হয় না। যারা 'মন্তর' নিত, তাদের প্রতিদিনই ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হত। যাদের 'মন্তর' হয়নি, তাদের ঠাকুরঘরে যেতে দেওয়া হত না। এমনকি শ্বশুর-শ্বাশুড়ীও তাদের হাতের জল শুদ্ধ বলে মনে করতেন না।

সেকালের মেয়েরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সদর দরজা থেকে শুরু করে বাড়ির অন্দরমহল পর্যন্ত সর্বত্র গোবর জলের ছিটে দিত। এ ছাড়া, প্রতি বাড়িতেই তুলসীমঞ্চ থাকত এবং সন্ধ্যাবেলা তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জেলে দেওয়া হত।

সেকালের মেয়েদের ধর্মবিশ্বাস এখনকার মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। শিশুকাল থেকেই নানা রকম ব্রতপালনের ভেতর দিয়ে তাদের ধর্মীয় জীবন গড়ে উঠত। পাঁচ থেকে আট বছরের মেয়েরা নানা রকম ব্রত করত। যেমন বৈশাখ মাসে শিবপূজা ও পুণ্যিপুকুর, কার্তিক মাসে কুলকুলতি, পৌষ মাসে সোদর, মাঘ মাসে মাঘমণ্ডল ইত্যাদি। সধবা মেয়েদের তো ব্রতের অন্তই ছিল না। সারা বছর ধরে দু-একদিন অন্তর একটা না একটা ব্রত লেগেই থাকত। যেমন সাবিত্রী ব্রত, ফলহারিণী ব্রত, জয়মঙ্গলবারের ব্রত, বিপত্তারিণী ব্রত, নাগপঞ্চমী, ইতুপূজা নীলপূজা, লুণ্ঠনষষ্ঠী, চর্পটাষষ্ঠী, রাধাষ্টমী, তালনবমী, অনন্তচতুর্দশী, কাত্যায়নী ব্রত, শীতল ষষ্ঠী, অশোক ষষ্ঠী, অরণ্য ষষ্ঠী ইত্যাদি। এ ছাড়া, অক্ষয়তৃতীয়ার দিন কলসী উৎসর্গ করা হত। বৈশাখ' মাসে তুলসী গাছে 'ঝারা' বাঁধা হত। কার্তিক মাসে আকাশে প্রদীপ দেওয়া হত। পৌষ সংক্রান্তিতে 'বাউনি' বাঁধা হত। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধন হত, আর পৌষ সংক্রান্তিতে হত পিঠেপুলি। আর, কোন বাড়িতে ছেলেপুলে হলে ষেটেরা পূজা হত, ষষ্ঠী পূজা হত, আর চারদিনের দিন কিংবা আটদিনের দিন চার-কৌড়ে বা আট-কৌড়ে হত। চার-কৌড়ে বা আট-কৌড়ের দিন কুলো-বাজানো পাড়ার ছেলেদের একটা বেশ আনন্দের ব্যাপার ছিল। আঁতুড় ঘরের সামনে ছেলেরা একখানা কুলো উলটা করে ধরে তার ওপর কাঠির ঘা মারত, আর বলতো, আট-কৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ঘরে। ছেলের মা কি বলে? ছেলের মা আঁতুড়ঘর থেকে উত্তর দিত, ছেলে আছে ভাল। তখন ছেলেরা সমস্বরে চেঁচিয়ে বলত, ছেলের বাপের মুখে হাগো। তার পর আমরা এক কোচড় করে খই মুড়কি, নারকেল নাড়ু ও মিষ্টান্ন পেতাম। দু-চারটে পয়সাও পাওয়া যেত।

꩜ ꩜ ꩜

ছেলেবেলার একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথা আমার মনে এখনও জ্বলজ্বল করছে। এটা হচ্ছে 'হাতে খড়ি'। 'হাতে খড়ি' অনুষ্ঠান না হলে সেকালে বিদ্যারম্ভ হত না। এটা বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ইত্যাদির মতো একটা শুভ দিনে হত। যদিও অনুষ্ঠানটা উঠে গেছে, তা হলেও 'বিদ্যারম্ভ'-এর (বা 'হাতে

খড়ি'র) তারিখগুলো এখনও পাঁজিতে ছাপা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'হাতে খড়ি'টা শ্রীপঞ্চমীর দিন হত। আমারও তাই হয়েছিল। আমার তখন চার বছর বয়স, কিন্তু অনুষ্ঠানটা আমার বেশ মনে আছে। সকালে পুরোহিত ঠাকুর এসে নারায়ণ পুজো, সরস্বতীর আরাধনা, হোমাগ্নি ইত্যাদি করলেন। ইত্যবসরে আমি স্নান করে শুদ্ধ হয়ে, একখানা নতুন কাপড় পরে তাঁর সামনে এসে বসলাম। তিনি আমার হাতে একটা রামখড়ি দিলেন। তারপর আমার হাতটা ধরে মেঝের ওপর 'অ', 'আ', 'ক', 'খ' লেখালেন। এই অনুষ্ঠানের জন্য পুরোহিত বোধ হয় এক আনা কি দু'আনা দক্ষিণা পেতেন। লক্ষ্মী বা সরস্বতী পুজোতেও পুরোহিতরা ওই রকমই দক্ষিণা পেতেন।

তখন বড্ড ছেলেমানুষ ছিলাম বলে, হাতে খড়ির পর আমাকে আর স্কুলে পাঠানো হল না। বাড়ির সামনে মল্লিকদের বস্তির ভেতর একটা পাঠশালা ছিল। পাঠশালা যাঁরা চালাতেন তাঁদের গুরুমশাই বলা হত। গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় ভর্তি হতে পয়সা লাগত না। কেবল মাঝে মাঝে গুরুমশাইকে 'সিধে' দেওয়া হত। একদিন বাড়ির চাকর একটা 'সিধে' সমেত আমাকে গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়ে এল। কিন্তু বেশীদিন আমার পাঠশালায় পড়া হল না। কেননা, মল্লিকরা ওই বস্তিটা উচ্ছেদ করে ওখানেই তাদের প্রাসাদতুল্য বাড়ি তৈরি করল। তারপর ভর্তি হলাম আমাদের বাড়ির পাশে পালেদের বাড়িতে অবস্থিত মিশনারী স্কুলে। সেখানে ছেলে-মেয়ে সব এক সঙ্গেই পড়ত। সেখানে এক বছর পড়েছিলাম। তারপর পড়েছিলাম সারকুলার রোড ও কালাচাঁদ সান্যাল লেনের মোড়ে অবস্থিত 'ফড়িয়াপুকুর আপার প্রাইমারী' স্কুলে। কয়েক বছর সেখানে পড়বার পর শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুলের সিক্স্থ্ ক্লাসে (আজকালকার ক্লাস ফাইভ) ভর্তি হলাম।

শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল তখনকার দিনে উত্তর কলকাতার এক শ্রেষ্ঠ স্কুল ছিল। ভাল ইংরেজি শিক্ষা দেবার জন্য ওই স্কুলের হেডমাস্টার বিহারীলাল সুরের সারা কলকাতার শিক্ষক মহলে সুনাম ছিল। অঙ্ক ও ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য সেকেন্ড টিচার তারকনাথ গাঙ্গুলীরও খুব প্রসিদ্ধি ছিল। ছেলেদের শুদ্ধ ইংরেজি লেখাবার জন্য বিহারীলাল সুর আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তিনি আমাদের ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে (আজকালকার ক্লাস 'টেন') পড়াতেন। প্রতি ছেলেকেই 'চেম্বারস্ টয়েনটিয়েথ্ সেঞ্চুরী ডিকশনারী' স্কুলে নিয়ে যেতে হত। পড়ার পাঠের মধ্যে হয়তো naive শব্দটা আছে। হেডমাস্টার মশাই বলে উঠলেন, "Atul, tell me the meaning of the word 'naive'।" দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, "Sir, 'naive' means 'simple'।" বললেন, 'Take your seat।' আমি

বসলাম। উনি কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলেন। তারপর আদেশ করলেন, 'Atul, go to the infant class and stand there on the bench, till I ask you to come back।'

যে অপরাধের জন্য আমার এই শাস্তি হল, তা হচ্ছে আমি naive শব্দের সঠিক মানে বলেও, বসবার পর ডিকশনারী খুলে ওই শব্দটার মানে ঠিক বলেছি কিনা, তা দেখিনি। কেননা, তাঁর motto ছিল 'Always make yourself doubly sure by consulting your dictionary'। আমি naive শব্দের সঠিক মানে বলবার পর ডিকশনারী দেখিনি বলেই আমার এই শাস্তি। এই অপরাধের জন্য অনেক ছেলেকেই infant class-এ গিয়ে বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হত। সাধারণত ক্লাসের পর উনি infant class-এ গিয়ে বলতেন,—'Now go back to your class, but never forget to make yourself doubly sure by consulting your dictionary'। কোন ছেলেকে যে infant class-এ পাঠিয়েছেন, কখনও কখনও তা ভুলেও যেতেন। তখন সে ছেলেকে পরদিনও infant class-এ বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হত। তখন ক্লাশে গিয়ে তাকে দেখতে না পেয়ে, তিনি তাড়াতাড়ি infant class-এ গিয়ে তাকে ডেকে আনতেন।

বিদ্যাসাগর স্কুলে পড়াকালীন দু'টো ঘটনা এখনও আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথমটা ঘটেছিল, তখন বোধ হয় ফার্স্ট কি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর সরকার এখানে Peace Celebration অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে তৎকালীন গভর্নর লর্ড রোনালডশের হাতে লেখা একখানা চিঠি ব্লক করে ছাপিয়ে সব স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। চিঠিখানা পাবার পরই আমি দাঁড়িয়ে উঠে শিক্ষককে বললাম, স্যার, চিঠিতে একটা বানান ভুল রয়েছে। 'Beginning' শব্দটায় মাত্র একটা 'n' আছে। সেই থেকে স্কুল-মহলে সকলে বলতে লাগল, অতুল লাটসাহেবের ইংরেজি বানানের ভুল ধরেছে।

আর দ্বিতীয় ঘটনা যেটা আমার মনে স্মরণীয় হয়ে আছে সেটা ঘটে আমি যখন ক্লাস সিক্স্-এ পড়ি। আমাদের সময় ছেলেদের ইংরেজি লিখতে হত হাঁসের পালকের কলম দিয়ে। নিবের কলমে লেখা ছেলেদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। প্রতি স্কুলের রুটিন-এ হাতের লেখার জন্য এক ঘণ্টা বরাদ্দ থাকত। বাড়ি থেকে 'হাতের লেখা' লিখে নিয়ে যেতে হত ও 'হাতের লেখা'র শিক্ষক ওই সময় সকলের হাতের লেখা দেখতেন। আমাদের 'হাতের লেখা'র শিক্ষক ছিলেন শিববাবু। শিববাবুর বাতিক ছিল, হাতের লেখা ঠিক 'কপি বুক'-এর মত হওয়া চাই। কপি বুকের মত হাতের লেখা না হলে, তিনি ছেলেদের বলতেন, হাত পাত্। তারপর

হাতের ওপর ভীষণভাবে ছাঁচি বেত মারতেন। বলা বাহুল্য, ছেলেদের নির্দয়ভাবে বেত মারা তখনকার দিনের শিক্ষকদের রীতি ছিল। শিববাবুর বেতের ভয়ে আমরা এক উপায় উদ্ভাবন করেছিলাম। আমাদের ক্লাসে হীরালাল নামে একটি ছেলের হাতের লেখা ঠিক কাঁপ বুকের মত ছিল। আমরা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে সেই পয়সা হীরালালকে উৎকোচ দিয়ে সকলেই হাতের লেখাটা তাকে দিয়ে করিয়ে নিতাম। হীরালাল পাইকারী হারে সকলের হাতের লেখা লিখে দিত। শিববাবু তো সকলের হাতের লেখা দেখে খুব খুসী। আমাদের সঙ্গে সৃষ্টিধর নামে এক ছুতোরের ছেলে পড়ত। তখনকার দিনে ছুতোরের দৈনিক মজুরী ছিল মাত্র পাঁচ-ছ-আনা। সৃষ্টিধর টিফিনের পয়সা পেত না। সে কারণে হীরালালকে উৎকোচ দিয়ে হাতের লেখা লেখাবার তার কোন অবকাশই ছিল না। একদিন শিববাবুর বোধ হয় বাড়িতে ঝগড়া হয়েছিল, সেই কারণে সেদিন তার মেজাজটা ছিল খুব খারাপ। সৃষ্টিধরের 'দেবাক্ষর' দেখে তো শিববাবু গেলেন ভীষণ ক্ষেপে। সৃষ্টিধরকে বললেন, হাত পাত্। তারপর এমন নির্দয়ভাবে বেত মারতে লাগলেন যে সৃষ্টিধরের হাত ফেটে ভীষণ রক্ত পড়তে লাগল। সৃষ্টিধর আর সহ্য করতে পারল না। হাতে ছিল সরু লোহার বাঁটওয়ালা এক ছাতা। সেই ছাতাটা দিয়ে সে শিববাবুর কপালে এমন আঘাত হানল যে, শিববাবুর কপাল ফুটো হয়ে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্তের ফোয়ারা সৃষ্টি হল। সৃষ্টিধর তাই দেখে বইপত্তর নিয়ে ছুটে ক্লাস থেকে পালিয়ে গেল। সৃষ্টিধরের শিক্ষা জীবনে সেখানেই 'ইতি' পড়ে গেল।

পঞ্চাশ বছর পরের কথা। একদিন একখানা ট্যাক্সী করে আফিস যাচ্ছি। কিছুদূর যাবার পর ট্যাক্সীচালক আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমাকে চিনতে পারছেন? আমি বললাম, না। তখন সে বলল, আমি আপনার সঙ্গে স্কুলে পড়তাম। আমার নাম সৃষ্টিধর।

আমার সঙ্গে স্কুলে আরও পড়ত রমণী ও মোহিনী মুখুজ্যে দুই ভাই, যারা ক্রিকেট মহলে প্রসিদ্ধ ছিল 'টগরে' ও 'ফকড়ে' নামে। আরও পড়ত দুখীরাম বাবুর ভাইপো ছোনে মজুমদার, যে ফুটবলের মাঠের একজন কিংবদন্তী পুরুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর, এক ক্লাস নীচে পড়ত আমাদের অ্যাসিস্টান্ট হেড-মাস্টারের ছেলে পলটু, ফুটবলের মাঠে সে-ও একজন বড় খেলোয়াড় হয়েছিল।

আমার বাবা যখন শ্যামবাজারে এসে ডাক্তারি শুরু করেন, তখন তিনি অ্যালোপ্যাথিমতে চিকিৎসা করতেন। তারপর তিনি আমাদের স্বজন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের (যিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অভ্ সায়েন্স স্থাপন করে গিয়েছেন) প্রভাবে পড়ে অ্যালোপ্যাথিমতে চিকিৎসা পরিহার করে হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা শুরু করেন। আমার বাবাই উত্তর কলকাতার প্রথম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। শ্যামবাজারের অপর প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক চন্দ্রশেখর কালীর তখন কলকাতায় আবির্ভাব ঘটে নি। তিনি তখন পাবনায় চিকিৎসা করতেন এবং সেখান থেকে হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা সম্বন্ধে একখানা বই লেখেন। বইখানার পাণ্ডুলিপি তিনি আমার বাবার কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেন। বাবা ওই বইখানায় বহু ভুল আবিষ্কার করে বইখানাকে সংশোধন করে দেন। পাবনা থেকে বইখানার যখন প্রথম সংস্করণ বেরোয়, তার ভূমিকায় চন্দ্রশেখর কালী মশাই এই ভুল সংশোধনের জন্য বাবার নিকট তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। কিন্তু কলকাতায় এসে যখন তিনি ওই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেন, তখন তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ওই অংশটা বাদ দিয়ে দেন। তারপর থেকে দুজনের মধ্যে সম্পর্কের এমনই অবনতি ঘটে যে, দুজনের একজন যে বাড়িতে চিকিৎসায় যেতেন, অপরজন সেখানে যেতেন না। আমার বাবাও হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে ইংরেজি ও বাংলায় বহু বই লিখেছিলেন। সে সব বইয়ের উল্লেখ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (পরবর্তী-কালের ন্যাশনাল লাইব্রেরী) ক্যাটালগে আছে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে সেকালে বাবার খুব নামডাক ছিল। শুধু কলকাতায় নয়, অনেক দূরদূরান্তর থেকে বাবার 'কল' আসত। দক্ষিণ ভারতে তিনি যে কয়বার গিয়েছিলেন, তা ডাক্তারি করতেই গিয়েছিলেন।

চিকিৎসা করে বাবা অনেক পয়সা উপার্জন করেছিলেন। বাবা প্রথম তিন বোনের বিয়ে দিয়েছিলেন ধনী পরিবারে। আমার বড়দিদির বিয়ে হয়েছিল বাড়ির সামনেই। মেজদিদির বিয়ে হয়েছিল বাগবাজারের মুখুজ্যেপাড়ায়। তাঁর শ্বশুরের নামে একটা রাস্তা (অন্নদা নিয়োগী লেন) এখনও তাঁদের অতীত সমৃদ্ধির চিহ্ন বহন করছে। আমার সেজ বোনের বিয়ে হয়েছিল বাগবাজারের বিখ্যাত ধনী ভুবন নেওগী মশাইয়ের বড় ছেলের সংগে। এই ভুবন নেওগী মশায়ই কলকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় 'গ্রাণ্ড ন্যাশনাল থিয়েটার' স্থাপন করেছিলেন। এ তিনজন বোনই আমার চেয়ে বড়। আর আমার চেয়ে ছোট চার বোনের বিয়েও বাবা নামজাদা পরিবারেই দিয়েছিলেন।

১১১

আগেই বলেছি যে আমাদের আদিবাড়ি ছিল গোপালপুরে। গোপালপুর থেকে এসে বাবা সরাসরি আমাদের শ্যামবাজারের পুরোনো বাড়িতে বাস করেন নি। প্রথম বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন উলটাডাঙগার একটা বাড়িতে। তখন উলটাডাঙগা ছিল একটা খুব ছোট্ট পল্লী। পল্লীটা শেষ হয়ে গিয়েছিল আজ যেখানে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। আমি ছেলেবেলায় যখন ফড়িয়াপুকুর আপার প্রাইমারী স্কুলে পড়তাম, তখন রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট থেকে খালধার পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলটাই দেখেছি একটা জলাভূমি। সব সময়েই সেটা কচুরিপানায় ভর্তি থাকত।

বাবা উলটাডাঙগার যে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলেন, সে বাড়িটায় তিনি বাস করেছিলেন মাত্র এক রাত্রি। রাত্রিতে ঘরের ভিতরে তক্তাপোষের ওপর শুয়েছিলেন। সকালে উঠে দেখেন কোন ভৌতিক ক্রিয়ায় তক্তাপোষটা বাড়ির সংলগ্ন গাছতলায় স্থানান্তরিত হয়েছে। ভয় পেয়ে বাবা সেদিনই সে বাড়ি ত্যাগ করেন।

আজকের দিনে এসব কথা রূপকথার মত শোনায়। কিন্তু আমার বাবা যে সময় এসে কলকাতায় প্রথম বাস করতে শুরু করেছিলেন, সে সময় কলকাতার পাড়াগেঁয়ে ভাবটা যায়নি। লোকের পাড়াগেঁয়ের মত সরল বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহার ছিল। লোকে প্রতিবেশীদের খুড়ো, জ্যাঠা, দাদা, দাদু ইত্যাদি নামে ডাকত। মাত্র ডাকা নয়, তাদের নিজের জ্যাঠা, খুড়ো, দাদা বলে মনে করত। আমার ছেলেবেলা পর্যন্ত কলকাতায় এই রেওয়াজই ছিল। শ্যামবাজারের মোড় থেকে শোভাবাজারের বাজার পর্যন্ত সমগ্র শ্যামবাজার স্ট্রীটের দুধারে যত বাড়ি ছিল, তাদের বাসিন্দারা পরস্পর পরস্পরকে চিনত ও জানত। আমাদের বাড়ির গায়েই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ সাংবাদিক গিরীশ ঘোষের ছেলে সাব-জজ অতুল ঘোষের বাড়ি। এই অতুল ঘোষের ছেলেই হচ্ছে সাহিত্যিক মন্মথ ঘোষ। এই পরিবারের সংগে আমাদের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু পরে কোন এক কারণে বিরোধ ঘটায়, ও'রা ও'দের শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাড়ি বিক্রি করে, কৃষ্ণরাম বসুর স্ট্রীটে শ্যামবাজার ট্রামডিপোর পিছনে জমি কিনে, সেখানে বাড়ি তৈরি করে উঠে যান। পালকির আড্ডার কথা বলতে গিয়ে আগেই বলেছি যে আমাদের বাড়ির সামনেই ছিল গোয়ালাদের (ঘোষেদের) বিরাট বাড়ি। তারা ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে লাটপ্রাসাদে দুধ সরবরাহ করত। তার সামনে ছিল বন্দুক-ওয়ালা বিশ্বাসদের (কে. সি. বিশ্বাসদের) বাড়ি। ও'দের পরিবারেই আমার বিয়ে হয়েছিল। বিশ্বাসদের বাড়ির গায়েই ছিল গৌরী-মার বাড়ি। এক পাড়ায় বাড়ি বলে গৌরী-মা প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন। তিনি পরতেন গেরুয়া

বসন ও তাঁর হাতে থাকত পাঁচহাত লম্বা এক মস্ত বড় লাঠি। আর একটু এগিয়ে গেলেই বাঁদিকে চৌধুরি লেনের মোড়ের বাড়িটায় থাকতেন 'বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। তাঁর স্ত্রীর সংগে আমার মার খুব অন্তরঙ্গতা ছিল, এবং দুজনে এক সংগেই গিয়েছিলেন নেপালে পশুপতিনাথ তীর্থভ্রমণে। আরও একটু পশ্চিমে এগিয়ে গেলে ডান দিকে ছিল ডাক্তার আর. জি. করের (রাধাগোবিন্দ করের) বাড়ি। ইঁনিই স্থাপন করেছিলেন আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। (প্রথম নাম ছিল অ্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল, পরে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল)। আরও পশ্চিমে এগিয়ে গেলে বাঁদিকে ছিল উকিল অজিত ঘোষের বাড়ি। এঁর ভারতীয় চিত্রকলার এক মূল্যবান সংগ্রহ ছিল, এবং আর্ট ক্রিটিক হিসাবে ইনি স্বনামধন্য হয়েছিলেন। এ সব পরিবারের সংগে আমার বাবার যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল এবং কাজকর্মের সময় পরস্পর পরস্পরকে নেমন্তন্ন করতেন।

কাজকর্মের কথা বলতে গিয়ে একটা কথা বলা প্রাসংগিক বলে মনে করি। সেটা সেকালের কলকাতার সামাজিকতা সম্বন্ধে। তখনকার দিনে লোককে ডাকে নিমন্ত্রণ সমাধা করা যেত না। সেরূপ নেমন্তন্ন অসামাজিক বলে মনে করা হত, যদিও পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়, শব্দগুলি নিমন্ত্রণপত্রে লেখা থাকত। হয় কর্মকর্তাকে নিজে আর তা নয়তো তাঁর ছেলেদের বা কোন নিকট আত্মীয়কে বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোকের সংগে দেখা করে নেমন্তন্ন করে আসতে হত। এ ছাড়া, ব্রাহ্মণ বাড়ি নেমন্তন্ন, ব্রাহ্মণের সাহায্যে করতে হত। মেয়েদের নেমন্তন্নও মেয়েদের নিজেদের এসে করে যেতে হত। তা না হলে মেয়েলী নেমন্তন্ন গ্রাহ্য হত না। এ ছাড়া কর্মকর্তাকে নিজের ব্যয়ে মেয়েদের গাড়ি করে তাঁর বাড়ি নিয়ে যেতে হত এবং খাওয়া দাওয়ার পর আবার নিজ নিজ বাড়িতে তাঁদের পৌঁছে দিতে হত। তখনকার দিনে লৌকিকতা লোকে টাকা দিয়ে রক্ষা করত, তার পরিমাণ ছিল আট আনা থেকে চার টাকা পর্যন্ত। আজকালকার দিনের মত দামী প্রেজেন্ট দেবার রীতি ছিল না। তবে নিকট আত্মীয়স্বজন (যেমন মাসী, পিসি ইত্যাদি) অলংকার দিয়ে কনেকে 'আশীর্বাদ' করতেন। কিছু পরে লোকেরা বই দিয়ে লৌকিকতা রক্ষা করা শুরু করেছিল।

তখনকার দিনে নেমন্তন্ন বাড়িতে দু'রকম পংক্তির ব্যবস্থা করা হত—ব্রাহ্মণদের জন্য ও অন্যান্য জাতিদের জন্য। ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণদের প্রথম ডাকা হত। ব্রাহ্মণরা ভোজনের পর 'ভোজন দক্ষিণা' পেতেন। এছাড়া, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতির লোকদের মধ্যে যাঁরা 'কুলীন', তাঁরা 'মৌলিক' আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গেলে, ভোজনের পর সম্মানসূচক দক্ষিণা পেতেন। এরও

পরিমাণ ছিল দু'টাকা থেকে আট টাকা। আমার ছেলেবেলায় এরূপ দক্ষিণা আমি পেয়েছি।

তখনকার দিনে বর বিয়ে করতে যেত মিছিল করে ব্যাণ্ড বাজিয়ে চতুর্দোলায় চেপে। বিয়ে করে ফেরবার সময় কনে আলাদা আসত মহাপায়ায় চেপে। এটা আমার বড়দার বিয়ের সময় (১৯১৩) পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমার বিয়ের সময় (১৯২৩) এটা উঠে গিয়েছিল। সব চেয়ে বড় বিয়ের মিছিল আমি যা দেখেছি তা হচ্ছে পাইকপাড়ার রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ (পরবর্তীকালের পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী রাজা বিমল সিংহের বাবা) মহাশয়ের বিয়ের সময়। শ্যাম-বাজারের পাঁচমাথার মোড় থেকে পাইকপাড়া রাজবাড়ি পর্যন্ত এই শোভাযাত্রা বিস্তৃত ছিল।

১১১

শ্যামবাজার স্ট্রীট তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ছিল। এই রাস্তা দিয়ে যেত রাসপূর্ণিমার দিন জৈনদের পরেশনাথের মিছিল। তখনকার দিনের পরেশ-নাথের মিছিল একটা দর্শনীয় মিছিল ছিল। আজকের দিনের পরেশনাথের মিছিলের তুলনায় এটা অনেক বড় ছিল। প্রায় দু'ঘণ্টা লাগত সমস্ত মিছিলটা অতিক্রম করতে। আমাদের বাড়ির বাইরের মহলের একতলা ছাদটা ছিল খুব প্রশস্ত। সেজন্য পরেশনাথ মিছিলের দিন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব অনেক লোকের সমাবেশ হত আমাদের বাড়িতে পরেশনাথের মিছিল দেখবার জন্য। একবার রাসপূর্ণিমার সময় শ্যামবাজার স্ট্রীটটা মেরামত হতে লাগল। তখন থেকেই পরেশনাথের মিছিল শ্যামবাজার স্ট্রীটের পরিবর্তে গ্রে স্ট্রীট (বর্তমান অরবিন্দ সরণী) দিয়ে যেতে আরম্ভ করল।

এ ছাড়া, রাখীপূর্ণিমা ও দোলপূর্ণিমার দিন কনসার্ট পার্টির মিছিল বেরুত। সে যুগে কনসার্টের প্রতি লোকের খুব অনুরাগ ছিল। আমাদের পাড়াতেই ছিল দক্ষিণারঞ্জন সেন মশায়ের কনসার্ট পার্টি ('ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা')। এরা কনসার্ট বাজিয়ে ছিল ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মিকী প্রতিভা'র দ্বিতীয় অভিনয়ের সময়। তবে বিখ্যাত কনসার্ট পার্টি ছিল কম্বুলিয়াটোলায় ননী নেওগী মশাইয়ের। তিনি ছিলেন আমার বড়দার দাদাশ্বশুর (তার মানে শ্বশুরের বাবা)। তাঁর কনসার্ট পার্টির খুব নামডাক ছিল। তিনি বড়লাট লর্ড রিপনের বাড়ি কনসার্ট বাজাবার জন্য প্রায়ই আমন্ত্রিত হতেন। পরবর্তী-কালে আমি ও'দের দলকে দেখেছি পরেশনাথ মিছিলের মধ্যে একখানা খুব বড়

গাড়িতে বসে কনসার্ট বাজাতে।

কনসার্টের কথা বলতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ে গেল। কনসার্ট ছিল সে যুগের থিয়েটারের একটা প্রধান অংগ। অভিনয় শুরু হবার আগে কনসার্ট তো বাজাতেই হত। তা ছাড়া, প্রতি ইনটারভেলে কনসার্ট বাজানো হত।

থিয়েটারের প্রসংগ যখন তুললাম, তখন একটা কথা বলি। আমি ছেলেবেলায় থিয়েটার দেখতে খুব ভালবাসতাম। তখনকার দিনে থিয়েটার কখনও কখনও আজ সন্ধ্যায় আরম্ভ হয়ে, কাল সকালে শেষ হত। এক এক রাত্রে চার-পাঁচ খানা (পাল-পার্বণে আট-দশ খানা) করে নাটক অভিনীত হত। থিয়েটারে বেশী ভীড় হত গ্যালারিতে। প্রবেশ দক্ষিণা ছিল মাত্র আট আনা। তার ওপরের শ্রেণী ছিল 'পিট'। 'পিট'-এর প্রবেশ দক্ষিণা ছিল এক টাকা।

থিয়েটার দেখতে আমাদের পরিবারের পয়সা লাগত না। কেননা, থিয়েটারের সংগে আমাদের পরিবারের একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল। আগেই বলেছি যে আমার সেজ বোনের শ্বশুর ভুবন নেওগী মশাই ছিলেন কলকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গমহল 'দি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর প্রতিষ্ঠাতা। তাছাড়া, আমার 'ন' বোনের মাসশ্বশুর দাসু নেওগী মশাই ছিলেন স্টার থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী। এই সকল কারণে থিয়েটারওয়ালাদের সংগে আমার বাবার খুব খাতির ছিল। থিয়েটারের দ্বার সবসময় আমাদের পরিবারের কাছে উন্মুক্ত ছিল। আমাদের পরিবারের সকলেই এই সুযোগের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করত। এই সূত্রেই থিয়েটারের নটীরা প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন।



আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আক্ষেপ যা থেকে গিয়েছে, তা হচ্ছে আমি স্বামী বিবেকানন্দকে দেখতে পাই নি। দু-এক বছর আগে জন্মালেই তাঁকে দেখতে পেতাম। বড় হয়ে যখন স্বামীজির বইগুলো পড়েছিলাম, তখন তাঁর প্রতি আমার গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মেছিল। তবে স্বামীজিকে দেখতে না পেলেও, প্রতিদিন দেখতে পেতাম তাঁর একান্ত শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাকে। ভগিনী নিবেদিতা বাগবাজারে থাকতেন। যখন তিনি বাইরের কাজে বেরুতেন, তখন তিনি শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোতে গিয়ে ট্রাম ধরবার জন্য আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই যেতেন। ভগিনী নিবেদিতার আসল নাম ছিল মারগারেট এলিজাবেথ নোবল। সত্যিই তিনি মহৎ (নোব্‌ল) বংশের মেয়ে ছিলেন। সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এসে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম ও আদর্শের

কাছে আত্মসমর্পণ করে সন্ন্যাসিনীর যে রূপ ধারণ করেছিলেন, তা অত্যন্ত অপূর্ব। পরে যখন তাঁর রচিত 'দি ওয়েব অভ্ ইণ্ডিয়ান লাইফ', 'কালী দি মাদার', 'ক্র্যাড্‌ল টেলস্ অভ্ হিন্দুইজম', 'রিলিজন অ্যাণ্ড ধর্ম', 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' প্রভৃতি বইসমূহ পড়েছিলাম তখন মুগ্ধ হয়েছিলাম এই মহিলার ভারতপ্রীতি দেখে। বাবার কাছে শুনেছিলাম যে আমি জন্মাবার কয়েক বছর আগে কলকাতায় যখন পর পর দু বছর প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সংগে নিবেদিতাও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেবাকার্যে। পরে রাজনীতিতে যোগদানের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সংগে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছিল, কিন্তু তিনি নিজের আত্মপরিচয় দিতেন 'সিস্টার নিবেদিতা অভ্ রামকৃষ্ণ অ্যাণ্ড বিবেকানন্দ' বলে। তিনি বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রীয় মুক্তিই হচ্ছে আত্মিক মুক্তির প্রধান উপায়। অখণ্ড ভারতবর্ষ ছিল নিবেদিতার স্বপ্ন। বালিকাদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনার উদ্বোধনের জন্য তিনি বাগবাজার অঞ্চলে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তা আজ 'নিবেদিতা স্কুল' নামে পরিচিত। আমার সাত-আট বছর বয়স পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

সারদামাকেও আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। মাঝে মাঝে তিনি বাগবাজারে এসে থাকতেন। এছাড়া, ঠাকুরের পরম অনুগামিনী গৌরীমাকে তো প্রত্যহ দুবেলাই দেখতাম। আমাদের শ্যামবাজার পাড়াতেই তিনি থাকতেন। আমাদের বাড়ি থেকে দু'চারখানা বাড়ি পরে। আমাদের বাড়িও তিনি ঘন ঘন আসতেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ের দুর্গম স্থানে কঠোর তপস্যার পর, ২৫ বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আসেন ও তাঁরই নির্দেশে স্ত্রীজাতির সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। সারদেশ্বরী আশ্রম ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁরই কীর্তি। আমার এক বোন তাঁরই বিদ্যালয়ে পড়ত। সে সময় আমি গৌরীমার শিষ্যা দুর্গাপুরী দেবীর সংস্পর্শে আসি। তিনিই তখন ছিলেন গৌরীমার স্কুলের অধ্যক্ষা। এ মহিলারও জীবনকাহিনী বিচিত্র। পিতা বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁকে ভগবানের কাছে উৎসর্গ করে পুরীর জগন্নাথদেবের সংগে আনুষ্ঠানিক বিবাহ দেন। মাত্র আট-ন' বছর বয়সে তিনি সারদা-মার কাছে দীক্ষা নেন ও চোদ্দ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও সংস্কৃতে 'সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ' হন। তিনি গৌরীমা প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের কাজে লিপ্ত থেকে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতিবিধানেই সারাজীবন নিযুক্ত ছিলেন।

১১১

আমার ছেলেবেলায় জিনিসপত্তরের দাম খুব সস্তা ছিল। চালের দর ছিল দু' টাকা মণ। দু-এক বছর আগে ছিল দেড় টাকা মণ। তবে বুয়ার যুদ্ধের জন্য দাম বেড়ে দেড় টাকা থেকে দু'টাকা হয়েছিল। তবে মেয়েরা বুয়ার যুদ্ধটুদ্ধ ওসব কিছু বুঝত না! মূল্যবৃদ্ধির সমস্ত কারণটা চাপিয়ে দিয়েছিল আমার ঘাড়ে। তারা প্রায়ই বলত, ছেলেটা কী অপয়া, সংগে করে নিয়ে এসেছে জিনিস-পত্তরের দুর্মূল্যতা। সে যাহোক, আমি যখন ইহজগতে আবির্ভূত হলাম, তখন চালের দাম ছিল দু' টাকা মণ। অধিকাংশ ডালের দাম ছিল ছ' পয়সা সের। আটা দু' পয়সা সের, ময়দা চার পয়সা, সরিষার তেল দশ পয়সা, চিনি দু'আনা ও ভাল ভয়সা ঘি দশ আনা সের। মাখন আট আনা সের। মাংস ছ' আনা সের। বাগদা, ট্যাংরা, পারসে ইত্যাদি মাছ চার আনা সের। কাটা রুই মাছ ছ'আনা সের। ফিরিওয়ালা হেঁকে যেত, 'টাকায় চারখানা কাপড়, একখানা ফাউ'। তবে সে কাপড় হচ্ছে পাঁচ হাতি কাপড়। দশ হাতি বিলাতী লাটটু মার্কা ভাল কাপড় দেড় টাকা থেকে সাতসিকা জোড়া বিক্রি হত। এখনকার আট আনা দামের রসগোল্লার নাম ছিল 'রসমুণ্ডি'। এক পয়সায় চারটে রসমুণ্ডি পাওয়া যেত। ফাউ চাইলে, দোকানদার আরও একটা ফাউ দিত। আর বাকী যত রকম খাবার ছিল, সব পাওয়া যেত ছ'আনা সের দরে।

সে যুগের টাকা পয়সার কথা বলি। তখনকার দিনে চালু ছিল খাঁটি তামার তৈরী এক পয়সা। এগুলোর সাইজ ছিল আজকালকার আধুলির মত। অধিকাংশ চলিত পয়সার ওপর ছাপ থাকত 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৮৩৪' বা কুইন ভিক্টোরিয়ার। তবে খুচরা কাজকর্ম বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হত আধলা পয়সার সাহায্যে। এগুলোর সাইজ ছিল স্বাধীনোত্তর যুগের ফুটো পয়সার সাইজ, তবে তাতে ফুটো থাকত না। এ ছাড়া ছিল পাই পয়সা (তিন পাই পয়সায় এক পয়সা হত) ও তামার ডবল পয়সা। ডবল পয়সার সাইজ ছিল আগেকার টাকার সাইজ। এক আনার কোন মুদ্রা ছিল না। রুপার মুদ্রার মধ্যে ছিল দু-আনি, চার-আনি, আধুলি ও টাকা। তখনকার দিনের পাঁচ টাকার ও দশ টাকার নোটের আকার এখনকার নোটের চেয়ে অনেক বড় ছিল। কালো ও গোলাপী কালিতে মাত্র এক পিঠে ছাপা হত, পিছন পিঠ খালি থাকত। পাঁচ টাকার নীচে কোন নোট ছিল না। এক টাকার নোট প্রথম চালু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৮) সময়। দু'টাকার নোট অনেক পরে চালু হয়েছিল। তখনকার দিনে নোট ব্যবহারের রীতি সম্বন্ধে একটা কথা বলি। অপরকে টাকা পাঠাবার দরকার হলে, লোক প্রায়ই

নোটের অর্ধাংশ কেটে খামে করে ডাকযোগে পাঠাত। তারপর প্রাপক প্রাপ্তিস্বীকার করলে, বাকী অংশ তাকে পাঠাত। সেজন্য আমাদের ছেলেবেলায় প্রায়ই কাটা-নোটের দু'অংশ পিছন দিকে এক ফালি সরু কাগজ দিয়ে জোড়া অবস্থায় বাজারে চালু ছিল। লোক শুধু দু'অংশের নম্বর মিলিয়ে সে সব নোট গ্রহণ করত। এ প্রথা উঠে যায় যখন নোটের পিছন দিকও ছাপা হতে লাগল। তখন থেকে কাটা-ছেঁড়া নোট অচল বলে ঘোষিত হল।



আমার ছেলেবেলায় গুজব প্রায়ই মানুষকে বিব্রত করত। আগেই বলেছি যে আগে খাঁটি তামার পয়সা ছিল। আমার ছেলেবেলাতেই প্রথম তামার সংগে নিকেল-মেশানো পয়সা বেরোয়, ঠিক সোনার মত দেখতে। সংগে সংগেই একদল স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোক গুজব রটিয়ে দিল যে টাঁকশালে পয়সা তৈরীর সময়, তার সংগে সোনা মিশে গিয়েছে। আর কি ? এক পয়সার মুদ্রা, দু-চারটাকায় কেনার হিড়িক পড়ে গেল। এসময় ডবল পয়সা উঠে গেল ও এক আনার মুদ্রার প্রবর্তন হল।

আরও গুজবের কথা বলি। একবার গুজব রটল যে পানে একরকম বিষাক্ত পোকা ধরেছে, যার ফলে পান খেলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। লোক আতঙ্কিত হয়ে পান খাওয়া ছেড়ে দিল। তবে যারা গুণ্ডি-দোক্তা ইত্যাদি খেত এবং সেই কারণে পান না খেলে যাদের চলত না, তারা জলে কেরোসিন তেল মিশিয়ে. সেই জলে পানগুলো ধুয়ে নিয়ে তারপর খেত। তাদের ধারণা ছিল যে বিষে বিষক্ষয় হবে। তবে সত্যি পানে পোকা ধরেছিল কিনা জানি না। মনে হয় পান ব্যবসায়ীদের জব্দ করবার জন্য কেউ এই গুজব রটিয়েছিল।

আর একটা গুজব রটল যে মানিকতলা অঞ্চলে একটা গাছের ওপর কোন এক প্রাণী এক অতিকায় ডিম পেড়েছে। এবং এই ডিম থেকে মাঝে মাঝে আকাশবাণী হচ্ছে, 'ফাটব, না ফুটব।' লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। কৌতূহলী হয়ে আমিও সেটা দেখে এলুম। দেশ-বিদেশ থেকেও লোক সেই রহস্যাবৃত ডিম দেখতে এল। পরে ধোঁকাটা ধরা পড়ে গেল। কে বা কারা কৌতুক করবার জন্য একটা মস্ত বড় মাটির জালায় চুন লাগিয়ে গাছের ওপর স্থাপন করেছিল এবং ওই জালার ভিতর থেকে একটি ছোট ছেলে ওই আকাশবাণী করছিল।

গুজবের কথা ছেড়ে দিয়ে এবার বাস্তবে আসা যাক। আমার মামার-বাড়ি ছিল চন্দননগরে। সেবার মায়ের সংগে মামার বাড়ি গিয়েছি। অনেক রাত্রে মা আমাকে

ঘুম থেকে তুলে বললেন, ওঠ, আকাশে খ্যাংড়া হাতে জটেবুড়ি উঠেছে, দেখবি চল। আমি ঘুমন্ত চোখে উঠে এসে দেখলুম যে আকাশে একটা মস্তবড় তারা দেখা যাচ্ছে, আর তা থেকে ঠিক ঝাঁটার মত আলোকছটা বেরুচ্ছে। পরে কলকাতায় ফিরে এসে আমার বড়দার কাছে শুনলাম যে ওটা ধূমকেতু। ওটার নাম হ্যালীর ধূমকেতু। জ্যোতির্বিদ এডমণ্ড হ্যালী ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ওই ধূমকেতুটি আবার দেখা দিবে ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে এবং প্রায় প্রতি ৭৫ বৎসর অন্তর ওর আবির্ভাব হবে। শেষ দেখা গিয়েছে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে যখন আমি ওটাকে দেখেছিলাম। ওটাকে আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে। বৃহস্পতিকে কেন্দ্র করে ওর গতিপথ উপবৃত্তাকারে আকাশে বিস্তৃত এবং ওই গতিপথ পরিভ্রমণ করতে ওর ৭৫ বৎসর সময় লাগে। পৃথিবী থেকে সূর্যের যে দূরত্ব, তার ৩৫ গুণ অধিক দূরত্বে হ্যালীর ধূমকেতু অবস্থিত।

লোকের বিশ্বাস যে ধূমকেতু যে বছর দেখা দেয়, সে বছরে নাকি নানারকম অমঙ্গল ঘটে। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দেও ঠিক তাই হল। সম্রাট এডওয়ার্ড মারা গেলেন। সম্রাটের মৃত্যু দিনটা আমার বেশ পরিষ্কার মনে আছে। তখন আমি সারকুলার রোড ও কালাচাঁদ সান্যাল লেনের মোড়ে অবস্থিত নেত্যবাবুর আপার প্রাইমারী স্কুলে পড়তাম। সেদিন স্কুলে যাওয়া মাত্রই স্কুলের ছুটি হয়ে গিয়েছিল।



কালাচাঁদ সান্যাল লেনের মোড়ের ওই স্কুলে বসেই দেখতাম সারকুলার রোডে বৃহদাকার জলের পাইপ বসানো। তখন সবেমাত্র টালার জলের ট্যাংকটা তৈরী হয়েছে। এবং ওখান থেকে জল সরবরাহের জন্য কলকাতা শহরে বৃহদাকার পাইপ বসানো হচ্ছিল।

কালাচাঁদ সান্যাল লেন ও সারকুলার রোডের মোড়ে যেমন নেত্যবাবুর স্কুল ছিল, তেমনই কালাচাঁদ সান্যাল লেনের অপর মোড়ে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ওপর আমার বাবার ডাক্তারখানা ছিল। কালাচাঁদ সান্যাল লেনের ভেতরেই ছিল ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে আই-এফ-এ শীলডের বিজয়ী মোহনবাগান দলের প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় দুই ভাই শিব ভাদুড়ী ও বিজয় ভাদুড়ীর বাড়ি। সব সময়েই এঁরা সাইকেলে করে ঘোরাফেরা করতেন। এঁরা আমাকে খুব ভালবাসতেন। যখনই গলি থেকে বেরুতেন, তখনই একবার আমার বাবার ডাক্তারখানায় ঢুঁ মারতেন। যদি আমি সে সময় আমার বাবার ডাক্তারখানায় থাকতাম তা হলে সাইকেলের

সামনে আমাকে তুলে নিতেন এবং খানিকটা পথ আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতেন। আমার ছেলেবেলার অনেকটা সময় এই দুই ভাইয়ের সঙ্গেই কেটেছে। শিব ভাদুড়ী পশুচিকিৎসক হিসাবে ভেটেরেনারি কলেজের সংগে যুক্ত ছিলেন। দুই ভাইয়ের মধ্যেই ছিল অসাধারণ স্বাদেশিকতার উন্মাদনা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁরা রচনা করেছিলেন বহু স্বদেশী গান। আমাদের একটা ছাপাখানা ছিল, নাম 'সুর প্রেস'। ও'দের ওই স্বদেশী গানের বইটা আমাদের ছাপাখানাতেই ছাপা হয়েছিল।



তখনকার দিনের একটা কথা শুনলে এখন অনেকেরই হাসি পাবে। ওড়িয়া ও চীনারা তখন মেয়েদের মত মাথায় লম্বা চুল রাখত এবং অনেকেই মেয়েদের মত মাথায় খোঁপা বাঁধত। আমাদের পাড়ায় ওড়িয়াদের তেলেভাজার ও বেনেমশলার দোকান ছিল। তাছাড়া, ওড়িয়া ধোপা, ওড়িয়া পাল্কি বাহক ও ওড়িয়া জলকলের মিস্ত্রি ছিল। এসব ওড়িয়াদের মধ্যে অনেকেই মাথায় মেয়েদের মত খোঁপা বাঁধত।

চীনাদের মধ্যেও ওই পদ্ধতি ছিল। ওই সময় আমার বাবার ডাক্তারখানার সামনে ট্রাম ডিপোর গায়ের বস্তিটা ভেঙে ফেলে পাথুরিয়াঘাটার যদু মল্লিকের ছেলে প্রমথ মল্লিক তার বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ওই প্রাসাদ তৈরী করার সময় দরজা, জানালা প্রভৃতি চীনা ছুতোর মিস্ত্রিরা তৈরী করেছিল। সেজন্য পাড়ায় প্রতিদিন সকালে বহু চীনা মিস্ত্রি আসত। তাদের সকলেরই মাথায় মেয়েদের মত লম্বা চুল ছিল। তখনকার দিনে চীনা পুরুষদের এরকম লম্বা চুল রাখার পদ্ধতি ছিল। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে চীন দেশে রাজতন্ত্র খতম্ করে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। এর পরই চীনদেশে পুরুষদের মাথায় চুল রাখা পদ্ধতি লোপ করা হয়।



১৯১২ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ মাড়বারীরা কলকাতায় ব্যাপকভাবে এক রকম জুয়া খেলার প্রবর্তন করে। তার নাম ছিল 'কটন ফিগার' বা 'তুলোর খেলা'। রাতারাতি কলকাতা শহরে হাজার হাজার তুলোর খেলার দোকান গজিয়ে ওঠে। খেলাটা হচ্ছে এই যে, আজ যদি কেউ এক থেকে দশ নম্বর-এর মধ্যে কোন এক নম্বর ধরে এবং সেই নম্বরটা যদি আগামী কাল ওঠে, তা হলে সে এক আনার

পরিবর্তে আট আনা পাবে। যে কোন তুলোর খেলার দোকানে গিয়ে আপনার পয়সা ওই খেলায় লাগাতে পারতেন। প্রতি দোকানেই ডাইং-ক্লিনিং-এর দোকানের রসিদের মত রসিদ বই থাকত। আপনি যে নম্বরটা ধরলেন, দোকানদার সেই নম্বর-এর বিপক্ষে কত পয়সা লাগালেন তা লিখে দিত। পরের দিন যদি ওই নম্বরটা উঠত তা হলে আপনি ওই দোকানে রসিদ খানা নিয়ে গেলেই আপনার প্রাপ্য পয়সা পেতেন। খেলাটা শহরের লোককে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিল যে, সারা শহরে জুয়ার স্রোত বহে গিয়েছিল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বাড়ির কর্তা খেলেন, গিন্নী খেলেন, বৌ খেলে, মেয়ে খেলে, ছেলে খেলে, জামাই খেলে, রাঁধুনী বামুন খেলে, ঝি-চাকর খেলে, মুটে খেলে, মজুর খেলে, দোকানদার খেলে, ব্যবসায়ী খেলে। এক কথায় শহরের সকল শ্রেণী, সম্প্রদায় ও স্তরের লোকই তুলোর খেলায় মত্ত হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির মেয়েমহলেই ছিল উত্তেজনাটা বেশী। একদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। সেদিন আমাদের বাড়ির সংলগ্ন মল্লিকদের বাড়ির ঝি একথালা সন্দেশ এনে আমার মার সামনে রাখল। বলল, মা পাঠিয়ে দিলেন। তখনকার দিনে কোন সুসংবাদ থাকলে প্রতিবেশীরা পরস্পরের বাড়ি সন্দেশ পাঠিয়ে সংবাদটা দিতেন। (শব্দতাত্ত্বিকদের এটা গবেষণার বিষয় যে 'সন্দেশ' শব্দের অর্থ 'সংবাদ', এই প্রথা থেকে উদ্ভূত হয়েছে কিনা)। মল্লিকবাড়ির ঝিকে মা জিজ্ঞাসা করলেন, কী সংবাদ গো? ঝি উত্তরে বলল, মা আজ বাজিমাৎ করেছেন কিনা, তাই এই সন্দেশ পাঠিয়ে দিলেন। মল্লিক বাড়ির ছাদের পাঁচিলের ধারে দাঁড়ালেই, আমাদের বাড়ির লোকদের সংগে কথাবার্তা বলা যেত। কিছু পরেই পাঁচিলের ধারে মল্লিক গিন্নীর আবির্ভাব হল। উচ্চকণ্ঠে তিনি ডাকছেন, ও দিদি, ও দিদি, একটা সুসংবাদ শোন। পরশু রাত্তিরে স্বপ্নে দেখি যে মা চণ্ডী স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে বলছেন, 'কাল তুই পাঁচ নম্বরে পাঁচ টাকা লাগা।' তাই কাল পাঁচ নম্বরে পাঁচ টাকা লাগিয়েছিলাম। আজ চল্লিশ টাকা পেয়েছি। তারপর একগাল হেঁসে বললেন, বুঝেছ, কর্তার একমাসের মাইনের চেয়েও বেশী। মা ক্লিষ্ট মনে কথাটা শুনলেন, কেননা, মায়ের নম্বর ওঠেনি। মা মল্লিক বাড়ির ঝিকে ডেকে বললেন, হ্যাঁরে, তুই তো গিন্নীমার নম্বর লাগিয়ে আসিস, তা তুই পাঁচ নম্বরে কিছু লাগাস নি? মল্লিকবাড়ির ঝি বলল, তা আর কী করে লাগাই বল মা, গিন্নী যে ছেলের দিব্যি দিয়ে দেয়। একটা ছেলে নিয়ে ঘর করি, কী করে ওই দিব্যি অমান্য করি বল? বস্তুত এই সময় মানুষের মনে স্বার্থপরতা খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। কেউ চাইত না যে, তার নম্বরের সাহায্যে অপরে লাভবান হয়। সকলেরই এক চিন্তা। কালকের নম্বর কি ভাবে আবিষ্কার করা যাবে। মল্লিক

গিন্নীর সাফল্যের কথা শুনে, আমাদের পাড়ার অনেকেই কালীঘাটে গিয়ে মানত করল, মা, আমাকে কিছু টাকা পাইয়ে দাও, আমি টাকায় একআনা হারে তোমার পুজো দিয়ে যাব। অনেকে আবার অন্যান্য কালীতলায় গিয়ে গণনা করাতে লাগল, কালকের নম্বর কি হবে।

তুলোর খেলায় যে নম্বরটা উঠত, সেটা আমেরিকার নিউ অরলীনস শহরের তুলোর ফাটকা-বাজারের দরের ভিত্তিতে নির্ধারিত হত। তুলোর খেলার যে বোর্ডগুলি দোকানের সামনে টাঙানো থাকত, তাতে এক থেকে দশ নম্বর ছাড়া আরও দু তিনটা বহু অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা থাকত। সকলেরই ধাঁধা ছিল, ওই সংখ্যাগুলি থেকে পরদিনের নম্বর আবিষ্কার করা।

আমার বাবার ডাক্তারখানায় তিন বৃদ্ধ মিলিত হতেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম জন ছিলেন গোপালচন্দ্র দাস মশাই। তিনি বাংলাভাষার অভিধানকার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মশাইয়ের জ্যাঠামশাই। তিনি সকাল থেকেই আমার বাবার ডাক্তারখানায় বসে থাকতেন। আমার জীবনের ওপর তাঁর প্রভাবের কথা পরে বলব। এখানে যে কথা বলতে চাই, তা হচ্ছে যে গোপালবাবুই বোধ হয় শহরের একমাত্র লোক যিনি তুলোর খেলা খেলতেন না। অপর দু'জন ছিলেন সিংগি মশাই ও দীনবন্ধু মিত্তির মশাই। এঁরা বিকালে আসতেন। জ্যোতিষী হিসাবে সিংগি মশাইয়ের বেশ নামডাক ছিল। তিনি একবার আমার হাত দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে লেখাপড়া আমার মোটেই হবে না, আমি ভবিষ্যতে ছুতোরের কাজে বিশেষ দক্ষ হব! সিংগি মশাই জ্যোতিষের সাহায্যে নম্বর বের করে তুলোর খেলা খেলতেন। মাঝে মাঝে তিনি সফল হতেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই অকৃতকার্য হতেন।

মিত্তির মশাই আগে অ্যাকাউন্টটেন্ট-জেনারেলের অফিসে চাকরি করতেন। তুলোর খেলার সময় তিনি অবসরপ্রাপ্ত বেকার। তিনি সারাদিন ধরে ওই বহু-সংখ্যা-বিশিষ্ট রাশিগুলি নিয়ে অঙ্ক কষতেন, আর পরের দিনের সংখ্যা বের করবার চেষ্টা করতেন। একদিন বিকালবেলা মিত্তির মশাই বেশ উৎফুল্ল হয়ে এসে বাবাকে বললেন, ডাক্তার, কেল্লা ফতে করেছি, শালা অমুকের বাচ্চারা আর কতদিন আমাদের ঠকাবে। অঙ্ক কষে নম্বরের মূলসূত্র বের করে ফেলেছি। কালকের নম্বর হচ্ছে ছয়। আমার বাবা, সিংগি মশাই ও মিত্তির মশাই—এই তিনজনেই সেদিন '৬' নম্বরে এক টাকা করে লাগিয়ে দিলেন। সে-রাতটা আমার ঘুম হল না। পরদিনের জন্য খুব উৎসুক হয়ে রইলাম। পরদিন দেখি—'ভো কাট্টা'। উঠল '৯' নম্বর। 'ছয়' নম্বরের পরিবর্তে 'নয়' নম্বর ওঠায় তিনজনের টাকাই নয়-ছয় হয়ে গেল।

এই রকমভাবে সমস্ত শহরের লোকই, সেই কালকের নম্বর কি আসবে তাই

নিয়ে জল্পনা-কল্পনা, অংক-কষাকষি ও জ্যোতিষের শ্রাদ্ধ করতে লাগল। কিন্তু কেউ কারুকে বলতে চাইত না সে সেদিন কোন নম্বরে বাজি লাগিয়েছে, পাছে আর কেউ সেটা জানতে পেরে লাভবান হয়। যার নম্বর উঠত, সে সেদিন বুক ফুলিয়ে হাঁটত। আর যার উঠত না, সে বেপরোয়া হয়ে 'যুদ্ধং দেহি' বলে পরের দিনের জন্য প্রস্তুত হত।

এইভাবে সারা শহরে প্রবাহিত হল জুয়ার বন্যা। লোক এক আনা লাগিয়ে আট আনা পেলে, আগেকার নষ্টধন উদ্ধারের জন্য, আট আনাই লাগিয়ে দিত পরের দিনের জন্য অন্য এক নম্বরে। সকলেরই এক আকাঙ্ক্ষা, অপরকে টেক্কা দেওয়া। এই টেক্কা দেবার আকাঙ্ক্ষা এমন তীব্রভাবে লোককে আক্রান্ত করল যে, লোক দশ আনা পয়সা খরচ করে দু'খানা রসিদ কাটতে লাগল—একখানা জোড় সংখ্যার, আর একখানা বিজোড় সংখ্যার। নম্বর-এর আর পালাবার উপায় নেই। জোড় নম্বর উঠলে, মাত্র জোড় নম্বরের রসিদখানা অপরকে দেখিয়ে গর্ব বোধ করত। আর যদি বিজোড় নম্বর উঠত, তা'হলে মাত্র বিজোড় সংখ্যার রসিদখানাই দেখাত। আশ্চর্য হয়ে লোক পরস্পর বলাবলি করত, দ্যাখ, অমুকের বরাত কি, রোজই বাজিমাত্ করছে। প্রথম যারা এটা করত, তারা এটাকে গোপন রাখত। কিন্তু যখন রহস্যটা ফাঁস হয়ে গেল, তখন সকলেই ওই এক পন্থা অবলম্বন করল। ফলে, দশ আনা লাগিয়ে লোক আট আনা পেতে লাগল। আজকের দিনের লোক বুঝতে পারবে না যে, সেদিন ওই দুই আনা ক্ষতির পরিমাণ কত। কেননা, তখনকার দিনে যে-কোন মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনিক বাজার খরচ হত মোট চার আনা। সেদিনকার দিনে বাজারে পারশে, ট্যাংরা, বাগদা চিংড়ি, ভেটকি প্রভৃতি মাছের দর ছিল তিন আনা থেকে চার আনা সের, আর কাটা বড় রুই মাছের দর ছিল ছ' আনা সের। তিনটা বড় বড় বেগুন পাওয়া যেত এক পয়সায়, আলুর সের ছিল দু থেকে চার পয়সা, আধ পয়সায় এক আটি নটে কিংবা কলমী শাক পাওয়া যেত, যার ওজন হবে আধ সেরের কাছাকাছি। তবে তখনকার দিনে কোন তরি-তরকারী (আলু ছাড়া) বা শাক ওজন দরে বিক্রি হত না। মাংস ছ' আনা সের ছিল, আর হাঁসের ডিমের দাম ছিল এক পয়সায় একটা।

সুতরাং শেষের দিকে যখন পরাজয়কে টেক্কা দেওয়ার জেদ মানুষকে গ্রাস করল, তখন বহু লোক ও পরিবার তুলোর খেলার প্রকোপে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। সংবাদপত্রে এই নিয়ে আন্দোলন হতে লাগল। খেলার সূচনা থেকে প্রায় আট-দশ মাস উত্তীর্ণ হবার পর, সরকার খেলাটা বন্ধ করে দিল। কিন্তু যারা সর্বস্বান্ত হল, তাদের প্রায় সবাই বাঙালী, আর যাদের সিন্দুকে গিয়ে বাঙালীর পয়সাটা পেঁছাল তারা মাড়বারী।

খেলাটা উঠে যাবার পর আবার রাতারাতি পট পরিবর্তন হল। কেউ তুলোর খেলার দোকানকে রূপান্তরিত করল খাবারের দোকানে, কেউ ড্রাইং-ক্লিনিং-এর দোকানে, কেউ ছাতার দোকানে, কেউ ঘড়ির দোকানে, কেউ স্টীল-ট্রাংকের দোকানে, কেউ বা আবার চপ-কাটলেটের দোকানে!

শহরের বুকের ওপর প্রকাশ্যভাবে দিনের আলোয় এরূপ ব্যাপক জুয়ার স্রোত পূর্বে বা পরে আর কখনও হয়নি।



এরই পদক্ষেপে এল বাঙালীর আর এক সর্বনাশ। শহরের উন্নতিকল্পে সরকার প্রণয়ন করলেন 'ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট অ্যাকট্'। পরিকল্পনায় শীর্ষস্থান পেল শহরের বুক চিরে একটা বড় রাস্তা তৈরি করা, যার নাম এখন চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনু। (আগেকার নাম সেনট্রাল অ্যাভেনু)। শহরের যে অংশের বুক চিরে এই রাস্তাটা তৈরি করা হল, সেটা ছিল ঘন বসতিবহুল বাঙালী পল্লী। ফলে বহু বাঙালী গৃহচ্যুত হল। ক্ষতিপূরণস্বরূপ তারা যে টাকা পেল, তা দিয়ে তাদের নষ্ট জমির এক-ভগ্নাংশও উদ্ধার করা সম্ভবপর হল না। এগিয়ে এল সদ্যপ্রসূত ধনী মাড়বারী সমাজ। তারাই উচ্চমূল্যে কিনতে লাগল সেণ্ট্রাল অ্যাভেনুর উভয় ধারের জমি। তাদের বাড়িগুলোই আজ বুক ফুলিয়ে শোভাবর্ধন করছে সেণ্ট্রাল অ্যাভেনুর। কিন্তু ওই সব বাড়ির তলায় নিহিত আছে বহু ভিটাচ্যুত বাঙালী পরিবারের দীর্ঘশ্বাস। অনেক সময়ই স্মরণ করি রবীন্দ্রনাথকে। 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা—যুগযুগধাবিত যাত্রী। হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।'

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট আরও একটা রাস্তা বানাতে লাগল। সেটা হচ্ছে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। শ্যামবাজার ব্রীজ রোড (এখন এর নাম আর. জি. কর রোড) বিস্তৃতকরণও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হল। পুরোনো কালের যত বসতবাড়ি ছিল, সেগুলো সব ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হল। পিছনের জলাভূমিকে সমতল করে মাঠ করে দেওয়া হল। তারপর দেশবন্ধু পার্কের পুকুরটা কাটানো হল।

ওই সব বাড়ি মাঠ করে দেবার পর, আমাদের সার্কাস দেখবার সুবিধা হল। শীতকালে ওই সব মাঠে এসে পড়তে লাগল সার্কাসের তাঁবু। আগে সার্কাস দেখতে হলে, আমাদের যেতে হত গড়ের মাঠের ময়দানে। তবে গড়ের মাঠে যে সব সার্কাস ছেলেবেলায় দেখেছিলাম, তাদের কেউই শ্যামবাজারের মাঠে তাঁবু ফেলতে এল না। আগেকার দিনের অনেক বিখ্যাত সার্কাস আমরা ছেলেবেলায়

গড়ের মাঠের ময়দানে দেখেছি। একবার এসেছিল 'রয়েল ইটালিয়ান সার্কাস'। সমস্ত দলটাই সাহেব-মেমে ভরা। তাদের দেখানো অনেক চিত্তাকর্ষক খেলা আজও আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে। একটা খেলায়, এক মেমসাহেবকে বসিয়ে দেওয়া হত একখানা চেয়ারের ওপর। তারপর তার কপালের ওপর-অংশে লাগিয়ে দেওয়া হত একটা তারের বেড়। বেড়টার ওপর খড়িমাটি দিয়ে তৈরি অনেকগুলো ছোট ছোট চাকতি লাগানো থাকত ও চাকতিগুলোর ওপর এক, দুই, তিন ইত্যাদি নম্বর দশ পর্যন্ত লেখা থাকত। তারপর এক শিম্পানজির হাতে একটা বন্দুক দিয়ে তাকে বলা হত, অমুক নম্বর চাকতিতে গুলি কর। শিম্পানজি ঠিক ঠিক ভাবে গুলি করত। আমরা ভাবতাম যদি কোনদিন শিম্পানজি ভুল করে বসে, তা হলে মেয়েটার কপাল ফুটো হয়ে গুলি বেরিয়ে যাবে।

শুধু সার্কাস নয়। সেকালে সাহেবদের দেখানো অনেক অদ্ভুত ম্যাজিকও আমরা দেখেছি। একবার এম্পায়ার থিয়েটারে কার্টার নামে এক বিশ্ববিখ্যাত ম্যাজিসিয়ান ম্যাজিক দেখাতে এলো। তাঁর ম্যাজিক দেখতে আমিও গিয়েছিলাম। সন্ধ্যা সাতটার সময় ম্যাজিক আরম্ভ হবার কথা। সাতটা বেজে গেল, সাড়ে সাতটাও বেজে গেল, কিন্তু কার্টারের দেখা নেই। দর্শকরা সকলে উদ্বেগ দেখাতে লাগল। রাত্রির আটটার পর কার্টার এসে হাজির। লোকের মুখে অসন্তোষ ও উদ্বেগের চিহ্ন দেখে তিনি দর্শকদের তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দর্শকরা কারণ বলল। তখন তিনি বললেন, আপনারা সকলেই ভুল করছেন, আমি ঠিক সাতটার সময়ই এসেছি, আপনারা একবার আপনাদের ঘড়ির দিকে তাকান তো। সকলেই নিজ নিজ ঘড়ি দেখে অবাক হয়ে গেল। ঘড়িতে ঠিক সাতটা বেজেছে। রংগমঞ্চ থেকে কার্টার বলে উঠলেন, এইটাই আমার প্রথম খেলা।

এসব সার্কাস বা ম্যাজিকের তুলনায় শ্যামবাজারের মাঠে যে-সব সার্কাস বা ম্যাজিক দেখাবার জন্য তাঁবু ফেলা হত, সেগুলো অনেক ছোট। তবে ছোট হলেও বাড়ির কাছে সার্কাস দেখবার আমোদটা উপভোগ করবার সুযোগ ওই অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা পেল। এখানে প্রথম আসে 'ছাত্রেস্ সার্কাস'। পরে আসে 'আগাসী সার্কাস'। সার্কাসের কথা বলতে গিয়ে একটা হাসির কথা মনে পড়ে। একবার সার্কাসে বাঘের খেলা দেখাবার জন্য সার্কাসের লোকরা বাঘটাকে আনতে গিয়ে দেখে যে, বাঘটা তার খাঁচার মধ্যে নেই। খাঁচার দরজা খোলা। এই খবর রাষ্ট্র হয়ে যাওয়া মাত্র দর্শকদের মধ্যে ভীষণ 'প্যানিক'-এর সৃষ্টি হল। সবাই সার্কাসের তাঁবু ছেড়ে বাড়ির দিকে ছুটল। আশপাশের বাড়ির লোকরা বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল, যদি বাঘটা ঢুকে তাদের ঘাড় মটকে দেয়। এদিকে সার্কাসের লোকরা চতুর্দিকে বাঘ খুঁজতে বেরুল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুসন্ধান

চলল। কিন্তু কোথাও বাঘটা নজরে পড়ল না। সেদিন শ্যামবাজার পল্লীতে একটা ত্রাসের সঞ্চার হল। রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে কেউই ঘুমুতে পারল না। সকলেরই এক ভাবনা, যদি বাঘটা দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পড়ে! পরের দিন সকালে বাঘটাকে পাওয়া গেল, সার্কাসের পাশেই এক হাঁড়ি-কলসির দোকানে, কয়েকটা বড় জালার আড়ালে। সার্কাসের লোক এসে কান ধরে বাঘটাকে নিয়ে গেল।

১১১

যখন শ্যামবাজারের মাঠটায় ঘর-বাড়ি হতে লাগল, তখন সার্কাসওয়ালাদের আর সেখানে তাঁবু ফেলা সম্ভবপর হল না। সেজন্য সেবছর 'আগাসী সার্কাস' এসে তাঁবু ফেলল এখন যেখানে 'শ্রী' ও 'উত্তরা' সিনেমা। তখনকার দিনে ওই জায়গাটা ছিল একটা নোংরা খোলা মাঠ। আমরা ওটাকে হেগোডাংগার মাঠ বলতাম, কেননা ওটাই ছিল সর্বসাধারণের বিষ্ঠাত্যাগের স্থান। সার্কাসওয়ালারা মাঠটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে ওখানেই তাঁবু ফেলল। গরম পড়াতেই 'আগাসী সার্কাস' জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। ওই জায়গাটাতেই তাঁবু ফেলল ম্যাডান কোম্পানি সিনেমা দেখাবার জন্য। ম্যাডান কোম্পানি কলকাতায় সিনেমা দেখাতে এসে প্রথম তাঁবু ফেলেছিল গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের কাছে। হাতিবাগানের তাঁবুতে ম্যাডান কোম্পানি বহুদিন সিনেমা দেখিয়েছিল। নাম ছিল 'এলফিনস্টন্ বায়োস্কোপ'। তারপর একদিন আগুন লেগে তাঁবুটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অনেকদিন সিনেমা দেখানো বন্ধ রইল। তারপর ওই জায়গায় ম্যাডান কোম্পানি পাকা ইমারত তৈরি করে নাম দিল 'কর্ণওয়ালিস থিয়েটার'। 'ক্রাউন সিনেমা' নাম দিয়ে ম্যাডান কোম্পানি ওখানে ছবি দেখাতে লাগল। প্রথমে ইংরেজি ছবিই দেখানো হত। তারপর জ্যোতিষ সরকারের সহায়তায় 'রাজা হরিশচন্দ্র', 'মহাভারত', 'নল-দময়ন্তী', 'ধ্রুব চরিত্র' প্রভৃতি হিন্দি চিত্র নির্মাণ করা হয়। এসব পৌরাণিক চিত্র মেয়েদের খুব আকৃষ্ট করতে লাগল। এ ভাবে মেয়েদের মধ্যে সিনেমা দেখার সূচনা হল। বাংলায় সর্বপ্রথম নির্বাক ছবি 'বিল্বমংগল' ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ৮ নভেম্বর তারিখে কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে মুক্তিলাভ করল। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ শিশিরকুমার ভাদুড়ী কর্ণওয়ালিস থিয়েটার ভাড়া নিয়ে ওখানে এক নাট্যমঞ্চ স্থাপন করে ন্যাট্যাভিনয় করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ম্যাডান কোম্পানি ওর দক্ষিণ দিকে 'উত্তরা' সিনেমা স্থাপন করে ফেলেছিল। ওঁরা ওখানেই সিনেমা দেখানো শুরু করলেন।

সে যুগের সিনেমায় সাধারণত ধারাবাহিক বই দেখানো হত। তার মানে কোন বই একবার দেখা শুরু করলে, শেষ পর্ব পর্যন্ত দেখতেই হত। খুব চিত্তাকর্ষক ও রোমাঞ্চকর ছিল এ-ডি-পলোর অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ। টিকিট কেনার জন্য খুব ভিড় হত। ভিড় যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেত, তখন ম্যাডানের জামাই রুস্তমজী একটা ঘোড়ার চাবুক নিয়ে নির্মমভাবে ভিড়ের ওপর কশাঘাত করত। আজ ভাবি যে সেদিনেই সেটা সম্ভবপর ছিল। আজকের দিনে হলে রুস্তমজীর রক্তাপ্লুত দেহ রাস্তায় গড়াগড়ি যেত।

আমি কলকাতায় প্রদর্শিত প্রথম দেশী ছবি 'হরিশচন্দ্র' দেখি বর্তমান কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের (তখন কলেজ স্ট্রীট মার্কেট হয়নি, ওখানে খোলার ঘরে ছিল চটি জুতা ও পুরোনো বইয়ের দোকান) পাশে অ্যালফ্রেড থিয়েটারে। এককালে আমি সিনেমা দেখার "ঘুণ" ছিলাম। এমন কি আমার এম. এ. পরীক্ষার আগের দিনেও তিনটা সিনেমায় তিনটা 'শো'-এ (দুপুর, সন্ধ্যা ও রাত্রি) তিনটা বই দেখেছি। তবে সবই ইংরেজি বই দেখতাম। সিনেমা দেখা আমি ছেড়ে দিলাম যখন নির্বাক বই দেখানো বন্ধ হয়ে গেল, এবং সবাক বই দেখানো শুরু হল। একটা কথা এখানে বলি। গোড়ার দিকে কলকাতায় সিনেমা সেনসরশিপ ছিল না। বিলাতী বইয়ে প্রায়ই বিবস্ত্রা নারীর ছবি দেখানো হত। আমার যতটা মনে আছে 'নেপচুনস ডটার'-ই শেষ বই যাতে নগ্নিকার ছবি দেখানো হয়েছিল। তারপর এরকম ছবি দেখানো রোধ করবার জন্য সরকার স্থাপন করলেন ' বোর্ড অভ্ ফিলম্ সেনসরস্'।

১১১

খুব উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে আমার ছেলেবেলাটা কেটেছিল। চতুর্দিকেই ছিল প্রবল রাজনৈতিক উত্তেজনা, আর এই উত্তেজনার পদাঙ্কেই দেশের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল বিপ্লববাদ। ভারতে বিপ্লববাদ আমার সমসাময়িক। সুতরাং এর 'এ' টু 'জেড্' আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে গ্রথিত। এর উপলক্ষ ছিল বঙ্গ-ভঙ্গ ও তাকে অবলম্বন করে স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গদেশের আয়তন এক সময় অনেক বড় ছিল। কিন্তু তাকে ক্রমশ ছোট করে আনা হয়েছিল বঙ্গ, আসাম, ওড়িষা ও ছোটনাগপুরে। তারপর আসাম প্রদেশকেও পৃথক করে একজন চীফ কমিশনারের শাসনাধীনে ন্যস্ত করা হয়। মোটকথা, নানা রকম রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গদেশকে খর্ব করবার অপচেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার এনড্রু ফ্রেজার প্রস্তাব করেন যে, বঙ্গদেশকে

দু'খণ্ডে বিভক্ত করা হউক। প্রস্তাবটা বঙ্গদেশের সর্বত্র গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। হাজার হাজার পুস্তিকা প্রকাশ করে এর প্রতিবাদ জানানো হয়। এমনকি ইংরেজ মালিকানাবিশিষ্ট ও ইংরেজ কর্তৃক সম্পাদিত 'ইংলিশম্যান' পত্রিকাতেও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে লেখা হয়। কিন্তু এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত বিলাতের 'স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় এক খবর বেরোয় যে সেক্রেটারী অভ্ স্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া বঙ্গবিভাগে সম্মত হয়েছেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ৬ জুলাই তারিখের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এটাকে গভীর জাতীয় সংকট বলে অভিহিত করেন। ১৩ জুলাই তারিখের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় লেখা হয় যে, ইংরেজকে এই অপকর্ম হতে বিরত করতে হলে তার ওপর চাপ দেওয়ার জন্য বিলাতী দ্রব্য বর্জন শুরু করা একান্ত প্রয়োজন। তারপর ১৬ জুলাই তারিখের এক জনসভায় বিলাতী দ্রব্য বর্জন সম্বন্ধে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৭ আগস্ট তারিখে আহূত টাউন হলের এক মিটিং-এ স্থির হয় যে বিলাতী পণ্য বর্জন সম্বন্ধে আন্দোলনটা দেশব্যাপী হওয়া প্রয়োজন।

ওই সময় দশ হাজার নরনারী কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে সমবেত হয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাল, বঙ্গবিভাগ যেন রহিত হয়।

কিন্তু এসব করা সত্ত্বেও ১৭ অক্টোবর তারিখে বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে দেওয়া হয়। পূর্বদিকে সৃষ্ট হল আসাম ও পূর্ববঙ্গ প্রদেশ ও পশ্চিমে বাকি অংশ। এর প্রতিবাদে ওই দিন কলকাতা শহর পালন করল সম্পূর্ণ হরতাল।

বিদ্বেষের বহ্নি ক্রমশই জ্বলতে লাগল। বিলাতী পণ্য বর্জন ছাড়া, স্বদেশীয় শিল্পগঠন ও জাতীয় শিক্ষাপ্রসারের জন্য স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল। স্বদেশী আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্য বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়িতে আহূত এক জনসভায় ৭০,০০০ টাকা চাঁদা তোলা হল।

এদিকে জেলায় জেলায় চলতে লাগল প্রয়াস, যারা বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করবে তাদের শাস্তি দেবার জন্য। বাঁকুড়ার মিষ্টান্ন বিক্রেতারা ঘোষণা করল, যে-সব মিষ্টান্ন বিক্রেতা বিলাতী চিনি ব্যবহার করবে, তাদের একশত টাকা জরিমানা হবে। বীরভূমের সিউড়ি বাজারে পর্বতাকার বিলাতী সিগারেট পথে ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হল। ব্রাহ্মণেরা সিদ্ধান্ত করলেন, যে-সব গৃহস্থ বিলাতী চিনি ও লবণ ব্যবহার করবে, তাদের বাড়ি আর তারা যজমানী করবে না। দিনাজপুরে ডাক্তার, উকিল ও মোক্তাররা সিদ্ধান্ত করলেন, যে-সব মাড়বারী বিলাতী পণ্য আমদানি করে, তাদের বাড়ি আর তাঁরা চিকিৎসা বা তাদের হয়ে তাঁরা ওকালতি করবেন না। জলপাইগুড়িতে ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করল, বিলাতী সিগারেট, ক্রিকেট ব্যাট ও বল, ফুটবল ও বস্ত্র প্রভৃতিতে আগুন

লাগিয়ে। সংগে সংগে বড়লাট লর্ড কার্জনের এক প্রতিমূর্তি পোড়ানো হল।

কিন্তু এসব উপায় বিশেষ ফলপ্রসূ না হওয়ায় জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকরা যে-সব দোকানে বিলাতী পণ্য বিক্রয় হয়, সে-সব দোকানে পিকেটিং শুরু করে দিল। এর ফলে বিলাতী পণ্য বর্জন আন্দোলন বেশ ফলবতী হল। এই সময় কলকাতার এক বিখ্যাত ইংরেজ ফার্ম তার লণ্ডন অফিসকে এক তারবার্তা পাঠিয়ে জানিয়ে দিল, এদেশে বিলাতে প্রস্তুত জিনিস বিক্রয় করা আর সম্ভবপর নয়। ফলে, ধুরন্ধর বিলাতী শিল্পপতিরা ইংলণ্ডে প্রস্তুত মালের ওপর 'জারমানীতে তৈরী' ছাপ দিয়ে এদেশে পাঠাতে লাগল।

এদিকে যে সকল স্বেচ্ছাসেবক বিলাতী জিনিসের দোকান পিকেটিং করছিল, পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করতে লাগল। এর প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষ প্রকাশ পেল। ক্রমশ স্কুল-কলেজ বর্জন শুরু হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন করা হল। বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলামখানা' আখ্যা দেওয়া হল। এ সময় 'ন্যাশনাল কাউনসিল অভ্ এডুকেশন' স্থাপিত হল। তার অধীনে দেশের সর্বত্র জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল।

ইংরেজ ক্ষেপে উঠল। মিস্টার স্টিনটন নামে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী আন্দোলনটাকে সম্পূর্ণভাবে রাজদ্রোহমূলক বলে বর্ণিত করলেন। নির্যাতন-নীতি অনুসৃত হল। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

এই সময় ভুল করল পূর্ববঙ্গের লেফটানেন্ট গভর্নর ব্রামফিল্ড ফুলার। তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উত্তেজিত করতে লাগলেন। ফলে, একদল মুসলমান হিন্দুদের ওপর হামলা করে পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধিয়ে দিল। দাঙ্গা শুরু হল কুমিল্লায়। কিন্তু তীব্র আকার ধারণ করল মৈমনসিংহ জেলার জামালপুরে। সেখানে মুসলমানরা হিন্দুদের দুর্গাপ্রতিমা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। দাঙ্গা ক্রমশ পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে বিস্তার লাভ করল। হিন্দুদের দোকানপত্তর পুড়িয়ে দেওয়া হল। গৃহস্থের সম্পত্তি লুঠ করা হল। মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করা হল। দাঙ্গা কলকাতা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এসময় অনেক বামুন-পণ্ডিত যাঁরা মুসলমানদের মত দাড়ি রাখতেন, তাঁরা প্রাণভয়ে রাতারাতি দাড়ি কামিয়ে ফেললেন।

স্বদেশী আন্দোলন থেকে উদ্ভূত হল জাতীয়তাবাদ, আর জাতিয়তাবাদ এক শ্রেণীর যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বীজ বপন করল বিপ্লববাদের। জাতীয়তাবাদী এক-দল দেশসেবক দেখলেন যে, ইংরেজকে জব্দ করতে হলে, মাত্র পণ্যবর্জন ও

স্বদেশী আন্দোলন যথেষ্ট নয়। এর দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন কোনদিনই সম্ভবপর হবে না। তার জন্য তারা মারমুখী সংগ্রাম-নীতি অবলম্বন করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' থেকে তাঁরা অনুপ্রেরণা পেলেন। অরবিন্দ শুরু করে দিলেন তাঁর 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার মাধ্যমে এই নতুন জাতীয়তাবাদ প্রচারকার্য।

বিপ্লববাদ প্রসারের জন্য প্রথম যে সমিতি গঠিত হল, তা হচ্ছে 'অনুশীলন সমিতি'। এর শাখা-প্রশাখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এর এক শাখা আমাদের শ্যামবাজারেও ছিল। আমার বড়দা ও তাঁর বন্ধুরা তার সদস্য ছিল। বিকালে তাঁরা সমিতিতে গিয়ে লাঠি খেলা শিখে আসতেন, আর রাত্তিরে ছাদের ওপর তা অভ্যাস করতেন। এটা যে শুধু আমাদের বাড়ির ছাদে হত, তা নয়। সব বাড়ির ছাদেই চলত লাঠি খেলার অভ্যাস। সব ছাদ থেকেই একই সময় শোনা যেত লাঠির খট খটাখট শব্দ।

অরবিন্দের ছোট ভাই বারীন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত হল এক সশস্ত্র বিপ্লবীদল। তারা তাদের গোপন কেন্দ্র করল মানিকতলার খালের ওপারে মুরারিপুকুরে এক নিভৃত বাগানবাড়িতে। এর পূর্বাভাস তাঁরা দিয়েছিলেন ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'ভবানী মন্দির' নামে এক পুস্তকে। দু'বছর পরে তাঁরা প্রকাশ করলেন আর একখানা বই—'বর্তমান রাজনীতি'। এর উদ্দেশ্য ছিল সামরিক শিক্ষালাভ করে ইংরেজদের সঙ্গে 'গেরিলা' যুদ্ধে সকলকে অবতীর্ণ হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। সশস্ত্র আন্দোলন প্রচার করবার জন্য তাঁরা 'যুগান্তর' নামে একখানা পত্রিকা বের করলেন। পত্রিকাটা আমাদের শ্যামবাজার অঞ্চল থেকেই বেরুত।

আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল ভট্টাচাজ্জি মশায়ের বেনে-মশলার দোকান। সন্ধ্যার পর তিনি দোকান বন্ধ করে আমাদের বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে এসে বসতেন। আমি তখন খুবই ছেলেমানুষ। কিন্তু সব কথাই আমার মনে আছে। দেখতাম, হঠাৎ চাদর-গায়ে দেওয়া একটা লোক বাড়িতে ঢুকল। লোকটা সরাসরি বৈঠকখানা ঘরে এসে উপস্থিত হল। চাদরের অন্তরাল থেকে একখানা কাগজ বের করে ফেলে দিয়ে চলে গেল। একটা কথাও বলল না। লোকটা যেমন এসেছিল, তেমনই নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। লোকটা চলে যাবার পরই আমার বড়দা উঠে গিয়ে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসতেন। তারপর সকলে মিলে লোকটার ফেলে দিয়ে যাওয়া 'যুগান্তর' পত্রিকাখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন ও আলোচনা করতেন।

'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে এবং এর আনুমানিক প্রচার সংখ্যা ছিল ৭,০০০। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে সরকার এর প্রচার নিষিদ্ধ করে দেন। 'মুক্তি কোন পথে ?'—নামে আর একখানা পুস্তক প্রকাশ করা হল। এই

পুস্তকের মাধ্যমে দেশবাসীদের অনুরোধ করা হল, তারা যেন ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীকে বিপ্লবাত্মক সমিতিসমূহে যোগদান করতে প্রবুদ্ধ করে ও মারমুখী সংগ্রাম চালাবার জন্য যেন বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে।

বারীন্দ্রের নেতৃত্বে যে দল গঠিত হয়েছিল, তারা এই সকল বিপ্লবাত্মক আদর্শকে রূপায়িত করবার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। দু'জন সদস্য বিদেশে গিয়ে বোমা তৈরি করার প্রণালী শিখে এল। তারপর থেকে মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে বোমা তৈরির আয়োজন চলতে লাগল। পূর্ববঙ্গের লেফটানেন্ট গভর্নর ও বঙ্গের গভর্নরকে হত্যা করবার চেষ্টা হল, কিন্তু উভয় চেষ্টাই ব্যর্থ হল।

তাদের পরবর্তী চেষ্টা হয় চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার কিংসফোর্ড-কে হত্যা করবার জন্য। সামান্য অপরাধের জন্য কিংসফোর্ড কয়েকজন তরুণকে নৃশংসভাবে চাবুক মারার শাস্তি বিধান করেছিলেন। এর পরই কিংসফোর্ড বিহারের মজফরপুরের জজ নিযুক্ত হন। বারীন্দ্রের দলের দুজন প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম মজফরপুরের দিকে রওনা হল কিংসফোর্ডকে হত্যা করবার জন্য। তারা ভুল করে কিংসফোর্ডের গাড়ির মত দেখতে একখানা গাড়ির ওপর বোমা নিক্ষেপ করল। আসলে গাড়িটায় ছিল মিস্টার কেনেডি নামে এক আইনবিদের স্ত্রী ও কন্যা। তারা উভয়েই বোমার আঘাতে মারা গেল। প্রফুল্ল ধৃত হল বটে, কিন্তু সে আত্মঘাতী হল। ক্ষুদিরামের বিচার হল এবং তাকে ফাঁসি দেওয়া হল।

এই ঘটনার দু'দিন পরেই মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে পুলিশ হানা দিল এবং বহু বোমা, ডিনামাইট ও কার্তুজ উদ্ধার করল। অরবিন্দ ও বারীন্দ্র সহ ৩৪ জন ধরা পড়ল। তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা আনা হল। মামলা চলা-কালীন যে সরকারী উকিল মামলা পরিচালনা করছিলেন, তাঁকে হত্যা করা হল। আবার, হাইকোর্টে যখন মামলার শুনানী চলছিল, তখন একজন ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট অভ্ পুলিশও নিহত হল। দুজনকেই গুলি করে মারা হল।

এরপর এল বিশ্বাসঘাতকের পালা। নরেন্দ্র গোস্বামী নামে দলের একজন সদস্য পুলিশের কাছে গোপন তথ্য সরবরাহ করে বারীন্দ্রের দলকে ধরিয়ে দিয়ে-ছিল। পরে সে যখন সরকারী সাক্ষী হয়ে দাঁড়াল, সারা দেশের লোক তাকে অভিসম্পাত করল। কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু নামে দলের দু'জন বন্দী জেলখানার মধ্যেই নরেন্দ্রকে হত্যা করল। কথিত আছে, বিপ্লবীদের এক আত্মীয়া বন্দীদের সঙ্গে দেখা করবার ছল করে জেলখানায় গিয়ে কাঁঠালের মধ্যে লুকিয়ে এক পিস্তল দিয়ে এসেছিল।

১৯১৯

বিচারে বারীন্দ্র সমেত ১৪ জন অপরাধী সাব্যস্ত হল। তাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। অরবিন্দ মুক্তি পেলেন। অন্তরের নির্দেশে তিনি রাজনীতি পরিহার করে, পণ্ডিচেরীতে যোগ সাধনায় নিবিষ্ট হলেন। উল্লেখনীয় যে, এই মামলায় চিত্তরঞ্জন দাশ আসামী পক্ষ অবলম্বন করে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।

কিন্তু এই সঙ্গে বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটল না। ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নূন্যাধিক ৬৩ জন বিপ্লবীদের হাতে নিহত হল। রাসবিহারী বসু চেষ্টা করলেন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে মারবার জন্য। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হল। সংগ্রামের জন্য অর্থসংগ্রহের প্রয়াসে বিপ্লবীদল রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু করল। এমনকি কলকাতার ভেতরেই দিনের বেলা দুঃসাহসিক ডাকাতি হতে লাগল। যারা ডাকাতি করত, তারা সাধারণতঃ মুখোস পরে পিস্তল হাতে কোন ধনীর গৃহে প্রবেশ করে সিন্দুকের চাবি চাইত। বাধা দিলে তারাও বাধা দিত। তবে এদের ওপর দলের আদেশ ছিল যে, ভুলক্রমেও যেন তারা কখনও কোন স্ত্রীলোকের গায়ে হাত না দেয়। ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ১১২ টা ডাকাতি হল এবং ডাকাতরা এভাবে সাত লক্ষ টাকা সংগ্রহ করল। তাছাড়া এ সময়ের মধ্যে বোমা দ্বারা ১২ জনকে হত্যা করবার ও তিনবার ট্রেন ধ্বংস করবার চেষ্টা হল।

ডাকাতি দমন করবার জন্য এসময় কলকাতার রাস্তার মোড়ে মোড়ে লোহার গেট বসান হল এবং শহরের ভেতর ইস্পাতের তৈরী ট্যাঙ্ক গাড়ি করে সশস্ত্র পুলিস টহল দিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাতিবাগানে এল. এম. রক্ষিতের কাপড়ের দোকান থেকে ডাকাতরা ৮০ হাজার টাকা নিয়ে উধাও হল।

অনেকেরই হয়তো কৌতূহল হবে, বিপ্লবীরা কিভাবে অস্ত্রশস্ত্র পেত? অস্ত্রশস্ত্র আরব, পারস্য ও আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে চোরা আমদানি হত। একজন কাবুলি কলকাতায় এই চোরাকারবারীদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করত। এ ছাড়া, ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ১৬ আগস্ট তারিখে এক ঘটনা ঘটল। রডা অ্যান্ড কোম্পানি নামে কলকাতায় এক প্রসিদ্ধ বন্দুক ব্যবসায়ী ছিল। বিপ্লবীদের একজন ওই দোকানে চাকুরি গ্রহণ করে। সে তার কর্মদক্ষতা দেখিয়ে শীঘ্রই কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠে। একদিন তাকে পাঠানো হল ডক্ থেকে ১২ পেটি মাল খালাস করে আনবার জন্য। ওই ১২ পেটির মধ্যে ৫০টা 'মসার' পিস্তল ও ৪৬,০০০ কার্তুজ ছিল। লোকটা মাল খালাস করে ১০টা পেটি নিয়ে অন্তর্ধান হয়ে গেল। পিস্তলগুলো তৎক্ষণাৎ ভিন্ন ভিন্ন বিপ্লবীদলের হাতে

গিয়ে পড়ল।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে আর এক ঘটনা ঘটল। ওই বৎসর অমৃতসরের বাবা গুরুদিৎ সিং 'কামাগোটা মারু' নামে একখানা জাহাজ ভাড়া নিয়ে তাতে করে বহুসংখ্যক শিখকে কানাডায় পাঠান। তারা বিপ্লবী এই অজুহাতে কানাডা সরকার তাদের কানাডায় অবতরণ করতে না দিয়ে ওই জাহাজেই তাদের ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। জাহাজখানা ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে বজবজে এসে নোঙর ফেলে। ভারত সরকার এই সকল শিখকে বিপ্লবী দলভুক্ত বলে ঘোষণা করে এবং বিনা প্ররোচনায় তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে ১৮ জন শিখকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ২৯ জন পালিয়ে যায়। বাকি লোকরা ধৃত হয়।

ঌ ঌ ঌ

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ। ইওরোপে লাগল প্রথম মহাযুদ্ধ। যুদ্ধের কারণটা ছিল, একটা সামান্য ব্যাপার। অস্ট্রিয়ার রাজপুত্রকে হত্যা করেছিল সার্বিয়ার এক ছাত্র। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটাকে ছুঁতো করে এক বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। অস্ট্রিয়ার পক্ষ নিল জার্মানী, রাশিয়া, তুর্কি ইত্যাদি দেশ। আর সার্বিয়ার পক্ষ নিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ। বিদেশে যে সমস্ত ভারতীয় বিপ্লববাদী ছিল, তারা এটাই চাইছিল। তারা চাইছিল যে ইংরেজ বিধ্বস্ত হয়ে যাক এক বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে।

বিদেশে ভারতীয় বিপ্লববাদ কিভাবে প্রসার লাভ করেছিল, তার ইতিহাসটা এখানে বলা দরকার। ভারতীয়রা বিদেশে গিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবাত্মক কাজ শুরু করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে। এর সূত্রপাত করেছিল শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা নামে একজন বিপ্লবী। তিনি ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সর্দারসিং রানা নামে আর একজন বিপ্লববাদী প্যারিসে গিয়ে আস্তানা গাড়েন। শ্যামজী বিলাতে এক বিপ্লববাদী দল গড়ে তোলেন। এই দলের মধ্যে ছিল সাভারকার, হরদয়াল ও মদনলাল ধিংরী।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে যখন ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠল, শ্যামজী তখন বিলাতে স্থাপন করলেন 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি'। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'নিষ্ক্রিয়' প্রতিরোধ ও অসহযোগ দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। তবে হিংসার আশ্রয় যে তাঁরা একেবারে নেবেন না, এমন কোন বক্তব্য তাদের ছিল না।

এঁদের কার্যকলাপে বিলাতের সংবাদপত্রসমূহ ও রাজনীতিকরা শঙ্কিত হয়ে

উঠল। শ্যামজী ও তাঁর অনুগামীদের ওপর তারা আক্রমণ চালাল। শ্যামজী লণ্ডন ছেড়ে প্যারিসে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সাভারকার বিলাতে রয়ে গেলেন। মদনলালও রইল। কিন্তু ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে মদনলাল এক হঠকারিতার কাজ করে ফেলল। ওই বছরের ১ জুলাই তারিখে মদনলাল ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটের এক সভায় কার্জন ওয়াইলী নামে এক ইংরেজকে হত্যা করল। মদনলালের ফাঁসি হল।

প্যারিসে শ্যামজীর উপযুক্ত সহকর্মী ছিলেন এক মহিলা। নাম মাদাম ভিখাজী রুস্তম কামা। স্টাটগুটের এক মিটিং-এ ভারতে ইংরেজ শাসনের তীব্র নিন্দা করে, এই মহিলা এক প্রস্তাব পাস করতে চাইলেন। তাঁকে সে প্রস্তাব পেশ করতে দেওয়া হল না। তারপর তিনি এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন ও ভারতের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন।

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ভারতীয় বিপ্লববাদ অগ্রগতি লাভ করল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে পাঞ্জাবের কৃষকরা দলে দলে ব্রহ্ম, মালয়, সিংগাপুর, হংকঙ, সাঙহাই ও চীনদেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মসংস্থানের চেষ্টায় যেতে শুরু করেছিল। পরিশেষে তারা অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে পৌঁছায়। শ্রমিক হিসাবে তাদের মজুরি সুলভ দেখে, আমেরিকার শিল্পপতিরা নিজেদের কলকারখানায় শ্বেতকায় মজুর দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্মঘট পঙ্গু করবার জন্য তাদের নিযুক্ত করল। এর ফলে আমেরিকার সর্বত্র তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশ পেতে লাগল। আমেরিকানদের এই বিদ্বেষ শিখ মজুরদের মনে জাগাল রাজনৈতিক চেতনা ও ভারতের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা। তারা পড়তে লাগল শ্যামজী ও মাদাম কামার বিপ্লবাত্মক রচনাসমূহ, যার মার্কিন মুলুকে অবাধ প্রবেশ ছিল। এগুলি পড়ে তাদের মনে বিপ্লবাত্মক উদ্দীপনা জাগল। বিভিন্ন বিপ্লবীদল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে 'ঘদর' (মানে 'বিদ্রোহ') নামে এক দল গঠন করল। দলের উদ্দেশ্য ছিল, ভারতে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধন করা। হরদয়াল এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু ও গুরুমুখী—এই চার ভাষায় 'ঘদর' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ হতে লাগল। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ২৫ মার্চ তারিখে ইংরেজ সরকারের সনির্বন্ধ অনুরোধে মার্কিন সরকার হরদয়াল-কে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করল। হরদয়াল জেনেভায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন এবং 'বন্দেমাতরম' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। যুক্তরাষ্ট্রে হরদয়ালের পর 'ঘদর'দলের নেতৃত্ব গিয়ে পড়ল রামচন্দ্রের ওপর।

এরই কিছুদিন পরে ইউরোপে আরম্ভ হল প্রথম মহাযুদ্ধ। জারমানীতে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লববাদীরা দেখল যে জারমানীর কাছ থেকে অস্ত্রসম্ভার

সংগ্রহ করে, সে সমুদয় যুদ্ধে নির্লিপ্ত নিরপেক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে ভারতে পাঠাবার এটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। তাদের প্রস্তাব জারমান সরকার সাদরে গ্রহণ করল। জারমানীর এই সহানুভূতি ও সহায়তা ভারতের প্রতি প্রীতিবশত ছিল না। নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্যই তারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। তারা ভেবেছিল যে ভারতে যদি একটা বিপ্লব লাগিয়ে দিতে পারা যায়, তা হলে ইংরেজ ভারত রক্ষার জন্য পশ্চিম রণাঙ্গনে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে ভারত রক্ষার জন্য স্বদেশে পাঠিয়ে দেবে এবং তার ফলে ইংরেজ পশ্চিম রণাঙ্গনে দুর্বল হয়ে পড়বে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে বার্লিনে এক কমিটি গঠিত হয়। জারমান সম্রাট কাইজারের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু (কোনো এক জাহাজ কোম্পানির মালিক) এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। সুখঠানকর সহ-সভাপতি ও বীরেন সরকার সেক্রেটারী হন। ভারতে এবং বিদেশে অবস্থিত বিভিন্ন বিপ্লবীদল যাতে একই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পারে, সেরূপ কর্মসূচী রচিত হল।

জার্মানী থেকে ভারতে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার পথ সুগম করবার জন্য ভারতীয় বিপ্লবীদের পাঠান হল জাপান, চীন, ফিলিপাইন, শ্যাম, জাভা প্রভৃতি দেশে। মতলব আঁটা হল যে শ্যামে অবস্থিত জারমানরা সেখানকার ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে মৌলমেনের ভেতর দিয়ে ভারত আক্রমণ করবে, আর চীন-দেশে অবস্থিত জারমানরা ভামোর পথ দিয়ে ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করে তাদের সঙ্গে মিলিত হবে।

তারপর অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর পালা এল। আশি হাজার রাইফেল ও চল্লিশ লক্ষ কার্তুজ 'আনি লারসেন' নামে এক ছোট জাহাজে বোঝাই করা হল। স্থির হল যে-কোন এক নিভৃত স্থানে ওই জাহাজের মাল 'মাভেরিক' নামে অপর এক বড় জাহাজে তুলে দেওয়া হবে। তারপর 'মাভেরিক' মালগুলো ভারতে নিয়ে গিয়ে বিপ্লবীদের হাতে পেঁছে দেবে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে 'মাভেরিক' ওখানে না পেঁছানোর ফলে ওই অস্ত্রসম্ভার আর ভারতে পাঠানো সম্ভবপর হল না। এ বিফলতার খবরটা কিন্তু ভারতে বিপ্লবীদের কাছে এসে পেঁছাল না।

এদিকে অস্ত্রশস্ত্র আসছে, এই খবর পেয়ে সেগুলো কোন নিভৃত স্থানে নামাবার ব্যবস্থা করবার জন্য যাদুগোপাল মুখুজ্যে গেলেন সুন্দরবনে ও যতীন মুখুজ্যে গেলেন বালেশ্বরে। যাদুগোপাল সুন্দরবন অঞ্চলে রায়মঙ্গলের এক জমিদারকে হস্তগত করলেন। জমিদার লঞ্চ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ওদিকে বালেশ্বরে যতীন মুখুজ্যের কাছে বাটাভিয়ায় অবস্থিত জারমান সরকারের প্রতিভূরা বিপ্লবে সাহায্য করবার জন্য টাকা পাঠাতে লাগল। কিন্তু শেষ কিস্তির দশ হাজার টাকা ব্রিটিশ সরকারের হাতে গিয়ে পড়ল। সেই সূত্র অবলম্বন করে পুলিস যতীন মুখুজ্যের তল্লাসে বেরিয়ে পড়ল।

যতীন মুখুজ্যে আগে থাকতেই খবর পেয়ে কয়েক মাইল দূরে এক ধানক্ষেতের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিল। পুলিস সেখান পর্যন্ত ধাওয়া করল। বুড়িবালামের তীরে যতীন মুখুজ্যে ও তার সহকর্মীদের সংগে পুলিসের এক ভীষণ সংঘর্ষ হল। পুলিসের সংগে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত লড়তে লড়তে যতীন মুখুজ্যে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে শহীদ হল।

অস্ত্রশস্ত্র যথাসময়ে ভারতে গিয়ে পেঁছিবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে রামচন্দ্র সেখানে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীদের স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য তাগিদ দিতে লাগল। তারা ভারত অভিমুখে যাত্রা করল। কিন্তু এ খবর ব্রিটিশ সরকার আগে থাকতেই পেয়ে গেল। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর তারিখে 'তোসা মারু' নামক জাহাজে করে তারা যখন কলকাতায় এসে পেঁছিল, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করল। ৪০০ জনকে জেলে রাখা হল ও ২৫৩০ লোককে নিজ নিজ গ্রামে অন্তরীন করা হল।

এদিকে মুখোমুখী সংগ্রামের দিন এগিয়ে আসছে ভেবে রাসবিহারী বসু ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করল। ঠিক হল যে, একই দিনে উত্তর ভারতে অবস্থিত সমস্ত ক্যানটনমেণ্টের সৈন্যগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে ইংরেজ সৈন্যদের ওপর হামলা চালাবে। যারা আত্মসমর্পণ করবে, তাদের বন্দী করা হবে; আর যারা প্রতিরোধ করবে, তাদের হত্যা করা হবে। বিদ্রোহের দিন ধার্য হল ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে। কিন্তু রাসবিহারীর দলে কিরপাল সিং নামে পুলিসের একজন গুপ্তচর যোগদান করেছিল। তার মারফত সরকার আগে থাকতেই খবর পেয়ে এ চেষ্টা বিফল করে দিল।

১১১

এদিকে জার্মান ডুবো জাহাজ 'এমডেন' বঙ্গোপসাগরে এসে রাহাজানি শুরু করে দিল। মাদ্রাজ হাইকোর্টকে লক্ষ্য করে ডুবো জাহাজ থেকে কামানের গোলা ছোঁড়া হল। হাইকোর্টের জজেরা চেয়ার উলটে পড়ে গেল। তারপর ডুবো জাহাজ সুন্দরবনের দিকে এগিয়ে এল। ব্রিটিশ সরকার ভীত হয়ে কলকাতা শহরের লোকদের ওপর নির্দেশ দিল যে প্রয়োজন হলে তাদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে

শহর ছেড়ে ৮০ মাইল দূরে চলে যেতে হবে। বিধাতা সেদিন ইংরেজের প্রতি সুপ্রসন্নই ছিলেন। তা না হলে বিপ্লবীদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হবে কেন ?

এই সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। চতুর্দিকে গুজব রটল যে মা কালী ইংরেজের পক্ষ নিয়ে স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং কচুপাতার পিছন দিকে দুই সরলরেখা চিহ্নিত করে তিনি তাঁর রথের চাকার দাগ রেখে গেছেন। খুবই বিচিত্র ব্যাপার। সকলেই দেখল যেখানে যত কচুগাছ আছে, সব জায়গাতেই কচুপাতার পিছন দিকে দুই সরল রেখার চিহ্ন রয়েছে।

এদিকে মহাযুদ্ধ এগিয়ে এল ভারতের দিকে। মেসপোটেমিয়া পরিণত হল এক বিরাট রণাঙ্গনে। এর নাম দেওয়া হল পূর্ব-রণাঙ্গন। ইংরেজ বেকায়দায় পড়ল। পশ্চিম রণাঙ্গনে তো তাকে লড়তেই হচ্ছিল, এখন পূর্ব রণাঙ্গনেও তাকে লড়তে হবে। ভারতের ধনী সমাজ, বিশেষ করে মাড়বারীরা, যারা লড়াইয়ের মরসুমে রাতারাতি বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছিল, তারা ইংরেজের সহায়তা করল, যুদ্ধের দরুন প্রচারিত ঋণপত্রসমূহ মুক্তহস্তে কিনে।

এই সময় ঋণপত্র বেচা সম্বন্ধে এক মজার ব্যাপার ঘটল। কলকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজ, এদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করবার জন্য ইংরেজ সরকার কলকাতার জি-পি-ওর মাথায় তিনটা বড় ঘড়ি স্থাপন করলেন। ওই ঘড়িগুলোর সাহায্যে দেখানো হতে লাগল, কোন্ শহর কত টাকার ঋণপত্র কিনছে। একবার শেষ মুহূর্তে সে কি চাঞ্চল্য ও আপসোস দেখা গেল। বোম্বাই কলকাতাকে হারিয়ে দিচ্ছে। এক কোটি টাকার তফাত। আর মাত্র এক মিনিট সময় আছে। হঠাৎ ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গেল। কলকাতা বাজিমাত করল। শোনা গেল, লড়াইয়ের সময় প্রসূত প্রখ্যাত ধনী কেশরাম পোদ্দার একাই এক কোটি এক লক্ষ টাকা দিয়ে কলকাতার মুখ রক্ষা করেছে।

১১১

অর্থসংগ্রহ ছাড়া ইংরেজ ভারতের মুখাপেক্ষী হল, পূর্ব রণাঙ্গনে রসদ সরবরাহের উদ্দেশ্য মাল কেনবার জন্য। ভারতে 'মিউনিশন বোর্ড' নামে এক সংস্থা স্থাপিত হল। মাড়বারী সমাজ এগিয়ে এল এই সংস্থার কাছে মাল বিক্রির জন্য। মাল কেনার ব্যাপারে অনেক রকম দুর্নীতি অবলম্বিত হল। একবার প্রকাশ পেল যে, এক লক্ষ মাত্র বাম পায়ের বুট জুতা সরবরাহ করে, সরবরাহকারীরা দু'পায়ের জুতার দাম নিয়ে গেছে।

এছাড়া, ইংরেজ আরও অনেকরকমভাবে ভারতের কাছ থেকে সাহায্য

নিয়েছিল। মেসপোটেমিয়ায় পরিবহণ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য তাঁরা ভারতের যেখানে যত ছোট রেলপথ ছিল, সেগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে মেসপোটেমিয়ায় রেলপথ স্থাপন করল।

এরপর এল লোকবল সংগ্রহের ব্যাপার। আগে বাঙালীকে কখনও সৈন্য-বাহিনীতে ভর্তি করা হত না। মেকলের সময় থেকে অজুহাত ছিল, তারা ভীরু ও কাপুরুষ। যুদ্ধের পক্ষে তারা অনুপযুক্ত। সে ভ্রান্ত ধারণা তাদের দূর হয়ে গেল যখন একদল বাঙালী যুবক স্বেচ্ছায় ফরাসী সরকারের পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য চন্দননগর থেকে পশ্চিম রণাঙ্গনে গিয়ে অসীম সাহস ও বীরত্ব দেখাল।

যেদিন তারা চন্দননগর থেকে যাত্রা করেছিল, সেদিন আমি চন্দননগরে আমার মামার বাড়িতে ছিলাম। সেদিনের দৃশ্য আমার মনে এখনও জ্বলজ্বল করছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! বোড়াইচণ্ডীতলা থেকে রেল স্টেশন পর্যন্ত সেদিন তাদের সঙ্গে গিয়েছিল তাদের মা, বোন, মাসী, পিসী ও অনেকে। সকলের হাতে ছিল শঙ্খ। শঙ্খধ্বনিতে আকাশ-বাতাস নিনাদিত করে, উলুধ্বনি দিতে দিতে তাঁরা তাঁদের বীরপুত্র ও ভাইদের মঙ্গল কামনা করতে করতে তাদের অনুবর্তিনী হয়েছিলেন রেলস্টেশন পর্যন্ত। অনেকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্তও এসেছিলেন।

চন্দননগরের এই বীরদল বিশ্বকে চমৎকৃত করল পশ্চিম রণাঙ্গনে এক অদ্ভুত বীরত্বপূর্ণ সাহস দেখিয়ে। জারমানদের গোলাবর্ষণের ব্যূহ ভেদ করে, সেদিন তারা কেড়ে নিয়ে এল জারমানদের কামানগুলো। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সরকার তাদের সম্মানিত করল ফরাসী দেশের পরম সামরিক উপাধি 'ক্রোয়া দে গের' মেডেল দিয়ে। যাঁরা এই মেডেল পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন আমার সেজ মাসীমার বাবা নরেন সরকার।

বাঙালীর শৌর্যবীর্য সম্বন্ধে সেদিন ইংরেজের চোখ খুলে গেল। বিডন স্ট্রীটে এক ডাক্তারের বাড়িতে পলটনে যোগদানকারীদের নাম লেখাবার অফিস খোলা হল। যারা ওখানে নাম লেখাতে যেত, তাদের অনেককেই ডাক্তারের মেয়ে বলত, আপনি যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আসুন, আপনার গলায় আমি বরমাল্য দেব। এই পলটনেই নজরুল ইসলাম, হেমন্ত বসু ও আরও অনেক বিখ্যাত লোক যোগদান করেছিল।

এই সময় আমার বড় বোনের ছেলে নিখোঁজ হল। কয়েকদিন তার আর কোন খবরই পাওয়া গেল না। পলটনে যারা যোগদান করত, তাদের সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হত নোসেরায়। আমার বড়দা নোসেরায় টেলিগ্রাম করে খবর পেলেন যে, সে পলটনে নাম লিখিয়েছে। আমার এই ভাগ্নে তুর্কীদের হাতে বন্দী হয়েছিল। তাদের কনস্তান্তিনপলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ও তাদের দিয়ে এমন সব

জঘন্য ও গর্হিত কাজ করানো হয়েছিল যে, যুদ্ধের শেষে আমার এই ভাগ্নে যখন বাড়ি ফিরে এল, তখন তার বৈরাগ্যপূর্ণ মনোবৃত্তি দেখা গেল। মাছ মাংস আহার সে ত্যাগ করল। সারাজীবন অকৃতদার রইল ও গলায় কণ্ঠী ধারণ করে বৈষ্ণবের জীবন অবলম্বন করল।

পূর্ব-রণাঙ্গনে লড়াই করবার জন্য যারা পলটনে যোগদান করেছিল, তাদের চিত্তবিনোদনের জন্য হারমোনিয়াম থেকে আরম্ভ করে নানারকম দ্রব্য পাঠাবার জন্য ভারতীয় YMCA-এর জাতীয় কাউনসিল এক সংস্থা স্থাপন করল। আমার বড়দা ওই সংস্থার কর্মকর্তা নিযুক্ত হল। আর যুদ্ধক্ষেত্রে এই সংস্থার প্রতিভূ হল ন্যাপা বোস, যিনি 'আলিবাবা' নাটকে আবদাল্লার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য বঙ্গীয় নাট্যজগতে বিখ্যাত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখনীয় যে, এই নাটকে ন্যাপা বোসের বিপরীতে কুসুমকুমারী মর্জিনার ভূমিকায় অপরূপ অভিনয় করে 'মর্জিনা' আখ্যা লাভ করেছিল। আমি একশতেরও অধিকবার এঁদের অভিনয় দেখেছি। ন্যাপা বোসের সঙ্গে আমাদের পরিবারের বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল।

১১১

লড়াইয়ের শেষে ভারতে আনন্দ উৎসবের ঢেউ বহে গিয়েছিল। সরকারী পয়সায় নানা জায়গায় আতসবাজি পোড়ানো হল। কলকাতার ইডেন গার্ডেন-এ এক বিরাট এক্জিবিশন হল। পরবর্তীকালে তারাতলায় অনুষ্ঠিত কৃষি ও শিল্প এক্জিবিশন দেখেছি, কিন্তু ১৯১৯ সালের 'পীস্ সেলিব্রেশন'-এর তুলনায় এটা একটা নগণ্য ব্যাপার মাত্র। এর পর ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে ইডেন গার্ডেন-এ আর একটা এক্জিবিশন হল। এই এক্জিবিশনেই শিশির কুমার ভাদুড়ী একটা নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তুলে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। সেটাই ছিল শিশিরকুমারের প্রকাশ্য অভিনয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ।

কিন্তু যুদ্ধের পর এত আনন্দ উৎসব সত্ত্বেও, এ সময় ভারতের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। ইনফ্লুয়েঞ্জা নামক মহামারীর (এর আগে এদেশে 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' নামটা অজ্ঞাত ছিল; এরকম জ্বরকে 'ডেংগু' জ্বর বলা হত) প্রকোপে ভারতের ৮০ লক্ষ লোক মারা গেল। এ সময় শ্মশানঘাটে মড়া পোড়ানো এক অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। গঙ্গার ধারে আধ মাইল ব্যাপী মড়ার খাটের লাইন পড়ে গেল। এ রকম দৃশ্য আমার জীবনে আমি আর কখনও দেখিনি।

আগেই বলেছি যে, লড়াইয়ের শেষে আনন্দ উৎসব করবার জন্য আতসবাজি

পোড়ানো হয়েছিল। আমাদের শ্যামবাজারেও বাজি পোড়ানোর জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু যাদের হাতে এর ভার দেওয়া হয়েছিল, তারা কৌশল করে দু-চার মিনিট বাজি পোড়াবার পর বাজির গাদায় আগুন লাগিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত কেউ জানতে পারল না যে দগ্ধবাজি এক হাজার টাকার, কি এক লক্ষ টাকার।

১১১

আবার বংগভংগের কথাতেই ফিরে আসছি। বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে দেশের মধ্যে যে মাত্র বিপ্লববাদের আগুন জ্বলে উঠেছিল, তা নয়। বঙ্গভংগ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে চাংগা করে তুলেছিল। আগে কংগ্রেসের নীতি ছিল, আবেদন-নিবেদন করে স্বরাজ লাভ করা। মহারাষ্ট্রের নেতা বালগংগাধর তিলক এই নীতির প্রতিবাদ করে রব তুললেন, 'স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার'। ইংরেজের কাছে আবেদন-নিবেদন না করে, আমরা নিজেদের শক্তিতেই স্বরাজ লাভ করব। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে এই নতুন ভাবের সঞ্চার হওয়া সত্ত্বেও বংগভংগের পর বিদেশী পণ্যবর্জন ও স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে ভীষণ মতভেদ প্রকাশ পেল। একদল বলল, ইংরেজের সংগে বিরোধসূচক কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। অপর দল বিদেশী পণ্যবর্জন একান্ত প্রয়োজন বলে রায় দিল।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে দুই দলের মধ্যে মতভেদ উগ্ররূপ ধারণ করল। এর ফলে 'চরমপন্থী' ও 'নরমপন্থী'—এই দুই দলের সৃষ্টি হল।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসে চরমপন্থীরা যখন বিলাতী পণ্যবর্জন ও জাতীয় শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, তখন নরমপন্থীরা ভীতগ্রস্ত হয়ে উঠলেন।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচনের বিষয় নিয়ে দুই দলের মধ্যে এমন হাতাহাতি, জুতা ও চেয়ার ছোড়াছুড়ি আরম্ভ হল যে, পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পুলিস অধিবেশন বন্ধ করে দিল। পরবর্তী ন'বছর কংগ্রেস নরমপন্থীদের করায়ত্ত হল।

এদিকে লর্ড কারজনের পর লর্ড মিনটো যখন ভাইসরয় হয়ে এলেন, তখন তিনি দেখলেন যে লর্ড কারজন যে বিষবৃক্ষ রোপণ করে গেছেন, তা সহজে উৎপাটিত হবার নয়।

ইংরেজ বণিকের জাত। বিলাতী পণ্যবর্জন তাকে ভাতে মেরেছিল। সেজন্য

ইংরেজ এসময় নরমপন্থীদের তুষ্ট করবার চেষ্টা করল। বিলাতে অবস্থিত 'ইণ্ডিয়া কাউনসিল'ই ভারত সম্পর্কে নীতি রচনা করত। তিনজন ভারতীয়কে তার সদস্য নিযুক্ত করা হল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের পাড়ার নরমপন্থী এটর্নী ভূপেন্দ্রনাথ বসু, যাঁর নামে ভূপেন্দ্র বোস এভেন্যুর নামকরণ করা হয়েছে এবং যাঁর এক আবক্ষ-মূর্তি ভূপেন বোস এভেন্যু ও পুরোনো শ্যামবাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থলে স্থাপিত হয়েছে। অপর দু'জন ছিলেন শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ। এই সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহই পরে লর্ড সিংহ অভীধায় বিহারের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইংরেজ আমলের তিনিই একমাত্র ভারতীয় গভর্নর।

এদিকে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু ঘটল। তাঁর ছেলে নতুন সম্রাট পঞ্চম জর্জ ঘোষণা করলেন যে, তিনি আগামী সালের শীতকালে ভারত সফরে আসবেন ও দিল্লীতে দরবার করবেন।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর তারিখে খুব জাঁকজমক করে দিল্লীতে দরবার অনুষ্ঠিত হল। সম্রাট নিজমুখে ঘোষণা করে, বঙ্গভঙ্গ নাকচ করে দিলেন। পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ আবার সংযুক্ত হয়ে গেল। আসাম পৃথক প্রদেশ হল। বিহার ও ওড়িশাকে নতুন প্রদেশের রূপ দেওয়া হল। লর্ড সিংহ বিহারের গভর্নর নিযুক্ত হলেন। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হল।

সম্রাট কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এলেন। স্কুলের ছেলেদের সম্রাট দর্শনের জন্য ময়দানে নিয়ে যাওয়া হল। রেড রোডের দু'ধারে বিরাট গ্যালারী তৈরি করা হল। স্কুলের ছেলেদের সেই গ্যালারীতে নিয়ে গিয়ে বসানো হল। মিষ্টান্ন দিয়ে আমাদের ভূরিভোজন করানো হল। প্রত্যেক ছেলেকে উপহার দেওয়া হল একখানা করে ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা ও একটি করে স্মারক-মেডেল।

১১

এদিকে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে লখনৌ অধিবেশনে কংগ্রেসের 'চরম' ও 'নরম' দুই দলই যোগদান করে, নিজেদের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে নিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে গরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মতভেদ ছিল, তারও আপোস এই অধিবেশনে হয়ে গেল। তারপর তিলক ও অ্যানি বেসান্তের 'হোমরুল লীগ' আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি আবার চাপা পড়ল। এদিকে মনটেগু-চেমসফোর্ড প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার নিয়ে, কংগ্রেসের নরম ও চরম পন্থীদের মধ্যে আবার বিবাদ বাঁধল।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের বোম্বাই কংগ্রেসের অধিবেশন নরমপন্থীরা বর্জন করল। তারা চিরকালের মত কংগ্রেস ত্যাগ করে, 'অল ইণ্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন' নামে এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করল।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে নতুন শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে যখন আইন পাস হল, সেটা কংগ্রেসের মনঃপূত হল না। এই সময় রাউলাট আইন পাস হওয়ায় দেশব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হল। গান্ধীজীর নির্দেশে সারা দেশ হরতাল পালন করল। স্কুলের ছেলেরাও এই হরতালের সামিল হল। আমরা স্কুলে গেলাম না ও শোকচিহ্নের প্রতীকস্বরূপ সারাদিন পাদুকা পরিহার করে খালি পায়ে রইলাম।

রাউলাট আইন পাস হওয়ায় দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হল, তারই অনুধাবনে পাঞ্জাবে ঘোরতর অত্যাচার ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হল। এরূপ অমানুষিক অত্যাচার ইংরেজের ভারত শাসনের ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি। অমৃতসরের পূর্বে অবস্থিত জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যানে আহূত এক সভায় সম্মিলিত জনতার ওপর জেনারেল ডায়ার-এর সৈনদল দশ মিনিটকাল অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ করল। সরকারী মতে ৩৭৯ জন নিহত ও ১২০০ জন আহত হয়েছিল। কিন্তু বেসরকারী মতে নিহতের সংখ্যা হাজারের ওপর। দেশব্যাপী এর তীব্র নিন্দা চলল। রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদে তাঁর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন।

এদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক কুটিল পরিস্থিতি ঘটল। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে অমৃতসর কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন দাশ যখন প্রস্তাব করলেন যে নতুন শাসন-পদ্ধতি বর্জন করা হউক, তখন তার বিরোধিতা করে গান্ধীজী বললেন যে, এই পদ্ধতি স্বীকার করে নিয়ে যতটুকু উন্নতি করা যায়, তা করা হউক। সেদিন গান্ধী-জীরই জয় হল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এর অল্পদিন পরেই গান্ধীজী নিজেই গভর্নমেন্টের সঙ্গে অসহযোগের প্রস্তাব করলেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গভর্নমেন্টের সঙ্গে অসহযোগিতার প্রস্তাব করলেন। এবার চিত্তরঞ্জন দাশ এর বিরোধিতা করলেন। কিন্তু এবারও গান্ধীজীরই জয় হল।

১১১

আমি ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। বেশভূষায় সেদিনের গান্ধী, পরবর্তীকালের গান্ধী

থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। 'বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি'র মত গান্ধীজীর মাথায় সেদিন ছিল এক বিরাট পাগড়ি। গায়ে ছিল ধোপদুরস্ত গিলে করা সাদা পাঞ্জাবী, যার ঝুল নেমে এসেছিল হাঁটুর তলা পর্যন্ত। পায়ে ছিল নাগরা জুতা। আর পরনে ছিল, সাদা ফিনফিনে একখানা ধুতি, যার কোঁচাটা লুটাচ্ছিল নাগরা জুতার তলা পর্যন্ত।

ওই কংগ্রেসে আমি দিকপাল অনেক দেশনেতার বক্তৃতা শুনেছিলাম। কিন্তু যাঁর বাগ্মিতা আমাকে অসাধারণভাবে অভিভূত করেছিল, তিনি হচ্ছেন মহম্মদ আলি জিন্না।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে গান্ধীজী হলেন কংগ্রেসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। তিনি বললেন, 'দাও আমাকে এক কোটি টাকা, আমি ছ'মাসের মধ্যে তোমাদের স্বরাজ এনে দেব।' লোকে অকৃপণভাবে সেদিন গান্ধীজীকে টাকা দিল। প্রতিদিন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রথম পৃষ্ঠায় 'বক্স' করে ছাপা হত সেদিন পর্যন্ত কত টাকা উঠল। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে এক কোটি টাকা উঠে গেল। কিন্তু স্বরাজ এল না। ওই টাকার হিসাবও কোনদিন কেউ দিল না। তা সত্ত্বেও তখন থেকে গান্ধীজীই কংগ্রেসের চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করতে লাগলেন। লোকে তাঁকে 'মহাত্মা' বলে অভিহিত করতে লাগল।

যদিও কলকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেছিলেন, তথাপি নাগপুর কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন-এর দল তা স্বীকার করে নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিলেন।

কিন্তু এর কিছুদিন পরেই সৃষ্ট হল বিধান সভার মধ্যে স্বরাজ লাভের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্য 'স্বরাজ্য পার্টি'। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হল যে, স্বরাজ্য পার্টি কংগ্রেসেরই অঙ্গ হিসাবে বিধান সভার মধ্যে স্বীয় কার্যক্রম অনুসরণ করে চলবে। বিধানসভার মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ব্রিটিশ সরকারকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করে তুললেন।

১১১

১৯২০ সালের কলকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হবার পর থেকেই দেশের সর্বত্র আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন। স্কুল, কলেজ ও ইউনিভারসিটি বয়কট করা হল। সে বছরেই আমার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার কথা। আমি পরীক্ষা দেব না বলেই ঠিক করলাম। কিন্তু পরীক্ষার ফি তো তিন মাস আগেই জমা দেওয়া হয়ে গিয়ে-

ছিল। যখন পরীক্ষা দেব না সিদ্ধান্ত করলাম, তখন পরীক্ষার ফি ফেরত পাবার জন্য ইউনিভারসিটির কাছে আবেদন করলাম। আরও হাজার হাজার ছেলে পরীক্ষার ফি ফেরত পাবার জন্য দরখাস্ত করল। তখনকার দিনে আবেদনের ভিত্তিতে পরীক্ষার ফি ফেরত দেবার ইউনিভারসিটির নিয়ম ছিল। যখন হাজার হাজার ছেলে পরীক্ষার ফি ফেরত পাবার জন্য আবেদন করল, তখন ইউনিভারসিটি এই নিয়মের পরিবর্তন করল। নতুন নিয়ম হল—পরীক্ষার ফি একবার জমা দেওয়া হলে আর ফেরত পাওয়া যাবে না। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দ থেকে সেই নতুন নিয়মই এখনও পর্যন্ত চালু আছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে পরীক্ষা দিতেই হল। বাহিরে অসহযোগী ছাত্রদলের 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি, আর ভেতরে চলছে আমাদের পরীক্ষা।

যথাসময়ে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে পরীক্ষার ফল বেরুল। তখনকার দিনে প্রতি বৎসরই ২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা শুরু হত এবং জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম ছাপা হত। এর কোন ব্যতিক্রম ঘটত না। কিন্তু আমাদের বছরে এর ব্যতিক্রম ঘটবার উপক্রম হয়েছিল, আমাকে নিয়ে। কেন সে কথা পরে বলব।

এখনকার মত যখন তখন পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা সেকালে অজ্ঞাত ছিল। আরও এক কথা। বাঙলা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সরকারের নিজস্ব গেজেটে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করবার কারণ, পরীক্ষার ফলাফলকে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া। তার ফলে, এখনকার মত নকল মার্কশীট দেখিয়ে কলেজে ভর্তি হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ যে পরীক্ষার ফল বের করা হত সেটা অনেকটা এই রকম :

গৌহাটি কটন কলেজিয়েট স্কুল

রোল নম্বর···সন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায় (১) EMmHL

" " ···বিনয় কুমার সেন (৩)

টীকা : রোল নম্বর = পরীক্ষায় বসবার রোল নম্বর ;

তারপর পরীক্ষার্থীর নাম ; নামের পর বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত কোন ডিভিসনে পাস করেছে ; সবশেষে ক'টা বিষয়ে শতকরা আশির উপর নম্বর পেয়েছে : E = English ; M = Mathematics ; m = additional mathematics ; H = ইতিহাস ; L = সংস্কৃত।

এখনকার দিনের মত তখন পরীক্ষা কেন্দ্রে টোকাটুকি করবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সেজন্য টোকাটুকির ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষার হলে কোন গোলমাল হত না। Invigilators-দের ছেলেরা খুব ভয় করত। সেজন্য পরীক্ষা নির্বিঘ্নেই

সম্পন্ন হত। এ ছাড়া, ইউনিভারসিটি কর্তৃক ডেস্‌কে আঁটা দোয়াতে দেওয়া কালি দিয়ে ইউনিভারসিটির ছাপা খাতায় পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখতে হত।

তা ছাড়া টোকাটুকি না হবার আর একটা কারণ ছিল। কারণটা হচ্ছে তখনকার দিনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য ইংরেজি, বাংলা প্রভৃতি বিষয়ে কোন পাঠ্যপুস্তক থাকত না। সেজন্য ছেলেদের সবই অজ্ঞাত প্রশ্নের উত্তর দিতে হত। সেই কারণে বই দেখে নকল করবার কোন অবকাশই থাকত না। বর্তমান যুগের পরীক্ষা-হলে টোকাটুকি সম্পর্কে যে-সব কেলেংকারী হয়, তা বন্ধ করতে হলে, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক একেবারে বর্জন করতে হবে। এতে তিন পক্ষের সুবিধা হবে। অভিভাবকরা পাঠ্যপুস্তক কেনার বিরাট খরচের হাত থেকে বাঁচবে; ছেলেরা ভাষার ওপর দখল লাভ করতে পারবে; আর, পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থা পরীক্ষা কেন্দ্রে অবলম্বিত দুর্নীতির হাত থেকে বেঁচে যাবে।

আমাদের সময়ে ইংরেজিটা ভাল করে শিখতে হত। কারণ, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না। পরীক্ষায় ফার্স্ট পেপারে দু-তিন পাতা বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ করতে হত ও একটা রচনা লিখতে হত। সেকেণ্ড পেপারে কতকগুলো ইংরেজি গদ্য প্যারাগ্রাফের ও কবিতার সারমর্ম লিখতে হত ও গ্রামারের প্রশ্নের উত্তর দিতে হত। বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদের জন্য যে দু-তিন পাতা বাংলা প্যাসেজ থাকত, তা সাধারণত বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে উদ্ধৃত করা হত। সেকেণ্ড পেপারে যে ইংরেজি গদ্য প্যারাগ্রাফ ও কবিতার সারমর্ম লিখতে হত, সেগুলো যেখান থেকে খুশি তোলা হত। সেজন্য আমরা স্কুলের লাইব্রেরী থেকে বহু ইংরেজি ও বাংলা বই পড়তাম। আমি পড়েছিলাম 'রবিনসন্ ক্রুসো', 'গালিভারস্ ট্র্যাভেলস্', জুলস্ ভারনের 'অ্যারাউণ্ড দি ওয়ালর্ড ইন এইটি ডেজ'; ডিকেনসের 'ডেভিড কপারফিল্ড', স্কটের 'আইভ্যান হো', ওয়াশিংটন আরভিং-এর 'রিপ ভ্যান উইংকল', ল্যামবস্ 'টেলস্ ফ্রম সেক্‌স্‌পীয়ার', বুকার টি ওয়াশিংটনের 'আপ ফ্রম স্লেভারি', বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, দামোদর মুখুজ্যের গ্রন্থাবলী, বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কংকাবতী', দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা', গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী, শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন'। তবে এই সব বই পড়ে ও ইংরেজিতে অনুবাদ করেই যে ইংরেজি শিখেছি, তা নয়। আমার ইংরেজি শিক্ষা দু'জনের কৃপায়। তাঁর মধ্যে একজন হচ্ছেন শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুলের হেডমাস্টার বিহারীলাল সুর। তাঁর কথা আমি আগেই বলেছি। তিনিই ডিক্‌শ-

নারী দেখাটা আমাদের মজ্জাগত করে দিয়েছিলেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও ওই অভ্যাস এখনও পরিহার করতে পারিনি।

আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যাঁর কৃপায় ইংরেজি শিখেছি ও যাঁকে আজও বিনম্রচিত্তে স্মরণ করি, তিনি হচ্ছেন অভিধানকার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের জ্যেষ্ঠতাত গোপালচন্দ্র দাস। তিনি ছিলেন আমার বাবার সহপাঠী। উভয়েই আলেকজান্ডার ডাফের সাক্ষাৎ ছাত্র। বৃদ্ধবয়সে তিনি অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন। বড় ছেলে কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু বাপের কোন খোঁজখবর রাখতেন না। অপর ছেলে ছিলেন বাঁকিপুর আর্ট স্কুলের শিক্ষক। তিনিই বাবাকে দশ টাকা করে মাসে মাসে পাঠাতেন। গোপলবাবু ছিলেন নিরাশ্রয় ব্যক্তি। সেকালের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী অন্নদা বাগচি মশাইয়ের সিকদার বাগানের বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে রাত্রিতে শয়ন করতেন। আর দিনের বেলাটা কাটাতেন আমার বাবার ডাক্তারখানায়। ওখানেই জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসকে আমি বহুবার আসতে দেখেছি। তিনি উত্তরপ্রদেশের ইনস্পেক্টর-জেনারেল অভ্ পুলিসের খাস মুনসী ছিলেন। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। যখনই আসতেন, তখনই একবার আমার বাবার ডাক্তারখানায় এসে বৃদ্ধ জ্যাঠামশাইকে দেখে যেতেন।

বৃদ্ধ স্থবির গোপালচন্দ্র দাসের একমাত্র সহায় ছিলাম আমি। দিনের বেলা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের এক পাউন্ড একখানা রুটি খেতেন। রুটিখানা আমিই সামনের পাল মশাইয়ের দোকান থেকে কিনে এনে দিতাম। দাম মাত্র একআনা। সেরেফ রুটিখানাই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতেন। রাস্তার কল থেকে এক বোতল জল এনে দিতাম, তাই পান করতেন। রাত্রে বাড়ি ফেরবার সময় গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে শালিগ্রামের দোকান থেকে দু-আনার পুরি-তরকারি খেয়ে অন্নদা বাগচি মশাইয়ের-বাড়িতে শুতে যেতেন। চোখে ভাল দেখতে না পেলেও প্রত্যহ একখানা 'ইংলিশম্যান' বা 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা কিনতেন। কাগজখানা আমাকেই পড়ে দিতে হত। তখন আমার বয়স দশ-বারো বৎসর হবে। সুতরাং অধিকাংশ শব্দেরই ভুল উচ্চারণ করতাম। আর মানে তো বুঝতামই না। উনি আমার উচ্চারণ শুধরে দিতেন ও মানে বলে দিতেন। তাতে আমার নতুন নতুন ইংরেজি শব্দ শেখা হত, আর পড়তে পড়তে ইংরেজি বাক্যবিন্যাসের রীতিও শিখে ফেলেছিলাম। তা ছাড়া ওঁর গভীর জ্ঞান ছিল পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শনের। ওসব বিষয়ে গল্পচ্ছলে তিনি আমাকে শিক্ষা দিতেন। আঠারো বছর বয়সে পেয়েছি আমার মাথা স্পর্শ করে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ, 'তুমি জীবনে কৃতী হও।' কিন্তু এই স্থবির বৃদ্ধের নীরব আশীর্বাদই হয়েছে আমার জীবনের পাথেয়।

তখনকার দিনের স্কুলের শিক্ষকরাও, ছেলেরা যাতে ভাষার ওপর দখল লাভ

করতে পারে, তার জন্য অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা দিতেন। আর ছেলেদেরও ছিল শিক্ষালাভ করবার জন্য তীব্র আগ্রহ। আজকালকার ছেলেদের মধ্যে সে আগ্রহ নেই। তাছাড়া, আজকাল তো মোটা মাহিনার প্রাইভেট টিউটার না রাখলে ছেলেদের লেখাপড়াই হয় না। আমাদের সময়ে ও-সব বালাই ছিল না। এটা আমি মধ্যবিত্ত সমাজের কথাই বলছি। কেননা, ধনী পরিবারের ছেলেদের পড়বার জন্য প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত করা হত।

ﻌ ﻌ ﻌ

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর সমস্যা হল, এর পর কি করব। কেননা, যদিও স্কুল কলেজ বর্জন করা হয়েছিল, তা হলেও সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প কিছু ব্যবস্থা করা হয় নি। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূব দিকের একটা বাড়িতে জাতীয় কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওখানে কোন কলেজ স্থাপিত হয়নি। দিন কতক ওখানে গিয়েছিলাম এবং চাটাই পাতা ঘরে সারাদিন কাটিয়ে, আসবার সময় নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের (ড. প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্রের পিতা) বাড়িতে লুচি হালুয়া খেয়ে বাড়ি ফিরে আসতাম। যারা ওই কলেজে ভর্তি হবার জন্য যেত, তাদের জন্য নির্মলচন্দ্র তাঁর বাড়িতে এই ব্যবস্থা করে ছিলেন।

ﻌ ﻌ ﻌ

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ওই প্রস্তাবিত কলেজ থেকে ফিরে আসবার পর, বাবা রোজই খবর নিতেন কলেজে ভর্তির কি হল? সব শুনে, বাবা বুঝে নিলেন যে ওটা একটা অনিশ্চয়তার ব্যাপার। তিনি চাপ দিলেন সাধারণ কলেজে ভর্তি হবার জন্য। আমাদের পরিবারে সকলেই বংশানুক্রমে স্কটিশ চার্চেস্ (এখন চার্চ) কলেজে পড়েছিল। বাবাতো আলেকজাণ্ডার ডাফ-এর (ইনিই স্কটিশ চার্চেস্ কলেজ স্থাপন করেছিলেন) সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন। আমার বড়দাও ওই কলেজে পড়েছে। আমার বোনের ছেলেরাও ওই কলেজে পড়েছে। এক কথায় স্কটিশ চার্চ কলেজ আমাদের 'ফ্যামিলি কলেজ।'

কিন্তু স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হওয়ার এক অন্তরায় দেখা দিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গুজব রটল যে কলেজের গেটে যে সকল ছাত্র পিকেটিং করবার জন্য শুয়ে ছিল, প্রিনসিপাল ওয়াট্ তাদের পদদলিত করে কলেজে প্রবেশ

করেছেন এবং তার প্রতিবাদে ইংরেজির অধ্যাপক ওয়ারেন সাহেব পদত্যাগ করে বিলাতে চলে গেছেন। গুজবটা যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। তা হলেও ওই গুজবটা নিয়ে বেশ একটা আন্দোলন জমাট বেঁধেছিল। ওই গুজবের প্রত্যুত্তরে ওয়াট সাহেব কাগজে যে বিবৃতি দিলেন, তা থেকে প্রকাশ পেল যে গুবজটা সম্পূর্ণ অলীক। প্রথমত, ওয়ারেন সাহেবের কর্মকালের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি স্কটল্যান্ডে অবস্থিত মিশনের কর্মকর্তাদের নির্দেশ অনুযায়ী দেশে ফিরে গেছেন। আর দ্বিতীয়ত, ওয়াট সাহেবের কলেজে প্রবেশের কোন প্রশ্নই ওঠে না, কেননা তিনি কলেজের দোতলায় তাঁর কোয়ার্টারে থাকতেন, এবং তাঁর কোয়ার্টার থেকে একটা সিঁড়ি সরাসরি কলেজের একতলায় অবস্থিত তাঁর অফিস ঘরে নেমে এসেছিল। তা ছাড়া, সেদিন যারা এই গুজব রটনা করেছিল, তারা একবারও চিন্তা করেনি যে মাত্র চার বছর আগে ওটেন-ঘটিত ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র বসুকে যখন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, তখন একমাত্র স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ ওয়াট সাহেবই নিজ কলেজে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। যাক্, গুজবটা যে অলীক তা শীঘ্রই প্রকাশ পেল। বাবা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। আমাকে স্কটিশ চার্চেস কলেজে ভর্তি হতে বললেন।

১১১

একটা কথা বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলাম। সেটাই এখানে বলতে চাই। আমি বলেছিলান যে সেকালে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বেরুত। কিন্তু আমাদের বছরে (১৯২১) এর ব্যতিক্রম হবার উপক্রম হয়েছিল। আমিই এর কারণ ছিলাম। আমি পরীক্ষায় ইতিহাসে ১০০-র মধ্যে ৯৯ নম্বর পেয়েছিলাম। সিণ্ডিকেটের মিটিং-এ আশুবাবু (স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়) এর বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, প্রতি বিষয়ে ছ'টা করে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, এবং প্রতি প্রশ্নের উত্তরের জন্য ১৬ নম্বর বরাদ্দ থাকে। সুতরাং সঠিক উত্তরের জন্য প্রতি বিষয়ের পূর্ণ নম্বর হচ্ছে ৯৬। ছেলেটি পূর্ণসংখ্যার অধিক নম্বর পায় কি করে? আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, এর আগে আশুবাবুর ছেলে রমাপ্রসাদ ইতিহাসে ৯৬ নম্বর পেয়ে ইউনিভার্সিটির ইতিহাসে এক 'রেকর্ড' স্থাপন করেছিল। সুতরাং আমাকে ৯৬-এর বেশী নম্বর দিলে রমাপ্রসাদের রেকর্ড নাকচ হয়ে যায়। আমার ৯৯ নম্বর পাওয়ার বিরোধিতা করবার এটাই ছিল আশুবাবুর আসল কারণ। সিণ্ডিকেটে আশুবাবুর বিরোধী দল, এই কারণটা

জেনে ফেলেছিল। আশুবাবু যখন বললেন যে, ছেলেটিকে ৯৬ পূর্ণসংখ্যার বেশী নম্বর কি করে দেওয়া যায়, তিন নম্বর কেটে নেওয়া হোক, তখন তাঁর বিরোধীদলের একজন ব্যঙ্গ করে বললেন—দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ছেলেটি ইতিহাসে ৯৯ নম্বর ছাড়া, অঙ্কে ১০০-র মধ্যে ১০০-ই পেয়েছে, সুতরাং ওর ইতিহাসের তিন নম্বর ছাড়া অঙ্কেরও চার নম্বর কেটে নেওয়া হোক। উত্তরে আশুবাবু বললেন, অঙ্কে ১০০-র মধ্যে ১০০ নম্বর দেওয়ার নজির আছে, সুতরাং অঙ্কের ১০০ নম্বরই বহাল থাকবে, কেবল ইতিহাসেরই তিন নম্বর কমিয়ে দেওয়া হোক। এই নিয়ে সিণ্ডিকেটের মিটিং-এ ভীষণ বচসার সৃষ্টি হল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল যে, আমার ইতিহাসের খাতাটা অপর কোন পরীক্ষকের কাছে পুনরায় পরীক্ষার জন্য পাঠানো হোক। ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমার ইতিহাসের খাতাটা অপর এক পরীক্ষকের কাছে পাঠানো হল। কিন্তু সে পরীক্ষকও যখন ৯৯ নম্বর দেওয়ার পক্ষে মত দিলেন, তখন আশুবাবু প্রস্তাব করলেন যে একজনের মতের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন হবে না, সুতরাং খাতাখানা তিনজন পরীক্ষকের কাছে পুনপরীক্ষার জন্য পাঠানো হোক এবং তাদের মধ্যে দু'জন যে মত দেবে, সেটাই গ্রহণ করা হোক। আশুবাবুর সেই প্রস্তাব অনুযায়ী খাতাখানা আরও তিনজন পরীক্ষকের কাছে পাঠানো হল, এবং ওই পরীক্ষকরা যখন ৯৯ নম্বর দেওয়া সাব্যস্ত করলেন, তখন আশুবাবু হালে পানি না পেয়ে ৯৯ নম্বর দেওয়াই মঞ্জুর করলেন। আমাকে ইতিহাসে ৯৯ নম্বর দেওয়া নিয়ে, সিণ্ডিকেটে যে গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছিল এবং ওই গোলযোগ চুকাবার জন্য যে সময় নষ্ট হচ্ছিল, তাতে অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন যে বুঝি বা সেবার জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা সম্ভবপর হবে না। যা হোক সিণ্ডিকেটের মধ্যে গোলযোগ সত্ত্বেও পরীক্ষার ফল জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছিল।

৯৯৯

সেকালে স্কটিশ চার্চেস্ কলেজে প্রতি শ্রেণীতে মাত্র ৪০ জন করে ছাত্র ভর্তি করা হত। পরীক্ষার মার্কশীট দেখে ভর্তি করা হত। তখনকার দিনে পরীক্ষার ফল বেরুবার পর আবেদন করে ও ফী জমা দিয়ে মার্কশীট কিনতে হত। এখনকার মত সঙ্গে সঙ্গে ও বিনা পয়সায় পাওয়া যেত না। মার্কশীটের নম্বর অনুযায়ী কলেজে রোল নম্বর নির্দিষ্ট হত। কলেজে আমার রোল নম্বর ছিল চার।

যে বৎসর আমি কলেজে ভর্তি হই, সে বৎসরই কলকাতার কলেজসমূহে ছাত্রদের মাহিনা বাড়ানো হয়। স্কটিশ চার্চেস্ কলেজে আগে মাহিনা ছিল পাঁচ টাকা। সে বৎসর (১৯২১) থেকে করা হল ছয় টাকা। অন্যান্য বেসরকারী কলেজে মাহিনা আরও কম ছিল। সিটি কলেজে চার টাকা, সেণ্ট পলস্ কলেজে পাঁচ টাকা, বিদ্যাসাগর কলেজে তিন টাকা, আর ক্ষুদিরাম বাবুর সেণ্ট্রাল কলেজে মাত্র দু'টাকা। আজকালকার দিনে এসব কথা আজগুবি গল্প বলে মনে হবে।

আগেই বলেছি যে আমাদের পরিবারের সকলে বংশানুক্রমিকভাবে স্কটিশ চার্চেস কলেজে পড়ে এসেছে। এছাড়া, স্কটিশ চার্চেস্ কলেজ সম্বন্ধে আমার আর একটা আকর্ষণ ছিল। সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ওয়াট সাহেবের সৎসাহস। নেতাজী সুভাষকে যখন ওটেন-ঘটিত ব্যাপার নিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সরে আসতে হয়েছিল, তখন সরকারী রোষের ভয়ে কলকাতার অন্য কোন প্রথম শ্রেণীর কলেজের প্রিন্সিপাল তাঁকে ভর্তি করতে সাহস করেন নি। একমাত্র প্রিন্সিপাল ওয়াটই তাঁকে স্কটিশ চার্চেস কলেজে স্থান দিয়েছিলেন। সুভাষ সম্বন্ধে স্কটিশ চার্চেস কলেজ বেশ গর্ব অনুভব করত। আমি কলেজে ভর্তি হবার অব্যবহিত পরেই, কলেজ ম্যাগাজিনের যে সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাতে সুভাষ-এর আই. সি. এস. পরীক্ষায় সাফল্যের সংবাদ বেশ গর্বের সঙ্গে সম্পাদকীয় স্তম্ভে ছাপা হয়েছিল।

ওয়াটের মত দক্ষ প্রিন্সিপাল কলকাতার আর কোন কলেজে ছিল না। ওয়াটের চেহারা ছিল দৈত্যের মত। বাহিরে থেকে লোকটা ছিল ইস্পাতের মত ভীষণ কঠিন, কিন্তু তার মনটা ছিল তুলোর মত নরম। তিনি ছাত্রদের যেমন প্রাণের সঙ্গে ভালবাসতেন, আবার কলেজে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখতে সেই রকম কঠোর ও তৎপর ছিলেন। তিনি বলতেন, কলেজের মধ্যে পান খাওয়া ও ইলেকট্রিক পাখার অপব্যবহার করা, স্কটিশ চার্চেস্ কলেজে নিষিদ্ধ। আমরা বাইরে গিয়ে পান খেয়ে আসতাম এবং ক্লাস শেষ হয়ে গেলে ইলেকট্রিক পাখা বন্ধ করে দিতাম। পরীক্ষার সময় টোকাটুকি করাও স্কটিশ চার্চেস্ কলেজ অজ্ঞাত ছিল। একথা পরীক্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াট সাহেব পরীক্ষা-হলে এসে ছাত্রদের স্মরণ করিয়ে দিতেন। আগেই বলেছি যে ওয়াট সাহেব যেমন একদিকে খুব কঠোর ছিলেন, অপর দিকে তেমনই খুব নরম ছিলেন। যদি কোন কারণে (যেমন হঠাৎ বাবার মৃত্যুতে) কোন ছাত্রের কলেজে পড়া আর সম্ভবপর হত না, ওয়াট সাহেব তার কলেজের মাহিনা মকুব করে, তার কলেজে পড়া অবিচ্ছিন্ন রাখতেন। তা ছাড়া, দু-চারজন দুঃস্থ ছাত্রকে কলেজে বিনা বেতনেই পড়তে দিতেন।

ওয়াট সাহেব খুব ভাল বাংলা বলতে পারতেন। আমার সময় কলেজে বাংলা

পড়াতেন কালীপণ্ডিত মশাই। যদি কোনদিন অসুস্থতার জন্য কালীপণ্ডিত মশাই কলেজে আসতে না পারতেন, তা হলে তিনি পাঠিয়ে দিতেন বঙ্কিমবাবুর ভাইপোকে (বোধ হয় সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র)। আবার তিনিও না এলে, তাঁর বিকল্প হিসাবে ওয়াট সাহেব নিজেই বাংলার ক্লাশ নিতেন। আমাদের সময় বাংলার পাঠ্য-পুস্তক ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'। 'কপালকুণ্ডলা'র ভাষা ও কালিদাস থেকে উদ্ধৃত শ্লোক 'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী, তমালতালী বনরাজীনীলা' ইত্যাদি ওয়াট সাহেব স্বচ্ছন্দগতিতে পাঠ করতেন ও ব্যাখ্যা করতেন।

ওয়াট সাহেব বেশ রসিক লোক ছিলেন। একবার অসহযোগ আন্দোলন এমন তীব্র আকার ধারণ করল যে, ছেলেরা কেউ আর কলেজে গেল না। কয়েকদিন পরে ছেলেরা যখন আবার কলেজে ফিরে এল, ওয়াট সাহেব ক্লাসে এসে দর্শন দিলেন। ছেলেদের পাশে বসে প্রত্যেক ছেলেকে, ক'দিন ক্লাসে না-আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কেউই আর সত্যি কথা বলল না। কেউ বলল, বাবার অসুখ ছিল, কেউ বলল, মার অসুখ ছিল, ইত্যাদি। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রোল নম্বর ফোর, তোমার কি হয়েছিল? মাসীমার অসুখ? এই বলে তিনি খুব হাসতে লাগলেন, এবং আর কারুকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে চলে গেলেন।



স্কটিশ চার্চেস্ কলেজে মোট চার বছর পড়েছিলাম। নানা কারণে এই চার বছর আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। কতরকম ভাবে যে এই চার বছরে উপকৃত হয়েছি, তার ইয়ত্তা নেই। রবীন্দ্রনাথকে স্কটিশ চার্চেস্ কলেজ এক বিশেষ মর্যাদা দিত। 'প্রেয়ার হল'-এ ঢুকবার দরজার বাঁদিকে একটা বিশেষ আলমারীতে ওঁরা সংরক্ষিত করে রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ। কলেজে ভর্তি হবার পর আমার প্রথম লোভ হল ওই বইগুলো সব পড়ে ফেলবার। এক একখানা করে বই বাড়ি নিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার সঙ্গে পরিচিত হলাম। ক্লাসে কালীপণ্ডিত মশাই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘোর বিরোধী। কথায় কথায় রবীন্দ্র-নিন্দায় ক্লাশ মুখরিত করে তুলতেন। কিন্তু আমি যখন রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, এক নতুন সৌন্দর্যের জগতে প্রবেশ করলাম, তখন রবীন্দ্র-নিন্দা আর সহ্য করতে পারলাম না। এক একদিন কালীপণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে তুমুল বাদানুবাদ লাগিয়ে দিতাম। আগে কালীপণ্ডিত মশাই যখন রবীন্দ্র-নিন্দায় লিপ্ত হতেন, তখন আমার সহপাঠীদের মধ্যে কেউ তার প্রতিবাদ করত না। কিন্তু আমি যখন কালীপণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হলাম,

তখন অনেকেই মুখ খুলল। শেষকালে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে কালীপণ্ডিত মশাই রবীন্দ্র-নিন্দা পরিহার করতে বাধ্য হলেন। কেবল আক্ষেপ করে বলতেন, বাবা, তোমাদের কবির 'সীমার মধ্যে অসীম তুমি' এসব বিদকুটে ধারণা, আমার মাথায় ঢোকে না।

শ্রদ্ধানতভাবে ও বিনম্রচিত্তে আজ স্মরণ করি আমার কলেজের অনেক শিক্ষককে, বিশেষ করে ইংরেজি, ইতিহাস ও লজিক-এর শিক্ষকদের। প্রথম দু'বছর ইংরেজি পড়েছি ক্যামারন, সিনক্লেয়ার ও এম. কে. মুখার্জি'র কাছে। আমি যখন কলেজে ভর্তি হই, তখন এম. কে. মুখার্জিই ছিলেন একমাত্র ইংরেজির ভারতীয় শিক্ষক। অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও দখল ছিল ওঁর ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর। খুব ভাল ইংরেজি গদ্য পড়াতেন। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সেকেণ্ড ইয়ার সম্পূর্ণ হবার পরই উনি শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে পাটনায় চলে গেলেন ওকালতি প্র্যাকটিস করবার জন্য। স্কটিশ চার্চেস্ কলেজের ইংরেজি বিভাগে আরও একজন ভারতীয় শিক্ষক ছিলেন ; তবে তিনি ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন না, মাত্র আমাদের ইংরেজির টিউটরিয়াল করাতেন। তিনি হচ্ছেন স্বনামধন্য অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু। ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী স্বর্ণপদক দিয়ে ও গিরিশ লেকচারার পদে বরণ করে সম্মানিত করেছিল। নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল এবং কথিত আছে যে, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ও নটশেখর নরেশচন্দ্র তাঁর কাছ থেকে অভিনয় বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। সুতরাং এ রকম এক মহারথীর কাছে শিক্ষালাভ করেছি বলে আজ নিজেকে ধন্য মনে করি।

ইংরেজির অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসাবে ক্যামারন সাহেবের বেশ সুনাম ছিল। তিনিই প্রথম আমাদের 'চেম্বারস্ টয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী' অভিধান বর্জন করে 'কনসাইজ অক্‌স্‌ফোর্ড ডিকশনারী' ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করেন। এতে আমাদের উপকার হয়েছিল। এর সাহায্যে আমরা ইংরেজি শব্দ ও ইডিয়মের যথাযথ ব্যবহার করতে শিখেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের ফাউলারের 'কিংস্ ইংলিশ' ও কুইলার-কাউচের 'দি আর্ট অভ্ রাইটিং' বই দুখানা পড়তে বলেন। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখনীয় যে, তখনও ফাউলারের 'মডার্ন ইংলিশ ইউসেজ' বইটা লেখা হয়নি এবং 'পকেট অকস্‌ফোর্ড ডিকশনারী' বইটাও প্রকাশিত হয়নি।

ক্যামারন সাহেবের প্রথম দিনের লেকচারটা এত ভাল লাগল যে, ইংরেজি সাহিত্যের কি কি বই পড়া উচিত, সে সম্বন্ধে পরামর্শ নেবার জন্য ওঁর সঙ্গে 'প্রফেসরস্ রুম'-এ গিয়ে দেখা করলাম। তিনি বললেন, দ্যাখ, আমাদের স্কটিশ

চার্চেস্‌ কলেজের বিরাট লাইব্রেরী ইংরেজি সাহিত্যের বইয়ে খুবই সমৃদ্ধশালী। তুমি একটা কাজ কর, স্টপফোর্ড ব্রুকস-এর 'ইরেজি সাহিত্যের ইতিহাস' সম্বন্ধে একখানা খুব ছোট বই আছে। তুমি ওই বইখানা নিয়ে পড়ে ফেল, তা হলে নিজেই বুঝতে পারবে তোমার কি কি বই পড়া উচিত। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কি বই পড়েছ ? আমি স্কুলে যে-সব বই পড়েছিলাম, সেগুলোর নাম করলাম। তাছাড়া কলেজে ভর্তি হবার পর গোপাল দাস মশাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী মিসেস শেলীর 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' ও এডমণ্ড বার্কের 'অ্যান এসে অন দি সাব্‌লাইম্‌ অ্যাণ্ড দি বিউটিফুল' বই দুখানা পড়ে ফেলেছিলাম। সে দুখানারও নাম করলাম। এদুখানা বই আমি পড়েছি শুনে তিনি বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন! তারপর আমাকে বললেন, তুমি কলেজ ম্যাগাজিনের জন্য আমাকে কিছু প্রবন্ধ দাও। সেই থেকেই আমি আমার প্রাবন্ধিক জীবনের অনুপ্রেরণা পেলাম। যে চার বছর স্কটিশ চার্চেস্‌ কলেজে পড়েছি, সে চার বছরই স্কটিশ চার্চেস্‌ কলেজ ম্যাগাজিন-এ ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধ লিখেছি। তা ছাড়া, ওই সময়ে 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী', 'আমার দেশ' ও 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় অনেকগুলো প্রবন্ধ, কাহিনী ও গল্প লিখেছি।

৯ ৯ ৯

স্কটিশ চার্চেস্‌ কলেজে পড়াকালীন শেষের দু'বছর কয়েকজন বিখ্যাত অধ্যাপকের কাছে পড়েছি। স্ক্রীমজার সাহেব তাঁদের মধ্যে একজন। স্ক্রীমজার সাহেবের কাছে পড়েছি শেকস্‌পীয়ারের 'ওথেলো' নাটক। স্ক্রীমজার সাহেব একসময় বিলাতের এক নামজাদা থিয়েটারের অভিনেতা ছিলেন। কিন্তু মঞ্চ থেকে পড়ে গিয়ে পা ভাঙার ফলে অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন। তিনি যখন 'ওথেলো' পড়াতেন, তখন মনে হত যেন তিনি ওই নাটকখানার অভিনয় করছেন। অধ্যাপক বি. বি. রায়ের কাছে পড়েছি গদ্যের বই 'মডার্ন থট্‌'। বি. বি. রায় প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। কলেজের কর্তৃপক্ষ মহলের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায়, তিনি সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্কটিশ চার্চেস কলেজে এসেছিলেন। খুব ভাল পড়াতেন। আর একজন শিক্ষক যাঁর কাছে ইংলিশ অনার্স ক্লাসে পদ্য বা কবিতা পড়েছি, তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক সুশীল দত্ত। তিনি আমাদের টেনিসনের 'প্রিন্সেস্‌' পড়াতেন। ইংরেজির বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য তাঁর অধ্যাপনা আমাদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। আমরা যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ি, তখনই তিনি কলেজে যোগদান করেন।

১১১

এখানে স্কটিশ চার্চেস্ কলেজের আরও তিনজন অধ্যাপকের নাম করি, যাঁদের কাছে আমি খুবই প্রিয় ছিলাম। তাঁদের মধ্যে প্রথম জন হচ্ছেন মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি আমাদের ইতিহাস পড়াতেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসের ওপর তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। তিনি ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ানো শুরু করবার আগে, আমরা ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়তাম ম্যাকলেনান সাহেবের কাছে। কিন্তু ম্যাকলেনান সাহেব পুণায় আর্মি চ্যাপলেন নিযুক্ত হওয়ায়, ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ানোর ভার পড়ে মহেন্দ্রলাল সরকারের ওপর। মহেন্দ্রলাল সরকার আমাদের ইংলণ্ডের ইতিহাসটা খুব ভালই পড়াতেন। ইতিহাসের একটা ঘটনার সঙ্গে আর একটা ঘটনার কি সম্পর্ক এবং ঘটনা-প্রবাহের কি যুক্তি আছে, তা ভাল করেই বুঝিয়ে দিতেন। যেহেতু পরীক্ষায় আমি তাঁর পেপারে সর্বোচ্চ নম্বর পেতাম, সেজন্য তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। ১৯২৫ সালে কলেজ থেকে বি. এ. পাস করে বেরিয়ে আসবার পর তাঁর সঙ্গে বহু বৎসর আর দেখা হয়নি। আবার দেখা হয়েছিল ২৫ বছর পর ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে। তিনি তখন স্কটিশ চার্চ কলেজের (আমি ১৯২৫ সালে কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়ে আসবার পর স্কটল্যাণ্ডের ধর্মযাজকদের মধ্যে আগে যে বিভেদ ছিল, তা লুপ্ত হবার পর কলেজের নতুন নাম হয়েছিল স্কটিশ চার্চ কলেজ) প্রিন্সিপাল। ১৯৫০ সালে গিয়েছিলাম আমার ছেলেকে ওই কলেজে ভর্তি করবার জন্য। গিয়ে দেখলাম ভর্তির জন্য প্রিন্সিপালের ঘরের সামনে লাইন লেগেছে। আমি লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। একজন ছেলে ও'র ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় 'সুইং ডোর'টা একটু ফাঁক হয়েছে। তারই ফাঁক দিয়ে উনি আমাকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। নিজের আসন ছেড়ে ছুটে এসেছেন দরজার বাহিরে। এসেই স্নেহার্দ্র চিত্তে আমাকে জড়িয়ে ধরেছেন। তারপর আমাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে আমার ছেলেকে ভর্তি করে নিলেন।

মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন খ্রীশ্চান। দ্বিতীয় জন সত্যপ্রিয় বিশ্বাসও তাই। তিনি আমাদের 'লজিক' ও 'বাইবেল' পড়াতেন। এ দুটো বিষয়েও আমি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেতাম। আগের বছর উনি এম. এ. পাশ করে কিছু-দিনের জন্য বজবজ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তারপর আমাদের কলেজে আসেন 'লজিক'-এর অধ্যাপকরূপে। বয়সে আমাদের চেয়ে সাত আট বছর বড়। সেজন্য আমাদের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতেন। ও'র বাড়িতে আমি প্রায়ই যেতাম। এই নিয়ে আমার পরিবারের মধ্যে এক

অশান্তি ঘটে। আমার এক ভাগ্নেও স্কটিশ চার্চেস কলেজে পড়ত। সে-ই এটা ঘটিয়েছিল। একদিন সে আমার বাবার কাছে এসে বলে যে, দাদা, হয়ে গেছে। বাবা জিজ্ঞেস করেন, কি হয়ে গেছে? সে কেবলই বলে, 'হয়ে গেছে!' বাবা বলেন, বলবি তো কি হয়ে গেছে। তখন সে বলে, মামা এবার ক্রীশ্চান হয়ে গিয়ে এক ক্রীশ্চান মেয়েকে বিয়ে করবে। তারপর সে আমার ওই অধ্যাপকের বাড়ি যাওয়া ও অধ্যাপকের অবিবাহিতা বোন থাকবার কথা বলে। বাবা আমাকে ডেকে, ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সরলচিত্তে বাবাকে সমস্ত ঘটনাটাই বললাম। বাবা কতটা কি বিশ্বাস করলেন জানি না, কিন্তু এর কিছুদিন পরেই তিনি আমার বিবাহ দিয়ে দিলেন। ভাবলেন, বোধ হয় ওইটাই ক্রীশ্চান না হওয়ার রক্ষাকবচ।

তৃতীয় জন ছিলেন হিন্দু। নাম অধ্যাপক অরুণ সেন, কবি সমর সেনের বাবা ও রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের মেজ ছেলে। তিনি আমাদের গ্রীস ও রোমের ইতিহাস পড়াতেন। তিনি ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত। প্রতি শনিবার শান্তিনিকেতন যেতেন ও রবিবার রাত্রে আবার ফিরে আসতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে অরুণ সেন মশাই রবীন্দ্রনাথকে বলেন, এবার আমাদের কলেজে একটি ছেলে এসেছে, তার স্মৃতিশক্তি অদ্ভুত। কোন বই একবার মাত্র পড়বার পর সে আনুপূর্বিক সব আবৃত্তি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, অরুণ, এবার তুমি আসবার সময় সেই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। আমি একবার ছেলেটিকে দেখতে চাই।

পরের বারে যাবার সময় অরুণবাবু আমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ তখন একখানা ইংরেজি বই পড়ছিলেন। তিনি সেই বইখানার একটা জায়গা খুলে আমাকে পড়তে দেন। আমার যখন প্রায় দু-পাতা পড়া হয়েছে, তখন তিনি আমাকে থামতে বলেন। বইখানা চেয়ে নিয়ে তিনি আমাকে আবৃত্তি করতে বললেন। আমি হুবহু সঠিক আবৃত্তি করলাম। রবীন্দ্রনাথ চমৎকৃত হলেন। তিনি প্রাণ খুলে আমার মাথা স্পর্শ করে আমাকে 'জীবনে কৃতী হও' বলে আশীর্বাদ করলেন।

১১১

স্কটিশ চার্চেস্ কলেজে পড়ার সময়েই বাঙলাদেশের দুই সুসন্তানের মহা-প্রয়াণে আমরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম। দুজনেরই মৃত্যু ঘটেছিল কলকাতার বাইরে। সেজন্য তাঁদের শবদেহ যখন কলকাতায় নিয়ে আসা হয়, তখন

রেলস্টেশন থেকে শ্মশানঘাট পর্যন্ত শোকগ্রস্ত মানুষের যে শবযাত্রা হয়েছিল, তা কলকাতার ইতিহাসে বিরল। আশু মুখুজ্যের মৃত্যুতে (২৫ মে ১৯২৪) বাঙলা সেদিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, কেননা তাঁর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গেই একটা গুজব রটল যে তাঁকে খাদ্যের সঙ্গে বিষপ্রয়োগে মেরে ফেলা হয়েছে। হাইকোর্টের জজিয়তি থেকে অবসরগ্রহণের পর তিনি পাটনায় গিয়েছিলেন ডুমরাঁও মামলায় ওকালতি করবার জন্য। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রচণ্ড স্বাজাত্যাভিমানের জন্য। সেজন্য তাঁকে 'বেঙ্গল টাইগার' বলা হত। গণিতশাস্ত্রে ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, এবং কঠিন কঠিন গাণিতিক সমস্যাসমূহ সমাধান করে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সেজন্য সরকার তাঁকে শিক্ষা-বিভাগে চাকরি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তৎপরিবর্তে তিনি আইনজীবীর স্বাধীন পেশা গ্রহণ করেছিলেন, যার পরিণতিতে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিছুদিন রাজনীতিও করেছিলেন, এবং ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজার মত মহারথীদের পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু জীবনে তাঁর আসল ভূমিকা ছিল শিক্ষাবিদ হিসাবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন প্রাণ-পুরুষ। উপাচার্যরূপে থাকাকালীন তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তার বর্তমান স্নাতকোত্তর রূপ দেন। স্নাতকোত্তর বিভাগে তিনি নানা বিষয় ও ভারতীয় নানাভাষার শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করেন। অসাধারণ নির্ভীকতার সহিত তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলবার জন্য। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্যামাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হিসাবে তাঁর আদর্শ বজায় রাখবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর (১৯৫৩) থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রম-অবনতি ঘটতে থাকে।

ℒℒℒ

দ্বিতীয় জন ছিলেন বাঙলার রাজনৈতিক জগতের মুকুটমণি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ জুন তারিখে তাঁর মৃত্যু ঘটে দার্জিলিঙ-এ। তাঁর শবযাত্রা বাঙলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দৃশ্য হয়ে আছে। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সেদিন মুষড়ে পড়েছিল তাঁর মৃত্যুতে। শোকার্ত-চিত্তে উদাত্তকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ সেদিন বলেছিলেন—

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

আশুতোষের মত তিনিও গ্রহণ করেছিলেন ব্যবহারজীবীর পেশা। বিখ্যাত হয়েছিলেন তিনি আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী পক্ষে দাঁড়িয়ে অরবিন্দ সমেত অনেকের মুক্তিলাভ সংগ্রহ করে। তখন থেকেই সুনাম অর্জন করেন দেশপ্রেমিক হিসাবে। সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সময় থেকে। বিরাট পসারযুক্ত ব্যারিস্টারী পেশা ত্যাগ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গান্ধীজীর সমকক্ষ বা তাঁর চেয়েও বড় রাজনীতিক ছিলেন। তাঁর সংগঠিত 'স্বরাজ্য দল' ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দলের মর্যাদা পায়। **১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের** নির্বাচনে স্বরাজ্যদল বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। আইনসভার মধ্যে সরকারী নীতির বিরোধিতা করে সরকারকে বিপর্যস্ত করে তোলেন। ব্যারিস্টারী পেশা ত্যাগ করার পর থেকেই, বিলাসবহুল জীবন পরিহার করে অসাধারণ কৃচ্ছ্রসাধন করেন। নিজের বসতবাটি জনসাধারণকে দান করেন। আজ সেই বসতবাটিতেই 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' অবস্থিত। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই বাঙলার রাজনৈতিক সংহতি নষ্ট হয়ে যায়।

~ ~ ~

আমার কলেজ জীবনের কথা বলতে বলতেই আমি জাতীয় জীবনের এই দুই শোকাবহ ঘটনার উল্লেখ করেছি। এবার আমি আমার কলেজ জীবনেই আবার ফিরে আসছি। কথায় কথায় ওয়াট সাহেব বলতেন, স্কটিশ চার্চেস্ কলেজের ছাত্ররা জীবনে কখনও অকৃতকার্য হয় না। কথাটা তিনি যখনই বলতেন, তখনই আমরা খুব অনুপ্রেরণা পেতাম। পরে মিলিয়ে দেখেছি তিনি একটা খাঁটি সত্য কথা বলতেন। স্কটিশ চার্চেস্ কলেজের ছাত্ররা জীবনসংগ্রামে কখনও পরাহত হত না। আমার সহপাঠীদের মধ্যে যারই সঙ্গে পরবর্তীকালে দেখা হয়েছে, দেখেছি যে তারা সকলেই কর্মক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে। কেউ অধ্যাপক, কেউ সাংবাদিক, কেউ ব্যবহারজীবী, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ হাকিম, আবার কেউ বা সরকারী উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কলেজে রোল-নম্বরই তাদের পরিচয় ছিল, সকলের নাম জানতাম না। সেজন্য এখানে মাত্র দু'একজনের কথাই বলব যাদের নাম জানতাম। প্রথমেই বলব ব্যাপটিস্ট মিশনের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড বি. এ. নাগের ছেলে প্রেমানন্দ নাগের কথা। আমার রোল-নম্বর ছিল চার, আর ওর রোল-নম্বর ছিল এক। আমাদের মধ্যে খুবই সৌহার্দ্য ছিল। সেজন্যাই ওর

নামটা আমি জানতাম। সে বি· সি· এস· পরীক্ষায় পাস করে সরকারী কর্মক্ষেত্রে ঢুকেছিল। এই পর্যন্তই জানতাম। পরে কি হয়েছিল তা জানতাম না। এবার এক প্রহসনের কথা বলি। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের কথা। দু'বছর আগে সিঁথিতে একটা একতলা বাড়ি তৈরী করেছি। মাত্র দুখানা ঘর, তা শোবার ঘরই বলুন, বা বসবার ঘরই বলুন। ছেলেপুলেদের নিয়ে ওই দুখানা ঘরে ঠাঁই হয় না। সেজন্য সিদ্ধান্ত করলাম, বাড়িখানাকে দোতলা করব। প্রয়োজন হল লোহার রড্ ও সিমেন্টের। কালোবাজারে দাম অনেক। কনট্রোলের পারমিট পেলে অনেক কম দামে পাওয়া যায়। 'আনন্দবাজার' আপিসে বিনোদবাবুকে আমার প্রয়োজনের কথা বললাম। উনি আমাকে সিভিল সাপ্লাইজ মিনিস্টার নিকুঞ্জ মাইতি মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতেব ললেন। তখন মাইতি মশাইয়ের আপিস টাউন-হলে। বিনোদ-বাবু শিখিয়ে দিলেন, ও'র আপিসের লোকেরা সহজে আপনাকে দেখা করতে দেবে না। দোতলায় উঠে দেখবেন ওঁর আপিসের বিরাট হলে কয়েকশত করণিক বসে কাজ করছে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ কনস্টবল। আপনি ওসব কিছুই ভ্রূক্ষেপ করবেন না। দেখবেন হলের দক্ষিণদিকে একটা বন্ধ দরজা আছে। আপনি সেরেফ গট্‌গট্ করে ওই দরজাটার দিকে চলে যাবেন। তারপর দরজাটা ঠেলে ভেতরে চলে যাবেন। সামনেই দেখবেন একটা বড় টেবিলে মাইতি মশাই বসে আছেন। তাঁকে গিয়ে আপনি সরাসরি আপনার প্রয়োজনের কথা বলবেন।

বিনোদবাবুর কথামত চলে গেলাম টাউন-হলে। দোতলায় উঠে দেখি মস্ত বড় হল। আপিসের চেহারা দেখে ভড়কে গেলাম। আরও ভড়কে গেলাম পুলিশ কনস্টবলদের দেখে। কিন্তু নিমেষের মধ্যে চিন্তা করে নিলাম যে এই মুহূর্তে ভড়কালে চলবে না। পুলিশ কনস্টবল ও করণিকদের ভ্রূক্ষেপ না করে দক্ষিণের ওই দরজাটার দিকে চলে গেলাম। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু কই, সেই মস্ত বড় টেবিলটার সামনের চেয়ারে কেউ তো বসা নেই। খুব বিব্রত হয়ে পড়লাম। ঘরের দক্ষিণ দিকেই দেখলাম একটা বারান্দা। বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলাম। বারান্দায় গিয়ে দেখলাম, একটা মাদুরের ওপর বসে একজন দপ্তরির মত লোক কতকগুলো কাগজ নিয়ে কি করছে। তাকে গিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, কিন্তু দেখছি উনি তো নেই, বলতে পারেন উনি কখন আসবেন? লোকটা বলল, মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে আপনার কি দরকার? আমি বললাম, আমার প্রয়োজনের কথা আমি মন্ত্রী-মশাইকেই বলব, আপনি শুধু বলুন উনি কখন আসবেন? লোকটা বলল, আমাকেই বলুন না, তাতেই আপনার কাজ হবে। গায়ে একটা খদ্দরের ফতুয়া, পরনে হাঁটুর ওপর একখানা খদ্দরের কাপড়, আর মাদুরের ওপর বসা, আমি তো

কল্পনা করতেই পারিনি যে, উনিই মন্ত্রীমশাই। আমি ভুল সংশোধন করবার জন্য তাড়াতাড়ি ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে, ওঁর সামনে বসে পড়লাম।

সেদিন সত্যিকারের একজন দেশসেবকের সামনে বসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। মাইতি মশাইকে আমার প্রয়োজনের কথা বলাতে, উনি উঠে নিজের ঘরে গিয়ে ঘণ্টাটা বাজালেন। তারপর আবার স্বস্থানে ফিরে এলেন। একজন চাপরাশি এসে হাজির হল। চাপরাশিকে তিনি বললেন, একবার কনট্রোলার সাহেবকে আসতে বল। নিমেষের মধ্যেই কনট্রোলার এসে হাজির। কনট্রোলারকে উনি বললেন, এঁর যা প্রয়োজন, তা একটা ফরম্ 'ফিল-আপ' করিয়ে নিন্, আর তিন দিনের মধ্যে উনি যাতে 'পারমিট' পান, তার ব্যবস্থা করুন। আমি মাইতি মশাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে, কনট্রোলারের সঙ্গে তাঁর টেবিলের সামনে এসে বসলাম। দেখলাম, কনট্রোলারের মুখে চাপা হাসি, আর তিনি নিজেই ফরম্টা ফিল-আপ করলেন, আমাকে শুধু আমার প্রয়োজনের কথাগুলো জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তারপর আমাকে বললেন, আপনি কাল-পরশু এসে পারমিটটা নিয়ে যাবেন। দু'দিন পরে গেলাম। আবার দেখলাম কনট্রোলারের মুখে সেই চাপা হাসি। আমাকে বললেন, আপনার পারমিটটা দু'দিন আগেই তৈরী হয়ে গেছে। এই কথা বলে তিনি পারমিটটা আমাকে দিলেন। আমি ওঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানালাম। উনি আমাকে বললেন, যদি আপনার রড্ 'শর্ট' পড়ে তো, আপনি সরাসরি আমার কাছে আসবেন, আমি ব্যবস্থা করে দেব। আমি ওঁর এই সহৃদয়তার জন্য আবার ওঁকে ধন্যবাদ জানালাম। তারপর চলে এলাম।

মাসখানেক পরে আমার ভায়েরাভাই অনিলের (যার পিতার নামে উল্টাডাঙ্গা রোডের এক অংশ 'হরিশ নিয়োগী রোড' বলে চিহ্নিত) সঙ্গে দেখা। অনিল বলল, আরে, অতুল তুমি করেছ কি? আমি বললাম, কি হয়েছে? কি করেছি? তখন সে বলল, তুমি, প্রেমানন্দকে চিনতে পারনি? জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ প্রেমানন্দ? উত্তরে অনিল বলল, আরে, আমাদের কলেজের সেই 'রোল-নম্বর ওয়ান' প্রেমানন্দ নাগ। বললাম, কেন, কি হয়েছে তার? কলেজ ছেড়ে আসবার পর, তার সঙ্গে আমার তো আর দেখা হয়নি। সে বলল, সেদিন গিয়েছিলাম প্রেমানন্দের আপিসে। তোমার সঙ্গে তো তার খুবই সৌহার্দ্য ছিল। সেজন্য পরিচয় দিলাম, তোমার ভায়েরাভাই বলে। শুনে প্রেমানন্দ তো হেসে গড়াগড়ি। বলল, জান, অতুল এসেছিল মাসখানেক আগে রড্-এর পারমিট-এর জন্য। সে তো আমাকে চিনতেই পারল না। আমিও আত্মগোপন করলাম। শুনে আমি বললাম, আরে, প্রেমানন্দই স্টীল কনট্রোলার? ওর চেহারা এত বদলে গেছে যে, আমি তো ওকে মোটে চিনতেই পারিনি।

ঌঌঌ

এবার আর একজন সহপাঠীর কথা বলব। অদ্ভুত ছেলে। আমরা যখন আই-এ পড়তাম, সে তখন পড়ত আই-এস-সি। তার মানে সে ছিল বিজ্ঞানের ছাত্র, আর আমরা আর্টস-এর ছাত্র। স্কটিশ চার্চ কলেজে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের ছাত্রদের ইংরেজি ও বাংলার ক্লাস এক সংগেই হত। সেজন্য বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের ছাত্রদের আমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনতাম। তবে কলা বিভাগের ছাত্ররাই শেষ পর্যন্ত চার বছর কলেজে থাকত। আর বিজ্ঞান বিভাগের অধিকাংশ ছাত্রই আই-এস-সি পাস করবার পর ডাক্তারী কিংবা ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বার জন্য মেডিকেল কিংবা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে চলে যেত। আমি যার কথা বলছি সে-ও আই-এস-সি পাস করবার পর ডাক্তারী পড়বার জন্য মেডিকেল কলেজে চলে যায়। প্রায় ছ'মাস মেডিকেল কলেজে পড়বার পর, একদিন তাকে হঠাৎ দেখি সে ফিরে এসেছে স্কটিশ চার্চ কলেজে আমাদের কলা বিভাগের তৃতীয় বার্ষিক ইংলিশ অনার্সের ছাত্র হিসাবে। আমরা সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। কি হল ওর ? ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিল কেন ? সকলেই পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করি। কেউই কিছু উত্তর দিতে পারে না। তারপর একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল, তোমার ডাক্তারী পড়বার ? বলল, ডাক্তারী পড়া ভাল লাগল না, ইংরেজি সাহিত্যেই আমার বরাবর অনুরাগ ; ইংরেজি সাহিত্য পড়বার জন্যই কলেজে ফিরে এলাম কলা বিভাগে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে।

আমার ওই সহপাঠীর নাম মহীমোহন বোস। আমাদের কলেজ থেকেই ভাল করে ইংরেজি অনার্স নিয়ে পাস করেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করে মহী গেল বিলাতে। বিলাতে গিয়ে অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের পাঠ সমাপ্ত করে বিলাতী ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে এল। স্কটিশ চার্চ কলেজেই ইংরেজির অধ্যাপক নিযুক্ত হল। ভাল পড়াবার জন্য অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রদের খুব প্রিয় হয়ে উঠল। ইংরেজি উচ্চারণ করত খুব বিশুদ্ধভাবে, এবং ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধেও ওর ছিল প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। পরে স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হয়েছিল। প্রিন্সিপাল হিসাবেও সুনাম অর্জন করেছিল।

ঌঌঌ

তখন আমি তৃতীয় বার্ষিক কলা বিভাগের ছাত্র। একদিন 'অমৃতবাজার

পত্রিকা'র ডানদিকের তিনের পাতার শেষ স্তম্ভে পড়লাম এক প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটা তার আগের বছরের এক প্রত্নতাত্ত্বিকের আবিষ্কার সম্বন্ধে। মনে হল ভারতের ইতিহাসের এক নতুন যুগে প্রবেশের সম্ভাবনা ঘটেছে। ওই প্রতিবেদন থেকে জানলাম ওই আবিষ্কার করেছেন একজন বাঙালী, নাম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্নতত্ত্বে আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল। এ অনুরাগ সৃষ্ট হয়েছিল গুরুদাস সরকার নামে একজন সিভিলিয়ান অফিসারের লিখিত 'মন্দিরের কথা' নামে একখানা বই পড়ে। তিন বন্ধুতে মিলে ওড়িশার তিন মন্দির—পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোনারক—দেখতে গিয়েছিলেন। তারই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভ্রমণ-কাহিনী। গুরুদাসবাবু তাঁর সুবৃহৎ বইখানার কোথাও অপর দুই সহযাত্রীর নাম করেন নি, মাত্র তাঁদের নামের আদ্যক্ষর দিয়েছিলেন। তা থেকে অনুমান করেছিলাম যে অপর দুই সহযাত্রী ছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালিদাস নাগ। গুরুদাসবাবুর বইটা পড়বার পরই রাখালদাসবাবুর 'বাংলার ইতিহাস' ও 'প্রাচীন মুদ্রা' সংজ্ঞক বই দুটো পড়ে ফেলি। সুতরাং রাখালদাসবাবুর প্রতি আমার আগে থেকেই শ্রদ্ধা ছিল। এখন তাঁর নতুন আবিষ্কারের কথা পুরী বিস্ময়ে অভিভূত হলাম।



সহপাঠী দ্বারকার সঙ্গে আমার খুবই সদ্ভাব ও সম্প্রীতি। দ্বারকার সঙ্গে স্কুল থেকেই পড়ে এসেছি। এখন স্কটিশ চার্চ কলেজে তার সঙ্গে পড়ি। দ্বারকা বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জি পরিবারের ছেলে। এই আনন্দ চ্যাটার্জির নামে যে গলিটা চিহ্নিত তারই মধ্যে আনন্দ চ্যাটার্জিদের বাড়ির এক অংশেই তখন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র অফিস ও ঘোষ পরিবারের আবাস স্থান। দ্বারকার সঙ্গে কলেজ থেকে একসঙ্গেই বাড়ি ফিরতাম। একদিন ফেরবার সময় কথাপ্রসঙ্গে ওকে বললাম, কাল 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় পড়ছিলাম যে সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার করেছেন, যার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস বোধ হয় নতুন করে লিখতে হবে। সব শুনে দ্বারকা আমাকে বলল, রাখালদাসবাবু আমাদের আত্মীয় হন, তুমি একদিন আমার সঙ্গে ওঁর কাছে কি যাবে? রাখালদাসবাবুর প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। এত সহজে ওঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভবপর হবে শুনে আমি খুব খুসী হলাম। ঠিক হল, সামনের রবিবার সকালে আমরা রাখালদাসবাবুর বাড়ি যাব।

পরের রবিবার সকালেই আমরা রাখালদাসবাবুর বাড়ি গেলাম। রাখালদাস-

বাবু তখন থাকতেন মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে ঢুকে (বিধান সরণীর দিক থেকে) ডান দিকে যে প্রথম গলিটা পড়ে, তারই মোড়ে কর্নারের বাড়িটাতে। বাড়িটার প্রবেশদ্বার গলির দিকে। প্রবেশদ্বার থেকেই একটা সিঁড়ি ওপরে দোতলায় উঠে গেছে। সামনেই রাখালদাস বাবুর বৈঠকখানা। বৈঠকখানা মানে টেবিল চেয়ার পাতা কোন ঘর নয়। সমস্ত ঘরটাই ফরাস-পাতা। খুব মোটা এক তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে রাখালদাসবাবু প্রত্নতত্ত্ববিভাগের এক প্রতিবেদন মুখে বলে যাচ্ছেন, আর একজন তা লিখে যাচ্ছেন। আমি আগেই ওঁর 'বাংলার ইতিহাস' বইয়ের ভূমিকায় পড়েছিলাম যে উনি লেখনী-ধারণে অশক্ত, এবং সব লেখাই শ্রুতিলেখকের সাহায্যে করেন। তখন ভেবেছিলাম যে ওঁর বোধ হয় একটা আঙুল কাটা, সেজন্যই উনি লেখনী-ধারণে অশক্ত। সামনে এসে দেখলাম, আমার অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন। আমরা ঘরে ঢুকবার পর উনি আমাদের ইসারা করে বসতে বললেন। তারপর শ্রুতিলেখককে যা বলে যাচ্ছিলেন, সে বাক্যটা শেষ করে তাকে বললেন, ওখানে বন্ধনীর মধ্যে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের 'ইণ্ডিয়ান অ্যানটিকোয়ারী'র একটা রেফারেন্স দিতে হবে। ওই ভল্যুমটা একবার নিয়ে এস। তারপর তিনি দ্বারকার কাছ থেকে আমার পরিচয় নিলেন। শুনে উনি আমাকে বললেন, তুমি তা হলে বিশ্বপণ্ডিত নগেন বোসের বাড়ির কাছে থাক? আমি বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় একেবারে পাশাপাশি, তবে ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ নেই। বললেন—খুব সাবধান, ওঁর সংস্পর্শে এস না, জান উনি কি করেন? প্রাচীন পুঁথির স্থলবিশেষ চেঁচে ফেলে, নিজের মত পোষণের জন্য নতুন শব্দ বসান। শুনে আমি তো স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তারপর রসাল গল্প করতে লাগলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে শুরু করে অনেকের সম্বন্ধে। বুঝলাম ওইটাই ওঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বয়সের অনেক ফারাক থাকলেও পাঁচমিনিটের মধ্যে আমরা অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হলাম। ওঁর আঙুল সম্বন্ধে আমি আমার ভুল ধারণার কথা বললাম। আমার কথা শুনে উনি এক হাসির ফোয়ারা ছুটালেন। বললেন, নিজ হাতে লিখলে, আঙুলে 'ক্র্যাম্প' ধরে বলেই নিজ হাতে লিখি না। বললাম, আপনার সম্বন্ধে আর একটা কথাও শুনেছি, বোধ হয় সেটাও ভুল। বললেন, কি শুনেছ? আমি বললাম, না, সেটা আর বলব না, সেটা খারাপ কথা। উনি বললেন, তুমি তো খুব বেরসিক ছোকরা দেখছি, এখনও বুঝতে পারনি যে তুমি আমার 'মাই ডিয়ার' বন্ধু হয়ে গেছ? বল, বল, আমার সম্বন্ধে কি শুনেছ? আমি বললাম, শুনেছি যে আপনি যখন পুনায় ছিলেন তখন আপনার বাসায় রোজ রাত্রে······আর বলতে পারলাম না, মুখে আটকাল। উনিই বলতে শুরু করলেন, শুনেছ তো, যে রোজ রাত্রে আমার বাসায় মাইফেল হত, বাইজী

নাচতো, এই সব কথা তো ? তা সব ঠিকই শুনেছ, শুধু পুনায় কেন ? যখন যেখানেই গেছি, সেখানেই জীবনটা ওই ভাবেই কাটিয়েছি, এইজন্যেই তো সর্বস্বান্ত হয়েছি, পৈতৃক ভিটে-বাড়ি পর্যন্ত বেচেছি, জীবনটা তো ভগবান ভোগ করবার জন্যই দিয়েছেন।

আমি বললাম, আমি এসেছি আপনার মুখ থেকে আপনার নতুন আবিষ্কারের কথা শুনতে।

উনি বললেন, আজ তোমার সঙ্গে প্রথম আলাপ হল, আজ লেখাপড়ার কথা থাক, সে আর একদিন হবে।

তারপর বহুদিন ও'র বাড়ি গিয়েছি, মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারের কথা ধাপে ধাপে শুনে বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়েছি। তখন ভাবিনি যে একদিন ওই মহেঞ্জো-দারোতে আমাকেও যেতে হবে!

১১১

সালটা বোধ হয় ১৯২৪। রাখালদাসবাবুর সঙ্গে আলাপটা খুব জমজমাট হয়েছে। রাখালদাসবাবু তখন টের পেয়ে গেছেন যে আমার দেহপিঞ্জরের মধ্যে একটা রসসিক্ত মন বন্দী হয়ে আছে। আমার মুখেই তিনি শুনেছেন যে আমার ছেলেবেলাটা থিয়েটার দেখে কেটেছে। আরও শুনেছেন যে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটার পুড়ে যাবার পর, যে নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছিল, তার দোতলার ওপর একটা ঘরে সকালের দিকে নট-নটীরা আড্ডা দেবার জন্য জড়ো হত, এবং আমি তখন বাঁশের ভারা দিয়ে উঠে (তখনও সিঁড়ি হয়নি) ওই আড্ডায় যেতাম এবং সেখানে আঙুর নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার খুব সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব ছিল এবং ওই সময় আমি নিষিদ্ধপল্লীতে নটীদের বাড়িতেও যাতায়াত করতাম।

১৯২৪ সালের মাঝামাঝি একদিন রাখালদাসবাবু বললেন, অতুল, শিশির ভাদুড়ীর 'সীতা' দেখতে যাবে ?

আমি বললাম, হঠাৎ আপনার 'সীতা' দেখবার সখ হল কেন ?

উনি বললেন, জাননা, 'সীতা'র প্রযোজনায় শিশির ভাদুড়ী আমার ও সুনীতি চাটুজ্যের সাহায্য নিয়েছে। সেজন্য দু'খানা 'কম্‌প্লিমেনটারী' টিকিট পাঠিয়েছে। তুমি যদি যাও তো তোমাকে একখানা টিকিট দিতে পারি। সেদিন রাখালদাসবাবুর দৌলতেই 'সীতা' দেখতে গিয়েছিলাম। থিয়েটারটা তো ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, কিন্তু সেদিনের দৃশ্য আজও আমার মনে স্মরণীয় হয়ে আছে। মনোমোহন থিয়েটার। ওখানেই শিশিরকুমার স্থাপন

করেছেন তাঁর 'নাট্যমন্দির'। অবাক হয়ে গেলাম দেখে প্রবেশপথে পূর্ণকলস ও আলপনা। প্রেক্ষাগৃহ চন্দন-অগুরু ধূপের গন্ধে আমোদিত। কনসার্টের বদলে রসনচৌকি বাজছে। পাদপ্রদীপের পরিবর্তে আলোকসম্পাত। আর সীনের পরিবর্তে 'বক্স্ সেট'। নামভূমিকায় প্রভার অভিনয়, আর রামের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। জনতার দৃশ্যে ১০০ জন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অংশগ্রহণও, সেদিন আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল।

ꕥ ꕥ ꕥ

যত পুরোনো দিনের কথা স্মরণ করি, ততই ভাবি যে আমাদের ছেলেবেলাটা কত আনন্দময় ছিল। নানারকম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল, এবং তখনকার দিনের মানুষ এইসব আমোদ-প্রমোদের আনন্দের মধ্যে ডুবে থাকত। বড়দের সংগে এ সব আমোদ-প্রমোদের স্রোতে আমিও অবগাহন করেছি। আগেকার দিনের লোক কবির গান, তরজার লড়াই ইত্যাদি থেকে খুব আনন্দ উপভোগ করত। কিন্তু আমার ছেলেবেলায় এসব প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে আমার বাবা তরজার লড়াইয়ের খুব অনুরাগী ছিলেন। সেজন্য, আমার ছেলেবেলায় আমি আমাদের বাড়িতে তরজার লড়াই অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। আমার ছেলেবেলায় আমোদ-প্রমোদের যেসব ব্যবস্থা ছিল তার মধ্যে ছিল পুতুলনাচ, যাত্রা, উড়ের যাত্রা, কথকতা ও রামায়ণী গান। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আমাদের বাড়ি রামায়ণী গান হয়েছে। তবে লোকের রুচিবোধ পালটে যাচ্ছিল। আগেকার যুগের লোক যা অশালীন মনে করত না এবং তা থেকে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করত, পরেকার যুগের লোক তা অশিষ্ট মনে করত। আমার ছেলেবেলাকার একটা ঘটনা এখনও আমার মনে আছে। তখন আমি খুব ছেলেমানুষ। এক বর্ষীয়ান দিদিমার সংগে রামায়ণ গান শুনতে যেতাম, ওঁরই সেজ জা-এর বাড়ি। ঋষি নামে এক গায়ক, তখনকার দিনে মেয়েমহলে খুব জনপ্রিয় ছিল। সেই-ই সেখানে রামায়ণ গান গাইত। একদিন সে গানের মধ্যে হঠাৎ গেয়ে উঠল —'একে তো কালকাসুন্দের বন, তাতে টিকল নারায়ণ। হাঁ করেছে, জিভ মেলেছে, গান শুনতেই মন॥' গাওয়া মাত্রই, মেয়েদের মধ্যে খুব চাঞ্চল্য, হাসাহাসি, গা ঠেলাঠেলি হল। সকলেই এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে! হাসির কারণটা আমি তখন বুঝিনি। কারণটা বুঝলাম, যখন দিদিমা বাড়িতে ফিরে, আমার মার কাছে বলল, 'ছুঁড়িগুলো ঋষির গান শুনতে শুনতে

এমন মত্ত হয়ে যায় যে পরনের কাপড় (তখন মেয়েদের কোনও অন্তর্বাস থাকত না) যে সরে গেছে, তার হুঁশ থাকে না। আজ ঋষি খুব শিক্ষা দিয়েছে।' এই বলে তিনি গানটা আবার আবৃত্তি করলেন।

তখনকার দিনের মেয়েরা এরকম ইঙ্গিতপূর্ণ অর্থব্যঞ্জক উক্তি থেকে খুব আনন্দ পেত। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের ছেলেবেলায় মুখে মুখে হেঁয়ালীর অর্থ বলার খুব চলন ছিল। একটা হেঁয়ালী এখানে উদ্ধৃত করছি। হেঁয়ালীটা হচ্ছে, 'অর্থ অর্থ অর্থ, তার ভেতরে গর্ত। গর্তের ভেতর লম্বা যায়, মাসে মাসে ন্যাকড়া খায়।' আপাতদৃষ্টিতে এটা খুব কুৎসিত হেঁয়ালী বলে মনে হবে, কিন্তু এটার অর্থ হচ্ছে সেকালে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বাংলা কালির (চাল-পোড়ানো ভুষা দিয়ে এ কালি তৈরী হত) দোয়াত, যার মধ্যে একটুকরো ন্যাকড়া দেওয়া হত এবং প্রতি মাসে তা বদলানো হত।



আবার স্কটিশ চার্চেস্ কলেজেই ফিরে আসছি। আমাদের সঙ্গে হাটখোলার দত্ত পরিবারের এক ছেলে পড়ত। নাম উমেন দত্ত। উমেন একদিন বলল, রেনলড্স্-এর 'মিস্টিরিজ্ অভ্ দি কোর্ট অভ্ লণ্ডন' পড়বি? বলল, ভারী মজার বই, বিলাতের রাজবাড়ির কেচ্ছা। তার পরদিন সে আমাকে এক খণ্ড বই এনে দিল। দেখলাম বইখানা বহু খণ্ডে সমাপ্ত। এক-একখানা খণ্ড খুবই বড়। কিন্তু এত 'ইনটারেস্টিং' যে বইখানা দিনরাত পড়ে শেষ করে ফেললাম। তারপর উমেন এক খণ্ডের পর এক খণ্ড বই এনে দিল। লেখককে প্রতিভাবান লেখক বলেই মনে হল। তখন আমি ইংলিশ অনার্স-এর ছাত্র। সেণ্টস্বেরীর 'হিস্ট্রি অভ্ ইংলিশ লিটারেচার' বইখানাতে দেখলাম লেখকের কোন নাম উল্লেখ নেই। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' খুলে দেখলাম। সেখানেও রেনলড্সের কোন নাম-গন্ধ নেই। সে যাই হোক্, রেনলড্সের লেখা আমার কাছে খুব ইনটারেস্টিং লাগল। উমেন আমাকে মোট ৩৪ খানা রেনলড্সের বই এনে দিয়েছিল। এমন আকৃষ্ট হলাম, যে ছ'মাস ধরে দিনরাত রেনলড্স্ পড়লাম। ছ'মাস ধরে রাত জেগে পড়ার ফলে, অসাধারণ মাথার যন্ত্রণার রোগে আক্রান্ত হলাম। তখন আমার পক্ষে কোন বই পড়া অসম্ভব ব্যাপার হল। কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। লেখাপড়া একরকম ছেড়েই দিলাম। এদিকে কলেজে 'টেস্ট' পরীক্ষা হয়ে গেল। প্রিন্সিপাল ওয়াট সাহেব ইতিমধ্যে অবসর গ্রহণ করে দেশে ফিরে গেছেন। তাঁর জায়গায় আরকুহার্ট হয়েছেন নতুন প্রিন্সিপাল। 'টেস্ট' পরীক্ষার পরই আরকুহার্ট

সাহেবের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। চিঠির মর্মার্থ, 'তুমি অবিলম্বে আমার সংগে দেখা কর।' দেখা করলাম। আরকুহার্ট সাহেব বললেন, 'তুমি পরীক্ষা দিতেছ না কেন?' সব কথাই তাঁকে খুলে বললাম। তিনি বললেন, 'না, না, তুমি পরীক্ষা দাও, কালই ফরম ভর্তি করে, ফি জমা দাও।' তাঁর কথা-মতই কাজ করলাম।



পরীক্ষা দেওয়াই যখন সাব্যস্ত করলাম, তখন পড়াশোনায় আবার মন দিলাম। দুপুরবেলা, দীনেশবাবুর (রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন) বৈঠকখানায় দীনেশ-বাবুর চতুর্থ পুত্র বিনোদের সংগে পড়তে শুরু করলাম। দীনেশবাবুর পরিবারের সংগে আমার খুব সম্প্রীতি ছিল। দীনেশবাবুর মেজ ছেলে অরুণ সেন ছিলেন স্কটিশ চার্চেস্ কলেজে আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক। ওঁর ছেলে সমর সেন (কবি) তখন খুবই ছেলেমানুষ। বোধ হয় বাবা ওঁকে 'নেপোলিয়ান' বলে ডাকতেন। দীনেশবাবুর বড় ছেলে কিরণ সেন কলকাতা ইউনিভারসিটির রেজিস্ট্রারের অফিসের সুপারিনটেন্ডেণ্ট। সেজ ছেলে বিনয় সেন 'জেনারেল হিস্ট্রি' ও 'এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার' দুই বিষয়ে এম. এ.। তার পরের ছেলে বিনোদ। বিনোদের পর শ্রীচন্দ্র ও আর এক ছেলে। দীনেশবাবুর জামাই তমোনাশ (দাশগুপ্ত) বাবু তখন দীনেশবাবুর ওখানেই থাকেন। ছোট জামাই নিশিকান্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই করণিকের কাজ করত। আর বাড়ির রেসিডেণ্ট প্রাইভেট টিউটর ছিলেন (পরে অধ্যাপক) জনার্দন চক্রবর্তী। এঁদের সকলেরই সংগে তখন আড্ডা দিতাম দীনেশবাবুর বৈঠকখানায়। দীনেশবাবুর পরিবারের সঙ্গে তখন আমার এমন হৃদ্যতা ছিল যে দীনেশবাবু যখন শুনলেন যে আমার বিয়ের দিন আমাকে উপবাসী থাকতে হবে, তখন তিনি গোপনে ওঁর বাড়ি আমার খাবার ব্যবস্থা করলেন।

দীনেশবাবুর ওখানে অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত লোক আসতেন। ওখানেই তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয়। একদিন একজন বলিষ্ঠ চেহারা, মাথায় রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল, মোটা গোঁফওয়ালা লোক দীনেশবাবুর সদর দরজা থেকেই উদাত্তকণ্ঠে এক কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বৈঠকখানা ঘরে এসে হাজির হলেন। বিনোদ বলল, এই যে কাজিসাহেব, কি খবর? দেখলাম, ভীষণ সংগ্রামী মন ও তেজ। পরিচিত হবার পর নজরুলকে আমি বললাম, আপনার কথা আমি আমার ভাগনের কাছ থেকে শুনেছি, আপনার সংগে সে একই পলটনে ছিল। তার কাছে

শুনেছি বিশ-ত্রিশ মাইল মার্চ করবার সময়, আপনার উদাত্তকণ্ঠের গান শুনেই তারা দীর্ঘ মার্চের কষ্ট ভুলে যেত। তারপর নজরুল যখন 'ধূমকেতু' বের করেছিলেন, তার এক কপি নিজে হাতে করে এনে দীনেশবাবুকে দিয়েছিলেন। আর একবার দ্বিতীয়বারের মত রবীন্দ্রনাথের সংগেও মিলিত হবার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম দীনেশবাবুর ওই বৈঠকখানায়। রবীন্দ্রনাথ সেদিন এসেছিলেন দীনেশবাবুর সংগে দেখা করতে।

আমি যেমন বিনোদের সংগে পড়বার জন্য দুপুরবেলা দীনেশবাবুর বৈঠকখানায় যেতাম, পরবর্তীকালে হুমায়ুন কবির তেমনই রোজ দুপুরে আসত শ্রীচন্দ্রের সংগে পড়াশোনা করবার জন্য। হুমায়ুনের সংগে ওখানেই আমার প্রথম পরিচয়।

বিনোদের সংগে ছিল আমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। বিনোদের কাছে আমি নানাভাবে ঋণী। বি. এ. পরীক্ষায় আমাদের দু'জনেরই 'সীট' পড়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে। মনে নেই সেদিন সেটা কোন্ পরীক্ষা ছিল, বোধ হয় বাংলা। পরীক্ষার উত্তর সন্তোষজনকভাবে লিখতে পারলাম না। পরীক্ষার ফল ভাল হবে না ভেবে একটার সময় ঘণ্টা বাজতেই পরীক্ষার হল্ থেকে বেরিয়ে সটান বাড়ি রওনা হলাম। বিনোদ খবরটা পেয়েই ট্রামে উঠে পড়ল। পথে আমাকে ধরে ফেলল। তারপর জোর করে আবার পরীক্ষার হলে নিয়ে গেল, দু'টার সময় যে পরীক্ষা শুরু হবে তাতে বসবার জন্য। সেদিন বিনোদই আমার শিক্ষাজীবনের একটা বছর বাঁচিয়ে দিয়েছিল। পরে যখন পরীক্ষার ফল বেরুল, দেখা গেল যে, সে বৎসরের বি. এ. পরীক্ষায় আমি বাংলায় প্রথম হয়েছি, যদিও ১০০-এর মধ্যে মাত্র ৬৮ নম্বর পেয়েছিলাম।

ঙ ঙ ঙ

দীনেশবাবুর আগের বাড়িটাই হচ্ছে 'বিশ্বকোষ'-এর নগেনবাবুর বাড়ি। আর তার দুখানা বাড়ির আগেই আমার বাড়ি। নগেনবাবুর বাড়িতে ঢুকবার দরজার মুখেই ছিল একটা উঁচু 'রক'। কোন কোন দিন ওখানে বসেই আমি, বিনোদ, আমার বন্ধু শ্যামাচরণ গল্পগুজব করতাম নগেনবাবুর একমাত্র ছেলে বিশুর সংগে। ওখানে বসেই আমরা দেখতাম অমূল্য বিদ্যাভূষণ মশাইকে নগেনবাবুর বৈঠকখানা ঘরে আসতে। বাড়িতে ঢুকেই ডান দিকে ছিল ওই ঘরখানা। তার মানে, আমরা যে রকে বসে গল্পগুজব করতাম তার গায়েই ছিল নগেনবাবুর ওই বৈঠকখানা ঘরটা। কিন্তু নগেনবাবুর চেহারাটা আমি কোনদিন দেখিনি।

নগেনবাবুকে আমি প্রথম দেখলাম তুষারবাবুর (তুষারকান্তি ঘোষ) বাড়িতে এক শ্রাদ্ধবাসরে। জমিদাররা যেরকম লম্বা ঝুলের জামদানি 'কোট' গায়ে দেয়, তিনিও সেদিন ওই রকম এক কোট গায়ে দিয়ে এসেছিলেন। ঘোষ পরিবারেই নগেনবাবুর একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছিল, মৃণালকান্তি ঘোষ মশাইয়ের ছেলে সুনীলকান্তি ঘোষের সঙ্গে।

নগেনবাবুর জীবনে শীঘ্রই এক বিপর্যয় ঘটে গেল। একমাত্র পুত্র বিশু মারা গেল। সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার তিনি বিশুর অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়েছিলেন। বিধবা বধূমাতা ও বিশুর শিশুপুত্র শম্ভুকে নিয়ে নগেনবাবু শেষজীবনে বেশ মুষড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তার ওপর এল, আর এক আঘাত। নগেনবাবু বের করছিলেন 'বিশ্বকোষ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ। এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করছিলেন অমূল্য বিদ্যাভূষণ মশাই। কিন্ত কোন কারণে দুজনের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় অমূল্য বিদ্যাভূষণ মশাই নগেনবাবুকে ত্যাগ করে নিজেই 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামে 'বিশ্বকোষ'-এর অনুকল্প এক অভিধান সংকলনে প্রবৃত্ত হলেন। নগেনবাবুর সহকারীদের মধ্যে অনেকেই অমূল্যবাবুর সঙ্গে যোগ দিল। নগেনবাবু খুবই বিপদে পড়লেন। এ সময় আমি এম. এ. পাস করে গিয়েছি এবং প্রত্নতত্ত্ব জগতের অনেক মহারথীদের সঙ্গে বাদবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়েছি। সেসব কথা আমি পরে লিখব। এখন যেকথা বলছিলাম, নগেনবাবু বিপন্ন হয়ে একদিন আমাকে এক চিঠি লিখলেন। চিঠিটার অনুলিপি আমি এখানে দিচ্ছি— "শ্রদ্ধাস্পদেষু, 'বিশ্বকোষ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদকমণ্ডলীতে আপনার নাম যুক্ত করতে চাই। আপনার অনুমতি পেলে বাধিত হব। ইতি বিনীত নগেন্দ্রনাথ বসু।" চিঠিটা দেখে আমার বন্ধু শ্যামাচরণ (ভট্টাচার্য) বলল, দেখুন নগেনবাবু কি করে কাজ সিদ্ধ করেন, ও'র আপনি হাঁটুর বয়সী লোক, অথচ আপনাকে 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' বলে সম্ভাষণ করেছেন। সে যাই-ই হউক, আমি অনুমতি দিয়েছিলাম এবং 'বিশ্বকোষ'-এর নতুন বিজ্ঞপ্তিপত্রে আমার নাম উনি সর্বোচ্চে দিয়েছিলেন।

১১১

বি. এ. পাস করলাম। বাবা বললেন, এম. এ. পড়বি তো? আমি বললাম, হ্যাঁ। বাবা বললেন, তবে তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে যা।

ভর্তি হবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। আজ যেখানে 'আশুতোষ বিলডিং' ওখানে ছিল মাধববাবুর বাজার। মাধববাবুর বাজার ভূমিসাৎ করেই ওখানে

তৈরী হচ্ছিল আশুতোষ বিলডিং। আমি যখন ভর্তি হতে গেলাম, তখন আশুতোষ বিলডিং-এর দোতলার নির্মাণ-কার্য চলছে। দোতলায় কতগুলো ঘর তৈরী হয়ে গিয়েছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই প্রথম যে ঘরখানা সামনে পড়ে, সে ঘরের দেওয়ালে দেখলাম চুবড়ি, ধুচুনী ইত্যাদি টাঙানো। খুব কৌতূহল হল। দরজার পাশে লাগানো বোর্ডে পড়লাম 'অ্যানথ্রপোলজি ডিপার্টমেণ্ট'। পড়ে অবাক হলাম, কেননা 'অ্যানথ্রপোলজি'র নাম তখন শুনিনি। ভাবলাম, এ আবার কোন্ শাস্ত্র ? ওর পরের ঘরটায় উঁকি মারতে দেখলাম, এক সুন্দরী মেম সাহেব ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। দরজার পাশে লাগানো বোর্ডে পড়লাম, 'এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার'। ওর পরের ঘরটা হচ্ছে 'ইণ্ডিয়ান ভারনা-কুলারস্ ডিপার্টমেণ্ট'। দেখি, ও-ঘরে দীনেশবাবু বসা। চোখাচোখি হতে উনি বললেন, এস অতুল, কি খবর ? বললাম, এম. এ. পড়ব বলে ভর্তি হতে এসেছি। দীনেশবাবু বললেন, তা কি বিষয় নিয়ে পড়বে ঠিক করেছ ? বললাম, সেটাই তো ভাবছি। এখানে আসবার পর 'অ্যানথ্রপোলজি' ও 'এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার', এ দু'বিষয়ের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছি।' শুনে বললেন, তা এ-দুটো বিষয় নিয়েই পড়াশোনা কর। বললাম, দুটো বিষয় একসঙ্গে নিয়ে কি করে পড়াশোনা করব ? উনি বললেন,—সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তবে কি না আমি ভেবেছিলাম, তুমি বি. এ.-তে বাংলায় ফার্স্ট হয়েছ, আমাদের 'ইণ্ডিয়ান ভারনা-কুলারস্'ই পড়বে।

বাড়িতে এসে চিন্তা করতে লাগলাম, কি করা যায় ? বড়দার সঙ্গে পরামর্শ করলাম। উনি আমাকে 'অ্যানথ্রপোলজি' ও 'এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার' পড়তে বললেন। বাবা বললেন, ওসব আবোল-তাবোল পড়ে কি হবে ? ওসব পড়ে কোন চাকরী পাওয়া যাবে না। তুই 'ইংরেজি' পড়। তারপর নিজেই সিদ্ধান্ত করে ফেললাম। 'এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার' ও 'অ্যানথ্রপোলজি' ক্লাসেই ভর্তি হলাম।

১১১

যে দুটো বিষয় নিয়ে এম. এ. পড়া সিদ্ধান্ত করলাম, এ দুটোর কোনটারই কর্মনিযুক্তির ক্ষেত্রে কোন মূল্য ছিল না। কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করবে বলে যারা এম. এ. পড়ত, তারা হয় 'ইংরেজি' আর তা নয় তো 'ইতিহাস' বা 'অর্থনীতি' পড়ত। মাত্র যারা কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবার জন্য এম. এ. পড়ত, তারাই আমার মত ওইরকম বিদকুটে বিষয়গুলো নিয়ে পড়ত।

যে দুটো বিষয় নিয়ে এম. এ. পড়ার সিদ্ধান্ত করলাম, সে দুটোই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে মাত্র কয়েক বছর হল যুক্ত করা হয়েছে। তার মানে, দুটোই নতুন বিষয়। কি ভাবে, এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা হল, তার ইতিহাসটা এখানে সংক্ষেপে বলে নিই। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হবার পর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল পরীক্ষা-গ্রহণকারী সংস্থা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে সংগে আরও দুটো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ে। কিন্তু রাজধানীর (১৯১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল) বিশ্ববিদ্যালয় বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ছিল সকলের ওপরে। সেজন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এবং ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের স্কুল-কলেজগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন (affiliation) লাভের জন্য গোড়া থেকেই আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, অনুমোদক ও পরীক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। প্রথম পরিবর্তন ঘটে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে, যখন ইউনিভারসিটি ল' কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন, তখন তিনি সচেষ্ট হয়ে ওঠেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রশিক্ষণ সংস্থায় পরিণত করবার জন্য। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। তখন থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক নতুন মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়।

১১১

যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তার মধ্যে ছিল 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি' ও 'নৃতত্ত্ব', যে দু'বিষয়ে এম. এ. পড়বার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম।

কথায় বলে 'ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার'। আমাদেরও তখন ছিল ঠিক অনুরূপ অবস্থা। তবে 'নিধিরাম'-রূপ যেসব অধ্যাপকদের সাহচর্য পেয়েছিলাম, তাঁরা সকলেই এক এক জন বিদ্যাদিগ্‌গজ মহারথী। তাঁদের কথা আমি পরে বলছি। এখানে যেটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের ছিল ঢাল-তরোয়াল-এর একান্ত অভাব। আজকাল যারা এসব বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে, তারা তো পরম সুখী। তারা হাতের নাগালের মধ্যে পায় বিভিন্ন বিষয়ে অজস্র বই। আমাদের সময় কিন্তু তা ছিল না। এক একটা বিষয়ের আটটা করে বিভিন্ন 'পেপার'-এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পুরোনো 'জর্নাল' থেকে আমাদের

নিজেদেরই 'নোট' তৈরী করে নিতে হত। সুতরাং খুব অসুবিধার মধ্যেই আমাকে পড়াশোনা করতে হয়েছিল। তবে আমাদের পাঠ্যাবস্থাতেই 'কেমব্রিজ হিস্ট্রি অভ্ ইণ্ডিয়া'র প্রথম খণ্ড ও চক্রবর্তী অ্যাণ্ড চ্যাটার্জি কোম্পানি কর্তৃক কানিংহাম-এর 'এনসিয়েণ্ট জিওগ্রাফি অভ্ ইণ্ডিয়া' পুনর্মুদ্রিত হওয়ার ফলে, খানিকটা সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের শিক্ষকদের রচিত দু-একখানা বইও ছিল, সে সম্বন্ধে আমি পরে বলছি।

১১১

প্রথম দিনের ক্লাসেই আমাদের কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিষয়ে 'প্রথম পেপার' ছিল বেদ, পুরাণ, মহাকাব্য ইত্যাদি সম্বন্ধে। এসব সাহিত্যের ইতিহাস, স্বরূপ, অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু, প্রতি যুগের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, বৈষয়িক রূপ, সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করতে হত। এই পাঠ দেবার জন্য দু'জন শিক্ষক ছিলেন, অবিনাশচন্দ্র দাস ও হারানচন্দ্র চাকলাদার। প্রথম জনের চেহারা ছিল বেশ মোটাসোটা এবং পোশাক-আশাক ও চালচলন জমিদারী ধাঁচের। পরে শুনলাম তিনি আজিমগঞ্জ এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। আশুবাবুর নেকনজরে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর অধ্যাপক পদে বৃত হবার সময় তাঁর সম্বন্ধে বহু বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। যে যোগ্যতার গুণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ পড়াবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন, তা হচ্ছে একখানা বই, নাম 'রিগ্‌বেদিক ইণ্ডিয়া'। এই বইখানার ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পি-এচ. ডি. ডিগ্রি দিয়েছিল। এবার বইখানার কথা কিছু বলি। ওই বইখানা লেখবার অব্যবহিত পূর্বে এচ. জি. ওয়েলস্ তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বই 'দি আউটলাইন অভ্ হিস্ট্রি' বইখানা প্রকাশ করেন। যাঁরা ওয়েলস্-এর বইখানার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন যে বইখানার গোড়ার দিকে একটা মানচিত্র আছে, যে মানচিত্রে দেখানো আছে যে ভূতত্ত্বের এক প্রাচীন যুগে হিমালয় ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যভাগে একটা সমুদ্র ছিল। অবিনাশবাবুর যদি ভূতত্ত্বের জ্ঞান থাকতো, তা হলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, ওয়েলস্ যে সমুদ্রের কথা বলেছেন, তা বিদ্যমান ছিল মানুষের পৃথিবীতে আবির্ভাবের বহু কোটি বৎসর পূর্বে। ঋগ্বেদের এক জায়গায় পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের কথা আছে। অবিনাশবাবু ওয়েলস্-এর বইয়ের ওই মানচিত্রটা নিজের বইয়ে ছাপিয়ে ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু একবারও চিন্তা করলেন না যে ওই

সমুদ্রের অস্তিত্ব ছিল মানুষ জন্মাবার বহু কোটি বৎসর পূর্বে। সে যাই হোক, অবিনাশবাবুর ওই 'অসাধারণ' আবিষ্কারের ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পি.-এচ্. ডি. ডিগ্রি দিল। তারপর যখন এই অসম্ভব কাণ্ডটা নিয়ে সমালোচনা হতে লাগল, তখন বইখানার পুনর্মুদ্রণ করে ওই ভ্রান্তি দূর করা হল। তবে বেদটা লোকটার ভাল করেই পড়া ছিল। সেটা প্রকাশ পেল উনি যখন ওঁর দ্বিতীয় পুস্তক 'রিগ্‌বেদিক কালচার' প্রকাশ করলেন।

লোকটা খুব সাদাসিধে ও সরল প্রকৃতির লোক ছিল। তবে আমরা ওঁর বাড়িতে গেলে উনি ওঁর বৃদ্ধ বয়সের তৃতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যাকে অন্তরালে রাখতে একটু বেশী সজাগ হতেন। এই সব তথ্যের ভিত্তিতে অবিনাশ-বাবু খুব শীঘ্রই ছাত্রমহলের কাছে কৌতুকের বিষয় হয়ে দাঁড়ালেন। ছাত্ররা কিভাবে এই কৌতুকটা জমাতো, তা বলবার আগে, আমাকে দ্বিতীয় জন হারান-চন্দ্র চাকলাদার সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে।

হারানবাবুর মত চৌকস পণ্ডিত সেকালে খুবই দুর্লভ ছিল। মাঝারি সাইজের রোগা লোক। পরনে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী। এককালে ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'ডন' পত্রিকায় ঐতিহাসিক গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, পালি ছাড়া ইতালীয় ও জার্মান ভাষায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বেদ ছাড়া, তিনি আমাদের আবয়বিক নৃতত্ত্বও পড়াতেন। ইতালীয় ভাষায় রচিত জিওভিন্ডা বুগেরির 'সিস্টেমেটিক অ্যানথ্রোপোলজি অভ্ এসিয়া' বইখানা ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। জার্মান ভাষায় রচিত বেদ ও মহাকাব্য (রামায়ণ ও মহাভারত) সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ তিনি অনুবাদ করে, আমাদের তার সংক্ষিপ্ত 'নোট' দিতেন। বেদ রচনায় যে সাতটা কাল-স্তর ছিল, সে সম্বন্ধে তিনি আমাদের এক অতি মূল্যবান 'নোট' দিয়েছিলেন।

আমরা জানতাম যে বৈদিক 'স্কলার' হিসাবে অবিনাশবাবুর সঙ্গে হারান-বাবুর খুব রেষারেষি ছিল। বোধ হয় এই রেষারেষিটা আমাদের মত কৌতুকপ্রিয় ছেলেরাই সৃষ্টি করেছিল। আমরা অবিনাশবাবুর মত সরল প্রকৃতির লোককে খ্যাপাবার জন্য প্রায়ই তাঁকে বলতাম, স্যার, আপনি বেদ সম্বন্ধে যেসব কথা বলেন, হারানবাবু তার বিরুদ্ধে বলেন। উনি বলেন যে অবিনাশবাবু বেদ সম্বন্ধে কি জানেন? অবিনাশবাবু চটে গিয়ে বলতেন, ও বেদ সম্বন্ধে কি জানে? একদিন অবিনাশবাবুকে একটু বেশী রকম খ্যাপাবার জন্য বললাম, স্যার, আপনি যেটা বলেছিলেন, সেটা শুনে হারানবাবু বললেন, পাগলে কিনা

বলে, ছাগলে কিনা খায়। ব্যাস্, আর যায় কোথায়! অবিনাশবাবু এক বিকট চীৎকার করে, টেবিলের ওপর সজোরে এমন এক ঘুষি মারলেন যে ও'র হাতের মাদুলিটা ছিঁড়ে গিয়ে ছিটকে ঘরের কোণে গিয়ে পড়ল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠে বলতে লাগলাম, স্যার, আপনার মাদুলি পালাচ্ছে, বলে ছুটে গিয়ে ও'র মাদুলিটা কুড়িয়ে এনে দিলাম। এক কথায়, আমাদের শিক্ষাজীবনের দু'বছর তিনিই ছিলেন কৌতুক করবার লক্ষ্য।



প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস পড়াতেন হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও হেমচন্দ্র রায়। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ছিলেন বেঁটে মোটাসোটা লোক, আর হেমচন্দ্র রায় ছিলেন লম্বা ও রোগা। দুজনকেই আমরা হেমবাবু বলতাম। সেজন্য অনেক সময়ই শ্রোতাদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হত। তাঁরা বুঝতে পারতেন না, কোন্ হেমবাবুর কথা বলছি। এরকম বিভ্রান্তি একবার আমাদের বিভাগের প্রধান ড. ভাণ্ডারকারের হয়েছিল। তাঁকে হেমবাবুর কথা উল্লেখ করাতে তিনি বলেছিলেন, 'কোন্ হেম, মোটা না বেঁটে, রোগা না লম্বা?'

ড. হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর পাণ্ডিত্যের বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। তাঁর রচিত 'পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অভ্ এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া' বইখানাই আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল। তবে এখনকার ছেলেরা ও'র এই নামের যে বইখানা দেখে, এখানা তা নয়। এখনকার বইটা দৈত্যকায়। আমাদের সময়কার বইখানা ছিল স্বল্পকায় বই। ওই বইখানাই ও'র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত পি-এচ. ডি.-র থিসিস্ ছিল। উনি আমাদের নন্দবংশের রাজত্বকাল থেকে শুরু করে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত সময়কালের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস পড়াতেন। এই সময়কালের ইতিহাস সম্বন্ধে বইখানায় ছিল মাত্র একটা রূপরেখা। সেজন্য ওই সময়কালের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমাদের নানা জর্নাল থেকে নিজস্ব 'নোট' তৈরী করতে হত। 'নোট'গুলো আমি ও'কে দেখিয়ে নিতাম। এজন্য প্রায়ই ও'র বাড়িতে আমাকে যেতে হত। উনি থাকতেন আমহার্স্ট স্ট্রীটে কার্তিক বোসের ল্যাবরেটরীর পাশে একটা দু-তিন ফুট চওড়া সর্পিল গলির ভেতর। পরে অবশ্য উনি বালিগঞ্জে মহিশুর রোডে এক মনোরম বাড়ি তৈরী করেছিলেন। আমি এম.এ. পাশ করবার অনেকদিন পরে একবার পুরোনো মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে ওই বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে উনি খুব আনন্দ পেয়েছিলেন ও আপ্যায়ন করেছিলেন।

ঌঌঌ

অপর হেমচন্দ্র ছিলেন অকৃতদার ব্যক্তি। তিনি হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের সুপারিন-টেণ্ডেনট ছিলেন এবং ওই হোস্টেলেই থাকতেন। আমরা এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হবার মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে তিনি 'এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার'-এ এম.এ. পাস করেছিলেন। অভিজ্ঞতা ছিল অল্পকালের। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? তাঁর নিজ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও পড়ানোর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তিনি আমাদের পড়াতেন গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ভারতে মুসলমান আধিপত্য স্থাপনের সময় পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস। আমাদের সময় এই সময়কালের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন বই ছিল না। সেজন্য আমরা খুব মন দিয়ে ওঁর লেকচার শুনতাম। তা ছাড়া, লাইব্রেরিতে বসে পুরোনো জর্নালগুলো পড়তাম। তা থেকে 'নোট' নিতাম। একদিন 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা'র একটা ভল্যুম নিয়েছি। খুব মন দিয়ে একটা অভিলেখ পাঠ করছি। মনে হল কে যেন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর হুমড়ে পড়ে দেখছেন, আমি কি পড়ছি। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি স্বয়ং উপাচার্য যদুনাথ সরকার। চোখাচোখি হতেই বললেন, পড় বাবা! পড়, মন দিয়ে পড়। বড় হবার এটাই হচ্ছে প্রশস্ত রাজপথ।

আমাদের ছাত্রাবস্থাতেই আমি এবং নীহার (ড. নীহাররঞ্জন রায়) ওই যুগের দুই রাজবংশ সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করে, দুটো নিবন্ধ লিখেছিলাম। দুটোই ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল। আমি লিখেছিলাম কনৌজের গাহড়বাল বংশ সম্বন্ধে, আর নীহার লিখেছিল মৌখরী বংশ সম্বন্ধে। আমার নিবন্ধটা সমস্তই অভিলেখের ভিত্তিতে লেখা হয়েছিল। সেজন্য আমাকে অসংখ্য অভিলেখ পড়তে হয়েছিল। এই নিবন্ধটা 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ারটারলি' পত্রিকায় (মার্চ ১৯২৯, পৃষ্ঠা ৮৬-১০২) বেরিয়েছিল। রয়েল আট পেজি সাইজের সতেরো পৃষ্ঠা ব্যাপী। নিবন্ধটা দেশে ও বিদেশে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে আমাদের মাস্টারমশাই হেমচন্দ্র রায় যখন লণ্ডন ইউনিভারসিটির পি-এচ. ডি.-র জন্য 'ডাইন্যাস্টিক হিস্ট্রি অভ্ নরদার্ন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এটা পরে প্রকাশ করেছিল), তখন তিনিও তাঁর ওই থিসিসে আমার নিবন্ধটির উল্লেখ করেছিলেন। এ ছাড়া, আমার নিবন্ধটা 'ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অভ্ ইণ্ডিয়া', হল্যাণ্ডের কার্ন ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত 'বিবলিওগ্রাফি অভ্ ইণ্ডিয়ান আরকিওলজি' পুস্তকে ও ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত 'হিস্ট্রি অভ্ দি ইণ্ডিয়ান পিপল অ্যাণ্ড কালচার' গ্রন্থেও প্রামাণিক সূত্র হিসাবে উল্লিখিত হয়েছিল।

হেমচন্দ্র রায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, আমি অন্য প্রসংগে চলে গিয়েছিলাম। সেজন্য আমি আবার ও'র কথাতেই ফিরে আসছি। আমাদের সিক্সথ ইয়ারের ক্লাস শেষ হয়ে গিয়েছে। এমন সময় আমরা শুনলাম যে হেমবাবু বিলাত যাচ্ছেন, 'লণ্ডন স্কুল অভ্ ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজ'-এ পড়াশোনা করে ডকটরেট্ উপাধি লাভের জন্য। সেজন্য ও'কে শুভেচ্ছা জানাবার জন্য গেলাম হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে। ও'র ঘরের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। কেননা, পরদার ফাক দিয়ে দেখলাম, মাস্টারমশাই এক মহিলার সংগে ভীষণ বচসায় লিপ্ত। মহিলা দেখলাম বিধবা, সাদা থান পরা, দীর্ঘাংগী এবং মাস্টারমশাইয়ের সংগে মুখের সাদৃশ্য আছে। মনে হল, উনি মাস্টারমশাইয়ের বোন হবেন। বোধ হল মাস্টারমশাই বিলাত যাবেন বলে, মাস্টারমশাইয়ের দেশ ফরিদপুর থেকে দেখা করতে এসেছেন। পরদার ফাঁক থেকে একটু সরে গিয়ে দাঁড়ালাম। শুনলাম, বচসার বিষয়বস্তু হচ্ছে, মাস্টারমশাইয়ের বিবাহের জন্য দেশে মেয়ে দেখা হয়েছে এবং মাস্টারমশাই বিলাত যাবার আগে যেন তাকে বিয়ে করে যান। মাস্টারমশাই নারাজ। এমন সময় মাস্টারমশাই বোধ হয় অনুমান করলেন যে পরদার বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। কেননা, তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তা দেখবার জন্য। আমাকে দেখেই একটু লজ্জা পেলেন এবং বললেন, কি খবর, কতক্ষণ এসেছ? বললাম, এই মাত্র। তারপর মাস্টারমশাই আমাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। এতক্ষণে মহিলা পাশের ঘরে চলে গেছেন।

তারপর মাস্টারমশাই ও'র লণ্ডনের থিসিস্ সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। বললেন, বিষয় নির্বাচন করেছি—'ভারতীয় ইতিহাসের গতির ওপর ভৌগলিক প্রভাব'। 'সিনপসিস্'টা পড়ে আমাকে শুনালেন। দেখলাম, ওটা খুব যুক্তিপূর্ণভাবে লেখা হয়েছে। বললাম, ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে এটা একটা নতুন বিষয়বস্তু হবে এবং এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করবে।

তারপর দু'বছর কেটে গেছে। একদিন আমি আমাদের শ্যামবাজারের বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। দেখি সামনের ফুটপাত দিয়ে মাস্টারমশাই চলেছেন। ছুটে গিয়ে ও'র সংগে দেখা করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বিলাত থেকে কবে ফিরলেন? এ পাড়ায় কোথায় এসেছিলেন? উত্তর দিলেন, এই কয়েক দিন হল বিলাত থেকে এসেছি, এবং এ পাড়াতেই উঠেছি। তারপর উনি নিয়ে গেলেন আমাকে ও'র বাসায়।

কিছুকাল পরে মাস্টারমশাই চলে গেলেন সিংহলে (শ্রীলঙ্কায়) এক কলেজের অধ্যক্ষের পদের চাকরী নিয়ে। তখন থেকে মাস্টারমশাইয়ের সংগে আমাদের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হল।

বারো-চোদ্দ বছর পরেকার কথা। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার। সমস্ত শহরটাই ব্ল্যাক-আউটের ঘোমটায় ঢাকা। একদিন রাত্রে চৌরংগীর ফুটপাতের ওপর দিয়ে চলেছি। বিপরীত দিক থেকে একজন লোক এসে আমাকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরল। প্রথম হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বুঝি বা কোন গুণ্ডা বা দুষ্কৃতকারী! তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে, যখন মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আমার সংগে কথা বললেন, তখন দেখলাম মাস্টারমশাই। খুব উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কলকাতায় এলেন কবে? ছুটি নিয়ে এসেছেন? না একেবারে দেশে ফিরে এলেন? বললেন, এক মাসের ছুটি নিয়ে এসেছি। তোমার সংগে যে দেখা হবে, এ একেবারে অপ্রত্যাশিত। ফুটপাতের একপাশে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মাস্টারমশাইয়ের সংগে গল্পগুজব করলাম। জানলাম, মাস্টারমশাই বিবাহ করেছেন, এবং সিংহলেই থাকবেন ঠিক করেছেন।



এবার আমি আমার অন্যান্য শিক্ষকদের সম্বন্ধে কিছু বলি। প্রথমেই বলব ডক্টর কালিদাস নাগের কথা। শিক্ষকমহলে ওরকম বাগ্মিতা ও বাচনভংগী খুব কম জনের মধ্যেই দেখেছি। ছেলেবেলায় দিদিমাদের মুখে রূপকথা শুনতাম। তাঁদের বাচনভংগীর মধ্যে ছিল এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি। কালিদাসবাবুর 'লেকচার'-এর মধ্যে ছিল সেই আকর্ষণী শক্তি। সেই আকর্ষণী শক্তি দ্বারা তিনি আমাদের মুগ্ধ করতেন, দক্ষিণ-পূর্ব দ্বীপপুঞ্জসমূহে ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ইতিহাসের এক নাটকীয় বর্ণনা করে। তাঁর একটা স্বকীয় ব্যক্তিত্বও ছিল, যা টেনে আনত তাঁর ছাত্রগণকে তাঁর সান্নিধ্যে। আমরা যখন এম.এ. পড়বার জন্য প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছিলাম তখন তিনি ছিলেন অকৃতদার। এ সময় তিনি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে থাকতেন। পরে তিনি রামানন্দ চাটুজ্যে মহাশয়ের মেয়ে শান্তা দেবীকে বিয়ে করেন। তখন তিনি রামানন্দবাবুর সংগে তাঁর টাউনসেন্ড্ রোডের বাসায় থাকতেন। আরও পরে তিনি রাজা বসন্ত রায় রোডে নিজস্ব বাড়ি নির্মাণ করে সেখানেই বাস করতেন।

কালিদাসবাবু আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন ও খুব ভালবাসতেন। কালিদাসবাবুই আমার সংগে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন সিলভাঁ লেভি, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ও প্রমথ চৌধুরীর সংগে, যখন ওই বিশ্ববিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক সিলভাঁ লেভির সম্মানার্থে মহাবোধি হলে এক অনুষ্ঠান হয়েছিল, সেখানে।

আবার ওই কালিদাসবাবুই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন রাজ্যপাল কাটজুর সঙ্গে যখন তিনি এসেছিলেন সিঁথিতে অতুলবন্ধু দত্ত-র 'উম্মাদ আশ্রম' পরিদর্শনে।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়বার ৩২ বছর পরে, আমি গিয়েছিলাম তাঁর রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়িতে আমার 'হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অভ্ বেঙ্গল' বইখানার ভূমিকা লিখে দেবার অনুরোধ নিয়ে। ৩২ বছরের ব্যবধান ঘটলেও লক্ষ্য করলাম তাঁর প্রীতিপূর্ণ হৃদ্যতার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। সেদিন তিনি হেমবাবুর মতই আমাকে আলিঙ্গন করে জড়িয়ে ধরেছিলেন। অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলাম সেদিন তাঁর ব্যবহারে আমি। লিখে দিয়েছিলেন তিনি আমার বইয়ের জন্য এক সুদীর্ঘ ভূমিকা, যাতে তিনি বলেছিলেন যে বইখানা বাঙালীজাতির একখানা পূর্ণাঙ্গ ও 'মাস্টারলি হিস্ট্রি'। আরও পরে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন, অতুল, বাঙলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তোমার পাণ্ডিত্য অনন্যসাধারণ।

এই ভূমিকা লেখা সম্পর্কে আমাকে ওঁর বাড়ি কয়েকদিন যেতে হয়েছিল। আমাকে কাছে পেয়ে তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। আমার সঙ্গে অনেক বিষয় আলোচনা করেছিলেন। আমি সিঁথিতে থাকি শুনে, আমার কাছে তিনি তাঁর জীবনের এক চরম ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বরানগরের পাটবাড়িকে (যা শ্রীচৈতন্যের পদস্পর্শে পূত হয়েছিল) এক বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা। এরপর মাস্টারমশাই আর চার বছর মাত্র বেঁচে ছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই অন্তিম ইচ্ছা আর পূর্ণ হয়নি।

১১১

আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকি, তখন আমাদের প্রাচীন ভারতের ভূগোল পড়াতেন ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী। কিন্তু শীঘ্রই আমরা এই বিষয় সম্বন্ধে পড়ানোর জন্য এক বিখ্যাত পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসি। তিনি হচ্ছেন ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচি। তিনি ফরাসী দেশে গিয়েছিলেন ডকটরেট্ করবার জন্য। ভারতে ফিরেই তিনি আমাদের প্রাচীন ভারতের ভূগোলের ক্লাস নিতে আরম্ভ করেন। আমাদের অধ্যাপকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেঁটেখাটো মানুষ। দেহটাও খুব বলিষ্ঠ নয়। হেম রায়েরই তিনি ছিলেন সমসাময়িক। দু'জনে এক সালেই (১৯২০) এম.এ. পাস করেছিলেন। কিছুকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর প্যারিসে গিয়ে তিনি বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ সিলভাঁ লেভির কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। চীনভাষায় পারিপক্ক জ্ঞানলাভ করেছিলেন। চীনভাষায় রচিত

বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে ডকটরেট্ হয়েছিলেন। চৈনিক অক্ষরে চীনাভাষার শব্দসমূহ ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সংগে লিখতে পারতেন। আমাদের পড়াতেন প্রাচীন ভারতের ভূগোল উয়াং চুয়াঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কাহিনীর ভিত্তিতে। কানিংহামের বইয়ে দেওয়া ভারতীয় স্থান-নামগুলোর প্রতিরূপ যে অনেক স্থলে ভুল, তা আমাদের বুঝিয়ে দিতেন ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর কানিংহাম-প্রদত্ত নামগুলোর চৈনিক প্রতিরূপের সংগে উয়াং চুয়াঙ-প্রদত্ত নামের প্রকৃত চৈনিক প্রতিরূপ অংকন করে। খুব অল্পকালের মধ্যেই তিনি ছাত্রমহলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতায় এসে দেশ থেকে নিয়ে এসেছিলেন তরুণী স্ত্রীকে। বাসা বেঁধেছিলেন ওয়েলিংটন স্ট্রীটে। সন্ধ্যার সময় আমি ওখানে যেতাম। বেশ আড্ডা জমত। ওখানেই পরিচিত হয়েছিলাম আর এক জন ফরাসী-দেশ প্রত্যাগত পণ্ডিতের সংগে। নাম তাঁর ডক্টর বিজনরাজ চ্যাটার্জি। যতদূর মনে পড়ে কাজ করতেন উনি বাঙলা সরকারের অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টে। ওটা ওঁর ভাত রুটির অবলম্বন ছিল মাত্র। আসলে উনি ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ পণ্ডিত লোক। কাম্বোডিয়ার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও শিল্পে খুঁটে খেয়েছিলেন। ওই সম্বন্ধেই প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে এক থিসিস্ পেশ করে ডি. লিট. উপাধি পেয়েছিলেন। হাসিখুসি ও খুব আমুদে লোক ছিলেন। তিনিই গুলজার করে রাখতেন প্রবোধ বাগচি মশাইয়ের ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাসাবাড়ির আড্ডা। পরে ডক্টর প্রবোধ বাগচি মশাই বালিগঞ্জে চলে গিয়েছিলেন। তবে সেখানেও আমি ঘন ঘন যেতাম।

৯৯৯

আমাদের আর একজন শিক্ষকের কথা বলি। তিনি হচ্ছেন ডক্টর পঞ্চানন মিত্র, উনিশ শতকের বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পৌত্র। তিনি আমাদের প্রাগৈতিহাসিক ভারত সম্বন্ধে পড়াতেন। তাঁর সম্বন্ধে বেশ রীতিমত বিরূপ ধারণা নিয়েই তাঁর ক্লাসে প্রথম যাই। কেননা, লোকে তাঁকে 'কাসিমুদ্দিন রিসার্চ স্কলার' বলে উপহাস করত। লোক ভুলে যায় যে মানুষের সমস্ত জীবনটাই ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা। সেজন্য ইংরেজিতে বলা হয় to err is human। দুর্ভাগ্যক্রমে পঞ্চাননবাবু এর শিকার হয়েছিলেন। একদিন তিনি ভারতীয় যাদুঘরে একখানা নবপলীয় যুগের কুঠার দেখেন। কুঠারটা তিনি বিপরীত দিক থেকে দেখেছিলেন। দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। দেখলেন, কুঠারটার ওপর এক অজ্ঞেয় লিপিতে কি লেখা রয়েছে। সংগে সংগেই তার একটা প্রতিলিপি বানিয়ে নিলেন। ভাবলেন,

তিনি এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার করে ফেলেছেন, ভারতের নবপলীয় যুগের মানুষ লিখনপদ্ধতির সংগে পরিচিত ছিল ! লিখে ফেললেন ও-সম্বন্ধে একটা নিবন্ধ। নিবন্ধটা ছাপা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জর্নাল অভ্ লেটারস্'-এ। ওই নিয়ে পণ্ডিতমহলে দিনকতক বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হল। তারপর সত্যটা প্রকাশ পেল। পঞ্চাননবাবু কুঠারঠা বিপরীত দিক থেকে ধরেই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলেন। একজন কুঠারটা সোজা দিক থেকে ধরে দেখালেন যে ওই কুঠারের ওপর লেখাগুলো রোমান হরফে লেখা এবং ওটা ওই কুঠারের acquisition date। ওটা যাদুঘরের কাসিমুদ্দিন নামে এক দপ্তরীর খোদিত। এটা তিনি যাদুঘরের Register of Acquisition-এর সাহায্যে প্রমাণ করলেন। সেই থেকেই মাস্টার-মশাইয়ের নাম হয়ে গেল 'কাসিমুদ্দিন রিসার্চ স্কলার'।

আগেই বলেছি যে ভুল-করা মানুষের সহজাত স্বভাব। সুতরাং অনবধানতার জন্য যে মাস্টারমশাইয়ের ভুল হতে পারে, তা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তা নিয়ে, হৈ চৈ করবার অবশ্য কিছু ছিল না।

আমরা পঞ্চাননবাবুর কাছে দু-তিন বছর পড়েছি। তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছি। আমরা জানি প্রাগৈতিহাসিক ভারত সম্বন্ধে মাস্টারমশাইয়ের মত গভীর জ্ঞান পণ্ডিতমহলে আর কারুরই ছিল না। তা ছাড়া, 'প্রাগৈতিহাসিক ভারত' সম্বন্ধে তিনিই তো প্রথম বই লিখেছিলেন। এক কথায়, মাস্টারমশাইয়ের এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অনস্বীকার্য। তিনি আমাকে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি যখন বিদেশের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করবার জন্য আমন্ত্রিত হন, তখন আমিই সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছিলাম।

আমাদের পড়ানোর সময়েই মাস্টারমশাইয়ের জীবনে এক গুরুতর কালো ছায়া নেমে আসে। সেটাই তাঁর বাকি জীবনটাকে অশান্ত করে তোলে। বেড়াতে গিয়েছিলেন পাবনার এক আশ্রমে। যখন ফিরে এলেন, তখন দেখলাম মাস্টার-মশাইয়ের মন অশান্ত, কেশ রুক্ষ, চক্ষু কোটরাগত, মুখ বিবর্ণ। পাবনার ওই আশ্রমে সংঘটিত এক ঘটনার প্রতিঘাতেই মাস্টারমশাইয়ের এরূপ অবস্থা হয়েছিল। সে ঘটনাটা আর আমি এখানে বিবৃত করব না। তবে সমসাময়িককালে সজনীকান্ত দাস তাঁর 'শনিবারের চিঠি'তে 'নকুড় ঠাকুরের আশ্রমে' শীর্ষক এক ধারাবাহিক কাহিনীতে সব কথাই খুলে লিখেছিলেন। তাতে 'শনিবারের চিঠি'র প্রচার-সংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছিল।

ড. পঞ্চানন মিত্রের সান্নিধ্যে আসবার পূর্বে ও'র সম্বন্ধে যেমন আমার একটা বিরূপ ধারণা ছিল, তেমনই বিরূপ ধারণা ছিল আমাদের 'এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার' ডিপার্টমেণ্টের প্রধান ড. দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার সম্বন্ধে। এই মারাঠী ভদ্রলোককে আশুবাবু যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে আদা-জল খেয়ে লেগেছিল রামানন্দবাবুর 'মডার্ন রিভিউ'। বোধ হয়, ভাণ্ডারকারের বিরুদ্ধে 'মডার্ন রিভিউ'তে যত প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, অন্য কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে তত বেরোয় নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবার পূর্বে তিনি ছিলেন আরকিওলজিক্যাল সারভে অভ্ ইণ্ডিয়ার সুপারিনটেণ্ডেন্ট। ওই চাকরি থেকেই আশুবাবু ও'কে 'লোন' নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনেছিলেন 'কারমাইকেল প্রফেসর অভ্ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার'-এর পদ অলংকৃত করবার জন্য। কিন্তু 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় নিরন্তর লেখা হত যে তাঁর কোনই পাণ্ডিত্য নেই! যদি পাণ্ডিত্যই না থাকবে তো, তবে উনি ননীগোপাল মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র সরকার-এর মত প্রখ্যাত 'এপিগ্রাফিস্ট' তৈরী করলেন কী করে?

সে যাই হোক, 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় ও'র বিরুদ্ধে লেখাগুলো পড়ে, ও'র সম্বন্ধে আমার মনে এক অত্যন্ত বিরূপ ধারণা হয়ে গিয়েছিল। ওই বিরূপ ধারণা নিয়েই আমি একদিন ও'র ক্লাসে ঢুকে পড়েছিলাম। সেদিন আমি ছিলাম তাঁর ক্লাসে একজন রবাহূত 'ট্রেস্‌পাসার'। মাত্র কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই তাঁর ক্লাসে প্রবেশ করেছিলাম। অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে (তারা সকলেই আমার সহপাঠী) গিয়ে তাদের পাশেই বসে পড়েছিলাম। ও'র ক্লাসটা হত পুরানো সেনেট হলের একেবারে পিছনের কক্ষে। (পরে এখানেই আশুতোষ মিউজিয়াম স্থাপিত হয়েছিল)। মনে পড়ল, বেশ কয়েক বছর আগে রবাহূত হয়ে ওই কক্ষেই এসে বসে পড়েছিলাম প্রখ্যাত অধ্যাপক জে. আর. বানার্জির লেকচার শোনবার জন্য। কিন্তু সেদিন সেরূপ কোন বিড়ম্বনা ঘটেনি, যা ঘটল, যেদিন ড. ভাণ্ডারকারের লেকচার শোনবার জন্য তাঁর ঘরে ঢুকলাম।

ঘণ্টা বাজল। শীঘ্রই প্রবেশ করলেন ড. ভাণ্ডারকার। সুপুরুষ চেহারা। অনেকটা রাজপুত্রের মত। স্যুট পরা, গলায় টাই বাঁধা, মাথায় জরি-বসানো কালো রঙের এক পাগড়ি। ও'র চেহারা দেখে আমি বিমুগ্ধ হয়ে গেলাম। আসন গ্রহণ করেই উনি 'উপস্থিতির খাতা' খুলে, 'রোল-কল' করতে আরম্ভ করলেন। 'রোল-কল' হয়ে গেল। উনি 'খাতা'তে উপস্থিতির সংখ্যা গুণে নিলেন। তারপর ক্লাসে উপস্থিত ছেলেদের মাথা গুণলেন। দেখলেন, একটা মাথা বেশী! তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, অতিরিক্ত মাথা কার? আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম।

—তা তুমি রোল-কলের সময় উত্তর দাওনি কেন ?

আমি বললাম, স্যার, আমি 'এপিগ্রাফি'র ছাত্র নই। তবে এটা শেখবার জন্যই আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। শুনে আমার দিকে একটা অবজ্ঞামিশ্রিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তারপর পড়াতে শুরু করলেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমার সম্বন্ধে ওঁর ধারণার পরিবর্তন ঘটল। যখন তিনি দেখলেন যে, দিনের পর দিন আমি ওঁর ক্লাসে উপস্থিত হই ও ওঁর লেকচার শুনি, তখন তিনি একদিন ক্লাসের শেষে আমাকে ওঁর কাছে ডাকলেন। কিছু কথাবার্তার পর উনি ৩৫ নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ওঁর বাড়িতে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন।

আমি শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে কৃতার্থ বোধ করলাম। পরদিন প্রাতঃ কালেই আমি ওঁর বাড়ি গেলাম। উনি হাসিমুখে ও আনন্দচিত্তে আমাকে স্বাগত জানালেন।

পরবর্তীকালে যা ঘটল, তার প্রেক্ষিতে আমি ওই দিনটাকে আমার জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণ বলে মনে করি।

সেদিন তিনি কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট করে আমাকে শিখিয়ে দিলেন কীভাবে প্রাচীন লিপি পড়তে হয়, কীভাবে অভিলেখসমূহের পাঠোদ্ধার করতে হয়। আরও বললেন, তুমি মনোমত কোন এক বিশেষ রাজবংশের অভিলেখসমূহ পাঠ করে, সেই রাজবংশের একটা ইতিহাস পুনর্গঠন কর।

আমরা কথা বলছি এমন সময় ওঁর ঘরে একজন পাতলা চেহারার লোক প্রবেশ করল। উনি বললেন, ইনি আমার স্টেনোগ্রাফার। আর স্টেনোগ্রাফারকে আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার গ্রন্থাগারে যা কিছু বইটই আছে সেগুলো ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা এঁকে দেবে, ইনি এখন থেকে আমার এখানেই পড়াশোনা করবেন।

কনৌজের গাহড়বাল রাজবংশ সম্বন্ধে যা-কিছু অভিলেখ ও সাহিত্যসূত্র আছে, সেগুলো সবই ওঁর ওখানে পেলাম। তারই ভিত্তিতে গাহড়বাল রাজবংশের একটা ইতিহাস রচনা করলাম। ড. ভাণ্ডারকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বৈচারিক মন দিয়ে নিবন্ধটি পড়লেন। তারপর সন্তুষ্টচিত্তে প্রকাশের জন্য 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ারটারলি' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন। ওই পত্রিকাতেই ওটা প্রকাশিত হয়েছিল।

রোজ সকালেই ড. ভাণ্ডারকারের বাড়ি যাই। প্রায়ই তিনি আমার সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের অনেক কুটিল ও জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। একদিন তিনি আমাকে রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষের একখানা অভিলেখের ছাপ দিয়ে,

সেখানার পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ করতে বললেন। আমি সেটা করবার পর, তিনি ওটা সংশোধন ও সম্পাদন করে 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা'য় প্রকাশ করেন। নগর ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ওঁর বিখ্যাত নিবন্ধের সংশোধিত সংস্করণের প্রস্তুতিতেও আমি ওঁকে সাহায্য করেছিলাম। সেটা 'ইণ্ডিয়ান অ্যানটিকোয়ারি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, এবং ওই নিবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার পাদদেশে আমার কাছ থেকে তিনি যে সাহায্য পেয়েছিলেন, তা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কাজ যা তিনি আমার ওপর ন্যস্ত করলেন তা হচ্ছে, তিনি উত্তর ভারতের ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত অভিলেখসমূহের যে বিরাট তালিকা তৈরী করছিলেন তাতে উল্লিখিত তারিখ-সমূহকে খ্রীস্টাব্দ তারিখে পরিণত করা। এই কাজ করতে গিয়েই আমি জ্যোতিষের কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করি, যা পরবর্তীকালে আমার ফলিত জ্যোতিষচর্চায় পরিণত হয়েছিল।

একদিন ড. ভাণ্ডারকার আমাকে একখানা চিঠি দেখালেন। চিঠিখানা লিখেছেন আর্কিওলজিক্যাল সারভে অভ্ ইণ্ডিয়ার ডিরেকটর-জেনারেল স্যার জন মার্শাল। চিঠিটায় তিনি লিখেছেন, 'আমার মনে হয় পরবর্তীকালের হিন্দু-সভ্যতার গঠনে সিন্ধুসভ্যতার অবদান আছে। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গেলে সেই গবেষকের মাত্র প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের জ্ঞান থাকলেই চলবে না, তার নৃতত্ত্বেরও সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। এরূপ কোন গবেষক-ছাত্রের সন্ধানে আমি ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু নিরাশ হয়েছি। আপনার সন্ধানে কি এরূপ কোন ছাত্র আছে ?'

যেহেতু আমার এই দুই বিষয়ের সম্যক জ্ঞান ছিল, সেজন্য ড. ভাণ্ডারকার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি যাবে ? বললাম, যাব।

স্যার জন মার্শাল চেয়েছিলেন, কাজটা আর্কিওলজিক্যাল সারভে অভ্ ইণ্ডিয়ার অধীনে হোক, কিন্তু অবস্থাচক্রে আমাকে মহেঞ্জোদারো থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল। পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও সেনেটের সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ইচ্ছাক্রমে এ কাজটা আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈতনিক গবেষক হিসাবে ড. ভাণ্ডার-কারের অধীনেই করতে হয়েছিল। সে গবেষণার কথা আমি পরে বলব। এখানে ড. ভাণ্ডারকারের সঙ্গে আমার পুনর্মিলন ও প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার কথাই বলছি।

ড. ভাণ্ডারকারের সান্নিধ্যে পুনরায় ফিরে আসায় উনিও খুসী, আমিও খুসী। আরও খুসী ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। ড. রাধাকৃষ্ণন তখন সবেমাত্র একখানা নতুন বই লিখেছেন, 'দি হিন্দু ভিউ অভ্ লাইফ'। ওই বইখানার

প্রতিপাদ্য বিষয়—হিন্দু সভ্যতা আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার মিশ্রণে উদ্ভূত। আমার কাজ চালিয়ে যাবার তিনিই যোগালেন সবচেয়ে বেশী অনুপ্রেরণা। বললেন, আমি ড. ভাণ্ডারকারের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে নিয়েছি, তিনি যতদূর পারবেন তোমাকে সাহায্য করবেন।

আমি তখন হিন্দুসভ্যতার উৎসের সন্ধানে এক নতুন দিগন্তের দিকে যাত্রা করেছি। অপরিসীম তখন আমার উৎসাহ। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে, শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় এসে কালীঘাটগামী প্রথম বাস ধরি। যদুবাবুর বাজারের কাছে নেমে, পদ্মপুকুর রোড ধরে হেঁটে ভাণ্ডারকারের বাড়ি যাই। সেটাই তখন ভাণ্ডারকারের বাড়ি যাবার একমাত্র পথ। ওখানে পেঁছিবার আর কোন বিকল্প পরিবহণ পন্থা ছিল না। ও'রই বাড়ির অদূরে গড়িয়াহাট রোডের মোড়ে একটা ছোট পুলিস-ফাঁড়ির কাছে গিয়েই লোকালয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপরে সবই বনবাদাড়। দক্ষিণেও হাজরা রোডের পর তাই। আর যদুবাবুর বাজার থেকে ভাণ্ডারকারের বাড়ি যাবার পথে বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের ধারে ধোবাদের ছিল কাপড়-কাচার বড় বড় মাঠ। বালিগঞ্জের তখন এই দৃশ্য!

৩৫-নং বালিগঞ্জ সারকুলার রোড। তার মানে যে বাড়িতে ভাণ্ডারকার থাকতেন। মস্ত বড় বাড়ি। বাড়িটার সামনের দিকে থাকতেন ড. স্টেলা ক্রামরিশ, আমাদের এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি ডিপার্টমেণ্টের 'ফাইন আর্টস'-এর অধ্যাপিকা। আর পিছনদিকের অংশে থাকতেন ড. ভাণ্ডারকার। এককালে ওটা ছিল কলকাতার একজন বিখ্যাত আইন-ব্যবসায়ী স্যার তারকনাথ পালিতের বসতবাড়ি। বাড়িখানা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছিলেন ১৫ লক্ষ টাকা। সেই টাকাতেই নির্মিত হয়েছিল সারকুলার রোডের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজ।

আমি যখন ভাণ্ডারকারের বাড়ি যেতাম, তখন ওটা ছিল এক নির্জন পল্লী। পড়াশোনা করার পক্ষে ওটা ছিল এক আদর্শ স্থান। ভাণ্ডারকারের ওখানে গিয়েই প্রত্যহ চা পান করতাম ও প্রাতরাশ খেতাম। তারপর কাজে বসতাম। এক এক দিন কাজ করতে করতে দুপুর হয়ে যেত। ভাণ্ডারকার ও'র ওখানেই খেতে বলতেন। সে-সব দিন বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করতাম। তারপর বৈকালীন চা খেয়ে বাড়ি ফিরতাম।

ভাণ্ডারকার নিজে খুব পরিশ্রমী লোক ছিলেন। তাঁর ছাত্ররা কেউ অলস বা আয়াসী হবে, এটা তিনি পছন্দ করতেন না। কঠিন পরিশ্রম করবার অভ্যাসটা আমি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম।

ভাণ্ডারকার বিশেষ গর্ববোধ করতেন যখন তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে লক্ষ্য

করতেন কঠিন পরিশ্রম করবার অভ্যাস, গবেষণা করবার আন্তরিক বাসনা, ও নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। চরিত্রের দিক থেকে তিনি ছিলেন কঠোর নীতিপরায়ণ ব্যক্তি। তাঁর আচার-ব্যবহার ছিল অতীব সুন্দর। সদাসর্বদাই ছাত্রদের সাহায্য করবার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকতেন। শিষ্টতা ও মর্যাদাপূর্ণ চালচলনের তিনি ছিলেন প্রতীক। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'বেদবাক্য হলেও কোন তথ্য সত্য বলে গ্রহণ করবে না। তার আদ্যপ্রান্ত যাচাই করে যদি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হও এবং মনে কোনরূপ সংশয় না থাকে, তবেই সেই তথ্যকে সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে।' এটা বিশেষভাবে প্রকাশ পেল যখন তিনি 'ইণ্ডিয়ান অ্যানটিকোয়ারি'-তে সমালোচনার জন্য একখানা বই একদিন আমাকে দিলেন। বইখানা লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড. রাধাকুমুদ মুখার্জির লিখিত 'হর্ষ'। আমি তখন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র জন্য প্রতি সপ্তাহেই দু'একখানা করে বইয়ের সমালোচনা লিখি। আমি সেইরূপই গতানুগতিক পদ্ধতিতে রাধাকুমুদ-বাবুর বইখানার একটা সমালোচনা লিখে ভাণ্ডারকারকে দিই। সমালোচনা পড়ে, উনি ওটা বাতিল করে দিলেন। বললেন, বইখানা বেশ করে মনোযোগ দিয়ে পড়ে, বৈচারিক পদ্ধতিতে একটা সমালোচনা লেখ। পরিণতিতে যা দাঁড়াল তা 'ইণ্ডিয়ান অ্যানটিকোয়ারি' পত্রিকায় এক 'ক্লাসিক' সমালোচনার মর্যাদা পেল। (ইণ্ডিয়ান অ্যানটিকোয়ারি ১৯৩১, পৃষ্ঠা ৩৪৭-৩৪৮)। দেখালাম যে বইখানাতে রাধাকুমুদবাবুর নিজস্ব উক্তি খুব কমই আছে, নিজের মৌলিক গবেষণালব্ধ তথ্য বলে যা উল্লেখ করেছেন, তা বিনা স্বীকৃতিতে তিনি অপরের বই থেকে নিয়েছেন, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের যতটা জ্ঞানের উনি বড়াই করেন ততটা জ্ঞানের উনি অধিকারী নন, বইয়ে যে-সব উদ্ধৃতি তুলেছেন সেগুলো ভুল, 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়েছেন' ইত্যাদি। অবশ্য ওটা বেরুবার পর রাধাকুমুদবাবুর পক্ষে তাঁর এক অধস্তন সহকর্মী ড. চরণদাস চাটার্জির একটা প্রতিবাদ ওই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হল। কিন্তু পণ্ডিতমহলে আমার সমালোচনাটাই বিশেষ সমাদর লাভ করল।

ভাণ্ডারকারের সান্নিধ্যে এসে আমি অনেক কিছু শিক্ষালাভ করেছিলাম, যা পরবর্তীকালে আমি আমার জীবন-সংগ্রামে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছি।

ভাণ্ডারকারের চরিত্রের এক বিশেষ গুণ ছিল নিজ ছাত্রগণের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে আমি বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে চলে এসেছিলাম ক্লাইভ স্ট্রীটের বৈষয়িক জগতে, নিজের ভাগ্যপরীক্ষার জন্য। কিন্তু আমার মাস্টারমশাই আমাকে ভোলেন নি। বরাবরই আমার সংগে সংযোগ রেখে গিয়েছিলেন। প্রায়ই তিনি আমাকে টেলিফোন করতেন, তাঁর সংগে দেখা

করবার জন্য। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্। পাণ্ডিত্যে মাস্টারমশাই ছিলেন তাঁর পিতারই অনুগামী। তিনি ছিলেন ধন্য পিতার ধন্য সন্তান। আমি মাস্টারমশাইয়ের প্রসঙ্গে আবার আসব।

ঌ ঌ ঌ

পাণ্ডিত্যের কোন আত্মাভিমান ছিল না, অথচ বিরাট পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, এরূপ একজন মাস্টারমশাইয়ের কথা এবার বলব। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের 'ফাইন আর্টস' সেমিনারের এক প্রান্তে বসে নীরবে সারস্বতসাধনা করে যেতেন। মানুষটার স্বভাব ছিল অত্যন্ত কোমল, এবং গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ছাত্রদের পড়াতেন। নাম তাঁর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পড়াতেন মূর্তিতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ব। এ দুই বিষয়েই ছিল তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। তাঁর পড়ানোর মধ্যে ছিল এক সন্দীপক মাধুর্য। যাদুঘরে সংরক্ষিত প্রাচীন মুদ্রার ক্যাবিনেট উন্মোচন করে যখন তিনি কোন মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতেন, তখন আমরা চলে যেতাম অন্য এক জগতে। অত্যন্ত ছাত্রবৎসল অধ্যাপক ছিলেন। বহু বৎসর পরে তাঁর ব্যবহারে আমি এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, সে ঘটনাটার উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিয়ে আসবার পর প্রায় ত্রিশ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে। ইতিমধ্যে মাস্টারমশাই 'কারমাইকেল অধ্যাপক'-এর (প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের সর্বোচ্চ পদ) আসনে বৃত হয়েছেন। ক্লাইভ স্ট্রীটের কর্মব্যস্ততার মধ্যে একটুও সময় পাইনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে একবার মাস্টারমশাইকে প্রণাম করে অভিনন্দন জানিয়ে আসি। একটা যে গভীর অপরাধ করেছি, সে বিষয়ে আমি তখন খুবই সচেতন। এমন সময় একখানা নিমন্ত্রণপত্র পেলাম, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রদের 'পুনর্মিলন উৎসব'-এ যোগদান করবার জন্য। উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ইউনিভারসিটি ইনস্টিট্যুট হলে। পৌরোহিত্য করবেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি'-তে এম.এ. পাস করেছিলেন, আমার দু'বছর পরে।

ইউনিভারসিটি ইনস্টিট্যুট হলে প্রবেশ করেছি। দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়েছেন জিতেনবাবু। ছুটে এসে আমাকে দৃঢ়-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। তারপর আমাকে নিয়ে গেলেন মঞ্চের ওপর বসা বিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। পরিচয় করিয়ে দিলেন এই কথা বলে—'This is famous Atul K.

Sur', আমাদের একজন প্রাক্তন ছাত্র, যার কথা তোমরা আমার মুখে শুনেছ।

মাস্টারমশাইয়ের অন্তরে আমার প্রতি যে এক গভীর স্নেহ-ভালবাসা এতদিন বন্দী হয়ে ছিল, তা প্রায় ত্রিশ বছর পরে আমি দেখে, তাঁর প্রতি গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে পড়লাম।

আরও পঁচিশ বছর পরেকার ঘটনা। ১৯৯২ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখ। আমার পৌত্রী সুপ্রিয়ার বিবাহের বৌভাতের দিন রাত্রে ওর শ্বশুরবাড়ি গিয়েছি প্রীতিভোজে।

ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতার জন্য সমবেত অতিথিবৃন্দের মধ্যে আমার নজর পড়েছিল সেদিন রাত্রে এক স্যুট পরা ভদ্রলোক ও তাঁর সমভিব্যাহারী দুই কন্যার ওপর। কিছু পরেই আমার পৌত্রীর শ্বশুরমশাই ওঁদের আমার কাছে এনে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কথাপ্রসঙ্গে ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আমার পিতা ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর নাম কি? বললেন, ড. জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—তিনি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের 'কারমাইকেল প্রফেসর' ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তবে তো আপনি আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

—কি রকম?

—তিনি ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই, আমি ছিলাম তাঁর প্রিয়তম ছাত্র।

~ ~ ~

আর একজন মাস্টারমশাইয়ের কথা এখানে বলব। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধ। একজন ভদ্রলোক তাঁর হাত ধরে তাঁকে নিয়ে এসে চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিতেন। নাম তাঁর বিজয়চন্দ্র মজুমদার। বিরাট পণ্ডিত ব্যক্তি, ভাষাতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ ও সুকবি। অনেক ভাষা জানতেন—ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি। প্রথম জীবনে সম্বলপুরে আইন ব্যবসায় করতেন। সোনপুর রাজ্যের আইন-উপদেষ্টা ছিলেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক হন। গ্লকোমা রোগে অন্ধ হয়ে যান।

নৃতত্ত্ব বিষয়ে মাস্টারমশাইয়ের অসাধারণ জ্ঞানের পরিধি প্রকাশ পেত, যখন

তিনি আমাদের আদিম মানবের ধর্ম ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। মনে হত ফেজারের 'গোলডেন বাউ'-টা ও'র সমস্ত কণ্ঠস্থ। তাঁর রচিত দু'খানা বই ও একটা নিবন্ধ পড়ে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছিলাম। বই দু'খানার নাম 'এলিমেণ্টস্ অভ্ সোশাল অ্যানথ্রপলজি' ও 'অ্যাবরজিনিস অভ্ সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া'। আর নিবন্ধটার নাম 'বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় উপাদান'। ও'র অন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য, ও'র প্রতি আমাদের মনে এক ভীষণ মমতার সৃষ্টি হয়েছিল। যতটুকু সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব শিখেছি, তার জন্য আজ বিনম্রচিত্তে ও'কে আমার পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

১১১

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া থেকে আমি কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে যেতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পাঠ্যাবস্থায় দেশের রাজনৈতিক ও আমার পারিবারিক জীবনে কি ঘটছিল তারই অনুবেদন করতে চাই। প্রথমেই বলব আমি আমার পারিবারিক জীবনের কথা। আগেই বলেছি যে আমি যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র (তখন আমার বয়স ১৮), আমার পিতা যখন শুনলেন যে আমি এক খ্রীস্টান অধ্যাপকের বাড়ি যাই ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশি এবং তাঁর এক অনূঢ়া ভগিনী আছে, তখন তিনি বোধ হয় এক ঘোরতর পারিবারিক বিপদ তাঁর ঘাড়ে আসছে ভেবে আমার বিবাহ দিয়ে দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দু'বছরের মধ্যেই আমার স্ত্রী গত হয়। অনেকের কাছেই এটা আমার জীবনের এক অজ্ঞাত অধ্যায়।

তখনকার দিনে বৌয়েরা শ্বশুরবাড়ি আসত বুক পর্যন্ত ঘোমটা দিয়ে। পায়ে থাকত মল বা তোড়া। সারাদিন বাড়ির ভেতর একগলা ঘোমটা দিয়ে মল বাজিয়ে ঘুরে বেরাত। দিনের বেলা স্বামি-স্ত্রীতে দেখা করা বা কথা কওয়া রীতিবিরুদ্ধ ছিল। তবে আমার প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে নিরিবিলিতে থাকতে পেরেছিলাম দু'মাস, তার মৃত্যুর আগের বছর যখন ডাক্তারের সুপারিশে বায়ুপরিবর্তনের জন্য তাকে মধুপুরে নিয়ে গিয়েছিলাম। আশ্রয় পেয়েছিলাম বাবার বন্ধু হরিহরবাবুর মীনাবাজারের বাড়িতে। মস্তবড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে দুটো বাড়ি ছিল। একটা ও'দের নিজ পরিবারের ব্যবহারের জন্য, আরেকটা জানাশোনা বন্ধুবান্ধবদের জন্য। আমরা ওই শেষের বাড়িটাতেই গিয়ে উঠেছিলাম। ও'দের মূল বাড়িতে তখন হরিহরবাবুর ছোট ছেলে ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন। তাঁদেরই তত্ত্বাবধানে বাবা আমাদের মধুপুরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আজকের লোক বুঝতে পারবে না, তখন মধুপুরে কি ছিল। হরিহরবাবুদের বাড়িটা ছিল মীনাবাজারের একেবারে শেষ প্রান্তে, নদীর শুকনো খাতি থেকে মাত্র পঞ্চাশ হাত এদিকে। ওদিকে নদীর অপর পারে বহুদূরে অবস্থিত ছিল সাঁওতালদের দেহাত। প্রথম দিন রাত্রে আমার স্ত্রী মুগ্ধ হয়েছিল দূর থেকে ভেসে আসা সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষের নাচ-গানের সমারোহের কলরবে। আমার কাছে অবশ্য ওটা নতুন নয়, কেননা আমি একলা মধুপুরের ওই বাড়িতে আগেও থেকে গিয়েছি।

মধুপুরে তখন কোন দোকানপাট বা বাজার ছিল না। সপ্তাহে মাত্র দু'দিন হাট বসতো। আমরা যেদিন বিকালে গিয়ে পৌঁছালাম, তার পরের দিনই ছিল হাট-বার। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমরা হাটে চলে গিয়েছিলাম; আমাদের নিত্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্তরগুলো কিনে ক্লান্ত হয়ে যখন বেলার দিকে বাড়ি ফিরে এসে চা তৈরির জন্য উনুন জ্বালাবার দরকার হল, তখন আমার স্ত্রী বলল, যাঃ, কেরোসিন তেল তো আনা হল না! আমি আবার হাটে যাবার জন্য উদ্যত হলাম। স্ত্রী নিরস্ত করল, বলল, বেলা পড়লে বিকালে গিয়ে কেরোসিন তেল এনো, এখন মালির কাছ থেকে তেল ধার করে নিয়ে কাজ চালিয়ে দেব।

কিন্তু দুপুরের পর থেকে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন হল। ক্রমশ মেঘ জমে সমস্ত দিকদিগন্ত অন্ধকার করে তুলল। আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম কেরোসিন তেল আনবার জন্য। শর্ট-কাট করবার জন্য নদীর শুকনো খাত ধরলাম। অদূরেই সর্বাধিকারী রোড। কিন্তু সর্বাধিকারী রোডে পৌঁছবার আগেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ছুটে সর্বাধিকারী রোডের দিকে গেলাম। দেখলাম বাঁদিকে শ্মশানের ঘরটার কোলাপ্‌সিবল্ গেটটা বন্ধ। ডান দিকে দোতলা বাড়িটার দরজা খোলা। ঢুকে পড়লাম। দাঁড়িয়ে রইলাম বাড়িটার প্রবেশ-পথে। বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখলাম, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার দু'দিকে দু'খানা ঘর। ঘর দু'খানা তালা-বন্ধ। ভাবলাম, বাড়ির কেউ না কেউ, এখনই নীচে নেমে আসবে, এবং আমাকে ওই অবস্থায় দেখে একখানা ঘর খুলে দেবে। সেই আশায় প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু কই, কেউ তো নামে না!

এদিকে বৃষ্টির ছাট প্রবেশ-পথে ঢুকে আমার জামাকাপড় ভিজিয়ে দিল। আমি ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগলাম।

এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ হল। মনে হল স্লিপার পায়ে কোন মহিলা নীচে নেমে আসছেন। মহিলা সিঁড়ির নীচে পর্যন্ত নেমে দাঁড়িয়ে গেলেন, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার পিছনে দশ-বারো হাত দূরে। মনে হল ভদ্র-মহিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করছেন। পিছন দিকে তাকিয়ে আমি

যে ওঁকে দেখব, সেটা তৎকালীন রীতি অনুযায়ী নীতিবিরুদ্ধ। সেজন্য আমি আর পিছন ফিরে তাকালাম না। দাঁড়িয়েই রইলাম।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভদ্রমহিলা আবার উপরে উঠে গেলেন। ভাবলাম, আমার দুর্দশাটা ভদ্রমহিলা যখন দেখে গেলেন, তখন নিশ্চয়েই উপর থেকে কারুকে পাঠিয়ে দেবেন একখানা ঘর খুলে দেবার জন্য। হয়তো, ভদ্রমহিলা এক কাপ গরম চা-ও পাঠিয়ে দিতে পারেন।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কেউই এল না। খানিক পরে ভদ্রমহিলা আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। আগেকার মতই তিনি সিঁড়ির নীচ পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। এইভাবে তিনি তিন-চারবার উপর-নীচ করলেন।

ইতিমধ্যে দূরে একদল দেহাতী মেয়ে-পুরুষের গলা পাওয়া গেল। বুঝলাম বৃষ্টি থেমে গেছে, এবং তারা এদিকেই আসছে। আমি সদর দরজার দিকে অগ্রসর হলাম। ঠিক যেমনই সদর দরজার বাহিরে গেছি, দেহাতী দল তখন রাস্তায় আমার সামনা-সামনি হয়েছে। হঠাৎ আর্তনাদের স্বরে তারা চীৎকার করে উঠল, বাবা গো! মা গো!— এবং ছুটতে আরম্ভ করল।

আমি ভাবলাম, সামনের শ্মশানের মধ্যে তারা ভূত-প্রেত কিছু দেখেছে। আমিও ভয় পেয়ে গেলাম। আমিও দৌড়াতে আরম্ভ করলাম। আমি যত দৌড়াতে থাকি, তারাও তত দৌড়াতে থাকে।

কিছুদূর দৌড়াবার পর আমি হাঁফিয়ে পড়লাম। ডানদিকে একটা একতলা বাড়িতে দেখলাম, আলো জ্বলছে। সামনের দরজা খোলা। আমি গেট পেরিয়ে সেই দরজার দিকে ছুটলাম। দেখি তক্তাপোশের ওপর এক ভদ্রলোক বসা। আমি সেই তক্তাপোশের ওপর বসে পড়ে হাঁফাতে লাগলাম। ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে আপনার? আমি তখনও হাঁফাচ্ছি, মোটেই কথা বলতে পারছি না। বুকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে ভদ্রলোককে একটু অপেক্ষা করতে বললাম।

তারপর একটু সুস্থ হয়ে ভদ্রলোককে সব কথা বললাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোন্ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন?

—ওই যে শ্মশানের সামনে দোতলা বাড়িটাতে।

—সে কি, খুন হবার পর থেকে আজ দশ বছর ওই বাড়িটাতে কেউ তো থাকেনা, ওটা তো চাবি-বন্ধ আছে।

তারপর ভদ্রলোক আমাকে সেই খুনের কাহিনীটা বললেন। বললেন, ওই বাড়িটা কলকাতার এক নামজাদা ব্যারিস্টারের বাড়ি। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন নবাগত এক ব্যারিস্টারের সঙ্গে। জামাই সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক ছিল। সব সময়েই স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করত। একবার হল কি, জামাই স্ত্রীকে

পাঠিয়ে দিল মধুপুরের এই বাড়িতে। বলল, দু'দিন পরে সে যাবে। কিন্তু পরের ট্রেনেই সে রওনা হল স্ত্রীর পিছনে পিছনে। তারপর কি ঘটেছিল কেউ জানে না। রাত্রে আমরা পর পর তিনটা পিস্তলের গুলির আওয়াজ পেয়েছিলাম। মেয়েটা লুটিয়ে পড়ে ওখানেই মারা গিয়েছিল। জামাইও সেই থেকে নিরুদ্দেশ।

এমন সময় শুনলাম, বাহিরে কেউ আমার নাম ধরে চীৎকার করে আমার খোঁজ করছে। বেরিয়ে এসে দেখলাম, লানটার্ন হাতে হরিহরবাবুর বাড়ির মালি। তার সংগেই আমি বাড়ি ফিরে এলাম। স্ত্রীকে সব কথা বললাম। ভয়ে সে কাঁপতে লাগল।

১১১

"মসজিদের সামনে হিন্দুর বাজনা বাজানো চলবে না"। এই উপলক্ষ করে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে বাধল হিন্দু-মুসলমানে দাংগা। এই দাংগাতেই মেছুয়াবাজার ও রাজাবাজারের মোড়ে কয়েকজন হিন্দু মাত্র লাঠির সাহায্যে সশস্ত্র মুসলমানদের প্রতিহত করে বিশেষ বীরত্ব দেখাল। শ্যামবাজার অঞ্চলেরও মুসলমানরা হাংগামা বাধাল। একদিন রাত্রে তারা যখন শ্যামবাজার স্টীটের মধ্যে ঢুকে পড়ল, তখন মেয়েরা বন্দুক ছুঁড়ে তাদের ভয় দেখিয়ে হটিয়ে দিল। বন্দুকগুলো ছোঁড়া হয়েছিল আমার ভাবী স্ত্রীর বাড়ি থেকে।

হিন্দু-মুসলমানের এই সাম্প্রদায়িক দাংগার মধ্যেই আমার দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়ে গেল। আমার তখন একুশ বছর বয়স। আমি তখন ফিফথ্ ইয়ারে পড়ি। যদিও মাত্র চারখানা বাড়ি পরেই আমার বিয়ে হল, তথাপি তখন ত্রাসের আবহাওয়া থাকার দরুন, যখন বিয়ে করতে গেলাম, তখন বরের গাড়ির সামনে ও পিছনে দু'খানা মোটরে আমার বড়দা ও শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ের ঘড়ি-ওয়ালা বাড়ির ললিত মিত্তির মশাই (যাঁর নামে ওই অঞ্চলের একটা রাস্তা চিহ্নিত) রিভলবার হাতে করে বরের অনুগমন করলেন।

আমার এই দুই স্ত্রীর মধ্যে যুগল-সম্পর্ক ছিল আমার দ্বিতীয় বারের স্ত্রীর ন'-মামীমার। আমার প্রথমা স্ত্রী ছিল তাঁর বোনের মেয়ে, আর দ্বিতীয়া স্ত্রী তাঁর ননদের মেয়ে। তবে এই সম্পর্ক ছাড়াও, আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বহুকালের। আমরা শ্যামবাজারের যে বাড়িটাতে বাস করতাম, ওটা ছিল আমাদের এক দিদিমার। তিনি ছিলেন আমার দ্বিতীয়া স্ত্রীর নিজ দিদিমার জা। সেজন্য আমি অতি ছেলেবেলা থেকেই ও'দের বাড়ি যেতাম, এবং যেহেতু গেটের পর ও'দের বাড়ির সামনে একটা মস্ত মাঠ ছিল, সেজন্য আমি আমার স্ত্রীর দিদিমাকে

'মাঠের দিদিমা' বলে ডাকতুম। ছেলেবেলা থেকেই আমি ওখানে আমার শাশুড়ী-ঠাকরুন ও ওঁর ছেলেমেয়েদের দেখে এসেছি। সেইজন্য বিবাহের সময় আমার স্ত্রীর সঙ্গে যে 'শুভদৃষ্টি' হয়, সেটা আমাদের প্রথম দৃষ্টি নয়!

তবে ও-বাড়িটা আমার স্ত্রীর বাপের বাড়ি নয়। মামার বাড়ি। আমার স্ত্রীর বাপের বাড়ি ছিল পলতায়। আমার স্ত্রীর পিতামহ ছিলেন বারাকপুরের ক্যান-টনমেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। আমার স্ত্রীর মুখে শুনেছি, ওর বাপের বাড়ি ছিল চার মহল। চার মহলে ছিল মোট ১০৮ খানা ঘর। এমন কি ফলের জন্য আলাদা আলাদা ঘর ছিল। একটা আমের ঘর, একটা কাঁঠালের ঘর, একট্য নারকেলের ঘর ইত্যাদি। বাড়ির সংলগ্ন ছিল বিরাট বাগান ও পুকুর। বাগানটা চার দিকে ঘেরা ছিল দোতলা সমান পাঁচিল দিয়ে, পাছে গোরা সৈন্যরা বাগানে ঢুকে মেয়েদের আবরু নষ্ট করে বলে।

আমার স্ত্রীর ছেলেবেলায় পাঁচ-ছ'বছর বয়স পর্যন্ত বেশ আনন্দে কেটেছিল। তারপর বিপদের পর বিপদ আসে। আমার শ্বশুরমশাই হঠাৎ কলেরায় মারা যান। আমার শাশুড়ীঠাকরুন নাবালক ছেলেমেয়েদের নিয়ে খুব বিপদে পড়েন। আমার স্ত্রী ছিল সকলের ছোট। তার উপরে ছিল আমার শালী, ও তার উপরে ছিল আমার শালা। আমার শালার বয়সই তখন বার-তের বছর।

এই বিপদের মধ্যে আমার শাশুড়ীঠাকরুনের মাথায় পড়ল বিনামেঘে বজ্রাঘাত। কলকাতা করপোরেশন ওখানে জলকল তৈরি করবার সিদ্ধান্ত করল ও আমার শ্বশুরবাড়ির সমস্তটাই গ্রাস করে নিল।

এই সময় ভিটাচ্যুত হয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি শ্যামবাজারে তাঁর বাপের বাড়ি এসে উঠলেন। উনি ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত বন্দুকওয়ালা কে. সি. বিশ্বাসের মেয়ে। সুতরাং তাঁর বাপের বাড়ি ছিল ধনী-পরিবার। আমার স্ত্রী তো নিজেও ধনী-পরিবারের মেয়ে ছিল। তা ছাড়া, মামার বাড়ির ধনী-পরিবেশের মধ্যে সে মানুষ হয়েছিল। আমার সঙ্গে যখন তার বিয়ে হয়, তখন তার বয়স মাত্র চোদ্দ বছর।

আমার যখন বিয়ে হল, আমার বাবা তখনও বেঁচে। আমার বাবা আমার স্ত্রীকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি বলতেন যে আমার স্ত্রী লক্ষ্মীরূপে এসেছে আমাদের সংসারে। ওর দেবদেবীর ওপর ছিল প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা। সে আসবার পর থেকেই আমাদের সংসারের সমৃদ্ধি বেড়েছিল। বাড়িতে দুর্গাপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা, রামায়ণ গান ইত্যাদি হতে শুরু হয়েছিল। তখন থেকে বারো-মাসই আমাদের বাড়ি রামায়ণ গান হত। এসব কারণে আমার বাবা আমার স্ত্রীকে সুলক্ষণা বলে মনে করতেন।

বিলাসিতার মধ্যে মানুষ হয়ে, আমাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারে এসে সে নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিয়েছিল। পঞ্চাশ বৎসরকাল বিবাহিত জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছে অপরের মনস্তুষ্টির জন্য, অপরের সুখ-শান্তি বজায় রাখবার জন্য, সংসারের এবং দশের মঙ্গলের জন্য। নিজের সুখ-শান্তি বা শরীরের প্রতি বিন্দুমাত্র তাকায়নি। তাতে স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে। কিন্ত তা ভ্রুক্ষেপের মধ্যে আনেনি। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, অপরে কিসে সুখে ও শান্তিতে থাকে। জীবনে নির্যাতিত হয়েছে মানুষের হাতে, ব্যাধির হাতে, যমের হাতে। তিন বয়স্ক পুত্রকে হারিয়েছে, একমাত্র ভাইকে হারিয়েছে, কিন্তু শোক-তাপ তাকে কোনদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি তার জীবনের ব্রত থেকে। মৃত্যুকেও সে বরণ করেছে প্রসন্নচিত্তে।

৯৯৯

আমাদের বিয়ে হয়েছিল জ্যৈষ্ঠ মাসে। হিন্দুর লোকাচার অনুযায়ী জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিতে নেই। যেহেতু আমি আমার মায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলাম, সেজন্য আত্মীয়-স্বজন সকলেই মাকে বলল, কি গো, জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিয়ে দেবে! মা বললেন, হ্যাঁ, জ্যৈষ্ঠ মাসেই ছেলের বিয়ে দেব। সেজন্য, জ্যৈষ্ঠ মাসেই আমার বিয়ে হয়ে গেল। আরও একটা লোকাচার আমি নিজেই ভ্রুক্ষেপ করলাম না। বিয়ের দিন বরকে উপবাসী থাকতে হয়। কিন্ত আমি গোপনে মধ্যাহ্নভোজনটা দীনেশ সেন মহাশয়ের বাড়িতেই সেরে নিলাম।

বিয়ের পর আশ্বিন মাস নাগাদ দীনেশবাবুর সেজ ছেলে বিনয় সেন (পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক) বললেন, চলুন পুজার সময় কাশী ঘুরে আসি। বললাম, এই তো গতবছর কাশীতে তিন মাস থেকে এলাম। কাশীর তো সবই আমার দেখা। গত-বছরে সারনাথ দেখতে যাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা তাঁকে বললাম। সে এক রোমাঞ্চ-কর কাহিনী। নিরালা নির্জন স্থান। ছোট ছোট ইট দিয়ে গাঁথা, দাঁত বের করে অবহেলিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে ধামেক স্তূপ। পাশেই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক এককালে উৎখনিত মাটির তলায় প্রাচীন যুগের আবাসগৃহসমূহের কঙ্কাল। আর, সেখানেই পড়ে রয়েছে অশোকস্তম্ভের মাথাটা। চতুর্দিকেই বন-জঙ্গল, চলাফেরা করতে ভয় লাগে, কোথায় সাপ-টাপে কামড়াবে!

বিনয় সেনকে বললাম, আমি যাব না, আপনি একাই চলে যান। তারপর পীড়াপীড়ি করাতে যেতে সম্মত হলাম।

বাড়িতে ফিরে স্ত্রীকে বললাম, চল, কাশী যাই। কাশীতে ওর দিদিমা তখন কাশীবাস করছেন। বললাম, চল, দিদিমাকেও দেখে আসবে।

স্ত্রী বলল, না, আমি কাশী যাব না। এইতো দু'তিন বছর আগে দিদিমার অসুখের সময় মায়ের সঙ্গে কাশীতে গিয়ে একবছর থেকে এলাম। আমি যাব না।

অগত্যা আমি একাই কাশী গেলাম। কাশীতে আমার মাসীর বাড়ি। সেখানেই গিয়ে উঠলাম।

বিনয় সেন আগেই গিয়েছিলেন। আমাকে ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং পরের দিনই সকালে আমি বিনয় সেনের বাসার উদ্দেশে রওনা হলাম। বাসাটা খুব কাছেই, গোধুলিয়া ও বাঙালীটোলার কোণের বাড়িটা।

আমাকে দেখেই বিনয় সেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন, এ বাড়িটা কার জানেন? বললাম, না।

—গোপীনাথ কবিরাজের।

—তবে ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন।

বিনয় সেন আমাকে গোপীনাথ কবিরাজের কাছে নিয়ে গেলেন। দেখলাম, ঘরের মধ্যে চতুর্দিকেই বইয়ের স্তূপ। সেই বইয়ের স্তূপের ভেতর দিয়েই পাশ কাটিয়ে ওঁর কাছে গিয়ে পেঁছালাম।

বিনয় সেন আমার পরিচয় দিলেন। উনি আমাকে বসতে বললেন। আমিই কথা শুরু করলাম। বললাম, আপনার সম্বন্ধে আমি আমার মাস্টারমশাই ভাণ্ডারকারের কাছে অনেক কথা শুনেছি। কাশী এসেছি, সেজন্য আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

—কি শুনেছেন?

—ড. ভাণ্ডারকার বলেন যে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে উনি আপনার এম.এ. পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষক ছিলেন। ওই পরীক্ষায় তিনি আপনার ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে নবীনতম গবেষণার সঙ্গে গভীর পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন। শুনে তিনি হাসতে লাগলেন।

তারপর তিনি কাশীর সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ভিনিস সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, ভিনিস সাহেবের স্নেহ ও সদুপদেশ কীভাবে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়, সে-সব কাহিনী শুনালেন।

ভিনিস সাহেবের উপদেশেই উনি এম.এ. পাস করবার পর গবেষণার কাজে রত থাকেন। তারপর গবেষণা-পর্বের শেষে কাশী সংস্কৃত কলেজের অন্তর্ভুক্ত নবসৃষ্ট সরস্বতী ভবনের বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত

হন। পরে তিনি কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে অধ্যক্ষ পদে বৃত হন। সুতরাং আমি যখন ওঁর সংগে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন তিনি কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

চতুর্দিকে বইয়ের স্তূপ দেখেই বুঝেছিলাম যে দিনরাত উনি পড়াশোনাতেই মগ্ন থাকেন, এবং এক বিরাট পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

তাঁর এই বিরাট পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার ওঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' ও ভারত সরকার 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

যদিও ভারতীয় সংস্কৃতির সব বিষয়েই উনি গবেষণা চালিয়ে গিয়েছিলেন, তা হলেও তন্ত্র ও আগম সাহিত্য বিষয়ক রচনাই ওঁকে প্রামাণিক গ্রন্থকার হিসাবে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছিল।

উনি একজন সাধকও ছিলেন। ভারতের ৩৯ জন সাধকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ও মা আনন্দময়ী। পরবর্তী কালে যখন ওঁর সংগে মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছি, লক্ষ্য করেছি ওঁদের প্রতি ওঁর কী গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এরূপ একজন মানুষের সান্নিধ্যে এসে আমি সেদিন নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম।

সে-বৎসরই কাশীতে থাকাকালীন আমি আমার অভীপ্সিত আর এক বিরাট মনীষীর সংগে পরিচিত হয়েছিলাম। তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। নিয়মিত আমি তাঁর লেখা পড়তাম 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায়। তা ছাড়া, ১৯২৫ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত আমি যখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়াশোনা করতাম তখন তাঁর লিখিত রচনাবলী পড়ে আমি তাঁর নানা বিষয়ে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিধি দেখে অবাক হয়ে থাকতাম। জানি না, আর কোন বাঙালী ওঁর মত মুদ্রিত অক্ষরে অত রচনা করে গিয়েছেন কিনা। ওঁর রচিত 'বর্তমান জগৎ'-এরই পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫০০০-এর উপর। নিত্য বইখানার বিজ্ঞাপন দেখতাম সিনেমা-হলে পর্দার ওপর। বোধ হয়, এটাই একমাত্র বই যার বিজ্ঞাপন সিনেমার পর্দায় দেখানো হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন এক অতি মেধাবী ছাত্র। একই বছরে দু'টি বিষয়ে (ইংরেজি ও ইতিহাস) অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ঈশান স্কলার ছিলেন। এম.এ. পাস করবার পর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মালদহ শাখায় বহু বৎসর অধ্যাপনা করেছেন। মালদহে থাকাকালীন হরিদাস পালিতকে উৎসাহিত করেছিলেন 'আদ্যের গম্ভীরা' সম্বন্ধে গবেষণামূলক রচনা প্রকাশ করতে। (বিদেশে থাকাকালীন উনি এর ইংরেজি সংস্করণ বের করেছিলেন 'ফোক্ এলিমেণ্টস্ ইন ইণ্ডিয়ান কালচার' নামে)। মধ্যে বামনদাস বসু ও

শ্রীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত এলাহাবাদের 'পানিনি অফিস'-এর সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী ড. ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অনুপ্রেরণায় 'পজিটিভ ব্যাকগ্রাউন্ড অভ্ হিন্দু সোসিওলজি' নামে এক অনন্যসাধারণ পুস্তক রচনা করেছিলেন।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে বিশ্বপর্যটনে বেরিয়েছেন। এগারো বৎসর নানাদেশ পর্যটন করেছেন। বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ইংরেজি ও বাংলা ছাড়া, ৬টি ভাষায় অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিদেশী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিয়েছেন। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে আবার দেশে ফিরে এসেছেন।

এরূপ মানুষের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মনে গভীর শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত হয়। আমারও তাই হয়েছিল।

তাই কাশীতে থাকাকালীন যেদিন একটা হ্যান্ডবিল পেলাম যে বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে স্কুলবাড়ির প্রাঙ্গণে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বক্তৃতা দেবেন, সেদিন আনন্দে মনটা নেচে উঠল তাঁকে দেখতে পাব বলে।

স্কুলবাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে পাতা হয়েছে এক মস্ত বড় আসর। লোকে লোকারণ্য। আমি তার মধ্যেই একপাশে গিয়ে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরেই বিনয় সরকার মশাই এসে হাজির হলেন। ওঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হলাম। তার চেয়ে বেশী মুগ্ধ হলাম ওঁর বক্তৃতা শুনে। দেখলাম ওঁর এক মুদ্রাদোষ আছে। কিন্তু ওই মুদ্রাদোষই ওঁর বক্তৃতাকে মনোহর করে তোলে। বক্তৃতা দেবার সময় উনি কখনও এক নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। আসরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটোছুটি করেন।

বক্তৃতা শেষ হবার পর উনি যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন ওঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। সঙ্গে আছেন এক সুন্দরী জার্মান মহিলা। উনিই ওঁর স্ত্রী। অধ্যাপক সরকারকে বললাম, স্যার, আমার মনের মধ্যে অনেকদিনের পুঞ্জীভূত বাসনা আজ পূর্ণ হল আপনাকে দেখে ও আপনার বক্তৃতা শুনে। বললেন, কোথায় থাকা হয়? বললাম, কলকাতায়।

—তা হলে কলকাতায় ফিরে আমার সঙ্গে দেখা করবে আমার বাড়িতে। ৪৫-নং পুলিস হসপিটাল রোডে।

ꣻ ꣻ ꣻ

কলকাতায় ফিরে এসেছি। আবার কলেজ যাই। ক্লাস করি। ক্লাসের পর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের 'ফাইন আর্টস্ সেমিনারে' বসে আড্ডা দিই। আড্ডাটা

আমাদের প্রত্যহ দিতেই হত। আমাদের আড্ডার দলে ছিল চার জন—দেবপ্রসাদ ঘোষ, নীহাররঞ্জন রায়, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য ও আমি। দেবপ্রসাদ ঘোষ আমাদের চেয়ে এক বছর কি দু'বছরের সিনিয়র। সে তখন সেমিনারে বসেই রিসার্চ করত, 'ডেকরেটিভ মটিভস্ ইন ইণ্ডিয়ান আর্ট' সম্বন্ধে। ওটা ওর পি.আর.এস-এর থিসিস্ ছিল। কলেজে ঢুকবার পরই জেনেছিলাম, দেবপ্রসাদ হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ভাইপো। ওর বাবা ব্রাহ্ম হবার পর থেকেই মূল পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। ও'রা তখন থাকতেন সারকুলার রোডে কাসিমবাজার-রাজবাড়ির বিপরীত দিকে অ্যাণ্টনি বাগান লেনে। ওই বাড়িতে আমি বহুবার গিয়েছি। খুব ছোট্ট পরিবার। সংসারে ছিলেন দেবপ্রসাদবাবু ও ও'র বাবা। মা ছিলেন না। দেবপ্রসাদবাবুর বাবার সংগেও আমার পরিচয় হয়েছিল। ওই বাড়িতেই দেবপ্রসাদবাবুর বিয়ে হয়। ও'র বাবার শ্রাদ্ধও হয়। ওই বিয়ে এবং শ্রাদ্ধে উপস্থিত থেকেই আমি প্রথম ব্রাহ্ম-সমাজের বিবাহ ও শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের সংগে পরিচিত হই। দেবপ্রসাদবাবুর সংগে আমার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল।

পরে যখন দেবপ্রসাদবাবু আশুতোষ মিউজিয়ামের কিউরেটর নিযুক্ত হয়েছিলেন, তখন সেনেট হলের পিছনে অবস্থিত আশুতোষ মিউজিয়ামে গিয়েও ও'র সংগে আড্ডা দিয়ে এসেছি। আরও পরে যখন আশুতোষ মিউজিয়াম বিধান সরণীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিপরীত দিকের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তখন ওখানেও গিয়েছি।

আমাদের ফাইন আর্টস্ সেমিনারের আড্ডার আর দুজনেই আমার সহপাঠী ছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের সংগেই আমার বেশি অন্তরংগতা। কেননা, নীহার ছিল 'ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট'-এর সম্পাদক অমল হোমের জ্ঞাতিভাই। অমল হোমের পরিবারের সংগে আমার আলাপ নীহারের সংগে পরিচিত হবার অনেক আগে থেকে। অমল হোম থাকতেন আমার বাবার ডাক্তারখানার দু'চারখানা বাড়ির দক্ষিণে। অফিস যাবার সময় ট্রাম ধরবার জন্য এসে দাঁড়াতেন আমার বাবার ডিসপেন্সারির সামনে। গরমের দিনে এক এক দিন ট্রাম আসতে দেরি হলে, আমার বাবার ডিসপেন্সারিতে ঢুকে চেয়ারে বসতেন। সেখানেই আমার সংগে ও'র প্রথম আলাপ। তারপর ও'র বাড়ি যাওয়া ও ও'র পরিবারের সকলের সংগে হৃদ্যতা। ওখানেই পরিচিত হই ও'র মায়ের সংগে, ও'র ভাই চারু ও অজয়ের সংগে। অমল হোমকে আমি অমলদা বলতাম। পরে এটা সত্যিকারের বড়-ভাই ও ছোট-ভাইয়ের সম্পর্কে দাঁড়ায়। অমলদার রচিত দু'খানা বইয়ের আমিই ছিলাম প্রকাশক। প্রকাশক হিসাবে আমারই নাম তিনি ছেপেছিলেন বই

দু'খানাতে। আমার জীবনে অমলদার প্রভাব ছিল অনেকখানি। সে-সব কথা আমি পরে বলব।

নীহার অমলদার 'কাজিন' বলে, নীহারের সংগে আমার একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেমিনারে বসে আড্ডা দিতে দিতে হঠাৎ নীহার বলে উঠত, চল, পুঁটিরামের দোকান থেকে গরম কচুরি খেয়ে আসি। অবশ্য নীহারের পয়সাতে। কোন কোন দিন আবার আমরা পুঁটিরামের দোকানের পরিবর্তে 'বসন্ত কেবিন'-এ যেতাম। আবার গরমের দিনে কোন কোন দিন 'প্যারাডাইজ'-এ গিয়ে ঘোলের সরবত খেয়ে আসতাম।

একদিন দুপুরবেলা খুব বিপদে পড়ে, নীহারের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। গিয়েছিলাম বালিগঞ্জে ড. ভাণ্ডারকারের বাড়ি। ফেরবার সময় যথারীতি যদুবাবুর বাজারের সামনে এসে বাসে উঠলাম। পার্ক স্ট্রীটের কাছে এসে বাস্-কনডাক্টার ভাড়া চাহিল। পয়সা দিতে গিয়ে দেখলাম নীচের পকেটের কোণের সেলাইটা খুলে গিয়ে, সেই ফাঁক দিয়ে পয়সাগুলো সব পড়ে গিয়েছে। কনডাক্টারকে সব কথা বললাম। এসপ্লানেডের মোড়ে এসে, সে আমাকে নামিয়ে দিল। কি করি? হাঁটতে শুরু করলাম নীহারের মেসের উদ্দেশ্যে। নীহার তখন থাকতো মির্জাপুর স্ট্রীটে 'মিকাডো ক্লাব'-এ। নীহারের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরলাম।

'মিকাডো ক্লাব'-এর উল্লেখে মনে পড়ে গেল পরবর্তীকালের এক মজার ঘটনা। আমি তখন কলকাতা স্টক্ একস্চেঞ্জে 'অর্থনৈতিক উপদেষ্টা'র কাজ করি। আমার স্টেনোগ্রাফার ছিল গোপালচন্দ্র মিত্র। ও'র বাবা ছিলেন ফরিদপুর কলেজের প্রখ্যাত অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ মিত্র। তাঁর সুদক্ষ অধ্যক্ষতা সম্বন্ধে স্যাডলার কমিশন খুব প্রশংসাবাচক মন্তব্য করেছিল। কামাখ্যাবাবুকে আমি প্রথম দেখি, যখন তিনি গোপালের বিয়ের সময় আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন। অত্যন্ত বিনয়ী ও অমায়িক ভদ্রলোক।

হ্যাঁ, এবার মিকাডো ক্লাবের সেই মজার কথাটা বলি। একদিন স্টক্ একস্চেঞ্জ অফিসে আমার শ্যালক সিদ্ধেশ্বর আমার সংগে দেখা করতে এসেছে। সে প্রায়ই আসত। সেজন্য গোপালের সংগে তার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। একদিন কথায় কথায় সে গোপালকে বলল, জানেন গোপালবাবু, একসময় অতুল অসাধারণ খেতে পারত। অতুলের বিয়ের পর ওদের বাড়ির ঝি এসে গোপনে আমাদের বলে গিয়েছিল, জামাইকে যদি নেমন্তন্ন করেন তো, তা হলে জামাইয়ের জন্য কুড়ি গণ্ডা লুচি তৈরি করবেন।

তখন গোপাল বলল, তবে শুনুন আমার কথা। কলকাতায় এসে আমি ও

আমার ছোট ভাই মেনা, দু'জনে প্রথম উঠেছিলাম 'মিকাডো ক্লাব'-এ। রাত্তিরে আমি খেয়েছিলাম আট গণ্ডা রুটি ও আমার ছোট ভাই দশ গণ্ডা। পরদিন সকালবেলা ম্যানেজার আমাদের ঘরে এসে হাজির। আমরা যে টাকা অগ্রিম জমা দিয়েছিলাম, তা ফেরত দিয়ে, হাতজোড় করে আমাদের হোটেল ছেড়ে যেতে বলল!

হ্যাঁ, নীহারের কথা বলতে বলতে অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। নীহারের কথাই বলি।

নীহার পরে থাকত 'রূপবাণী' সিনেমার পাশে রাজা রাজকিষেণ স্ট্রীটে স্বামী অভেদানন্দের আশ্রমের ওপর-তলার একটা ঘরে। তখন সে ঘন ঘন অমলদার বাড়ি আসত, এবং আমার খোঁজ করতে এসে আমার বাবার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। যখন সে "লিবার্টি" পত্রিকার রবিবাসরীয়ের সম্পাদক হয়েছিল, তখন আমার কাছ থেকে লেখার প্রয়োজন হলে, আমার বাবাকেই সে-কথা বলে যেত। নীহারের প্রসঙ্গে আমি পরে আবার ফিরে আসব। এখন আমাদের আড্ডার তৃতীয় জন শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যের কথা কিছু বলব।

শ্যামাচরণ ছিল আমার প্রতিবেশী। দীনেশবাবুর বাড়ির নম্বর ছিল ৭, আর শ্যামাচরণের, একখানা বাড়ি পরে, ৫-নং বিশ্বকোষ লেনে। এক-পাড়ার ছেলে বলে, ছেলেবেলা থেকেই আমাদের দু'জনের মধ্যে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। পথে লোক সব-সময়েই আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখত। সেজন্য পাড়ার লোক ঠাট্টা করে আমাদের 'ডিপ্থং' বলত। শ্যামাচরণের বাবা ছিলেন বাঙলাদেশের একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। নাম দক্ষিণাচরণ স্মৃতিরত্ন। উনি ছিলেন মহেশ ন্যায়রত্ন মশাইয়ের বংশের লোক। কলকাতার সমস্ত অভিজাত পরিবারেই ওঁর পরিচিতি ছিল। প্রত্যহই উনি পণ্ডিতবিদায়ে বেরুতেন, এবং একগাদা দানসামগ্রী নিয়ে আসতেন। বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, এবং খানিকটা স্থবিরত্বও এসে গিয়েছিল। সেজন্য, যখনই তিনি বেরুতেন সঙ্গে থাকত তাঁর প্রিয় ছাত্র কালীপদ তর্করত্ন। আমরা তাঁকে কালীপণ্ডিত মশাই বলতাম। কালীপণ্ডিত মশাই দক্ষিণাবাবুর বাড়িতেই থাকতেন। ওই বাড়ির সামনেই ছিল একখণ্ড জমি। জমিটা ছিল বাগবাজারের পশুপতি বসুদের। পশুপতিবাবুর ছেলে কালী বসুর (নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের জামাতা) সৌজন্যে কালীপণ্ডিত মশাই ওই জমিটা সংগ্রহ করে, ওখানে স্থাপন করেছিলেন এক চতুষ্পাঠী, নাম পশুপতি চতুষ্পাঠী। ওটাই ছিল 'ক্যালকাটা সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশন'-এর সদর অফিস। যারা আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা দিত, তারা সকলে ওখানে এসেই পরীক্ষার ফি ও ফরম জমা দিয়ে যেত। ওখান থেকেই আবার তারা পরীক্ষায় সাফল্যের অভিজ্ঞানপত্র

নিয়ে যেত।

বিখ্যাত পণ্ডিতের ছেলে বলে, শ্যামাচরণ বিনা বেতনে সংস্কৃত কলেজে পড়বার সুযোগ পেয়েছিল, এবং ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস করেছিল। তারপর আমরা দু'জনে একসংগে বৃত্তি করে 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' পড়বার জন্য এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম। প্রথম শ্রেণীতে প্রথন স্থান অধিকার করে সে এম.এ. পাস করেছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণপদক পেয়েছিল।

আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে আর একজন ছিলেন প্রবোধচন্দ্র সেন। (পরে বিশ্বভারতীর আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন)। বয়সে উনি আমাদের চেয়ে সাত বছর বড় ছিলেন, এবং সেজন্য একটা বয়সোচিত গাম্ভীর্য বাজায় রাখতেন। প্রথম দিন ও'র ক্লাসে ঢুকবার সময় বেশ একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। আমরা তো প্রথম দিন আমাদের মাস্টারমশাইদের কারুকে চিনতাম না। সেজন্য প্রথম দিন বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবোধবাবু যখন ক্লাসে ঢুকলেন, তখন আমরা ও'কে কোন অধ্যাপক ভেবে সব দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। অধ্যাপকের ক্লাসে ঢুকবার সময়, তাঁর সম্মানার্থে ছাত্রদের দাঁড়িয়ে ওঠাই তৎকালীন রীতি ছিল। এখন এ রীতি আছে কিনা জানি না।

তারপর প্রবোধবাবু ক্লাসে ঢুকে যখন আমারই পাশে এসে বসলেন, তখন আমরা আমাদের ভুলটা বুঝতে পারলাম।

উনি বরাবর আমারই পাশে বসতেন। একে বয়সে বড়, তারপর ও'র অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতি দেখে, আমরা ও'র সংগে বিশেষ মেলামেশা করতাম না। তবে আমার স্বভাব তো ছিল সবসময়েই সকলের সংগে মেলামেশা করা। সেজন্য একদিন গিয়েছিলাম ও'র মেসে। মেসটা ছিল, পুবমুখো হয়ে মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে ঢুকে খানিকটা এগিয়ে গেলেই বাঁ দিকে প্রশস্ত প্রাঙ্গণযুক্ত এক মস্ত বাড়িতে। কিন্ত সেখানেও ও'কে গম্ভীর দেখে, ও'র সংগে মেলামেশা করার আশাটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ক্লাসে যদিও উনি আমার পাশেই বসতেন, তা হলেও বিশেষ কোন কথাবার্তা বলতেন না। দেখতাম, যে-খাতায় উনি ক্লাসে নোট নিতেন, সে-খাতায় নানারকম যতিচিহ্ন আঁকা। প্রথম ভেবেছিলাম উনি বোধ হয় কলেজের কোন ছাত্রকে পড়ান, এবং খাতায় আঁকা যতিচিহ্নগুলি Prosody পড়াবার নিদর্শন। একে বয়সে অনেক বড়, তারপর আমার পাশে এসে খুব গম্ভীরভাবে বসতেন, সেজন্য ও'কে সরাসরি কিছু জিজ্ঞাসা করবার সাহস হত না। সহপাঠী একজনকে ও'র কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে কিছুই বলতে পারল না। একদিন নীহারকে জিজ্ঞাসা করলাম। নীহার বলল, উনি ছন্দের চর্চা করেন।

তারপর কত বছর কেটে গেল। শান্তিনিকেতনের একজন প্রবোধচন্দ্র সেনের

কথা প্রায়ই শুনি। কিন্তু তিনি তো ওখানে বাংলার অধ্যাপক। সুতরাং তিনিই যে আমাদের সহপাঠী প্রবোধচন্দ্র সেন, তা কোনদিনই ভাবিনি! কেননা, আমাদের সহপাঠী তো ছিলেন পুরাতত্ত্বের ছাত্র। আর ইনি তো বাংলার অধ্যাপক।

ভুলটা ভাঙল সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে। একদিন একখানা চিঠি পেলাম শান্তিনিকেতনের আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন মশাইয়ের কাছ থেকে। চিঠিতে উনি লিখেছেন, আপনি আপনার লিখিত 'প্রি-হিস্ট্রি অ্যান্ড বিগিনিংস অভ্ সিভিলিজেশন' বইখানার এক কপি আমাকে ভি.পি. করে পাঠিয়ে দেবেন। দেখলাম, উনি আমার 'হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অভ্ বেঙ্গল' বইখানা পড়েছেন। বুঝলাম, ভদ্রলোকের পুরাতত্ত্বে অনুরাগ আছে। তখনই সন্দেহ হল, তবে কি ইনিই আমাদের সেই সহপাঠী প্রবোধচন্দ্র সেন? যে বইখানা উনি চেয়েছিলেন, তার এক কপি ওঁকে সৌজন্যের সঙ্গে উপহার পাঠালাম। পত্রে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ১৯২৫-১৯২৭ সময়কালের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি'র ছাত্র ছিলেন? ওঁর কাছ থেকে একখানা ইতিবাচক উত্তর পেলাম। জানালাম, তবে তো আপনি আমার সহপাঠী।

এর কিছুদিন পরেই একদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে আমার সহকর্মী ও 'আনন্দবাজার'-এর বার্তা-সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী আমার ঘরে এসে জানালেন যে প্রবোধবাবু কলকাতায় ওঁর মেয়ের বাড়ি এসেছেন এবং আগামী কাল উনি আনন্দবাজার' অফিসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। (অমিতাভ চৌধুরীর 'সংবাদের নেপথ্যে' পুস্তক দ্রঃ)।

পরদিন অমিতাভ চৌধুরী প্রবোধবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। বহুকাল পরে আমাদের পুনর্মিলন। দু'জনেই আবেগে অভিভূত। পুরোনো দিনের অনেক কথাই হল। উনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন ওঁর লেখা একখানা বই, আমাকে উপহার দেবার জন্য। বইখানা সদ্যপ্রকাশিত 'ভারতাত্মা কবি কালিদাস'।

কয়েকদিন পরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে 'ভারতাত্মা কবি কালিদাস'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। গেলাম সেখানে। প্রবোধবাবুর সঙ্গে ছিলেন ওঁর স্ত্রী রুচিরা দেবী। প্রবোধবাবু আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন। তারপর থেকেই পরস্পরের মধ্যে জড়াজড়ি ও চিঠি-লেখালেখি। ওঁকে শেষ দেখে এসেছি ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে। আমার হৃৎপিণ্ডের আংশিক বৈকল্যের কথা উনি জানতেন। সেজন্য ঝুঁকি নিয়ে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত যেতে উনি আমাকে মানাই করেছিলেন। কিন্তু আমি গেছি দেখে উনি অভিভূত হয়ে বিছানা থেকে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। দুজনের মনই তখন আনন্দে পরিপূর্ণ।

অনেক কথা হল। পরের দিনও আমরা মিলিত হলাম। কথাপ্রসঙ্গে আবেগের বশীভূত হয়ে উনি বললেন, 'অতুল সুর মারা গেলে, বাঙলাদেশে আর দ্বিতীয় অতুল সুর জন্মাবে না'। সহৃদয় বন্ধুর এই শ্লাঘা সমৃদ্ধ উক্তিতে আমি কৃতজ্ঞ-চিত্তে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ꕥ ꕥ ꕥ

আবার শহরের কথাতেই ফিরে আসছি। আগেই বলেছি যে আমাদের ছেলেবেলায় শহরে যানবাহন বলতে ছিল পালকি, ছ্যাকড়া গাড়ি ও ট্রাম। তারপর এল মোটর গাড়ি। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এল রিকশা, এবং ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাস। শহরের বাস প্রবর্তনের ইতিহাসটা খুব চাঞ্চল্যকর। এটা প্রবর্তন করেছিল ওয়ালফোর্ড ট্রানসপোর্ট কোম্পানি, মাত্র তিনখানা মাথাখোলা দোতলা বাস নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম কোম্পানি ওয়ালফোর্ড কোম্পানির নামে মামলা দায়ের করে দিল। ওদের অজুহাত কলকাতা শহরে পরিবহণ সম্বন্ধে ওদেরই একচেটিয়া অধিকার। অনেকদিন মামলা চলেছিল। শেষে ট্রাম কোম্পানি হেরে যায়। কিন্তু মামলা লড়তে গিয়ে ওয়ালফোর্ড কোম্পানি সর্বস্বান্ত হয়ে যায়, এবং তাদের বাস সার্ভিস তুলে দেয়। তারপর অনেক বাঙালী আসে বাসের ব্যবসায়ে। তারা তাদের বাসগুলোর নাম দেয় 'কিন্নরী', 'উর্বশী' ইত্যাদি। কিন্তু তারা বাস চালাতে পারল না। তারপর বাসের ব্যবসাটা সম্পূর্ণ পাঞ্জাবীদের হাতে চলে যায়।

এদিকে বাসওয়ালাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য ট্রাম কোম্পানিও বাস-সার্ভিস প্রবর্তন করল—শ্যামবাজার থেকে আলমবাজার ও শিয়ালদহ থেকে বেলিয়াঘাটা পর্যন্ত। কিন্তু ট্রাম কোম্পানি বেশীদিন বাস-সার্ভিস চালাতে পারল না। পরিশেষে বাসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য তারা সারকুলার রোডে (পরবর্তীকালের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) ট্রাম লাইন পাতল। তখনই শ্যামবাজার গ্যালিফ স্ট্রীট থেকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত নতুন সার্ভিস প্রবর্তিত হল।

এই সময়েই মেয়ে স্কুলের গাড়িগুলো বাস-এ পরিণত হল।

ꕥ ꕥ ꕥ

বিশের দশকেই ছিল আমাদের ছাত্রজীবন, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ সময়-

কালটা ছিল দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক চাঞ্চল্যকর যুগ। সেজন্য আমরা যে খুব শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে লেখাপড়া করতে সক্ষম হয়েছিলাম তা নয়। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আমাদের মনে প্রায়ই উত্তেজনা সৃষ্টি করত। অসহযোগ আন্দোলন তো পুরোদমেই চলছিল। তার মধ্যেই ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলেন শাসন সংস্কার। সব প্রদেশেই গঠিত হবে বিধান সভা, সাধারণ নির্বাচনের ভিত্তিতে। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে গয়া কংগ্রেসে মতিলাল নেহেরু প্রস্তাব করলেন, পাঞ্জাব ও খিলাফতের প্রতিকারের জন্য ও আশু স্বরাজ্যলাভের উপায় হিসাবে অসহযোগ আন্দোলনের নেতাদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত। কিন্তু এই নিয়ে হল বাগ্‌বিতণ্ডা। তা সত্ত্বেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাঙলার সদস্যরা স্থির করল তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং বিধানসভার মধ্যেই নির্বাচিত সদস্যরা আন্দোলন পরিচালনা করবেন স্বরাজ্য-লাভের জন্য। নতুন দল সৃষ্ট হল। নাম হল 'স্বরাজ্য পার্টি'। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হল, 'স্বরাজ্য পার্টি' কংগ্রেসেরই অংগ হিসাবে বিধানসভার মধ্যে স্বীয় কার্যক্রম অনুসরণ করে চলবে।

ওই ১৯২৩ সালের এপ্রিল-মে মাসে আমরা ছাত্রসমাজ বিচলিত হয়ে পড়লাম হুগলী জেলে কাজি নজরুল ইসলামের অনশনে। জেল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে কাজিসাহেব অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিলেন। অনশন ৪১ দিন স্থায়ী হয়েছিল। শেষের দিকে তাঁর অবস্থা এমন সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল যে প্রতি মুহূর্তেই আমরা আশঙ্কা করছিলাম, যে-কোন মুহূর্তে দুঃসংবাদ আসতে পারে।

এদিকে বিধানসভার মধ্যে 'স্বরাজ্য পার্টি' ব্রিটিশ সরকারকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করে তুলল। আমরা খবরের কাগজে জ্বালাময়ী বক্তৃতাগুলো পড়তাম ও যথেষ্ট উদ্দীপনা পেতাম। এসময় দেশের মধ্যে প্রবাহিত হল এক অনির্বাণ স্বদেশপ্রেমের উদ্বেল-লহরী। তার প্রমাণ পেলাম যখন হাওড়া স্টেশনে গেলাম, ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি মতিলাল নেহেরুকে দর্শন করতে। এরকম শোভাযাত্রা, এরকম ভীড় জীবনে আর কখনও দেখিনি। ৩৪ ঘোড়ার গাড়ি করে মতিলালকে শহরে নিয়ে আসা হল। দু'হাজার সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক, পাঁচশত মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা, অশ্বারোহী দল, পদাতিক দল নিয়ে শোভাযাত্রা গঠিত হয়েছিল। সকলেই সামরিক পোশাক পরিহিত। একদিকে বিউগলের শব্দ, অপরদিকে গগনভেদী 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! রাস্তার দু'-ধারে বড় বড় বাড়িগুলোর অলিন্দ থেকে মেয়েরা পুষ্পবর্ষণ করছে ও শঙ্খধ্বনি করছে। আর বিরাট জনসমুদ্র 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করছে।

দেশের লোকের এই দুর্বার স্বদেশপ্রেমের আবহাওয়ার মধ্যেই ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দেব লাহোর কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হল যে অতঃপর পূর্ণ-স্বাধীনতা-লাভই কংগ্রেসের পরম ও চরম লক্ষ্য হবে।

এরপর দেশের সর্বত্রই মেয়ে-পুরুষ সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বাধীনতা-সংগ্রামে। আইন আমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে গেল।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে গান্ধিজী আইন অমান্যের শরিক হয়ে লবণ তৈরীর জন্য যাত্রা করলেন তাঁর ডাণ্ডী অভিযানে। লবণ তৈরীর আন্দোলন দেশেব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। কাঁথিতে পুলিশ অমানুষিক অত্যাচার করল গ্রামবাসীদের ওপর। খবরের কাগজে লেখা হল "কোন সভ্য গভর্নমেণ্ট যে এরকম অত্যাচার করতে পারে, তা কল্পনার বাইরে ছিল'। কিন্তু পরের বছরে পুলিশের অত্যাচার তুঙ্গে উঠল তমলুকে। হাজার হাজার লোককে পুলিশ নির্দয়ভাবে প্রহার করল। ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে ভগ্নস্তূপে পরিণত করল। মাঠের শস্য নষ্ট করল। দু-এক টাকা ট্যাক্সের জন্য গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠিত হল। মন্দির অপবিত্র করা হল। বিগ্রহ ভাঙ্গা হল। মেয়েদের অবমাননা করা হল। বন্দুকের গুলিতে অনেককে হতাহত করা হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশবাসী দৃঢ় ও অটল থেকে তাদের কর্তব্যপথ থেকে বিচ্যুত হল না।

বড়বাজারে মেয়েরা পিকেটিং শুরু করল। পুলিশের হাতে তারা নির্যাতিত হল। হাসিমুখে সকলে কারাবরণ করল।

বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়িতে এক বিরাট মিটিং হল। সভাপতিত্ব করলেন সরোজিনী নাইডু। দেশের সর্বত্রই তকলি-হাতে সকলে সুতো কাটতে আরম্ভ করল। পশুপতি বসুর দ্বিতীয়পক্ষের বড় ছেলে ভুঁড়ে নিজেদের ঠাকুরদালানে একটা তাঁত বসালো। আমি ও আমার স্ত্রী যা সুতো কেটেছিলাম, তা দিয়ে ভুঁড়েব তাঁতে দু'খানা শাড়ি ও ধুতি বুনিয়ে নিয়ে এলাম।

১১১

এসময় কংগ্রেসের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে বামপন্থী বিপ্লবী দল। চট্টগ্রাম ও ঢাকা তাদের লীলাকেন্দ্র হয়। চট্টগ্রামে এই দলের নেতা ছিল সূর্য সেন বা 'মাস্টারদা'। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে সে যখন বহরমপুর কলেজে বি.এ. পড়ত, তখনই সে এক গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য হয়। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে গান্ধিজী যখন এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন, তখন সূর্য সেন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। কিন্তু গান্ধিজীর প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হওয়ায়, সূর্য সেন আবার তার বিপ্লবী

কার্যকলাপ শুরু করে। তার সংগী হয় অম্বিকা চক্রবর্তী, অনুল সেন, নির্মল সেন, অনন্ত সিং, দেবেন দে, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে এই দল চট্টগ্রাম শহরের একপ্রান্তে সরকারী রেলের টাকা লুঠ করে। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার পুলিস কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করবার চেষ্টা করে। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল তারিখে ৬৫ জন অসীম সাহসী যুবককে নিয়ে সূর্য সেন দুটি অস্ত্রাগার ও পুলিস লাইন এবং ডাক ও তার অফিস একযোগে আক্রমণ করে দখল করে। তার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম শহর ৪৮ ঘণ্টার জন্য ইংরেজশাসনমুক্ত ও স্বাধীন থাকে। পরে তারা শহর ছেড়ে জালালাবাদ পাহাড় অঞ্চলে চলে যায়। গুপ্তচরের মুখে খবর পেয়ে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী তাদের সেখানে ঘিরে ফেলে। সারাদিন তারা সেন্যবাহিনীর সংগে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। পরে তারা আত্মগোপন করে। কিন্তু এক জ্ঞাতিভাইয়ের (নেত্য সেন) বিশ্বাসঘাতকতায় সূর্য সেন গৈরালা গ্রামে ধরা পড়ে ও তার ফাঁসি হয়। এই দলের অন্যতমা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারই প্রথম মহিলা যে সশস্ত্র বিপ্লবে যোগ দিয়ে পাহাড়তলী ইওরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল।

ঢাকায় যে বিপ্লবীদল গঠিত হয়েছিল, তার নাম ছিল বি.ভি. বা বেংগল ভলান্টিয়ারস্। এই দলের নেতা বিনয় বসু ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ২৯ আগস্ট তারিখে ঢাকার কুখ্যাত পুলিস অফিসার লোম্যানকে হত্যা করে। চার মাস আত্মগোপন করে থাকবার পর তারা পুনরায় আবির্ভূত হয় ৮ ডিসেম্বর তারিখে কলকাতায়। বিনয়ের সংগে ছিল বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত। তারা রাইটার্স বিল্ডিং এর মধ্যে ঢুকে কারাবিভাগের ইনস্পেকটর-জেনারেল কর্নেল সিমসনকে হত্যা করে। পুলিস তাদের ঘিরে ফেললেও, তারা ধরা না দিয়ে অসীম বীরত্বের সংগে লড়াই চালিয়ে যায় পুলিসের সংগে। পরের দিন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা এই লড়াইয়ের নাম দেয় 'ভেরান্ডা ব্যাটল্' বা অলিন্দ যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত তারা লড়ে যায়। কিন্তু গুলি ফুরিয়ে গেলে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে তারা পটাসিয়াম সায়নাইড খায়। খাবার সংগে সংগেই বাদলের মৃত্যু হয়। বিনয় হাসপাতালে মারা যায়। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য দীনেশকে সরকার বহু চেষ্টা করে বাঁচিয়ে তোলে। কিন্তু কোন স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারে না। বিচারে দীনেশের ফাঁসি হয়।

১১১

বিপ্লববাদীদের কর্মকাণ্ডের ফলে পুলিসের তৎপরতা খুব বেড়ে যায়। চতুর্দিকেই তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দয়া করে তারা একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আমাদের 'ফিজিক্যাল কালচার' ক্লাবের ওপর! আমাদের ক্লাবটা ছিল কালীপণ্ডিত মশাইয়ের চতুষ্পাঠীর দাওয়ার সামনে যে খোলা জায়গাটা পড়ে ছিল, সেখানে। আমাদের ক্লাবের বৈশিষ্ট্য ছিল, আমরা মাত্র 'ওয়েটলিফ্‌টিং' প্র্যাকটিস করতাম। কলকাতায় 'ওয়েটলিফ্‌টিং' প্রবর্তন করেছিল চিট্‌ টুন নামে মেডিকেল কলেজের এক ব্রহ্মদেশীয় ছাত্র। সুন্দর, লম্বা ও বলিষ্ঠ চেহারা ছিল চিট্‌ টুনের। ক্রীক রোডে থাকত। আমরা ওর বাড়িতে প্রায় যেতাম। চিট্‌ টুনও দু-একবার আমাদের ক্লাবে এসেছে। চিট টুনের কোন ক্লাব-ট্লাব ছিল না। সে নিজের বাড়িতে ব্যক্তিগত-ভাবেই 'ওয়েটলিফ টিং' প্র্যাকটিস্‌ করত। সংস্থা হিসাবে 'ওয়েটলিফ্‌টিং ক্লাব' আমরাই প্রথম করি। ক্লাবটা গড়ে তুলেছিলাম আমি ও আমার সহপাঠী শ্যামাচরণ। সম্পূর্ণ আমাদেরই উদ্যোগ। আমাদের দুজনের পয়সাতেই কেনা হয়েছিল ক্লাবের সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম। 'ওয়েটলিফটিং'-এর একমাত্র ক্লাব বলে, আমাদের ক্লাবে কলকাতার সব প্রান্ত থেকেই ছেলেরা আসত। যারা নিয়মিত প্র্যাকটিস্‌ করতে আসত, তাদের মধ্যে ছিল, রাজবল্লভপাড়া থেকে অ্যাটর্নি হরিপদ দত্তর ছেলে জ্ঞান দত্ত জ্ঞান দত্তই ছিল আমাদের ক্লাবের সেরা ওয়েটলিফ্‌টার। সে-ই ছিল আমাদের গর্ব। জ্ঞান দত্ত পরে পুলিসের চাকরিতে ঢুকেছিল এবং ডেপুটি কমিশনার অভ্‌ পুলিস হয়েছিল। আরও আসত বৌবাজার জেলেপাড়া থেকে শ্যাম আঢ্যি, নিকাশীপাড়া থেকে সুধীর দাস, বাগবাজার মারহাট্টা ডিচ লেন থেকে গোবিন্দ চাটুজ্যে, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট থেকে রাকা বাঁড়ুজ্যে, কম্বুলিটোলা থেকে অনাথ মুখুজ্যে, রাধাকান্ত জিউ স্ট্রীট থেকে আনন্দবাজারের প্রফুল্ল সরকারের ছেলে অশোক সরকার, দক্ষিণ কলকাতা থেকে কেরলের ছেলে গোবিন্দম্‌। এই গোবিন্দম্‌ই পরবর্তীকালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসের সন্নিকটে 'আনন্দ টেলারিং' নামে একটা দোকান করেছিল।

আমাদের ক্লাবের ছেলেদের 'ওয়েটলিফ্‌টিং' দেখবার জন্য কলকাতার নানা ক্লাবের ছেলেরা আসত। গড়পাড় থেকে বিষ্টু ঘোষ আসত। বিষ্টুরও একটা নামজাদা ক্লাব ছিল। তবে বিষ্টুর ক্লাবের বৈশিষ্ট্য ছিল 'মাস্‌ল কনট্রোল' করা। বিষ্টুও যেমন আমাদের ক্লাবে আসত, আমরাও তেমনই বিষ্টুর ক্লাবে যেতাম, ওর ছেলেদের 'মাস্‌ল কনট্রোল' দেখবার জন্য।

যাক, যে কথা বলছিলাম, সন্ত্রাসবাদের প্রাদুর্ভাবের সময় আমাদের ক্লাব

পুলিসের নেকনজরে পড়েছিল। আমাদের ক্লাবের পূর্বদিকে বিশ্বকোষ লেনের যে সরু গলিটা ছিল, ওই গলিটায় দাঁড়িয়ে অনেক লোক আমাদের 'ওয়েটলিফ্‌টিং' দেখত। পুলিসের লোক তাদের মধ্যেই মিশে থাকত। পুলিসের লোকের বিশেষ নজর ছিল দু'জন লোকের ওপর। পণ্ডিতমশাইয়ের চতুষ্পাঠীর দাওয়ার ওপর পাতা ছিল একখানা তক্তাপোশ। এরা দু'জনে ওই তক্তাপোশের ওপর বসে থাকত। একজন প্রৌঢ়, খদ্দরের জামা-কাপড় পরা, আর দ্বিতীয়জন বৃদ্ধ। পুলিসের লোক প্রথম তাদের চিনত না। কিন্তু যখন জানতে পারল যে ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হচ্ছেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র তুষারকান্তি ঘোষ মশাইয়ের মামা হরিমোহন বিশ্বাস ও ওই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি হচ্ছেন শিল্পী যামিনী রায়, তখন পুলিসের তৎপরতা অনেকটা কমে গেল।



যামিনদার সঙ্গে তখন আমাদের খুবই অন্তরঙ্গতা। যামিনদা আগে থাকতেন শ্যামবাজার স্ট্রীটে আমারই শ্বশুরদের ফ্লাটবাড়িগুলোর একটা বাড়ির ফ্লাটে। যামিনদা বরাবরই লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসতেন। তখন যামিনদার মেলামেশার কেন্দ্রস্থল ছিল শ্যামবাজার স্ট্রীটে কৃষ্ণরাম বসুর বাড়ির ফটকের প্রবেশপথের মুখে বাঘাবাবুর আড্ডায়। বাঘাবাবু ইনসিওরেন্সের কাজ করতেন। বেশ আড্ডা জমাতেন রোজ সকালে। ওখানে যামিনদা ছাড়া, আরও অনেকে আসতেন। তাদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন কলকাতার বিখ্যাত 'কমার্সিয়াল আর্টিস্ট' ও 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার আর্টিস্ট পূর্ণ সেন।

শ্যামবাজার স্ট্রীট থেকে যামিনদা উঠে আসেন বিশ্বকোষ লেনের ৬নং বাড়িতে। আগেই বলেছি যে বিশ্বকোষ লেনের ৮নং বাড়িটা ছিল 'বিশ্বকোষ'-এর নগেন্দ্রনাথ বসুর, ৭নং বাড়িটা দীনেশচন্দ্র সেনের ও ৫নং বাড়িটা আমার বন্ধু শ্যামাচরণের। মাঝখানে ৬নং বাড়িটাই ছিল ভাড়াবাড়ি। ওই বাড়িটা তৈরি হবার পর একে একে যারা ভাড়াটিয়ারূপে এসেছিল, তারা সকলেই আমাদের কৌতূহলের বিষয় ছিল। প্রথম ভাড়া আসে এক সুবর্ণবণিক পরিবার। ওই পরিবারের মেয়েরা ছিল অত্যন্ত শুচিবাইগ্রস্ত। ওদের বাড়ি যে ওড়িয়া ঠাকুর রান্না করত সে প্রায়ই আমাদের কাছে এসে অনুযোগ করত, বাবু, ও বাড়িতে আর আমার চাকরি করা সম্ভবপর হবে না। আমরা জিজ্ঞাসা করতাম, কেন, কি হল ঠাকুর ?

—আর বলেন কেন ? রাঁধব, না, দিনরাত চোখ বুজে থাকব ? বাড়ির মেয়েরা

রান্নাঘরে ঢুকবেন, কখনও কাপড় পরে ঢুকবেন না। এটা দিতে আসছেন, ওটা দিতে আসছেন, আর প্রতি ক্ষেপেই বলছেন, ঠাকুর একবার চোখটা বুজোও তো! এ অবস্থায় ওখানে কি করে কাজ করি বলুন ?

ওরা চলে গেলে, ভাড়াটিয়ারূপে ওখানে আসে কলকাতার বাসের এক বিখ্যাত পাঞ্জাবী মালিক ও তার সঙ্গী সাগরেদগণ। ন্যূনপক্ষে পনেরো-বিশটা পরিবার। আমরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম, ও বাড়িটায় তো মোট তিনখানা ছোট ছোট ঘর—ওরা থাকে কি করে? একদিন ওই বাড়িটাতে হল এক অ্যাক্সিডেন্ট। একটা বাচ্ছা ছেলে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। বাড়িতে কোন পুরুষমানুষ নেই। মেয়েরা আর্তনাদ করে উঠল। আর্তনাদ শুনে আমাদের ক্লাবের ছেলেরা ছুটে গেল। আমরা তো দেখে অবাক। প্রতি ঘরে এক-খানা তক্তাপোশের ওপর আর একখানা তক্তাপোশ। এরকমভাবে একটার ওপর আর একখানা করে পাঁচ ছয়খানা তক্তাপোশ। প্রতিরাত্রে এক একখানা তক্তাপোশে এক-একটা পরিবার শোয়! এরকম একটা তক্তাপোশের ওপরতলা থেকে বাচ্ছাটা পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

তার পরের ভাড়াটিয়া যামিনদা। যামিনদার জীবনের সেটা হচ্ছে এক সন্ধিক্ষণ। সঙ্কটময় যুগও বটে। যামিনদার পসার ছিল বিলাতী শিল্পরীতিতে 'প্রোট্রেট' আঁকায়। তখন দেশের সর্বত্র চলছে আইন-অমান্য আন্দোলন। যামিনদা দিনরাত পড়ছেন গান্ধীজীর 'হিন্দ্ স্বরাজ'। যতই পড়ছেন, ততই মস্‌গুল হয়ে উঠছেন বিদেশী-বিদ্বেষে। ঘোষণা করে দিয়েছেন, তিনি আর বিলাতী শিল্পরীতিতে ছবি আঁকবেন না। কিন্তু ঘোষণা করলে কি হবে? অনেকের কাছ থেকেই ছবি এঁকে দেবেন বলে আগাম টাকা নিয়েছেন। সবই খরচ করে ফেলেছেন। 'প্রোট্রেট' আর আঁকবেন না, এই সিদ্ধান্ত নেবার আগে যার যতটুকু ছবি এঁকেছিলেন, সেই অবস্থাতেই সেগুলো অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। কোনখানাতে ক্যান্‌ভাসের ওপর মাত্র চৌকো ঘর টেনেছেন, কোনখানাতে মুখটা মাত্র এঁকেছেন, কোনটাতে মাত্র কাঁধ পর্যন্ত। এরকম অনেক ছবি যামিনদার চিত্রশালাতে পড়ে ছিল। যাদের কাছ থেকে আগাম টাকা নিয়েছেন, তারা এসে যামিনদাকে যা-তা বলে। যামিনদা হেসে হেসে মিষ্টিকথা বলেন। তারা আবার সবাই চলে যায়। হেসে হেসে মিষ্টিকথা বলাই ছিল যামিনদার বৈশিষ্ট্য।

যামিনদার ঘরে তাঁর নিত্য সহচর ছিলাম আমি ও আমার বন্ধু শ্যামাচরণ। যামিনদার ওখানেই আমরা পরিচিত হই যামিনদার বন্ধুদের সঙ্গে—শিশির-কুমার ভাদুড়ী, রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী, শিল্পী অতুল বসু প্রমুখদের সঙ্গে। কিন্তু যামিনদা কারুর কাছেই নিজের সঙ্কটের কথা

বলেন না। যামিনদার তখন সবচেয়ে বেশী অন্তরঙ্গতা, আমার ও শ্যামাচরণের সঙ্গে। সঙ্কট শুধু আমাদের কাছেই গোপন করেন না। আমি তখন ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের তাড়নায় শ্যামবাজারের পুরোনো বাড়ি ছেড়ে ২নং বৃন্দাবন পাল লেনের এক অংশে থাকি। আমার পাশের অংশেই থাকে চিন্তামণি কর। সে তখন আর্ট স্কুলের ছাত্র। তার দাদা রাধারমণ আমার বন্ধু। রাধারমণের অসাধারণ দক্ষতা ছিল ফটোগ্রাফিতে। বিধান সরণী ও বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে অবস্থিত তার স্টুডিওতে গিয়ে প্রায়ই আমরা আড্ডা দিতাম ও তার ফটোগ্রাফির অনুশীলনের কথা শুনতাম।

দু'নম্বর বৃন্দাবন পাল লেনে যখন থাকতাম, তখন প্রায়ই দুপুরবেলা আমার মা এসে খবর দিতেন, ওরে, যামিনীবাবু এসেছেন, তোকে ডাকছেন। বুঝতাম, যামিনদার অর্থসঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। নীচেয় আসতেই যামিনদা বলতেন, বিশটা কি পঁচিশটা টাকা না দিলেই নয়, আজ বাড়িতে সকলেই অনশনে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই যামিনদার সংকটমোচন করতাম। আবার দু-চারদিন পরে আমার বন্ধু শ্যামাচরণের কাছে শুনতাম যে যামিনদা এসে তার কাছ থেকেও টাকা নিয়ে গেছেন।

কিন্তু এভাবে তো মানুষের চিরদিন চলে না। যামিনদাকে আমরা অনেক বুঝাতাম, আপনি আবার 'প্রোট্রেট' ছবি আঁকা শুরু করুন। কিন্তু যামিনদা কিছুতেই নিজ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবেন না।

এ সময় যামিনদার জীবনে বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় এল। যামিনদার মেয়ে সুনীতির সমস্ত পিঠটা কার্বঙ্কলে ভরে গেল। চিকিৎসা তো করাতেই হবে। তা না হলে মেয়েটা তো মারাই যাবে। কিন্তু যামিনদার তো সঙ্গতি নেই। তখনকার দিনে শ্যামবাজার পল্লীতে থাকতেন প্রখ্যাত শল্য-চিকিৎসক ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ছুটে গেলাম শিববাবুর কাছে। সব কথাই খুলে বললাম। শিববাবু বললেন, আমি তো নয় বিনাপয়সায় অস্ত্রোপচার করতে গেলাম; কিন্তু আমাকে সাহায্য করবার জন্য তো দু-একজন 'অ্যাটেনডেন্ট'-এর দরকার হবে। তাদের তো পয়সা দিতেই হবে। আমি শিববাবুকে বললাম, আমি এবং আমার বন্ধু শ্যামাচরণ, আমরা দু'জনে আপনাকে অ্যাটেনডেন্টরূপে সাহায্য করব।

সে এক বীভৎস দৃশ্য। শিববাবু কোমরের ওপর থেকে 'গজ' ঢুকাচ্ছেন, আর সে 'গজ' বের করছেন কাঁধের কাছে। আমার বন্ধু শ্যামাচরণ সে দৃশ্য আর দেখতে পারল না। ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল। আমারও তখন অনুরূপ অবস্থা। মনে হচ্ছে, এবার আমি অজ্ঞান হয়ে যাব। আবার ভাবছি, আমি চলে গেলে তো

সমস্ত অস্ত্রোপচারটাই পণ্ড হয়ে যাবে। হয়তো বা মেয়েটা মারাই যাবে! মন শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইলাম ও শিববাবুকে সাহায্য করতে লাগলাম। অস্ত্রোপচার হয়ে গেলে, বাইরে বেরিয়ে বারান্ডায় ধপাস্ করে পড়ে গেলাম। এখনও মনে মনে ভাবি, সেদিন ভগবান আমার মনে বল দিয়ে সাহায্য করেছিলেন বলেই সুনীতি ভাল হয়ে উঠেছিল। পরে সুনীতির চুঁচুড়ায় বিয়ে হয়েছিল।

এর পর যামিনদার বড় ছেলে ধর্মদাস ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করল। আমাদের চেষ্টাতেই এটা হয়েছিল। কেননা যামিনদার ইচ্ছা ছিল না যে ছেলে 'গোলামখানা'র পরীক্ষায় বসে। গোলযোগ হল পরীক্ষায় পাস করবার পর। যামিনদা ছেলেকে আর পড়াবেন না। বাগবাজার স্ট্রীটে হরিদাস সাহার ব্যারাক বাড়ির নীচে রাস্তার দিকের একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে, ধর্মদাসকে একটা পাউরুটি বিস্কুট কেকের দোকান করে দিলেন। ধর্মদাস যখন দোকানে থাকে না, তখন দোকানে বসে যামিনদার মেজ ছেলে জীমূত। জীমূত যখনই দোকানে যায়, দেখি, তখনই ব্যারাকবাড়ির ওপরতলা থেকে একটি মেয়ে এসে জীমূতের সঙ্গে কি আলোচনা করে। লোকমুখে শুনতাম মেয়েটি এক বিপ্লবী দলের সদস্যা। মনে মনে ভাবছি, যামিনদাকে ঘটনাটা বলব, এমন সময় জীমূত হঠাৎ বাড়ি থেকে নিরুদ্দিষ্ট হল। পুলিস, হাসপাতাল, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সকলের বাড়িতেই খবর নেওয়া হল, কিন্তু জীমূতকে কোথাও পাওয়া গেল না। যামিনদার ছোটভাই রজনীবাবু যামিনদার দেশ বেলিয়াতোড়ে খোঁজ করতে গেলেন। রজনীবাবু সেখান থেকে খবর নিয়ে এলেন, জীমূত দেশের বাড়িতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তারপর ক'দিন একা একা উদ্বিগ্নচিত্তে ঘরের মধ্যে পায়চারি করত এবং তারপর সে কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ চলে গিয়েছে। তখন আমার মনে পড়ল মেয়েটির সঙ্গে জীমূতের সংযোগের কথা। সম্প্রতি বাঁকুড়ায় বেলিয়াতোড়ের কাছে বিপ্লবীরা ডাক লুঠ করেছে। খবরের কাগজ থেকে তারিখটা মিলিয়ে দেখলাম যে ওই ঘটনা ঘটেছে জীমূত নিরুদ্দেশ হবার দু'দিন পরে। আমার সন্দেহ হল, জীমূত বিপ্লবীদের সঙ্গেই গিয়েছিল এবং পাছে স্বীকারোক্তি করে এই আশঙ্কায় বিপ্লবীরাই জীমূতকে মেরে ফেলেছে। তখন যামিনদাকে আদ্যোপান্ত সব কথা খুলে বললাম। আমার মুখে সব শুনে যামিনদা ও রজনীবাবু দু'জনে আবার বেলিয়াতোড়ে গেলেন। সংবাদ পেলাম, জীমূতের মৃতদেহ নিকটস্থ এক জঙ্গলে, পাওয়া গিয়েছে!

কিছুদিন পরে যামিনদা দেশ থেকে ফিরে এলেন। যামিনদার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যামিনদা বলে উঠলেন, অতুলবাবু, উৎসের সন্ধান পেয়েছি। মনে মনে ভাবলাম, যামিনদার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! কোথায়

জীমূতের হত্যাকাণ্ডের কথা বলবেন, তা নয় কোথাকার কি উৎসের কথা বলছেন! আমার ভুল ভাঙল, যখন যামিনদা বললেন, দেশে গিয়ে পটুয়াদের ছবি-আঁকা দেখে উপলব্ধি করেছি, ছবির মূলসূত্র কোথায়। তারপর থেকে যামিনদা পটুয়াদের সেই বলিষ্ঠ রেখার টানে ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। এক স্বকীয় শিল্পরীতি গড়ে তুললেন, যা যামিনদাকে দিল চিরদিনের জন্য বিশ্বখ্যাতি।

১১১

একদিন ফাইন আর্টস্ সেমিনারে বসে আড্ডা দিচ্ছি, এমন সময় পাশের অ্যানথ্রোপোলজি সেমিনার থেকে নির্মল বসু এসে আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। বলল, কাল আপনাকে সতীশদার কাছে নিয়ে যাব। জিজ্ঞাসা করলাম, সতীশদা আবার কে? বলল, যখন যাবেন তখন জানতে পারবেন। ভারী মজার লোক।

নির্মল বসু আমাদের পাড়ার ছেলে। বিখ্যাত স্থপতি সি. কে. সরকারের ভাগনে। নির্মল বসুর বাবা বিহার ও ওড়িশা সরকারের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার। পুরীতে 'সুধাসিন্ধু' নামে ওদের একখানা বাড়ি ছিল। নির্মল বসুর সঙ্গে ও-বাড়িতে গিয়ে আমি দু-একবার থেকে এসেছি। নির্মল বসু আমার চেয়ে বয়সে তিন বছর বড় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব ক্লাসে দু'বছরের সিনিয়র। সুতরাং নির্মল বসুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই ছিল। সেজন্য ভাবলাম, নির্মল বসু আমাকে বাজে লোকের কাছে নিয়ে যাবে না।

পরের দিন নির্মল বসু আমাকে সতীশদার ছাপাখানায় নিয়ে গেল। ছাপাখানার নাম 'শক্তি প্রেস'। সতীশদার নিজের ছাপাখানা। ছাপাখানাটা ছিল পুরোনো সিমলা পোস্ট-অফিসের ঘরে।

সতীশদার সঙ্গে আলাপ হল। বেশ মজার লোক সতীশদা। এককালের বিপ্লবী। এখন মেট্রপলিটান ইনস্টিটিউশনের হেডমাস্টার। দেখলাম, ও'র ছাপাখানাটা হচ্ছে কট্টর গান্ধীবাদীদের আড্ডা। ওই আড্ডায় আরও অনেকের সঙ্গে পরিচিত হলাম। সুধীর লাহা, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র ও এ.বি.টি.এ.-র অনেকের সঙ্গে। সকলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রকে আমরা সকলে শম্ভুদা বলতাম। শম্ভুদা পরে 'বিহার হেরাল্ড' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিল। আরও পরে কলকাতার ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের অর্থনীতির অধ্যাপক হয়েছিল।

দেশের রাজনীতি নিয়েই সতীশদার ওখানে আমাদের আলোচনা হত। সেজন্য সতীশদার চক্রটা সব সময়েই পুলিসের নজরে থাকত। কথা বলতে বলতে সতীশদা হঠাৎ থুতু ফেলবার জন্য ঘরের বাইরে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, ব্যাটা আজ চ্যানাচুরওয়ালা সেজে চ্যানাচুরের ডালা নিয়ে দরজার পাশে এসে বসেছে। এরকমভাবে বহুরূপীর বেশ ধরে পুলিসের লোক সবসময়েই সতীশদার ছাপাখানা-ঘরের প্রবেশপথটা নজরে রাখত। একমাত্র উদ্দেশ্য, কে আসছে কে যাচ্ছে তা লক্ষ্য করা।

সতীশদার সংগে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমার বাবা যোগসিদ্ধ পুরুষ শুনে, সতীশদা বললেন, তোমার বাবার সংগে একদিন আলাপ করে আসব। বললাম, বাবাকে বলে রাখব। বাবা আমার মুখে শুনেছিলেন যে সতীশদা ঘণ্টায় পাঁচ-ছ' কাপ চা খায়। আমার বাবা চা-খাওয়ার ভীষণ বিরোধী ছিলেন। সেজন্য আমাদের পরিবারে কেউ চা খেত না। চা-খাওয়াটা বাবা প্রবর্তন করলেন আমার বিয়ের পর আমার স্ত্রীর জন্য। বাবা বললেন, চা না খেলে বৌমার কষ্ট হবে, সুতরাং তোমরা চা খাও। তবে বাবা নিজে কখনও চা খাননি।

সতীশদা যখন বাবার সংগে দেখা করতে এলেন, তখন বাবা সতীশদার অত্যধিক চা খাওয়ার কথাটা তুলে বললেন, আপনি অত চা খাবেন না, এতে আপনার পরমায়ু হ্রাস পাবে।

পরে সতীশদার সংগে যখন দেখা হল, সতীশদা বললেন, আমি এত বেশী চা খাই বলে আপনার বাবা তো আমাকে খুব ভয় দেখিয়ে দিলেন।

তবে সতীশদা তখন থেকে চা খাওয়া অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন।

ꩰ ꩰ ꩰ

এই সময় আমাকে একবার এলাহাবাদ যেতে হল। 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সম্পাদক ওয়াটসন সাহেবের সংগে আমার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। এ হৃদ্যতার সূচনা হয়েছিল 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিউম্যান সাহেবের মাধ্যমে। নিউম্যান সাহেব তখন 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় এক অতি চিত্তাকর্ষক 'কলাম' পরিচালনা করতেন। ওই 'কলাম'টার নাম ছিল 'হিয়ার অ্যাণ্ড দেয়ার'। তলায় ওঁর ছদ্মনাম ছাপা হত 'কিম্'। ওই 'কলাম'-এ প্রায়ই পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক প্রসংগ আলোচিত হত। নিউম্যান সাহেব ছিলেন রোটারি ক্লাবের সদস্য। ভাণ্ডারকারও তাই। সেজন্য দু' জনের মধ্যে ছিল সম্প্রীতি। এবং ভাণ্ডারকারের মাধ্যমেই নিউম্যান সাহেবের সংগে আমার পরিচয় ও বন্ধুত্ব। নিউম্যান সাহেব

পুরাতত্ত্বের নানা বিষয় নিষয় প্রায়ই আমার সংগে আলোচনা করতেন।

সে বৎসরই প্রয়াগে অনুষ্ঠিত হবে অর্ধকুম্ভ মেলা। 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে আমি গেলাম প্রয়াগে। এই আমার প্রথম কুম্ভমেলার অভিজ্ঞতা। গিয়ে দেখলাম গংগা-যমুনার তটভূমিতে পড়েছে অসংখ্য তাঁবু ও দরমার তৈরি খুপরি। প্রতি তাঁবুর মাথায় আছে একটা করে প্রতীক-চিহ্ন। ওই প্রতীক-চিহ্নগুলিই হচ্ছে বিরাট জনসমাগমের মধ্যে যাত্রীদের নিশানা। কেউ পথ হারিয়ে গেলে, অপরকে জিজ্ঞাসা করে, বলতে পারেন কোন্ দিকে হবে 'নারিয়াল ঝাণ্ডা', বা 'কাটারি ঝাণ্ডা,' বা 'রাম-লখনকা ঝাণ্ডা'।

আমার সংগে গিয়েছিলেন আমার মা ও বাড়ির এক বৃদ্ধা পরিচারিকা যাকে আমরা 'মাসী' বলে ডাকতাম। এলাহাবাদের মেলাস্থল তখন লোকে লোকারণ্য। সর্বত্রই থাকবার স্থানাভাব। সব ধর্মশালাই যাত্রীতে পরিপূর্ণ। যাবার সময় বাবার কাছ থেকে আমাদের পাণ্ডার নাম জেনে গেলে হয়তো একটা সুরাহা হত। কিন্তু তা-ও জেনে যাই নি। দূরে শহরের ভেতর হোটেলে অবশ্য স্থান পেতাম, 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার খাতিরে। কিন্তু মা তো হোটেলে থাকবেন না। আমরা কোন জায়গাতেই স্থান পেলাম না। দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় ভগবান জুটিয়ে দিলেন আমাদের থাকবার মতো একটা স্থান। এক দোকানদারের সংগে আলাপ হল। সে আমাদের থাকতে দিতে রাজী হল তার দোকানের দাওয়ায়। দোকানটা খাবারের দোকান। দোকানের মালিক ব্রাহ্মণ। আমরা তারই দোকানে দু'বেলা পুরি-তরকারি, লাড্ডু ইত্যাদি খাব বললাম।

দোকানদারই একজন পাণ্ডার সংগে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। কুম্ভ স্নানের দিন মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ভোরবেলা এসে সে আমাদের ঘুম থেকে তুলল। তারপর আমাদের নিয়ে গেল যমুনার ধারে। সেখানে আমাদের এক নৌকায় তুলল। নৌকা সংগম পর্যন্ত গেল। দেখলাম, নৌকার একধারের জল শাদা, আর অপর ধারের জল কালো। গংগা ও যমুনা সেখানেই পরস্পর জড়াজড়ি করেছে। সেখানেই আমরা নৌকার একপাশ থেকে গংগার জল, আর অপর পাশ থেকে যমুনার জল ঘটি করে তুলে মাথায় ঢেলে স্নান করলাম।

তারপর আমরা ফিরে এসে বড় রাস্তার ধারে দাঁড়ালাম, সাধুদের মিছিল দ্যাখবার জন্য। বড় বড় দলের সাধুদের আগে আগে চলেছেন হাতির ওপর হাওদায় চেপে তাদের মোহন্তরা। অনেকটা রাজকীয় ভাবে। কুম্ভের পুণ্যস্নানের জন্য কত যে সাধুর দল আসতে লাগল, তার ইয়ত্তা নেই। তারই মধ্যে দেখলাম মেয়ে-সাধুদের। কাঠিয়া সাধুদের। তারা লজ্জা-নিবারণের জন্য মাত্র একখণ্ড কাঠ ঝুলিয়ে রেখেছে সামনে। তারপর এল নাগা সন্ন্যাসীর দল, সম্পূর্ণ উলংগ।

আরও দেখলাম, সাধুদের মিছিল দেখবার জন্য হাতির ওপর হাওদায় চেপে বেরিয়েছেন লাটসাহেব ম্যালকম হ্যালীর স্ত্রী।

তারপর বাড়ি ফেরবার পালা। কুম্ভমেলার উদ্দেশ্যে সদ্যগঠিত প্রয়াগ-ঘাট স্টেশনে এসে দেখি এক অদ্ভুত কাণ্ড। লক্ষ লক্ষ যাত্রীকে পুরে দেওয়া হয়েছে এক খোঁয়াড়ের ভেতর। যেমন-যেমন এক-একখানা স্পেশাল ট্রেন আসছে, খোঁয়াড় থেকে মাত্র সেই পরিমাণ যাত্রী ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। খোঁয়াড়ের গেটে কর্মরত পুলিস অফিসারকে আমার পরিচয় দেওয়ায়, তিনি এক পাশে আমাদের দাঁড়াতে বললেন। স্পেশাল ট্রেন আসতেই তাঁর নির্দেশমতো আমরা ট্রেনে গিয়ে বসে পড়লাম।

কলকাতায় পৌঁছানো মাত্র এক দুঃসংবাদ পেলাম। আমার বন্ধু শ্যামাচরণ আমাকে খবর দিল যে সতীশদা হার্ট-ফেল করে মারা গিয়েছেন। অত্যধিক চা-পানের ফলেই সতীশদার মৃত্যু ঘটল!

আগেই বলেছি যে হিন্দুসভ্যতার গঠনে সিন্ধুসভ্যতার অবদান সম্বন্ধে অনুশীলন করবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্র আছে কিনা, তা জানবার জন্য ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ স্যার জন মারশাল, ড. ভাণ্ডারকারের নিকট এক চিঠি লিখেছিলেন। তার জেরেই আমাকে মহেঞ্জোদারো যেতে হয়েছিল। সে এক চাঞ্চল্যকর অভিযান। কলকাতা থেকে ট্রেনে চাপবার চার দিন পরে সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা স্টেশনে গিয়ে পৌঁছালাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। কাছাকাছি কোথাও থাকবার ব্যবস্থা আছে কিনা খোঁজ করবার জন্য স্টেশনমাস্টারের ঘরে গেলাম। তখনকার দিনের স্টেশনমাস্টাররা সবই সাহেব। দেখলাম সাহেব খুব সহৃদয় ব্যক্তি। আমার পরিচয় পেয়ে তিনি বললেন যে তিনি খুবই খুসী হবেন যদি আমি রাত্রিবাসটা তাঁর কোয়ার্টারে করি। তাই ঠিক হল। সাহেবের মেমসাহেব আমার বিশেষ যত্ন নিলেন। ভোরবেলা উটের পিঠে চেপে মহেঞ্জোদারোর অভিমুখে যাত্রা করলাম। দুপুরে মহেঞ্জোদারোর তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছালাম। মহেঞ্জোদারোয় তখন খননকার্য চালাচ্ছিলেন আরনেস্ট ম্যাকে। তিনি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। অত্যন্ত অমায়িক ব্যক্তি। তাঁর চেয়েও অমায়িক তাঁর স্ত্রী ডরোথি ম্যাকে। পাছে পৃথক তাঁবুতে থাকলে রাত্রিতে ভয় পাই, সেজন্য তাঁরা নিজেদের তাঁবুর মধ্যেই পর্দা ঘিরে আমার থাকবার ব্যবস্থা করলেন।

দুপুরে খাবার পর তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে দেখি চতুর্দিকে জনহীন প্রান্তর,

আর অদূরে সেই রহস্যময়ী নগরীর কঙ্কাল।

প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতা আমাকে বেশ ভয়ার্ত করে তুলল। চতুর্দিকে জমা অন্ধকার। গভীর নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে কানে আসতে লাগল নানারূপে জন্তু-জানোয়ারের সম্ভাষণ। রাত্রে তো ঘুমই হল না। ভোরের দিকে সবেমাত্র তন্দ্রা এসেছে, তন্দ্রা ভেঙে গেল টাইপরাইটারের শব্দে। উঠে দেখি, ডরোথি টাইপ করতে লেগেছেন তার স্বামীর পূর্বদিনের খননকার্যের বিবরণী।

পরদিন সকালে ম্যাকে নিয়ে গেলেন আমাকে সেই রহস্যময়ী নগরীর ভেতরে। দেখলাম নগরটি আয়তনে প্রায় তিন মাইল। ঠিক দাবাখেলার ছকের অনুকরণে গঠিত। সমান্তরাল কতগুলি রাস্তা বেরিয়ে গেছে প্রশস্ত রাজপথ থেকে। প্রতি দুই সমান্তরাল রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দশ বারোখানা করে বাড়ি। বাড়ির সামনের ঘরগুলি বোধ হয় দোকান ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত, কেননা প্রতি বাড়িতেই প্রবেশ করতে হত পাশের সরু গলি দিয়ে। বাড়িগুলো সবই ইটের তৈরি। অধিকাংশই একতলা, তবে দোতলা বাড়িও ছিল।

পোড়া ইট দিয়ে তৈরি এক পয়ঃপ্রণালী অনেকটা পথ রাস্তার পশ্চিম ধার দিয়ে এসে, এক জায়গায় রাস্তা অতিক্রম করে, রাস্তার পূব ধার দিয়ে চলে গিয়েছিল। বাড়ির দূষিত জল এই পয়ঃপ্রণালীতে এসে পড়ত, তবে অনেক বাড়িতে 'সোক্-পিট'ও ছিল। প্রতি বাড়ির প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকলেই সামনে পড়ত বাড়ির প্রাঙ্গণ। প্রবেশপথের নিকট প্রাঙ্গণের একপাশে থাকত বাড়ির কূপ। স্নানের সময় আবরু রক্ষার জন্য কূপগুলিকে দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত করা হত। রাজপথের দিকে বাড়ির যে দোকান ঘরগুলি ছিল, তার অনেকগুলির সামনে আমরা আবিষ্কার করেছিলাম ইটের গাঁথা পাটাতন। বোধ হয় এই পাটাতনগুলির ওপর বিক্রেতারা দিনের বেলা তাদের পণ্যসম্ভার সাজিয়ে রাখত এবং রাত্রিকালে সেগুলিকে দোকান-ঘরে তুলে রাখত। ছোট ছোট যে-সব দ্রব্যসামগ্রী আমরা সে বৎসর পেয়েছিলাম, তার মধ্যে ছিল মেয়েদের মাথার কাঁটা। তা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করেছিলাম যে, মেয়েরা মাথায় খোঁপা বাঁধত ও খোঁপায় কাঁটা গুঁজত। তবে মেয়েরা যে বেণী ঝুলিয়েও ঘুরে বেড়াত, তার প্রমাণও আমরা পেয়েছিলাম।

ম্যাকের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' স্মরণ করে সাড়ে চারহাজার বছর আগের নরনারীর কলরব ও কর্মব্যস্ততার স্বপ্ন দেখতাম।

১১১

মহেঞ্জোদারোয় দিনগুলি বেশ সুখেই কাটছিল। তাঁবুতে তো আমরা মাত্র তিনটি প্রাণী—ম্যাকে, ডরোথি ও আমি। ম্যাকে সারাদিন খননকার্যে ব্যস্ত থাকতেন। ডরোথি ও আমি সিন্ধুসভ্যতার সংগে পরবর্তী হিন্দুসভ্যতার যোগসূত্র সম্বন্ধেই গল্পগুজব করতাম। তাতে আমরা বেশ আনন্দ উপভোগ করতাম। কিন্তু শীঘ্রই আমাদের আনন্দের দিনগুলি ফুরিয়ে এল।

একদিন মহেঞ্জোদারোয় বেড়াতে এলেন ননীগোপাল মজুমদার। বিকেলের দিকে তিনি আমাকে তাঁবুর বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন যে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সকলেই স্যার জন মারশ্যাল বা আরনেস্ট ম্যাকে নন্। একজন বাঙালী-বিদ্বেষী অফিসারের নাম করে আমাকে সতর্ক করে দিলেন। বললেন, যত শীঘ্র পার, এখান থেকে পালিয়ে যাও।

কলকাতায় আবার ফিরে এলাম। আমার দুই বন্ধু প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পূর্ব-চক্রের অধ্যক্ষ কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত ও ভারতীয় যাদুঘরের অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ-এর সংগে দেখা করলাম। তাঁরা বললেন, ননীগোপালবাবু ঠিকই পরামর্শ দিয়েছেন।

মহেঞ্জোদারোয় আর ফিরে যাব না, ঠিক করলাম। কিন্তু যাব না সিদ্ধান্ত করলে কি হয়? 'কমলি নেহি ছোড়েংগা'। প্রত্নতত্ত্ব-সমীক্ষাটা ছিল গভর্নমেন্টের এডুকেশন বিভাগের অধীনস্থ। স্যার জন মারশালের নির্দেশে এখানে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে আমাকে ডেকে পাঠালেন ডিরেক্টর অভ্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন স্টেপলটন সাহেব—যিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রেসিডেনসী কলেজ থেকে। রাইটার্স বিল্ডিং-এ তখন যাওয়াই মুস্কিলের ব্যাপার ছিল। এক সার্জেন্ট টেলিফোন করে, অনুমোদন পেয়ে, চাবি হাতে করে আমাকে সংগে করে নিয়ে চললেন। দু-তিনটা কোলাপ্সিবল গেটের চাবি খুলে, আমাকে স্টেপলটন সাহেবের ঘরে পৌঁছে দিলেন। সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মহেঞ্জোদারোয় যাচ্ছ না কেন? আমি বললাম, আমার ৯০ বৎসর বয়সের পিতা অসুস্থ, সেজন্য আমি দূরে যেতে চাই না। আরও একদিন ডেকে পাঠালেন। আমাকে অনেক বুঝালেন। আমি একই কথা বললাম। তারপর বিরক্ত হয়ে বললেন, অল্ হাম্বাগ্, আই আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার মাস্ট বি সাম্ পলিটিক্যাল রিজন্ ফর ইউর নট গোইং ব্যাক্ টু মহেঞ্জোদারো। তারপর আমার ফাইলটা বের করে, তার মলাটের ভেতরদিকে কি লিখলেন। লেখা শেষ করে আমাকে বললেন, আই অ্যাম্ রাইটিং দিস্ রিমার্ক অন ইউর ফাইল—ইফ অতুলকৃষ্ণ সুর এভার

অ্যাপ্লাইজ ফর এনি পজিশন ইন দি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট অভ্ দি গভর্নমেন্ট অভ্ ইণ্ডিয়া, হিজ অ্যাপ্লিকেশন ইজ ফার্স্ট টু বি রিজেকটেড্। আমি সংগে সংগেই 'থ্যাংক ইউ স্যার' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

ঌ ঌ ঌ

কথাটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাডুয়েট ডিপার্টমেন্টের প্রেসিডেন্ট ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ও সেনেটের সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কানে গেল। তারা আমাকে বেতনিক গবেষক নিযুক্ত করে বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধীনে অনুশীলন চালিয়ে যেতে বললেন। দু'বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুশীলন চালিয়ে এই তথ্য উপস্থাপন করলাম যে হিন্দুসভ্যতার গঠনের মূলে বারো-আনা ভাগ আছে সিন্ধু-উপত্যকার প্রাক্-আর্য সভ্যতা; আর মাত্র চার-আনা ভাগ মণ্ডিত আর্যসভ্যতার আবরণে।

তারপর অনেক বছর কেটে গেল। ভারতের ইতিহাসের ওপর প্রাক্-বৈদিক সিন্ধু সভ্যতার প্রভাব যে কতখানি, তা আমাদের ঐতিহাসিকরা বুঝলেন না। গতানুগতিক ভাবে ভারতের ইতিহাস রচিত হতে লাগল, মাত্র বৈদিক যুগের আগে সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে একটা অধ্যায় যোগ করে দিয়ে।

ঌ ঌ ঌ

এবার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নেবার পালা আমার অগোচরে আসন্ন হয়ে এল। একদিন শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন। ও'র বাড়িতে গেলাম। উনি তখন দোতলার বৈঠকখানার বড় টেবিলটার সামনে বসে দাড়ি কামাচ্ছিলেন। দাড়ি কামাতে কামাতেই আমাকে বেশ রুষ্টস্বরে বললেন, তোমার মতো নেমকহারাম আমি দুনিয়ায় দেখিনি। আমি তো ও'র কথা শুনে অবাক। তারপর দাড়িকামানো শেষ হলে, আমাকে বললেন, 'মডার্ন রিভিউ'তে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে-সব কুৎসাপূর্ণ লেখা বেরুচ্ছে, সেগুলো বেনামীতে তুমি লিখছ? আমি বললাম, 'মডার্ন রিভিউ' এর সঙ্গে আমার কোনই সংযোগ নেই, যদিও অন্যান্য পত্রিকায় আমার যে-সব প্রবন্ধ বেরোয় তার অংশবিশেষ ও'রা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ও'দের পত্রিকায় পুনরমুদ্রিত করেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। উনি বিশ্বাস করবেন না, তা আমি জানতাম। কেননা, শ্যামপ্রসাদবাবুর কান ছিল অত্যন্ত পাতলা। অপরের কাছ থেকে কারুর বিরুদ্ধে যা-কিছু শুনতেন,

তা ধ্রুবসত্য বলে বিশ্বাস করতেন। প্রতিবাদীর কথা মোটেই শুনতেন না। শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে খুব ঘনিষ্ঠভাবেই জানতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমার আনুগত্য সম্বন্ধে ওঁর মনে যে কোনরূপ সংশয় জন্মাতে পারে, এটা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল। ওঁর কথা শুনে আমি মনে অত্যন্ত পীড়া পেলাম। অভিমানে আমার মন ভরে গেল আমি আর তর্কবিতর্ক না করে, ওঁকে অভিবাদন জানিয়ে চলে এলাম। সিদ্ধান্ত করলাম, আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব না।

১৯৫৯

যেদিন শ্যামপ্রসাদবাবুর ওপর অভিমান করে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে এসেছিলাম, সেদিন শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে ভুল বুঝেছিলেন। পরে অবশ্য ওঁর ভুল ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন ওঁর ওপর অভিমান করে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসাটা আমার দিক থেকে ভুল হয়েছিল। পরে আমি বহুবার এজন্য পরিতাপ করেছি। ক্লাইভ স্ট্রীটে অবশ্য আমি নাম, যশ ও খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিলাম, কিন্তু ক্লাইভ স্ট্রীট তো বিদগ্ধজনের সমাবেশের জায়গা নয়। সেজন্য বিদ্বৎসমাজে আমি ক্রমশ বিস্মরণের গর্ভে চলে গিয়েছিলাম। উপলব্ধি করেছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক না হলে, কেউ 'বিশ্বপণ্ডিত' হিসাবে বিদ্বৎসমাজে স্বীকৃতি পায় না। একদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ড. উজ্জ্বল মজুমদারের সঙ্গে ট্যাকসীতে আসছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে বললেন, ড. রমেশ মজুমদার মশাই প্রায়ই বলতেন, আমাদের দুর্ভাগ্য যে অতুল সুরের মতো একজন কৃতী ছাত্র আমাদের লাইন ছেড়ে অন্য লাইনে চলে গেল। কথাটা শুনে আমার দুই সহপাঠী—শান্তিনিকেতনের ড. প্রবোধচন্দ্র সেন ও ড. নীহাররঞ্জন রায়ের কথা মনে পড়েছিল। ড. প্রবোধ সেন একবার এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"যখন আপনার যে বই পড়ি, তাতেই বিস্ময় বোধ করি। অন্যতর একটি ক্ষোভের বিষয় এই যে, আপনি তো অবিরাম কাজ করেই চলেছেন, কিন্তু আপনার প্রতিভার এখনও যথেষ্ট খ্যাতি হয়নি। আমি জানি আপনি খ্যাতির কাঙাল নন। হবেনই বা কেন? কিন্তু তাতে যে দেশেরই ক্ষতি। অমূল্য ধন হাতে পেয়েও যে তার মূল্য বোঝে না, ক্ষতি তো তারই। দেশের এই ক্ষতিটা অবশ্যই শোচনীয়।" নীহার লিখেছিল—"আমাদের সমপর্যায়ের লোক হলেও আপনার পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই, নীরবে বাঙলা দেশ ও বাঙালীর ইতিহাস আপনি উদ্ভাসিত করে চলেছেন, আপনি আমার মতো অনেকেরই শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন, আপনার কর্মের দ্বারা।"

১১১

যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরে এলাম, তখন তো আমি একেবারেই বেকার। একটা সংগ্রামী মন নিয়ে জন্মেছিলাম, যে কারণে সারাজীবন কেবল সংগ্রামই করে গিয়েছি। সুতরাং বেকারত্বের কাছে পরাজয় স্বীকার করলাম না। পুরানো দিনের আয়ত্ত বিদ্যাগুলি কাজে লাগালাম। আমার প্রথমা স্ত্রীর দিদা (পিতামহ) ছিলেন টেলিগ্রাফ চেক অফিসের একজন যশস্বী কর্মী। সেজন্য অবসরগ্রহণ করবার পরও সাহেবরা তাঁকে খুব ভালবাসতেন। তিনি আমার বিবাহের পর আমাকে পরামর্শ দিলেন, আর বেশি লেখাপড়া শিখে কি হবে? আমি তোমাকে টেলিগ্রাফ অফিসে ভাল চাকরীতে ঢুকিয়ে দেব, তুমি অ্যাকাউনটেনসিটা শিখে ফেল। সেজন্য আমি ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবার পরই অ্যাকাউনটেনসি শেখবার জন্য বাটলিবয়ের ফার্মে ঢুকে পড়লাম। ফিলড্হাউসের অ্যাকাউনটেনসি বইটা সবই শেষ করে ফেললাম। ফার্মের লোকেরা পরামর্শ দিল, আপনি জি.ডি.এ. পরীক্ষাটা দিন। কিন্তু সবই ভেস্তে গেল যখন বাবা বললেন, অন্ততঃ বি.এ. পাস করবার জন্য কলেজে আবার ভর্তি হয়ে যা। সেজন্য কলেজেই আবার ভর্তি হলাম।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার পর আমি শর্টহ্যাণ্ডও শিখেছিলাম, এবং কলেজের সব নোট-ই শর্টহ্যাণ্ডে লিখতাম। প্রথমে একটা শর্টহ্যাণ্ড সিস্টেম-ই শিখেছিলাম, কিন্তু পরে পিটম্যান, গ্রেগ্ ও স্লোন-ডুপ্লোয়াঁ এই তিনটা সিস্টেম-ই শিখে ফেললাম। এই তিনটা সিস্টেমেই আমি টিচারস্ ডিপ্লোমা পেয়েছিলাম। গ্রেগ্ সিস্টেমকে আমি বাংলা শ্রুতিলিখনের উপযোগীও করেছিলাম, এবং পশুপতি বসুর বাড়িতে কংগ্রেসের যে মিটিং হয়েছিল, সেখানে সরোজিনী নাইডুর বাংলা বক্তৃতা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আমি ওর শ্রুতিলিখন ওই সিস্টেমেই করেছিলাম। আর টাইপরাইটিং করার অভ্যাস আমার ছেলেবেলা থেকেই ছিল। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন আমি সরে এলাম, তখন আমি শ্যামবাজার বাজারের ওপর ঘর ভাড়া নিয়ে একটা কমার্সিয়াল স্কুল খুললাম। সঙ্গে সঙ্গে ভাল ইংরেজি শিক্ষা দেবার জন্য 'মাস্টারি অভ্ ইংলিশ' নাম দিয়ে একটা 'করেসপণ্ডেন্স কোর্স'ও আরম্ভ করলাম। আমার ওই কোর্সের এক ছাত্র আলাহাবাদে অনুষ্ঠিত আই.সি.এস. পরীক্ষায় ইংরেজিতে ভাল রেজল্ট করল। আমার এসময়কার ইংরেজি রচনা পড়ে Newspaper Institute of America বলেছিল—'Atul Krishna Sur is master of a vigorous English style'। এদিকে আমি আমার স্কুলটিকে বৈশিষ্ট্য দেবার

জন্য আরও একটা জিনিস করলাম। ওখানে ফ্রেঞ্চ ও জারমান ভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলাম। এ দুটো ভাষাই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিখেছিলাম, অনেকটা চাপে পড়ে। এম.এ. পড়বার সময় আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পঁয়ত্রিশ টাকার একটা স্টাইপেন্ড পেতাম। ওই স্টাইপেন্ডের শর্ত ছিল যে, ফ্রেঞ্চ ও জারমান ভাষার ক্লাসে ভর্তি হতে হবে। আমাদের প্রথম ফ্রেঞ্চ শেখাতেন এক বৃদ্ধা মহিলা, পরে চন্দননগরের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। আর জারমান ভাষার শিক্ষক ছিলেন সায়েনস্ কলেজের ডুক সাহেব। ডুক সাহেব চলে গেলে, ড. ডি. পি রায়চৌধুরী নামে এক শিক্ষক জারমান পড়াতে এলেন। তিনি চট্টগ্রামের লোক, এবং প্রথম দিন তাঁর ক্লাসে এক প্রহসন ঘটল। তখনকার দিনে জারমান ভাষার দুটো শাখা ছিল—'হাই জারমান' ও 'লো জারমান'। সবই এক ছিল, কেবল পার্থক্য ছিল 'ch' বর্ণের উচ্চারণ নিয়ে। তার ফলে, উত্তমপুরুষ ইংরেজি 'I'-এর জারমান প্রতিশব্দ 'Ich' এক শাখার লোকরা উচ্চারণ করত 'ইখ্,' আর অন্য শাখার লোকরা উচ্চারণ করত 'ইশ্'। ডুক সাহেব আমাদের 'ইখ্' উচ্চারণই শিখিয়েছিলেন। রায়চৌধুরী এসে আমাদের শেখালেন 'ইশ্'। আমরা 'ইশ্' বললাম। উনি বললেন, ঠিক হল না। 'ইশস্' ক'ন। আমরা কিছুতেই ওঁকে অনুকরণ করতে পারলাম না। তখন তিনি আমাদের ইংরেজি 'goat' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ উচ্চারণ করতে বললেন। আমরা যতই সকলে বলি 'ছাগল', আর উনি বলেন, 'আরে, শাগল ক'ন না'। ক্লাসে তুমুল হাসির রোল পড়ে গেল। উনি ভীষণ লজ্জা পেলেন, এবং জারমান ক্লাস নেওয়া বন্ধ করে দিলেন।

১১১

বাগবাজার স্ট্রীট দিয়ে রোজ সকালে গঙ্গাস্নানে যান ইণ্ডিয়ান জরনালিস্ট এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার বাবার তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেজন্য দেখা হলেই তাঁকে নমস্কার করি। একদিন তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন, তুমি এখন কি করছ? এম.এ. পাস করে 'কমারসিয়াল স্কুল' চালাচ্ছি এটা গোপন করবার জন্য বললাম, কিছু না, বসে আছি। উত্তরে উনি বললেন, দশটার সময় তুমি আমার অফিসে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

আর. জি. কর রোড ও রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের কোণে যে মস্ত বড় বাড়িটা, ওটাই কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। বাড়ির একতলায় ছাপাখানা।

দোতলায় সম্পাদকীয় দপ্তর। আমি যেতে কিশোরীবাবু বললেন, দ্যাখ এখানে বাংলা কাগজ ছাড়া আমাদের তিনখানা ইংরেজি কাগজ আছে—'ইণ্ডাস্ট্রি' 'কমারসিয়াল ইণ্ডিয়া' ও 'ব্রেড্ অ্যাণ্ড ফ্রীডম্'। এছাড়া আমাদের একখানা 'ইয়ার-বুক'ও আছে, নাম 'ইণ্ডাস্ট্রি ইয়ার-বুক' ও অন্যান্য বহু বই আছে। এক জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইনি হীরালালবাবু। ইনিই 'ইণ্ডাস্ট্রি' ও 'ইণ্ডাস্ট্রি ইয়ার-বুক' সম্পাদনা করেন। আর পাশের লোকটিকে দেখিয়ে বললেন, ইনি মণীন্দ্র রায়, ইনি 'ব্রেড্ অ্যাণ্ড ফ্রীডম্'-এর কাজ দেখেন। আর 'কমারসিয়াল ইণ্ডিয়া' সম্পাদনা করতেন রামবাবু, উনি এই খালি টেবিলটায় বসতেন, সম্প্রতি টি.বি.-তে মারা গেছেন। ওটাই তোমার 'সীট'। তোমাকে 'কমারসিয়াল ইণ্ডিয়া' কাগজখানা সম্পাদনা করতে হবে।

প্রতিদিন দশটার সময় কিশোরীবাবু নীচের সম্পাদকীয় দপ্তরে এসে বসেন। তারপর ঘণ্টাখানেক থেকে ওপরে চলে যান। আবার আসেন ছুটির সময়, পাঁচটায়। ঘণ্টাখানেক পরে কিশোরীবাবু ওপরে চলে যাবার পর, হীরালালবাবু আমার সংগে গল্প জুড়ে দিলেন। কাগজে আমার 'Mastery of English' কোর্সের বিজ্ঞাপন দেখেছেন। সেই সম্বন্ধেই ওঁর কৌতূহল, এবং সেই সম্বন্ধেই জানতে চাইলেন। হীরালালবাবুর বলা শেষ হলে, আমার সংগে মণীন্দ্রবাবু গল্প করতে লাগলেন। দেখলাম উনি বেশ ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছেন। তখন দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ চলছে। সন্ত্রাসবাদ নিয়েই আমাদের মধ্যে বেশি আলোচনা হয়। একদিন উনি আমাকে বললেন, এক জায়গায় নিয়ে যাব, যাবেন? বললাম, যাব। তারপর ছুটির পর ওঁর সংগে গেলাম। মেছুয়াবাজার অঞ্চলে নিয়ে গেলেন। একটা বাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন। দেখলাম বাড়িটা মুসলমানী কায়দায় তৈরি। নীচের তলায় ঢুকবার কোন পথ নেই। বাড়ির প্রবেশপথের পাশে সিঁড়ি দিয়ে একেবারে ওপরতলায় যেতে হয়। ওপরতলায় অনেকগুলো বারান্দা ও ঘর পার হয়ে, বাড়ির পিছনদিকের সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে আসতে হয়। এরকম অনেক বাড়ি আমি কলিন স্ট্রীট ও ওর আশপাশের রাস্তায় দেখেছি। তবে সে-সব বাড়ির একতলায় মেয়েরা বাস করে। কিন্তু মণীন্দ্রবাবু আমাকে যে বাড়িটায় নিয়ে গেলেন, সে বাড়িটার নীচের তলায় যখন নেমে এলাম, সেখানে মেয়েমানুষের কোন গন্ধই পেলাম না। নীচের তলার একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তিনি একটা দেওয়াল-আলমারি খুললেন। দেখলাম আলমারিটাতে কেবল একরাশ পুতুল সাজানো আছে। এক কোণের একটা পুতুল সরিয়ে তিনি একটা চাবি ঘুরালেন। তারপর ঠেলা দিতেই পুতুল-সমেত সমস্ত আলমারির ভেতরটা দরজার মত পিছনদিকে খুলে গেল। মণীন্দ্রবাবু আমাকে বললেন, আসুন। আমি

অপরদিকে গেলাম। তারপর একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে এক চোরা সিঁড়ি দিয়ে আমাকে মাটির তলার এক ঘরে নিয়ে গেলেন। দেখলাম, সে ঘরটায় একটা টেবিলের ওপর রয়েছে বহু রিভলবার, পিস্তল, বন্দুক, ছোরা, ছুরি, তরবারি ইত্যাদি। বললেন, এটাই আমাদের অস্ত্রাগার। তারপর আমাকে বের করে এনে কতকগুলো গোলকধাঁধার মত বারান্দা অতিক্রম করে, রাস্তায় নিয়ে এলেন। দেখলাম, যে-রাস্তা দিয়ে ঢুকেছিলাম, এটা সে রাস্তা নয়, অন্য রাস্তা। পথে এসে আমাকে বললেন, জীবনে কখনও এসব কথা কারুকে বলবেন না, তা হলে বিপদে পড়বেন। তারপর মণীন্দ্রবাবু আর কোনদিন 'ইণ্ডাস্ট্রি' অফিসে এলেন না।

এদিকে মণীন্দ্রবাবু না আসায়, কিশোরীবাবু 'ব্রেড অ্যাণ্ড ফ্রীডম্'-এর সম্পাদনার ভারটাও আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। বাবার বন্ধু বলে, কিশোরী বাবুকে কিছু বলতে পারি না। কিন্তু নিজেই বুঝতে পারছিলাম, আমার অতিরিক্ত পরিশ্রম হচ্ছে, শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়ব। এমন সময় ঈশ্বর আমার সহায় হলেন।

এই সময় একখানা চিঠি পেলাম। চিঠিটা লিখেছেন ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের সেক্রেটারী ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ। ভদ্রলোকের নাম আমি আগেই শুনেছিলাম। কয়েক বছর আগে কলকাতায় যখন ইণ্ডিয়ান চেম্বার অভ্ কমার্স স্থাপিত হয়, তখন পুরকায়স্থ মশাই ছিলেন ওর প্রথম সেক্রেটারী। তারপর উনি ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের সেক্রেটারী হয়ে চলে যান।

পুরকায়স্থ মশাইয়ের কাছ থেকে চিঠি পাবার পর, আমি ও'র স্ট্র্যাণ্ড রোডের অফিসে গিয়ে দেখা করলাম। পুরকায়স্থ মশাই বললেন, শুনেছি, আপনি মুদ্রানীতি সম্বন্ধে যে-সব প্রবন্ধ লিখেছেন, তা পড়ে মুগ্ধ হয়ে অধ্যাপক জে. এম. কীইনস্ (পরে লর্ড কীইনস্) নিজে প্রস্তাব করে আপনাকে রয়েল ইকনামিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত করেছেন। 'কমারসিয়াল ইণ্ডিয়া'তেও আমি আপনার লেখা পড়ে অনেক সময় বিস্মিত হই। অর্থনীতিতে আপনার যথেষ্ট প্রতিভা আছে। আপনি শ্যামবাজারে 'ইণ্ডাস্ট্রি' অফিসে পড়ে থেকে কি করবেন? ওখানে 'rot' করবেন তো? আমি বলি, আপনি ক্লাইভ স্ট্রীটে চলে আসুন। ক্লাইভ স্ট্রীটের শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক 'কমারসিয়াল গেজেট' পত্রিকার অ্যাসিস্টাণ্ট এডিটরের একটা পদ খালি আছে। 'কমারসিয়াল গেজেট' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ক্ষেত্রপাল ঘোষ মশাইয়ের সংগে আমার যথেষ্ট খাতির আছে। আপনি যদি রাজি থাকেন, তা হলে আমি আপনার কথা ও'কে বলতে পারি। আমি একটা ইতিবাচক উত্তর দিয়ে চলে এলাম। কয়েকদিন পরেই 'কমারসিয়াল গেজেট' পত্রিকা থেকে একখানা 'অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার' পেলাম।

১১১

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'কমারসিয়াল গেজেট' পত্রিকায় যোগ দিলাম। দেখলাম ক্লাইভ স্ট্রীটে 'কমারসিয়াল গেজেট'-এর দোর্দণ্ড প্রতাপ। ক্লাইভ স্ট্রীটে তখন আরও তিনখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল—'ক্যাপিটাল', 'কমার্স' ও 'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স'। সকলকেই 'কমারসিয়াল গেজেট'-এর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হটে গিয়ে 'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স' ন'মাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও'র স্বত্বাধিকারী ও ম্যানেজিং এডিটর সি. এস. রংগস্বামী ছিলেন তৎকালীন ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জন শুস্টার ও ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেকটর স্যার অসবোর্ন স্মিথের বন্ধু। তাদের উৎসাহে ও সহায়তায় 'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স' পুনরায় বের হতে শুরু করেছে, এমন সময় আমি 'কমারসিয়াল গেজেট' পত্রিকায় যোগ দিলাম। কিন্তু 'ক্যাপিটাল' ও 'কমার্স'-এর তখন মুমূর্ষু অবস্থা। ইওরোপিয়ান ব্যবসায়ীদের সংঘ বেংগল চেম্বার অভ্ কমার্স-এর চেষ্টায় এক নতুন কোম্পানি গঠিত হল 'ক্যাপিটাল' পত্রিকা চালাবার জন্য। আর অসহায় অবস্থায় 'কমার্স' হল পলাতক। বোম্বাইয়ে গিয়ে সে নতুন আস্তানা গাড়ল।

এরকম এক প্রতাপশালী পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে স্থান পেয়ে আমি নিজে খুব আনন্দিত হলাম। উৎসাহের সংগে কাজ করতে লাগলাম। সহকর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতা পেলাম। সহকর্মীদের মধ্যে পেলাম নৃপেন্দ্রমোহন গুহ ও অনিলেশ্বর রায়কে। দুজনেই অভিজ্ঞ সাংবাদিক। নৃপেনবাবু ছিলেন ইস্ট বেংগল ক্লাবের সেক্রেটারী। সেইসূত্রে ইস্ট বেংগল ক্লাবের খেলোয়াড়রা অনবরতই নৃপেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসত। আমিও তাদের সংগে পরিচিত হলাম। অফিস চালান যতীন লাহিড়ী, আর অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার হচ্ছেন একজন খাস ইওরোপীয়ান—কিংগ্ সাহেব। মালিক ক্ষেত্রবাবু অত্যন্ত সবল ও সৎ প্রকৃতির লোক। ভীষণ বিবেকবাদী। বিবেকের বশবর্তী হয়ে নিজ স্ত্রীকেই ত্যাগ করেছিলেন। আমরা 'কমারসিয়াল গেজেট' অফিস থেকে প্রতিমাসে নিয়মিত সেই ভদ্রমহিলাকে তাঁর পিত্রালয়ে মাসহারা পাঠাতাম। কিন্তু কোন রকম চিঠিপত্রাদি কখনও বিনিময় হত না।

১১২

আমি যখন 'কমারসিয়াল গেজেট' পত্রিকায় যোগদান করলাম, তখন 'কমারসিয়াল

গেজেট অফিস অবস্থিত ছিল পাঁচ নম্বর পোলক স্ট্রীটে। আমাদের অফিসের বিপরীতদিকে অবস্থিত ছিল সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের মেট্রপলিটান ইনসিওরেন্স কোম্পানি। সচ্চিদানন্দবাবুর সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। ওখানেই পরিচিত হয়েছিলাম ড. নলিনাক্ষ সান্যাল মশাইয়ের সঙ্গে। তিনি তখন মেট্রপলিটান ইনসিওরেন্স কোম্পানির উপদেষ্টা। সবেমাত্র তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এচ.ডি. ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরেছেন। একজন আমাকে সাবধান করে দিলেন। বললেন, ওখানে যাবেন, যান, কিন্তু সান্যাল মশাইয়ের সঙ্গে বেশি তর্কাতর্কি করবেন না। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? বললেন, ওঁর ট্রাউজারের পকেটে সবসময় ছোরা থাকে, যেকোন সময়ে দেবেন বসিয়ে। আমি কিন্তু কোন দিন তা দেখিনি।

আমাদের 'কমার্সিয়াল গেজেট' পত্রিকা ছাপবার জন্য ক্ষেত্রবাবুর নিজের ছাপাখানা ছিল। ছাপাখানাটা ছিল পারশিবাগানে। সারকুলার রোড দিয়ে ঢুকলে ডানদিকের প্রথম বাড়িটাতে। বাড়িটার পিছনেই ছিল আচার্য জগদীশ চন্দ্রের বিজ্ঞান-মন্দির। আর সামনে ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজ। ওই সায়েন্স কলেজেরই ওপরতলাতে থাকতেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। প্রায়ই ওঁকে দেখতাম লুঙ্গি-পরা অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে। ওঁর একটা মস্ত বড় মগ ছিল। যখন চা খেতেন তখন এক মগ চা খেতেন।

পারশিবাগানে 'কমারসিয়াল গেজেট প্রেস'-এর দু চারখানা বাড়ির পশ্চিমেই ছিল রাজশেখর বসু মশাইয়ের বাড়ি। তখন সারকুলার রোডে ট্রাম হয়নি। সেজন্য 'কমারসিয়াল গেজেট প্রেস' এ যাবার জন্য আমাদের নামতে হত ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির সামনে। তারপর সমস্ত বেচু চাটুজ্যে স্ট্রীট ও পঞ্চানন ঘোষ লেন অতিক্রম করে আমাদের ছাপাখানায় পৌঁছাতে হত। যাবার সময় ওই রাজশেখর বাবুর বাড়ির সামনে দিয়েই যেতে হত।

কমারসিয়াল গেজেট প্রেসটা দেখাশোনা করতেন ক্ষেত্রবাবুর ছোট ভাই শচীন বাবু। উনি ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গেই ওই প্রেস বাড়ির দোতলায় থাকতেন। ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে আরও থাকতেন ওঁর বড় ভাই রাজেন্দ্রবাবু। রাজেন্দ্রবাবু ছিলেন একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত। বেদান্ত সম্বন্ধে ওঁর অনেক বই আছে। গীতার একখানা বড় রকমের ভাষ্যও লিখেছিলেন। কলকাতার অনেক বড় বড় পণ্ডিত রাজেন্দ্রবাবুর কাছে বেদান্ত সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে আসতেন। এটা আমরা রোজই দুপুরে দেখতাম।

কমারসিয়াল গেজেট প্রেস-এর পাশের বাড়িটা ছিল শচীনবাবুর শ্বশুর-বাড়ি। ওটাই আবার পরবর্তীকালের 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সম্পাদক

সুধাংশুকুমার বসুর মামার বাড়ি। সুধাংশুবাবু মামার বাড়িতেই মানুষ হয়েছিলেন। আমরা যখন 'কমারসিয়াল গেজেট প্রেস'-এ যেতাম, সুধাংশুবাবুর তখন অল্প বয়স। কাপড়ের খুঁটটা গায়ে দিয়ে উনি আমাদের প্রেস-বাড়িতে আসতেন খবরের কাগজ পড়বার জন্য। ওখানেই সুধাংশুবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আরও অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। যাঁরা নিয়মিত ওখানে আসতেন, তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন সুরেশচন্দ্র রায়। তাঁর 'ইনসিওরেন্স ওয়ার্লড' নামে একখানা কাগজ ছিল। ওটা আমাদের কমারসিয়াল গেজেট প্রেসেই ছাপা হত। তা ছাড়া 'কমারসিয়াল গেজেট প্রেস'-এ নলিনীরঞ্জন সরকারের 'হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ ইনসিওরেন্স কোম্পানি'র যাবতীয় ছাপার কাজ হত। সুরেশচন্দ্র রায় তখন ছিলেন হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্সের একজন পদস্থ অফিসার। এই দুই সূত্রেই সুরেশবাবু আমাদের প্রেসে আসতেন। পরে সুরেশবাবু 'আর্যস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানি' নামে নিজ কোম্পানি গঠন করেছিলেন। সুরেশবাবু কলকাতার শেরিফও হয়েছিলেন। সুরেশবাবুর সঙ্গে আমাদের রীতিমত পরিচয় ছিল। আরও পরিচয় ছিল ওঁর বড় ভাই পূর্ণবাবুর সঙ্গে। পূর্ণবাবু ছিলেন 'হিন্দু মিউচ্যুয়াল ইনসিওরেন্স কোম্পানি'র কর্ণধার।

পাশাপাশি বাড়ি বলে আরও আসত আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষকরা। তারা বেশ জমাটি করে আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিত এবং আচার্য জগদীশচন্দ্রের নামে কুৎসা রটনা করত। আমরা শুনতাম, কিন্তু কোনও মন্তব্য করতাম না।



এবার 'কমারসিয়াল গেজেট'-এর পোলক স্ট্রীটের অফিসের কথা বলি। আমি যাবার পর ওখানে অবশ্য আমরা বেশিদিন থাকিনি। শীঘ্রই আমরা দু'নম্বর রয়েল একস্‌চেঞ্জ প্লেসে উঠে গেলাম। দোতলার প্রশস্ত হলটায় আমাদের অফিস হল। আর তিনতলাটা দখল করল বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অভ্ কমার্স। শীঘ্রই দোতলার সঙ্গে তিনতলার স্থাপিত হল হার্দিক সম্পর্ক। দুপুরবেলা টিফিনের সময় তিনতলাটাই ছিল আমাদের আড্ডা দেবার জায়গা, সেক্রেটারী জিতেন সেনগুপ্ত ও অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারী সুধীশ বিশ্বাসের সঙ্গে। ওখানে আরও অনেকে সম্মিলিত হত। দেবেন ঘোষ, মুকুল গুপ্ত, বিনোদ বিশ্বাস, ক্লিটাস, বিনয়েন্দ্র ব্যানার্জি, নলিনাক্ষ সান্যাল, নীহার মুখুজ্যে প্রমুখ। সকলেই

অনুরাগ একই বিষয়ে। দেশের অর্থনীতি সম্বন্ধে। সময়টা ছিল সারা বিশ্বের আর্থিক দুর্গতির যুগ। এর সূচনা হয়েছিল ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে, যখন আমেরিকার ওয়াল স্ট্রীটে অবস্থিত জগতের সেরা শেয়ার-বাজার ভেঙে পড়ে। এর পদক্ষেপে সারা বিশ্বের অর্থনীতি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড স্বর্ণমান (gold standard) পরিহার করে। তাতে পরিস্থিতিটা আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বের সব দেশেই বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, এবং জিনিসপত্তরের দাম দ্রুত পড়ে যায়। চলমান পরিস্থিতির অবনতি নিয়েই আমাদের মধ্যে আলোচনা হত। একদিন এরকম আলোচনা চলছে, হঠাৎ ঘর-শুদ্ধ সব কেঁপে উঠল। দিনটা হচ্ছে ১৪ জানুয়ারী ১৯৩৪। সকলেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, ভূমিকম্প! ভূমিকম্প! কম্পন ক্রমশ বেড়ে উঠল। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে রাস্তার দিকে ছুটলাম। সেদিনের সে ভয়াবহ দৃশ্য আমার মনে এখনও জ্বলজ্বল করছে। আমাদের দু'নম্বর রয়েল একসচেঞ্জ প্লেসের বাড়িটা তৈরি করেছিলেন কলকাতার প্রখ্যাত ধনী গলস্টন সাহেব। বাড়িটা বিলাতী কায়দায় তৈরি হয়েছিল। ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত বাড়ির সমস্ত সিঁড়িটা কাঠের তৈরি। আমরা যখন ওপর থেকে নীচে নামছিলাম, তখন দেখলাম সমগ্র সিঁড়িটাই দেওয়াল থেকে এক হাত খুলে বেরিয়ে আসছে, আবার দেওয়ালের ভেতরে চলে যাচ্ছে! আমরা সবাই সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে নামতে নামতে দেখতে পাচ্ছি যে দেওয়ালের দিকে সিঁড়ির পাশটাতে এক হাত করে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। তারপর রাস্তায় নেমে এসে দেখি এক ভয়াবহ ব্যাপার। একদিক থেকে চাটার্ড ব্যাংক বিলডিং-টা ঝুঁকে পড়ে রাস্তার মাঝখান পর্যন্ত এগিয়ে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। আর রাস্তার অপর দিক থেকে আলাহাবাদ ব্যাঙ্ক বিলডিং টাও ঠিক অনুরূপভাবে রাস্তার মাঝখান পর্যন্ত ঝুঁকে এগিয়ে আসছে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, দুটো বাড়ির মাথা পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে চুরমার হয়ে যাবে। কয়েক মিনিট ধরে ওই ভয়াবহ কাণ্ড চলতে লাগল। পরের দিন খবরের কাগজে দেখি ওই ভূমিকম্পে বিহারের মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, জামালপুর প্রভৃতি কয়েকটা শহর বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। দশ হাজার লোক এই ভূমিকম্পে মারা গিয়েছিল।

এই সময় ভয়াবহ আরও অনেক কাণ্ড ঘটল। কলকাতায় ঝিনঝিনিয়া নামে একরকম রোগের প্রাদুর্ভাব হল। লোক রাস্তা দিয়ে চলছে, হঠাৎ তার সমস্ত দেহটা ঝিনঝিন করে উঠল। তারপর রাস্তায় পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু ঘটল। কে পড়ল, কে মরল, সনাক্ত করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। সহজে সনাক্ত করার জন্য, রেলের কুলিরা যেমন ওপর-হাতে নম্বর-ওয়ালা পিতলের চাকতি তাবিজের মত করে

বাঁধে, তেমনই লোক নিজের ওপর-হাতে নাম-ঠিকানা লেখা ওইরকম পিতলের চাকতি বাঁধল। আবার মহামারীরূপে দেখা দিল বেরিবেরি রোগ। আমার স্ত্রী ও এই রোগে আক্রান্ত হল। কয়েকমাস জীবন-মৃত্যুর সংগে লড়াই করে ও চিকিৎসার শ্রাদ্ধ করে তাকে বাঁচিয়ে তুললাম। কিন্তু সেই সময় তার শরীরের যে পতন ঘটল, তা সারাজীবন তার সাথী হয়ে দাঁড়াল।

১১১

ক্লাইভ স্ট্রীটে এসে একটা জিনিস শিখলাম। এতকাল অর্থনীতির যে-সব বই পড়ে এসেছি সে-সব বইয়ে পড়া তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব জগতের অর্থনীতির মিল খুব কম। যে-সব বই পড়ে ক্লাইভ স্ট্রীটে এসেছিলাম, সেগুলি হচ্ছে মারশালের 'ইকনমিকস্ অভ্ ইনডাস্ট্রি' ও 'প্রিনসিপলস্ অভ্ ইকনমিকস্' ইত্যাদি। পরে পিগুর বই, এবং আরও পরে স্যামুয়েলসনের 'ইকনমিকস্'ও পড়েছিলাম। আমি যখন ক্লাইভ স্ট্রীটে এলাম তখন কীইনস্ এর 'ট্রিটিজ অন মনি' বইটা সবেমাত্র বেরিয়েছে। তার আরও পরে বেরুল তাঁর 'জেনারেল থিওরি'। দেখলাম এসব বইয়ে যে সব তত্ত্বের কথা লেখা আছে, সে-সব তত্ত্বের সংগে বাস্তব জগতের অর্থনীতির সম্পর্ক খুব কম। বুঝলাম, বেসাদৃশ্যের কারণ মাত্র একটাই। এসব বইয়ে অর্থনৈতিক তত্ত্ব বা 'থিওরি' রচনার সময় একটা স্থিতিমান (Static) পরিস্থিতি ধরে নেওয়া হয়। আর বাস্তব ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটা হচ্ছে চলমান (dynamic)। এই কারণেই কেতাবী অর্থনীতির সংগে প্রকৃত ব্যবসাজগতের অর্থনীতির মিল খুব কম।

মনে পড়ে গেল বিনয় সরকার মশাইয়ের বুলি : "ওহে. গোলদিঘির জল নিয়ে গিয়ে লালদিঘিতে ঢাল"। তার মানে তিনি বলতে চাইতেন যে গোলদিঘির জল (theory) আর লালদিঘির জল (practice) এক নয়। একটার সংগে আর একটা মেশাতে হবে। তবেই বাস্তব অর্থনীতির সন্ধান পাওয়া যাবে। এসব কথা তিনি বলতেন তাঁর আখড়ায়। তাঁর আখড়ার নাম ছিল 'বংগীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ'। এ আখড়া নিয়মিত বসত আমহার্স্ট স্ট্রীটে নরেন লাহা মশাইয়ের বাড়ির নীচের তলার দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে। সে ঘরটা আজ আর নেই। রূপান্তরিত হয়ে সে-ঘরটা আজ হয়েছে 'আজকাল' সংবাদপত্রের অফিস।

আমরা বিনয় সরকার মশাইয়ের আখড়ায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতাম। অনেকেই আমাদের মধ্যে ছিলেন। একদিকে যেমন কলেজের পড়ুয়া ছাত্ররা ছিল, অপরদিকে তেমনই ছিল পেশাদারী লোকরা, হাকিম থেকে ডাক্তার পর্যন্ত।

ড. নরেন লাহাও থাকতেন। যাঁরা উপস্থিত থাকতেন, তাঁদের মধ্যে বয়সের দিক দিয়ে সকলের বড় ছিলেন ডাক্তার সরসীলাল সরকার, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কানাই সরকার মশাইয়ের বাবা। বিনয় সরকার মশাইয়ের ধনবিজ্ঞান পরিষদের বৈঠকে নানা বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হত। সবই বাস্তব জীবনের সমস্যা। সকলেই আগ্রহের সঙ্গে এই আলোচনায় যোগ দিতেন।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। ক্লাইভ স্ট্রীটে এসেই প্রথম উপলব্ধি করলাম ইকনমিক থিওরির সঙ্গে প্র্যাকটিসের গরমিল। আগেই বলেছি এর একমাত্র কারণ, কেতাবী স্থিতিমান (static) অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে ব্যবসা-জগতের চলমান (dynamic) অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পার্থক্য। সুতরাং বুঝলাম যে বিনয় সরকার মশাইয়ের কথামত গোলদিঘির জলের সঙ্গে লালদিঘির জল মেশাতে হবে। এই মেশানোর ফলেই উদ্ভূত হল 'অ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস' বা ফলিত অর্থনীতি। ফলিত অর্থনীতির চর্চা শুরু করলাম। সেই চর্চার ফলশ্রুতিতে লিখে ফেললাম 'Public Expenditure and Taxation in India', 'What Price the Ottawa Agreement?' ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (রিজার্ভ ব্যাংক অভ্ ইণ্ডিয়া) প্রয়োজনীয়তা, সাম্রাজ্যিক পাক্ষনীয় নীতির (ইম্পিরিয়াল প্রেফারেনস্) বিলোপ ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা, জীবনবীমা কোম্পানিসমূহকে দুর্নীতি মুক্ত করবার জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনানস্ করপোরেশন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, ইউনিট ট্রাস্ট স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, বিলডিং সোসাইটি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি বিষয়ে ত্রিশের দশকে নানা প্রবন্ধ লিখলাম যা তৎকালীন অর্থনৈতিক জগতে সাড়া জাগালো। এই প্রস্তুতি নিয়েই আমি শুরু করলাম আমার ক্লাইভ স্ট্রীটের জীবন।

ꕥ ꕥ ꕥ

একদিন এক মাদ্রাজি ছোকরা আমাদের 'কমার্সিয়াল গেজেট' অফিসে এসে হাজির। আমার সঙ্গেই দেখা করতে চায়। পরিচয় দিল: আমার নাম এম. এস. নটরাজন। বলল, আমি দিনের বেলা 'ইণ্ডিয়ান ফিনানস্' অফিসে সহকারী সম্পাদকের কাজ করি, আর সকাল সন্ধ্যায় আনন্দীলাল পোদ্দারের একান্ত সচিবের কাজ করি। আনন্দীলাল পোদ্দার তখন কলকাতার মেয়র। নটরাজন আমাকে বলল, 'ইণ্ডিয়ান ফিনানস্'-এর সম্পাদক সি. এস. রংগস্বামী আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান, আপনি কবে যাবেন বলুন, আমি আপনাকে এসে নিয়ে

যাব। তারিখ দিলাম। নির্দিষ্ট দিনে ওর সঙ্গে গেলাম। বেঁটে-সেঁটে লোক, সাহেবদের মত ফরসা, আর ব্যবহারে নিখুঁত ভদ্রলোক। খুব বেশি পান খান, এক বিশেষ রকমের সুপারি দিয়ে। আমাকে কফি ও পান দিয়েই আপ্যায়ন করলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে আমাদের মধ্যে নানারকম আলাপ-আলোচনা হল। সেদিনের সেই আলাপই পরবর্তীকালে রঙ্গস্বামী ও আমার মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হল। ওখানে শ্রীনিবাস ও শেষন নামে সম্পাদকীয় মণ্ডলীর আর দু'জনের সঙ্গেও আলাপ হল। সকলেই তাদের ব্যবহার ও হৃদ্যতা দিয়ে আমাকে ওদের আপনজন করে নিল।

তারপর থেকে আমি প্রায়ই 'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স' অফিসে যাই। নটরাজনও প্রায় প্রত্যহ আমাদের 'কমারসিয়াল গেজেট' অফিসে আসে। আমাদের দু'জনের মধ্যে প্রবাদ বাক্যের মত বন্ধুত্ব গজিয়ে উঠল। তখনকার দিনে ভারতের মূলধনের বাজারের গঠন ও কার্য সম্বন্ধে আমার মত জ্ঞান ক্লাইভ স্ট্রীটে আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির ছিল না। একদিন আমি নটরাজনকে বললাম, তুমি দক্ষিণ ভারতের মূলধনের বাজার সম্বন্ধে একখানা থিসিস পি এচ-ডি ডিগ্রির জন্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ কর। আমি তোমাকে সাহায্য করব। নটরাজন তাই করল, এবং পি এচ-ডি ডিগ্রি পেয়ে গেল। এই ডিগ্রির ব্যাপার উপলক্ষেই নটরাজন দেশে গেল, এবং সেই সুযোগে বিয়ে করে ফেলল।

নটরাজন বউকে নিয়ে কলকাতা ফিরল। প্রতাপাদিত্য রোডে সবেমাত্র তৈরি হয়েছে, এরকম একখানা একতলা বাড়ি মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় ভাড়া নিয়েছে। একদিন আমাকে বলল, চল আমার বউকে দেখে আসবে চল। গেলাম। দেখলাম চোদ্দ পনেরো বছরের একটি মেয়ে। তামিল মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দেয় না। সুতরাং সমস্ত মুখখানাই খোলা। রঙ ফরসা, দেখতে সুশ্রী। মেয়েটি ইংরেজি জানে না, হিন্দিও জানে না। মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্যালফ্যাল করে বসে রইল। তারপর নটরাজন তামিল ভাষায় বউকে কি বলল। তখন মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একবার সপ্রতিভভাবে ফিক্ করে হেসে ফেলল। তারপর মেয়েটি কফি বানাল। কফির কাসার বাটিটা আমার সামনে এনে রাখল। আমরা তো পরস্পরের ভাষা জানি না, সুতরাং নির্বাক হয়েই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নটরাজনের সঙ্গে আমি খানিকক্ষণ গল্প করে চলে এলাম।

নটরাজন বিয়ে করেছে। ভালই করেছে। কিন্তু ঝামেলাটা বাধল আমার। কয়েকদিন পরে নটরাজন 'কমারসিয়াল গেজেট' অফিসে এসে আমাকে বলল, সুর, যদি কিছু না মনে কর, তা হলে তোমাকে একটা অনুরোধ করি। আমি বললাম, বলো না। নটরাজন বলতে শুরু করল, দ্যাখ বউকে তো কলকাতায় নিয়ে

এসেছি, কিন্তু মহা বিপদে পড়েছি। ও তো ওর গর্ভধারিণীর ভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষা জানে না; কখন কে বাড়িতে ঢুকে পড়বে, কি বিপদ ঘটবে কে জানে! সেজন্য আমি সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার সময় বাড়ির সদর দরজায় তালা লাগিয়ে আসি, আর সেই রাত্তির ন'টার পর বাড়িতে ফিরে গিয়ে তালা খুলি। সারাদিন ও বাড়িতে বন্দী হয়ে একা একা থাকে। ওর এটা ভাল লাগছে না। সেজন্য বলছি, আমি দুপুরবেলা তোমার কাছে চাবিটা রেখে যাব, তুমি চারটের সময় অফিসের ছুটির পর আমার বাড়ি চলে যাবে। তাতে অন্তত তিন-চার ঘণ্টার জন্য ও একজন সংগী পাবে। আমি বিপদ গুনলাম, বললাম, দ্যাখ আমি তো তামিল জানি না, আমি ওখানে গিয়ে কি করব? তুমি বরং তোমার দেশের কারুকে বলো সে তোমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবে। নটরাজন বলল, দ্যাখ আমি তোমাকে ছাড়া আর কারুকে বিশ্বাস করি না। তা, তুমি যাবে কিনা বলো? দেখলাম, নটরাজন বেশ চটে গিয়েই আমাকে কথাগুলো বলল। অগত্যা আমাকে রাজি হতে হল।

বিকালে যেতেই নটরাজনের বউ ইংগিতে আমাকে বসতে বলল। কফি বানিয়ে এনে আমাকে দিল। তারপর আমার সামনের চেয়ারটায় বসে রইল। এভাবে ঠায় রাত্তির নটা পর্যন্ত, নটরাজন বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা বসে রইলাম। দু'জনেই নির্বাক। কেবল ভয় হতে লাগল, ইঙ্গিতে কিছু বলতে গেলে ও যদি ভুল বুঝে বসে। তা হলে, নটরাজনের সংগে আমার বন্ধুত্ব চিরকালের মত ঘুচে যাবে।

পরদিন নটরাজন আমার অফিসে এসে আমাকে অনেক ধন্যবাদ জানাল। জিজ্ঞাসা করলাম, তা, তোমার বউ কি বলল? —তুমি গিয়েছ বলে সে খুব খুশি। আমি বললাম, ওসব বাজে কথা ছাড়। দ্যাখ এরকম চলতে পারে না। আমি কোনরকম ইংগিত করলে ও ভুল বুঝতে পারে। ওর মুখের দিকে তাকালেও ও ভুল বুঝতে পারে। আমি আর যেতে পারব না।

আমার কথা শুনে নটরাজন বেশ দমে গেল। তারপর দু'জনে বসে এ সমস্যার একটা সমাধান বের করবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

আমার মাথায় একটা idea খেলে গেল। সে সময় ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি. কে. অগডেন 'বেসিক ইংলিশ' নামে এক নতুন ভাষা সবেমাত্র উদ্ভাবন করেছেন। ইংরেজি ভাষার মাত্র ৭৫০টা শব্দ ব্যবহার করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব ভাবই প্রকাশ করা যায়।

নটরাজনকে আমি বললাম, দ্যাখ, আজ আর আমি তোমার বাড়ি যাব না। কাল আমি বাড়ি থেকে আমার 'বেসিক ইংলিশ' এর বইখানা নিয়ে আসব। আমি

তোমার বউকে কাল থেকে ইংরেজি শেখাব। তোমার বউ একবার ইংরেজিটা শিখতে পারলে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে আড়ষ্টতাটা কেটে যাবে। তখন আমরা পরস্পর কথা বলতে পারব। তুমি তোমার বউকে আজ কথাটা বলে রাখবে।

পরের দিন নটরাজনের বাড়ি গিয়ে ওর বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ওর ইংরেজি শেখবার জন্য দারুণ উৎসাহ। সেদিন ওকে উত্তম পুরুষ একবচন (I) ও বহুবচন (we) ও প্রথম পুরুষ এক বচনটা (he) শেখালাম। আমি আমার বুকে হাত রেখে বললাম 'আই'। ইংগিত করে ওকে উচ্চারণ করতে বললাম। তারপর আমাকে, আর ওকে দেখিয়ে বললাম 'উই'। তারপর নটরাজনের নাম উল্লেখ করে বললাম 'হি'। বারংবার উচ্চারণ করে ও এই তিনটা শব্দ বেশ রপ্ত করে ফেলল। রাত্তিরে নটরাজন বাড়ি ফিরে এলে, ওর উল্লাস আর ধরে না! তামিল ভাষায় নিজেকে দেখিয়ে বলল 'আই', আর আমাকে দেখিয়ে বলল 'হি', আর নিজেকে ও নটরাজনকে দেখিয়ে বলল 'উই'। নটরাজন তো দেখে অবাক। আমি নটরাজনকে বললাম, তুমি এই বইটার শব্দগুলোর পাশে তামিল প্রতিশব্দ লিখে রাখবে। আমি ওকে এখন কেবল শব্দ-পরিচয় ও উচ্চারণ শেখাব। পরে ওকে বর্ণপরিচয় শেখাব। কিন্তু মেয়েটা খুবই চালাক। আমাকে আর বর্ণপরিচয় শেখাতে হল না। ও নিজে নিজেই দুপুরবেলা ওর অবসর সময়ে বর্ণপরিচয়টা শিখে ফেলল।

একমাসের মধ্যেই ও 'বেসিক ইংলিশ' আয়ত্ত করে ফেলল। তখন আমরা স্বচ্ছন্দে ইংরেজিতে কথা বলতে লাগলাম। দেখলাম মেয়েটা খুব কৌতুক ভালবাসে। প্রায়ই ইংরেজিতে ঠাট্টা-তামাশা আরম্ভ করল।

কিন্তু বেশিদিন আমাদের ঠাট্টা-তামাশার আসর চলল না। নটরাজন একটা ভাল চাকরি পেয়ে দিল্লি চলে গেল।

SSS

উত্তরভারতে লালা দেওয়ানচাঁদ নামে এক বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অনেক পড়াশোনা ছিল। তিনি প্রায়ই লক্ষ্য করতেন যে কেন্দ্রীয় বিধান সভার সদস্যরা সঠিক তথ্যের অভাবে সরকারী পক্ষের কোন বক্তব্যের উত্তর দিতে পাবে না। সেজন্য তিনি কেন্দ্রীয় বিধান সভার সদস্যদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের জন্য দিল্লির ফিরোজশাহ রোডে একটা সংস্থা স্থাপন করেন। নাম 'দেওয়ানচাঁদ পলিটিক্যাল ইনফরমেশন ব্যুরো'। ১৯৩৫ সালে নটরাজন ওই সংস্থার ডিরেক্টর নিযুক্ত হল। দিল্লিতে যাবার পর নটরাজন ও ওর বউয়ের সংগে

আমার প্রায় চিঠি-বিনিময় হত। কিন্তু নটরাজনের বউ একটা জিনিস আমার কাছে গোপন রেখে যেত। সেটা দিল্লিতে যাবার পর আমি জানতে পারলাম।

আমি দিল্লিতে প্রথম যাই ১৯৩৮ সালে। গিয়েছিলাম অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর মুখপত্র 'লিসনার' পত্রিকার সম্পাদকের পদের জন্য 'ইনটারভিউ' দিতে।

আমি দিল্লি যাচ্ছি শুনে নটরাজন ও ওর বউ আমাকে ওদের ওখানে থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানালো। কিন্তু বিকাল চারটার সময় দিল্লি মেল যখন দিল্লিতে গিয়ে পৌঁছাল ও ট্রেন থেকে সকলেই নামল, তখন সমস্ত প্লাটফরমটা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। নটরাজনকে আমি ভিড়ের মধ্যে খুঁজে পেলাম না। এত ভিড় যে খুঁজে না পাবারই কথা। আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাবার গেটের সামনে গিয়ে দাড়ালাম। ভাবলাম, সব লোক বেরিয়ে গেলে নটরাজনকে ওখানেই পাব। আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় চোদ্দ পনেরো বছর বয়সের এক বাঙালী ছোকরা গেটের ওপাশ থেকে আমাকে বলল, আপনি এদিকে আসুন, বলেই গেটের ভেতর ঢুকে আমার সুটকেসটা আমার হাত থেকে প্রায় কেড়েই নিল। তারপর বলল, আপনি আসুন, আপনার জন্য টাঙ্গা 'রেডি' আছে। আমি খানিকটা ভড়কে গেলাম। তবুও ওকে অনুসরণ করে টাঙ্গায় গিয়ে বসলাম। ছোকরা টাঙ্গাওয়ালাকে বলল, টমসন রোড নিয়ে চল। সে আবার কোথায়? খুব বিব্রত হয়ে পড়লাম। ওকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছি, এমন সময় ও নিজেই বলতে শুরু করল, দাদাবাবু আপনার বর্ণনা দিয়ে কলকাতা থেকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন, আমরা যেন স্টেশন থেকে আপনাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাই এবং আপনার বিশেষ যত্ন নিই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার দাদাবাবু কে? সে উত্তর দিল, কেন, তারক দাস। এই তো পনেরো দিন আগে আমার মেজদির সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়েছে।

তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। এটা তারকের কীর্তি। তারক আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পড়ত। এখন সে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ফটোগ্রাফার। আমার সঙ্গে খুবই সোহার্দ্য। ফটোগ্রাফ তুলে আনে, আর 'নিশানাথ কেবিন' নামে চায়ের দোকানে বসে আমাকে দিয়ে ছবিগুলোর caption লিখিয়ে নেয়। মাত্র পনেরো দিন আগে তারকের বিয়ে হয়েছে। তারক দিল্লিতে বিয়ে করতে আসেনি। ওর শ্বশুরমশাই মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় এসেছিল, এবং তারকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে, আবার দিল্লিতে ফিরে গিয়েছিল। তারকের শ্বাশুড়ী-ঠাকরুন বা তারকের শালা-শালীরা কেউই তারককে দেখেনি। সেক্ষেত্রে তারক যে আমার অগোচরে এমন একটা কাণ্ড করে বসবে, তা আমার কল্পনাতীত।

তারকের শাশুড়ী-ঠাকরুন আমাকেই বিকল্প জামাই হিসাবে গ্রহণ করলেন।

আমি ও'কে 'মা' ব'লেই সম্বোধন করলাম। তারকের শালা-শালীরা নতুন জামাই এলে যে-সব কাণ্ড করে, সেইসব কাণ্ড করে বসল। দশদিন দিল্লিতে ছিলাম, ও-দশদিন তারকের পরিবর্তে আমিই জামাইয়ের আদর পেলাম।

সেটা ডিসেম্বর মাসের শেষদিক। দিল্লিতে সেবার প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আমি তো দিল্লির ঠাণ্ডা জল কি, তা দিল্লিতে দশদিন থেকেও জানতে পারলাম না। সব সময়ই ও'রা আমার জন্য গরম জল তৈরি রাখতেন। এমনকি পায়খানা যাবার জন্যও। রাত্তিরে বিছানার তলায় 'আংগেটি" জ্বালিয়ে দিত, যাতে ঠাণ্ডায় না কষ্ট পাই।

তারকের শ্বশুরমশাই হরিপদবাবু পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করতেন। সেজন্যই টমসন রোডে ও'দের বাড়ি। কেননা, টমসন রোডের সব 'বাংলো' বাড়িগুলোই পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের কর্মীদের জন্য তৈরি। সব বাড়িগুলোরই একরকম চেহারা। বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই, কোনটা কার 'বাংলো'।

সেজন্য সন্ধ্যাবেলা যখন আমি একবার বাড়ি থেকে বেরুতে যাচ্ছি, তখন তারকের বড় শালী আমাকে সাবধান করে দিল, দেখবেন বাড়ি হারিয়ে ফেলবেন না। আমি হেসে উঠে বললাম, না গো, না, আমাকে এত বোকা ভেব না যে, বাড়ি হারিয়ে ফেলব।

বেশীদূর গেলাম না। টমসন রোডের শেষেই জি-আই পি- রেলের ব্রিজ। তারপরই দিল্লির সবচেয়ে বড় ও আভিজাত্যসম্পন্ন হোটেল 'হোটেল মেরিনা'। হোটেলের নীচেই দেখলাম একটা মস্ত বড় 'কাফে'। বাইরে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'ড্রিঙ্ক কফি'। ঢুকে পড়লাম। সামনের এক টেবিলে গিয়ে বসলাম। সংগে সংগেই 'বয়' এসে এক 'পট' কফি দিয়ে গেল। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। কফিটা খেয়ে শরীরটা খানিকটা গরম হল। বয় বিল নিয়ে আসবে, সেই অপেক্ষায় বসে আছি। এমন সময় বয় এসে জিজ্ঞাসা করল, আর এক পট কফি দেবে কিনা। ঠাণ্ডার দিন। আর এক পট কফি খেলে মন্দ লাগবে না ভেবে, দিতেই বললাম। আর এক পট কফি খেলাম। তারপর উঠে গিয়ে ম্যানেজারকে বললাম, আমার বিলটা দিন। ম্যানেজার বলল, আপনার পয়সা লাগবে না। এটা ইণ্ডিয়ান কফি সেস্ কমিটির প্রতিষ্ঠান। এখানে কফি খেলে পয়সা লাগে না।

বাড়ির দিকে রওনা হলাম। বাড়ি আর কিছুতেই ঠিক করতে পারি না। দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াই। এমন সময় বাড়ির দরজার বাইরে বেরিয়ে এল তারকের বড় শালী। বলল, ঠিক হয়েছে, যাবার সময় যে বড্ড হেসেছিলেন!

হরিপদবাবুর সুখী পরিবার। বড় মেয়ে পূর্ণিমার এখনও বিয়ে হয়নি।

মাত্র মেজ মেয়ে নীলিমারই তারকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। ছোট মেয়ে সুষমা বিয়ের যোগ্য হয়েছে। আমি পূর্ণিমাকে বড়দি বলে ডাকতাম, আর সুষমাকে ছোড়দি। সেই অজুহাতে তারকের স্ত্রী নীলিমা আমার মেজদি হল। আর সব পুত্রসন্তান। বড়ছেলে চিত্ত। সে-ই ক'দিন আমার সঙ্গে থেকে দিল্লির সব জায়গা ঘুরিয়ে নিয়ে এল।

সন্ধ্যাবেলা হরিপদবাবু বাড়ি ফিরে গল্প জুড়ে দিলেন। রাত্তিরে খাঁ সাহেব এলেন সুষমাকে গান শেখাবার জন্য। খাঁ সাহেব দিল্লির একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ। দিল্লির বেতার কেন্দ্রে ও'র প্রায়ই প্রোগ্রাম থাকত। ও'র সঙ্গে আলাপ করে খুব প্রীত হলাম।

পরদিন সকালে নটরাজনের বাড়ি গেলাম। নটরাজনের বউ তো আমার ওপর রেগেই টঙ! বলল, out of sight, out of mind। তোমার জন্য কাল সারাদিন ধরে কতরকম খাবার তৈরি করলাম। আমি তো জানি তুমি কি খেতে ভালবাস। আর তুমি সে-সব নষ্ট করে দিয়ে, কোথায় কোন্ অচেনা জায়গায় গিয়ে উঠলে। আমি বুঝি তোমার কেউ নই?

যাই হোক, ঝগড়া মিটে গেলে, আমি শুনে খুব খুশি হলাম যে, ও সামনে বছর বি.এ. পরীক্ষা দেবে। আমি বললাম, সবই তোমার অধ্যবসায়ের ফল। ও বলল, আমার অধ্যবসায়ের ফল হবে কেন? বলো, তোমার অধ্যবসায়ের ফল। তুমি যদি আমাকে ইংরেজি না শেখাতে, তা হলে কি এসব হত?

১৯৪৪ সালে যখন দ্বিতীয়বার দিল্লি গেলাম, সেবার নটরাজনের ওখানেই রইলাম। নটরাজনের বউ তখন একটা স্কুলে মাস্টারি করে। একটা কথা আমি আগে বলিনি। নটরাজনের বউকে, আমি 'বউ' বলেই ডাকতাম। তাতে ও খুব আনন্দ পেত। কৌতুক করতে ও নিজেও যেমন ভালবাসত, অপরে কৌতুক করলে তেমনই আনন্দ পেত।

ꕥ ꕥ ꕥ

এদিকে আমার ইনটারভিউর দিন এগিয়ে এল। 'মা' বললেন, আমি ভোরবেলা উঠে রান্না করে দেব, তুমি খেয়েদেয়ে বেরুবে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ভোরবেলা উঠলে ও'র কষ্ট হবে, সেজন্য আমি বললাম, না, আমি এসেই খাব।

সকাল থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল, আর সঙ্গে প্রচণ্ড হাওয়া। আমার পরনে ছয় প্রস্থ পোশাক। একটা সুতোর গেঞ্জি, তার ওপর একটা সোয়েটার, তার ওপর শার্ট, তার ওপর ওয়েস্টকোট, তার ওপর কোট, আর

সকলের ওপর ওভারকোট। গলায় মাফলার জড়ানো, মাথায় 'মন্‌কি' ক্যাপ, পায়ে মোজা, আর দু'হাতে 'গ্লাভ্‌স্‌'। কিন্তু টাঙ্গা করে যখন 'মেটকাফ হাউস' এর দিকে যাচ্ছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল ঠাণ্ডা হাওয়া শরীরের হাড়ের ভেতরে গিয়ে বিঁধোচ্ছে।

মেটকাফ হাউস-এ গিয়ে আরাম পেলাম। আমাদের বসবার ঘরটায় একটা মস্ত বড় 'ফায়ার-প্লেস', তাতে পাঁচ-সাত মণ কাঠ পুড়ছে। তাতে সমস্ত ঘরটা বেশ গরম হয়ে রয়েছে।

শুনলাম, ৮০০ জন আবেদনকারীর মধ্যে ও'রা মাত্র পাঁচজনকে ইনটারভিউর জন্য নির্বাচিত করেছেন। কলকাতা থেকে ডেকেছেন দু'জনকে। আমাকে ও অধ্যাপক খগেন সেনকে। আর তিনজনের সংগে ওখানেই পরিচিত হলাম। একজন মহিলা প্রার্থীও ছিলেন। তিনি এসেছেন বিলাত থেকে। আর একজন দক্ষিণ ভারত থেকে—নাম টি. টি. কৃষ্ণমাচারী। আর একজন এসেছেন আলাহাবাদ থেকে, 'পাইওনিয়ার' কাগজের নিউজ এডিটর এস. এন. ঘোষ। আমি এস. এন. ঘোষকে বললাম, পাঁচজনের মধ্যে আমরা তিনজন বাঙালী। এস. এন. ঘোষ সংগে সঙ্গে ইংরেজিতে তার প্রতিবাদ করল। বলল, Don't call me a Bengalee. I am an U.P. man। আমি ও খগেন সেন শুনে তো স্তম্ভিত। পরে বুঝেছিলাম তিনি কেন নিজেকে বাঙালী বলতে অস্বীকার করেছিলেন। এক এক জনকে ইনটারভিউতে ডাকা হল। আমার পালা এল তৃতীয়। আমার ইনটারভিউয়ের পর আমি বিচারকদের জিজ্ঞাসা করলাম, যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে, তা হলে বলুন না, আমার 'চানস্‌' কিরকম। চেয়ারম্যান বললেন, Your chances are fair, but if we get an U.P. or a Delhi man, then the post will go to him। তখন বুঝলাম এস. এন. ঘোষ কেন নিজেকে ইউ.পি.-র লোক বলে দাবি করেছিলেন। Post-টা অবশ্য তিনিই পেয়েছিলেন।

বাড়িতে যখন ফিরলাম তখন বেলা তিনটা। 'মা' উদ্‌গ্রীব হয়ে অভুক্ত অবস্থায় বসেছিলেন। 'মা' জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল? সব কথা তাঁকে বললাম। দেখলাম তিনি বিষণ্ণ হলেন। তারপর তাড়াতাড়ি ভাত চাপাতে চলে গেলেন।

আমি কিন্তু নিজে মোটেই বিষণ্ণ হইনি। কেননা, আমি নিজে দরখাস্ত করিনি। আমাকে স্টক একসচেঞ্জ থেকে হটাবার জন্য সেক্রেটারী ধীরেন চক্রবর্তী নিজেই একটা দরখাস্ত লিখে আমার নাম সই করে পাঠিয়েছিল। সেদিন আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছিলাম এই কারণে যে এই উপলক্ষে বিদেশে এমন একটা সুখী বাঙালী পরিবারের মধ্যে এসে পড়েছিলাম, যারা সম্পূর্ণভাবে আমাকে আপন করে নিয়েছিল। অকপটে বলছি, ওক'টা দিন আমি অনাবিল

আনন্দে কাটিয়েছিলাম। বিশেষ করে বড়দি ও ছোড়দির আচরণ ও ব্যবহারে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার এখনও মনে পড়ে আমার আসবার দিন তারা কিরকম চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল।



'কমারসিয়াল গেজেট'-এর কথা বলতে বলতে অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। 'কমারসিয়াল গেজেট'-এ আমার প্রথম দুটো বছর কেটেছিল কাগজটার বেশ রমরমা 'বিজনেস' এর মধ্যে। কিংগ্ সাহেব নিয়ে আসে প্রচুর বিজ্ঞাপন। সরকারী বিজ্ঞাপনও আসে হইহই করে। মোটা অঙ্কের আয় হয়। সকলেই বেশ স্বচ্ছন্দে দিন কাটায়। এমন সময় ঘটল এক বিপর্যয়।

একদিন গিলবার্ট নামে এক সাহেব এসে ক্ষেত্রবাবুকে বুঝিয়ে দিল 'ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন' ইলেকট্রিসিটি-ব্যবহারকারী গৃহস্থদের কি-ভাবে ঠকাচ্ছে।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশ বন্যায় বিধ্বস্ত হয়েছিল। সেবার বন্যার জল পশ্চিমবঙ্গকে এমনভাবে প্লাবিত করেছিল যে তারকেশ্বরের মন্দির ছ'হাত জলের তলায় চলে গিয়েছিল। ওই বন্যায় বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল বাংলার কয়লা শিল্প। কলকাতায় কয়লা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হয়ে উঠেছিল। সেই অজুহাতে 'ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন' তাদের বিদ্যমান ইউনিট-প্রতি চার আনা মূল্যহারের ওপর আরও আধ-আনা অতিরিক্ত মূল্য (surcharge) ধার্য করে প্রতিশ্রুতি দিল যে কয়লার মূল্যহ্রাস ঘটলেই তারা এটা তুলে দেবে। বিশের দশকে রেল কোম্পানি ঝরিয়ায় নিজ কয়লাশিল্প স্থাপন করার ফলে, কয়লা শিল্পে এক ভীষণ মন্দা আসে। এই সময়েই বিখ্যাত বাঙালী কয়লা-শিল্পপতি এন· সি· সরকারের পরিচালিত কয়লা কোম্পানিগুলি উঠে যায়। কয়লার দাম দ্রুত হ্রাস পেয়ে অত্যন্ত নিম্নমানে গিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু 'ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন' তাদের ১৯১৮ সালে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায়। তারা ওই অতিরিক্ত আধ-আনা সারচার্জ বরাবরই বলবৎ রাখে।

গিলবার্ট যখন আমাদের কাছে এসে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের নামে নালিশ করে, তখনও ওই আধ-আনা সারচার্জ বলবৎ ছিল। আমি আগেই বলেছি যে ক্ষেত্রবাবু একজন বিবেকবাদী পুরুষ ছিলেন। তিনি গিলবার্টের অনুযোগ শুনে খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি গিলবার্টকে নৃপেন বাবুর কাছে নিয়ে গেলেন। নৃপেনবাবু বিশেষ গা দিলেন না। অনিলেশ্বর

বাবু কোম্পানি ব্যালানস্ শীট নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। আমার সংগ্রামী মনটার কথা ক্ষেত্রবাবু জানতেন। সেজন্য তিনি গিলবার্টকে আমার কাছেই নিয়ে এলেন। একটা প্রবন্ধ লিখে ফেললাম। 'কমারসিয়াল গেজেট'-এর পরবর্তী সংখ্যায় সেটা ছাপা হল। কোম্পানি সংগে সংগেই ওই আধ-আনা সারচার্জ তুলে দিল।

গিলবার্ট এসে আমাকে অভিনন্দন জানাল। ওর বাড়িতে যেতে আমাকে অনুরোধ করল। ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের একটা ঠিকানা দিল। একদিন সন্ধ্যায় গেলাম। গিয়ে দেখি প্রবেশ-পথ দিয়ে ঢুকলেই ভেতরে একটা বড় চত্বর, আর চত্বরের চার-ধারে ফ্ল্যাট বাড়ি। প্রতি ফ্ল্যাট বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। তাদের কাছে গিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, গিলবার্টের ফ্ল্যাট কোন্‌টা? মেয়েগুলো খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর আঙুল দিয়ে কোণের একটা বাড়ির নিচের তলার ফ্ল্যাটটা দেখিয়ে দিল। বাইরের জানালা দিয়ে দেখলাম ভেতরে গিলবার্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঢুকে পড়লাম। গিলবার্ট আমাকে অভিবাদন জানাল। সেখানে বসে ছিল গিলবার্টের মেয়ে। তার সংগেও পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর 'আসছি' বলে, পাশের ঘরে চলে গেল। মেয়েটা আমার সংগে আলাপ করতে লাগল। লক্ষ্য করলাম মেয়েটা ক্রমশ আমার সংগে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে। আমরা কথা বলছি এমন সময় একটা লুংগি পরা লোক ঘরে ঢুকে মেয়েটাকে বলল, মেমসাহেব! মেয়েটা ইঙ্গিতটা বুঝল, এবং পাশের একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই স্যুট-পরা এক বাঙালী ছোকরাকে ওই লুংগি-পরা লোকটা সঙ্গে করে নিয়ে এল, এবং মেয়েটা যে ঘরে ঢুকেছিল সেই ঘরটা দেখিয়ে দিল।

ওই লুংগি-পরা লোকটাকে আমি চিনতাম। বহুদিন ও-লোকটা চৌরংগীর ফুটপাথে আমার কাছে অগ্রসর হয়ে বলেছে, সাহেব, মেমসাহেব,—একদম তাজা মেমসাহেব! তারপর একটা অ্যালবাম আমার চোখের সামনে খুলে দেখিয়েছে। তাতে সবই বিবস্ত্রা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের ছবি। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে একবার 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলাম। 'স্টেটস্‌ম্যান' 'Street Pimps' শিরোনামা দিয়ে চিঠিটা ছেপেছিল।

কি সূত্রে লোকটার গিলবার্টের ওখানে আসা, তা আমি এক মুহূর্তেই বুঝে নিয়েছিলাম। আমি আর গিলবার্টের অপেক্ষায় ওখানে বসে না থেকে, ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলাম। পরদিন ক্ষেত্রবাবুকে সব কথা বললাম। ক্ষেত্রবাবুকে আরও বললাম, ও লোকটাকে আর আপনি এখানে আমল দেবেন না। আমল দেওয়া, না-দেওয়ার প্রশ্ন আর উঠল না। কেননা গিলবার্ট নিজে থেকেই আসা বন্ধ করে দিল। শুনলাম, গিলবার্টের ছেলেকে ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন একটা

ভাল চাকরি দিয়েছে।

গিলবার্ট আসুক, আর নাই আসুক, ক্ষেত্রবাবু তখন ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত। আমাকে বললেন, অতুলবাবু, কোম্পানির ব্যালানস্ শীট পরীক্ষা করে নির্ধারণ করুন কোম্পানি আজ পর্যন্ত আমাদের কত টাকা ঠকিয়ে নিয়েছে।

কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরুল! কোম্পানির হিসাবপত্রিকা বিশ্লেষণ করে দেখলাম যে কোম্পানির যথার্থ উৎপাদন খরচ হচ্ছে আধ-আনা। আর, ইওরোপীয়ান পরিচালিত চটকলসমূহকে ইলেকট্রিসিটি বেচে সিকি আনারও কম মূল্যে। এতে কোম্পানির যা ক্ষতি হয়, সেটা কোম্পানি উসুল করে নেয় ইলেকট্রিসিটির গৃহস্থ-ব্যবহারকারীদের ঘাড় ভেঙে। সব শুনে ক্ষেত্রবাবু তো ভীষণ গরম হয়ে উঠলেন। বললেন, লিখতে থাকুন শালাদের বিরুদ্ধে। আমারও সংগ্রামী মন তখন চাংগা হয়ে উঠল।

লিখতে লাগলাম বটে, কিন্তু এর প্রতিঘাত পড়ল আমাদের আয়ের ওপরে। আয়ের প্রধান সূত্র ছিল বিজ্ঞাপন। তখনকার দিনে বড় বড় ভারতীয় কোম্পানিরা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে জানত না। 'কমারসিয়াল গেজেট'-এ যা বিজ্ঞাপন ছাপা হত, তা সবই সাহেব-কোম্পানিদের বিজ্ঞাপন। একটা ইংরেজ কোম্পানিকে আমরা আক্রমণ করেছি দেখে বেংগল চেম্বার অভ্ কমার্স এক গোপন সারকুলার দ্বারা সব সাহেব-কোম্পানিকে 'কমারসিয়াল গেজেট'-এ বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করতে বলল। 'কমারসিয়াল গেজেট' আর্থিক দুর্গতির মধ্যে গিয়ে পড়ল। কর্মচারীদের আর মাহিনা দিতে পারে না। কর্মচারীদের সকলেরই ঘর-সংসার আছে। মাহিনা না পেয়ে তারা নিঃসম্বল হয়ে পড়ল। নৃপেনবাবুই প্রথম 'কমারসিয়াল গেজেট' ছেড়ে চলে গেলেন। তারপর একে একে গেলেন অনিলেশ্বর-বাবু ও যতীনবাবু। রয়ে গেলাম শুধু একা আমি। আমার তখন ২৬ মাসের মাহিনা বাকি! কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ করলাম না। ইংরেজ কোম্পানির শোষণের বিরুদ্ধে রক্ত তখন আমার টগবগ করছে।

ক্ষেত্রবাবু একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়েছেন দেখে, আমার সংগ্রামী মনকে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারলাম না। ক্ষেত্রবাবুকে পরিহার করার প্রশ্নই আমার মনে জাগল না। অবিশ্রান্তভাবে চার বছর আমি সংগ্রাম চালিয়ে গেলাম। কোম্পানির বিরুদ্ধে কয়েক হাজার প্রবন্ধ লিখলাম। প্রতি সপ্তাহে কোম্পানির সলিসিটর স্যান্ডারসন মরগান চার কপি করে কাগজ কিনে নিয়ে যায়, আমাদের বিরুদ্ধে 'ড্যামেজ সুট' করতে পারে কিনা তা দেখবার জন্য। কিন্তু 'ড্যামেজ'-এর কারণ পাবে কোথায়? কেননা, সাংবাদিকতায় আমি শিক্ষা নিয়ে-

ছিলাম 'লণ্ডন স্কুল অভ্ জরনালিজম'-এ স্যার ম্যাকস্ পেমবারটনের অধীনে। তাঁর পয়লা বাত্ ছিল, প্রতি বাক্যরচনার সময় হুঁসিয়ার থাকবে, যেন libel বা damage-এর মধ্যে না পড়। পরবর্তীকালে আমি ত্রিশ বৎসরের ওপর কাল 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় সরকার, বিভিন্ন কোম্পানি ও ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেছি, কিন্তু ম্যাকস পেমবারটনের দেওয়া উপদেশ সব সময়েই স্মরণ করেছি।

যাক, যে কথা বলছিলাম। আমাদের একক সংগ্রামের ফলে 'ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন' ইলেকট্রিসিটির মূল্যহার ইউনিট প্রতি প্রথম দফায় চার আনা, দ্বিতীয় দফায় সাড়ে তিন আনা, এবং তার পরে তিন আনায় হ্রাস করল। তিন আনা পর্যন্ত হ্রাস করে, কোম্পানি ইউনিট প্রতি মূল্যহার আর হ্রাস করল না। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম চলতেই লাগল। এরই মধ্যে কোম্পানির সর্বময় কর্তা এফ টি. হোমান আমাকে ডেকে একটা 'কভেনেন্টেড সারভিস' এর চাকরি ও নগদ পাঁচ হাজার টাকা দেবার প্রলোভন দেখাল। বলল, আমি যেন 'কমারসিয়াল গেজেট'-এর চাকরি ছেড়ে দিই। কিন্তু আমার প্রতি ভগবানের অসীম করুণা আছে। টাকার প্রলোভন কোনদিন আমাকে লুব্ধ করতে পারেনি। সাংবাদিক হিসাবে আমি আমার কর্তব্য সব সময়ই কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি।

আমাদের এই সংগ্রাম ছিল সম্পূর্ণভাবে একক ও অসম। একদিকে ছিল মাত্র 'কমারসিয়াল গেজেট' পত্রিকা, আর অপরদিকে সমগ্র বিলাতী বণিক সম্প্রদায় ও বাংলা সরকার। কথাটা খুলেই বলি। 'ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন' ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে গঠিত হবার সময় থেকে খবরের কাগজে কখনও বিজ্ঞাপন দিত না। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম শুরু হবার অব্যবহিত পর থেকেই কোম্পানি কলকাতার সমস্ত সংবাদপত্রে মোটা অঙ্কের বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করে তাদের সকলের মুখ বন্ধ করে দিল। ফলে, কলকাতার কোন সংবাদপত্রই সেদিন আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল না। এমনকি যারা দেশসেবার নামে উত্তপ্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখত, তারাও নয়! আর বেঙ্গল চেম্বার অভ কমার্স-এর সারকুলারের কথা আমি তো আগেই বলেছি। বাংলা সরকারও কোম্পানির পক্ষে ছিল। কেননা, বাংলা সরকারের ফিনানস্-সচিব অবসরগ্রহণ করলে কোম্পানি ৬৪,০০০ পাউণ্ড বেতনে তাদের কোম্পানির লণ্ডন বোর্ডের ডিরেকটর পদে নিযুক্ত করত।

ইউনিট প্রতি মূল্যহার যখন কোম্পানি তিন আনার নিচে আর নামাল না, তখন আমরা বিধানসভার সদস্যদের শরণাপন্ন হলাম। তাঁদের প্রভাবান্বিত করে, এক তদন্ত কমিশন বসালাম। ওই কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন হাইকোর্টের

প্রাক্তন বিচারপতি স্যার নলিনীরঞ্জন চ্যাটার্জি। অপর তিনজন সদস্য হলেন কেটলওয়েল বুলেন কোম্পানির বড়সাহেব ম্যাক্‌গ্যারো, বাংলা সরকারের ইলেকট্রিসিটি-উপদেষ্টা র‍্যাডক্লিফ সাহেব ও বাংলা সরকারের অ্যাকাউনটেন্ট-জেনারেল শ্রীনিবাসন্।

কোম্পানি 'যুদ্ধং দেহি' বলে কমিশনের সামনে লড়বার জন্য বিলাত থেকে ডবলিউ. কে. পেজ নামে একজন বিখ্যাত আইনবিদকে নিয়ে এল। তার সঙ্গে লড়বার সমকক্ষ, কলকাতা হাইকোর্টে তখন মাত্র একজন আইনবিদই ছিলেন। তিনি হচ্ছেন শরৎচন্দ্র বসু। তিনি তখন সবেমাত্র জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

একদিন সন্ধ্যার পর আমরা ওঁর বাড়িতে গেলাম। বেয়ারা আমাদের বলল, সাহেবের নামতে এখনও দু'ঘণ্টা দেরী, আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে।

একটা চিরকুট কাগজে নাম লিখে বেয়ারার হাতে দিয়ে বললাম, এটা সাহেবের কাছে নিয়ে যাও। দু'মিনিটের মধ্যেই আমাদের সামনে আবির্ভূত হলেন সৌম্য-দর্শন শ্রীশরৎচন্দ্র বসু। হাসতে হাসতে বললেন, এইতো নিশ্চয়ই দায়ে ঠেকে এসেছেন, তা না হলে কখনও আসেন না, পাছে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করে কিছু অর্থনীতি শিখে নিই।

ওঁর কথায় আমি ভীষণ লজ্জা পেলাম। আমি আর কথা বলতে পারলাম না। ক্ষেত্রবাবুই বলতে শুরু করলেন, দেখুন শরৎবাবু, গিলবার্ট নামে এক সাহেব এসে আমাদের কাছে অভিযোগ করে যে 'ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন' আমাদের ঠকাচ্ছে। আমরা কোম্পানির ব্যালান্স শীট বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে যদিও কোম্পানির উৎপাদন খরচ হচ্ছে ইউনিট প্রতি মাত্র আধ-আনা, ওরা গৃহস্থ-ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ইউনিট প্রতি সাড়ে চার আনা করে উসুল করে তাদের শোষণ করছে। তারপর থেকে অতুলবাবু সহস্রাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন কোম্পানির শোষণের বিরুদ্ধে। প্রথম তিন বছরের মধ্যেই কোম্পানি কয়েক স্তরে মূল্য কমিয়ে তিন আনা করল। কিন্তু তার পর থেকে কোম্পানি একেবারে অটল অনড় হয়ে রইল। তখন আমরা বিষয়টা বিধানসভায় তুলি। এ সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য বাংলা সরকার এক উচ্চ পর্যায়ের কমিশন বসিয়েছেন। কোম্পানি বিলাত থেকে ডবলিউ. কে. পেজ নামে এক জাঁদরেল ব্যারিস্টারকে নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে লড়বার মত আইনবিদ কলকাতায় একমাত্র আপনিই আছেন। সেজন্যই আজ আমরা আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

সব শুনে শরৎবাবু বললেন, জেলখানা থেকে বেরুবার পর প্রায় শ'চারেক ব্রীফ এসে গেছে। কতকগুলো মোকদ্দমার তারিখ আবার আপনাদের তদন্তের

সময়েই। তা সেসব আমি কোন রকমে ম্যানেজ করে নেব। আপনাদের প্রয়াসের সঙ্গে যখন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট, আর মামলার বিষয়বস্তু হচ্ছে ইংরেজ কোম্পানির শোষণ, তখন আপনাদের মামলা আমাকে নিতেই হবে।

বিনা পারিশ্রমিকে ২৬ দিন সকাল দশটা থেকে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত একনাগাড়ে তিনি লড়ে গেলেন পেজ সাহেবের সঙ্গে। আমরা চেয়েছিলাম এক আনা রেট। কমিশন রায় দিল দু'আনা। তাহলেও ওই নৈতিক বিজয় আমাদের হত না, যদি না শরৎবাবু সেদিন নিঃস্বার্থভাবে কৌঁসুলী হিসাবে আমাদের তরফে দাঁড়াতেন।

আজ দেশের লোক ক্ষেত্রপাল ঘোষকে ভুলে গিয়েছে। অথচ এই ক্ষেত্রপাল ঘোষ দেশের ও দশের জন্য সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। আজ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অতীতের কোন অতলতলে বিলীন হয়ে যেত, যদি না এর সহায় হিসাবে সেদিন থাকতেন ক্ষেত্রপাল ঘোষ। আমরা তো নিজের চোখে দেখেছি, সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাখন সেন এসে ক্ষেত্রবাবুকে বলেছে, কাল আর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বেরুবে না ভোলানাথ আর কাগজ দেবে না, ভোলানাথকে আজ অন্ততঃ দু'শো টাকা দিতেই হবে। ক্ষেত্রবাবু তৎক্ষণাৎ সে টাকা দিয়েছেন। এদেশে মুখোসধারী লোকদেরই জয়জয়কার! ক্ষেত্রপাল ঘোষের মত দেশসেবকদের কোন সম্মান নেই।



সে-যুগের লোক বলত—'India is ruled not by the Viceroy or the Governor-general, but by the European Association'। ইওরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপ। তাদের কাজই ছিল, সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি তৈরি করা। আমি যখন ক্লাইভ স্ট্রীটে যাই, তখন ইওরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট ছিল চ্যাপমান-মর্টিমার। তিনি ছিলেন বার্ড-হিলজারস্ কোম্পানির বড়সাহেব। সে-হেন চ্যাপমান-মর্টিমার একদিন প্রকাশ্য মিটিং-এ বললেন—'There are only four clever men in Clive Street. They are G. L. Mehta, Atul K. Sur, M. P. Gandhi and J. N. Sengupta'। আমাকে তিনি প্রায়ই লোকের কাছে 'the naughty boy of Clive Street' বলে অভিহিত করতেন। যে চারজনের নাম চ্যাপমান-মর্টিমার করেছিলেন, এ চারজনের মধ্যে আমাদের নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। জি. এল. মেহ্‌টা বা গগনবিহারী লাল মেহ্‌টা ছিলেন

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত শিল্পপতি ও সিন্ধিয়া স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানির মালিক স্যার লালুভাই শ্যামলদাসের ছেলে। বাবার সংগে বনিবনা না হওয়ায় পাড়ি মেরেছিলেন রেঙ্গুনে। সেখানে এক পত্রিকার দপ্তরে সাংবাদিকের কর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তারপর বাবার সংগে পুনরায় প্রীতিস্থাপনের পর সিন্ধিয়ার কলকাতা অফিসের ম্যানেজার হয়ে কলকাতায় আসেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় আমার লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়ে তিনি আমার সংগে আলাপ করেছিলেন। আলাপ অন্তরংগ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সে-সময় খুব প্রভাবশালী দেশীয় পত্রিকা ছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় আমি তখন নিয়মিত লিখতাম। এত লিখতাম যে ওই পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যায় আমার সাতটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল. নিজ নামে ও ছদ্মনামে। আর 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় আমি ঘন ঘন লিখতাম। সেসব লেখার মধ্যে তিনটা লেখা প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটা লেখা ছিল Japanese Dumping সম্বন্ধে। লেখাটা পড়ে 'অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বারস্ অভ্ কমার্স'-এর প্রেসিডেন্ট V. F. Gray খুব তারিফ করে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। দ্বিতীয় লেখাটা ছিল Polyandry in India সম্বন্ধে। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের Census Report-এর আমি একটা বিরাট ভুল বের করি। ওই রিপোর্টে ভারতে বিবাহিতা নারীর যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যা দেখানো হয়েছিল বিবাহিত পুরুষের। আমি ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে 'স্টেটস্ম্যান' পত্রিকায় ওই ভুলটা প্রকাশ করে, প্রশ্ন করি, তবে কি ভারতে ব্যাপকভাবে বহুপতিক বিবাহ প্রথা (Polyandry) প্রচলিত আছে ? পরের দিনই 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা আমার ওই লেখাটাকে অবলম্বন করে তাদের first editorial প্রবন্ধ লেখে। আমার লেখাটার তারিফ করে ওরা ওর একটা মজার শিরোনামা দেয়। শিরোনামাটা হচ্ছে Wifeless Husbands ! আর আমার তৃতীয় লেখা যেটা সেযুগে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল, সেটা হচ্ছে জীবনবীমা কোম্পানিদের দুর্নীতি সম্বন্ধে ! এর ফলে ভারত সরকার জীবনবীমা সম্বন্ধে এক আইন প্রণয়ন করে। আমার ও-যুগের আরও যেসব প্রবন্ধ 'ফিনানসিয়াল টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হচ্ছে—'A Reserve Bank for India', 'Industrial Finance in India', 'Public Expenditure and Taxation in India' ও 'What Price the Ottawa Agreement ?' প্রথম প্রবন্ধটির ফলে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে Reserve Bank of India স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে আমি ভারতে Industrial Finance Corporation নামে একটি সংস্থা স্থাপনের দাবী জানাই। যদিও আমার ওই

প্রবন্ধটি ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, ভারত সরকার কিন্তু দীর্ঘকাল টালবাহানা করে ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে ওই নামেই ওই সংস্থা স্থাপন করে। শেষের দুটি নিবন্ধ বোম্বাইয়ের 'ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস্ চেম্বার অভ্ কমার্স' গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করে। শেষের নিবন্ধটিই (যা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর ফলেই ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে কেন্দ্রীয় বিধানসভা চিরকালের জন্য ভারতে Imperial Preference নীতি লোপ করে। ওই নিবন্ধে আমিই এদেশে প্রথম bilateral trade agreement-এর কথা বলি, যা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত নীতিতে পরিণত হয়। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে ভারতের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সংস্থা Critics Circle of India আমাকে CCI Award দিয়ে সম্মানিত করেছিল। তখন তারা ওই সম্মানের citation-এ লিখেছিল 'for outstanding and original contribution to economics'।

এই আত্মচরিত লিখতে গিয়ে, আমি যতই ভাবছি যে নিজেকে নেপথ্যে রাখব, ততই সামনে এসে পড়ছি। কি করব? উপায় নেই। কেননা, এসব কথা না বললে, আমার সময়কালের সব ইতিহাস বলা হয় না।

ꕥ ꕥ ꕥ

জি. এল. মেহ্‌টার কথা বলতে-বলতেই আমি বিপথে চলে গিয়েছিলাম। গগন বিহারীর মত অকৃত্রিম বন্ধু আমি জীবনে খুব কম পেয়েছি। যদি কোনদিন বাড়িতে ঝগড়া করে, না খেয়ে, ও'র অফিসে গিয়েছি, উনি আমার মুখ দেখেই সেটা টের পেতেন, এবং চাপরাশিকে ডেকে একরাশ খাবার এনে আমাকে খাইয়ে, তবে তৃপ্তি বোধ করতেন। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা লাভের পর গগনবিহারী যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়ে ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের পুরানো বন্ধুত্ব অটুট ছিল।

এম. পি. গান্ধী ছিলেন 'ইণ্ডিয়ান চেম্বার অভ্ কমার্স'-এর সেক্রেটারী। তখন ইণ্ডিয়ান চেম্বার অভ্ কমার্স অবস্থিত ছিল ১৩৫ নম্বর ক্যানিং স্ট্রীটে, গগন-বিহারীর অফিসের প্রায় বিপরীত দিকে। ও'র দুখানা বর্ষপঞ্জী ছিল, নাম 'ইণ্ডিয়ান কটন টেকস্‌টাইল ইয়ার-বুক' ও 'ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্ অ্যানুয়েল'। এ দু'খানা বই নিঃস্বার্থভাবে আমিই তৈরি করে দিতাম। সেজন্য আমাদের উভয়ের মধ্যে ছিল অত্যন্ত প্রীতি। ও'র প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে আমি প্রায়ই যেতাম। ও'র স্ত্রীর সঙ্গেও আমার খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। ও'রা ছিলেন

নিঃসন্তান। সেজন্য ও'র স্ত্রী কুমারী মেয়েদের মত স্ফূর্তিতে থাকত। গুজরাটীদের রীতি অনুযায়ী ও'দের বাড়িতে একটা দোলা টাঙানো ছিল। ওই দোলায় বসে গান্ধীর স্ত্রী খুব দোল খেত। মাঝে মাঝে আমাকে বলত, সুর, এস, আমার কোলের উপর বসে পড়। আমি বলতাম, ছি ছি, কি ছেলেমানুষি কর! ও হো-হো করে হাসত, আর স্বামীকে বলত, সুরের লজ্জা দ্যাখো।

লড়াইয়ের সময় গান্ধী চেম্বারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে, মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে D. G. Supplies হয়েছিলেন। তারপর বোম্বাই চলে গিয়েছিলেন। উনি বোম্বাই যাবার পরও আমি দু-তিনবছর ওর বই দুখানা তৈরি করে দিয়েছিলাম। কিন্তু নানারকম অসুবিধা হওয়ায়, আমি ও'কে আর সাহায্য করতে পারিনি। তবে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত গান্ধী আমাকে নিয়মিত চিঠিপত্র লিখতেন।

৯ ৯ ৯

দুনম্বর রয়েল একসচেঞ্জ প্লেস বিল্ডিং-এ ছিল জে. এম. দত্তের অফিস। তাঁর পুরো নাম জিতেন্দ্রমোহন দত্ত। তিনি ছিলেন স্টক একসচেঞ্জের একজন বিশিষ্ট সদস্য ও কমিটি মেম্বার। একসময় তিনি ভারতের এক নামজাদা কলেজে (D. A. V. College) রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। তারপর অসহযোগ আন্দোলনের সময় চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্টক-ব্রোকার হয়েছিলেন। তখনকার দিনে এরকম গুণী ব্যক্তি স্টক একসচেঞ্জে আরও দু-একজন ছিলেন। যেমন ডক্টর এম. এম. রায়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগে অধ্যাপনা করতেন, আবার আর. জি. কর মেডিকেল কলেজে রসায়নশাস্ত্রও পড়াতেন। তিনিও স্টক একসচেঞ্জের সদস্য ও কমিটি মেম্বার ছিলেন। আমার স্টক একসচেঞ্জে নিয়োগের সময় তিনি ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু পরে আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন। সেই কারণে, ও'র মৃত্যুর পর ও'র গুণমুগ্ধরা যখন স্মৃতিরক্ষার জন্য 'ডক্টর এম. এম. রায় মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট অভ্ ইকনমিক রিসার্চ' স্থাপন করে, তখন তারা আমাকেই ওর ডিরেকটর নিযুক্ত করে। ওই সংস্থা থেকে মাত্র একখানা বই-ই প্রকাশিত হয়েছিল। বইখানা আমারই লেখা 'সেভিংস্ অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া', যেখানা পড়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মুগ্ধ হয়েছিলেন। বইখানার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের কথা আমি পরে বলব। এখন আমি জে. এম. দত্তের কথাতেই আবার ফিরে যাচ্ছি।

জে. এম. দত্তের সঙ্গে ক্ষেত্রবাবুর খুবই বন্ধুত্ব। ইলেকট্রিসিটির মূল্যহ্রাসের ব্যাপারটা তদন্ত কমিশনের হাতে যাওয়ার পর, একদিন জিতেনবাবু ক্ষেত্র-

বাবুকে বললেন, অতুলবাবুকে এবার আপনি ছেড়ে দিন, বহুদিন তো আপনি ওঁকে মাইনেপত্তর দিতে পারেননি, ওঁরও তো ঘর-সংসার ছেলেপুলে আছে, আমাদের স্টক একসচেঞ্জে একটা নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, আমি ওঁকে ওখানে নিয়ে যেতে চাই। স্টক একসচেঞ্জের প্রেসিডেণ্ট রায় বাহাদুর কেদারনাথ খাণ্ডেলবাল অতুলবাবুকেই ওখানে চান।

রায় বাহাদুর কেদারনাথ খাণ্ডেলবালকে আমি আগে থাকতেই চিনতাম। ওঁর ভাইপো এচ. পি. খাণ্ডেলবাল বিলাত থেকে চাটার্ড অ্যাকাউনটেনসি পাস করে এসে কলকাতায় একটা শেয়ারহোলডারস্ অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করে। আমি ওই অ্যাসোসিয়েশনের কমিটির একজন সদস্য ছিলাম। কেদার খাণ্ডেলবালও ওই কমিটির সদস্য ছিলেন। কেদার খাণ্ডেলবাল একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি। বি. এ., এল-এল. বি. পাস করে তিনি স্টক ব্রোকার হয়েছিলেন। আমরা দুজনেই শেয়ারহোলডারস্ অ্যাসোসিয়েশনের কমিটির সদস্য। সেইসূত্রেই ওঁর সংগে আমার পরিচয়।

একদিন অ্যাসোসিয়েশনের মিটিং-এর পর কেদারবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সুর, তাহলে তুমি স্টক একসচেঞ্জে আসছ তো? আমি উত্তরে বললাম, ক্ষেত্রবাবুর এই দুর্দিনে আমি ওঁকে কি করে ত্যাগ করি বলুন? তাছাড়া, আমি কখনও দরখাস্ত করে কোথাও চাকরি করিনি। কেদারবাবু বললেন, ওসব আমি 'ম্যানেজ' করে নেব। আমি আর কোন কথা বললাম না।

পরে শুনলাম, কেদারবাবু 'ইণ্ডিয়ান ফিনানস্'-এর সম্পাদক সি. এস. রংগ স্বামীকে দিয়ে এক দরখাস্ত লিখিয়ে, ওঁকে দিয়েই আমার নাম সই করিয়ে সেখানা স্টক একসচেঞ্জে পেশ করেছেন।

ক্ষেত্রবাবুও এসব কথা শুনলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আপনি স্টক একসচেঞ্জে যাচ্ছেন? আমি বললাম, না। উনি বললেন, তবে? আমি বললাম, তবে আর কি!

স্টক একসচেঞ্জ থেকে ক্রমাগতই চিঠি আসতে লাগল, ইনটারভিউ'তে হাজির হবার জন্য। আমি আর যাই না।

তারপর তলে তলে কি ঘটল জানি না। একদিন ক্ষেত্রবাবু নিজে থেকেই বললেন, ওরা যখন বার বার 'ইনটারভিউ'র জন্য চিঠি লিখছে, তখন আপনি একবার যান-না।

আমি গেলাম। কিন্তু আমাকে ভীষণ বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হল। তা সত্ত্বেও পদটা আমার ভাগ্যেই এসে পড়ল।

১১১

যদিও শ্যামাপ্রসাদবাবুর ওপর অভিমান করে আমি ক্লাইভ স্ট্রীটে এসে অর্থনৈতিক প্রবন্ধ লেখাতেই মেতে উঠেছিলাম, তা হলেও আমি আমার পুরানো 'প্রেমিকা' পুরাতত্ত্বকে ভুলে যাইনি। সমানভাবেই আমি পুরাতত্ত্বের চর্চা করে যাচ্ছিলাম, এবং বিভিন্ন পত্রিকাসমূহে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখছিলাম। 'ক্যালকাটা রিভিউ'র ১৯৩১ সালের এপ্রিল-মে সংখ্যায় লিখলাম ভারতে মাতৃদেবীর পুজোর উদ্ভব ও বিবর্তন সম্বন্ধে ও ১৯৩২-এর নভেম্বর ডিসেম্বর সংখ্যায় লিখলাম হিন্দু সভ্যতার গঠনে প্রাক্-আর্য উপাদান সম্বন্ধে। ওই ১৯৩২ সালেই লিখলাম তন্ত্রধর্মের রহস্য সম্বন্ধে। আবার, ১৯৩২ সালের জুন মাসের 'ইণ্ডিয়ান অ্যানটিকোয়ারি' পত্রিকায় 'হর্ষ' শিরোনামায় এক প্রবন্ধ লিখে দেখালাম যে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড. রাধাকুমুদ মুখার্জি 'হর্ষ' সংজ্ঞক যে পুস্তকখানি রচনা করেছেন তাতে ওঁর মৌলিক গবেষণা কর্ম কিছুই নেই। অপরের বই থেকে উনি বিনা স্বীকৃতিতে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁদেরই ভাষা ব্যবহার করেছেন। ওই সালেরই অকটোবর-নভেম্বর মাসে নানা পত্রিকায় লিখে আমি পাঠকসমাজকে জানালাম যে মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত সীলমোহরসমূহের ওপর যে লিপি আছে, তার মধ্যে ১৩০টির অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ইস্টার দ্বীপে প্রাপ্ত লিপির সহিত। ওই সালেরই 'ইলাস্ট্রেটেড ইণ্ডিয়া'য় আমি একগুচ্ছ প্রবন্ধ লিখলাম নানা বিষয়ে, যথা 'দশ লক্ষ বৎসর পূর্বের ভারত', 'বিবাহের উদ্ভব ও বিকাশ' ও '৩০ হাজার বৎসর পূর্বের ভারতের পর্বতগাত্রে অঙ্কিত চিত্র' (rock paintings) সম্বন্ধে। ১৯৩৩ সালে ড. বিমলাচরণ লাহা আমাকে এক চিঠিতে জানালেন, 'আমি 'ইণ্ডিয়ান কালচার' নামে পুরাতত্ত্বের একখানা উচ্চমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করছি। তার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশের জন্য আপনার একটা প্রবন্ধ চাই।' ওই সময় পাটনার বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ ও ব্যারিস্টার কাশীপ্রসাদ জয়সবাল ১৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৩৫০ খ্রীস্টাব্দ সময়কালের একখানা 'ভারতের ইতিহাস' সদ্যোমাত্র প্রকাশ করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন, গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তই যে হিন্দু সাম্রাজ্যিক অভ্যুত্থানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তা বিবেচনা করা ভুল। তিনি মন্তব্য করলেন যে, এটা তাঁর পূর্বে ভারশিব-নাগবংশীয় মহারাজা ভবনাগের আমলে ঘটেছিল। তাঁর একমাত্র যুক্তি ছিল যে ভবনাগ এক অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। সে সময় পর্যন্ত পণ্ডিতমহলে এটাই স্বীকৃত মতবাদ ছিল যে মাত্র সার্বভৌম নৃপতিরাই অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারতেন। আমি আমার

প্রবন্ধে জয়সবালের বিপক্ষে প্রতিবাদ খাড়া করে লিখলাম, মাত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করলেই যে কোন নৃপতি সার্বভৌম হন, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, কেননা বিষ্ণুকুণ্ডিবংশীয় মাধববর্মন নামে একজন সামান্য নৃপতি এগারোটা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। আমার এই মতবাদের বিরুদ্ধে এক প্রবল ঝড় উত্থাপন করলেন শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার (পরবর্তীকালের কারমাইকেল প্রফেসর)। দীনেশ-চন্দ্র আপস্তম্ব ধর্মসূত্র থেকে এক সূত্র (২০।১।১) উদ্ধৃত করে বললেন যে ওই সূত্রে পরিষ্কার লেখা আছে 'রাজা সার্বভৌমেনোশ্বমেধ যজেত'। উত্তরে আমি দেখালাম যে দীনেশচন্দ্র তাঁর উদ্ধৃতির পরবর্তী অংশ গোপন করেছেন। কেননা, ওই সূত্রের পরবর্তী অংশ হচ্ছে 'ন অপি' অসার্বভৌমঃ'। 'ন অপি শব্দের প্রয়োগ নিয়ে একবৎসরকাল (এপ্রিল ১৯৩৪ থেকে এপ্রিল ১৯৩৫ পর্যন্ত) আমাদের মধ্যে ভীষণ বাদানুবাদ চলল। 'ন অপি' শব্দদ্বয়ের সঠিক অর্থ কি, তা আমি পাণিনির সূত্র উদ্ধৃত করে, দীনেশকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যেহেতু দীনেশ সংস্কৃত অনার্সের ছাত্র ছিল, সেজন্য নিজের সংস্কৃতের জ্ঞান সম্বন্ধে তার একটা গর্ব ছিল। গর্বিত হয়ে দীনেশ পাণিনিকেও মানতে চাইল না। এভাবে আমাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলল। শেষকালে রণাঙ্গনে শক্তিরূপেন অবতীর্ণা হলেন ওই পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী করুণাকণা গুপ্ত। নানা সূত্রগ্রন্থ থেকে অজস্র উদ্ধৃতি তুলে তিনি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করলেন যে আমার মতবাদই ঠিক। তখন দীনেশচন্দ্র রণে ভঙ্গ দিল।

ওই ১৯৩৪ সালেই আমি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় দুটি প্রবন্ধ লিখলাম। একটি পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের আমলে উদ্ভূত 'প্রাচ্যদেশীয় শিল্পঘরানা' সম্বন্ধে ও অপরটি 'ওড়িশার স্থাপত্য শিল্পরীতি ও তার বিকাশ' সম্বন্ধে। আজকের দিনে এসব পরিচিত বিষয়। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন তা ছিল না।

১৯৩৪ সালেরই নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে মহাবোধি সোসাইটির মুখপত্র 'মহাবোধি' পত্রিকার সংখ্যাদ্বয়ে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে আমি 'বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি'র একটা রূপরেখা টানলাম। (এটাই বিস্তারিত হয়ে ১৯৬৩ সালে আমার বিখ্যাত বই 'হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অভ্ বেঙ্গল'-এ পরিণত হয়েছিল)। ওই পত্রিকারই ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের সংখ্যায় আমি বাংলার বৌদ্ধ দেবদেবী সম্পর্কিত শিল্পের একটা পরিচয় বাঙালী পাঠকসমাজকে দিলাম।

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৮ জানুয়ারী তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় 'মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখলাম। আবার ওই সালেরই 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'র শারদীয়া সংখ্যায় 'শিল্পে মহিষমর্দিনী মূর্তির বিবর্তন' সম্বন্ধে

বাংলায় এক সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করলাম। ইতিমধ্যে আমি ‘ক্যালকাটা রিভিউ’ পত্রিকায় ভারতীয় লিপিমালার উদ্ভব সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখে নিশ্চিতভাবে মতবাদ প্রকাশ করলাম যে সিন্ধুসভ্যতার লিপিমালা থেকেই ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব ঘটেছে। (পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. গ্রেগরী পয়সেলের ‘এনসিয়েণ্ট সিটিজ অভ্ দি ইণ্ডাস্’ দ্র.)। শান্তিনিকেতনের ‘বাসবী’ থেকে বিখ্যাত হাঙেগরীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. সি. এল. ফার্বার ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ জুলাইয়ের ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’য় প্রকাশিত এক পত্রে আমাকে সমর্থন করলেন। ওই ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমি ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’য় বিখ্যাত ইটালীয় নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক চিপ্রিয়ানি (Cipriani) ভারতের জনগোষ্ঠীর গঠনে নিগ্রোয়েড ও নেগ্রিটো উপাদান আছে বলে যে মতবাদ প্রকাশ করলেন, তাও নস্যাৎ করে দিলাম। এই সময় ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকেও আমি সাহায্য করলাম তাঁর ‘রেসেস্ অভ্ ইণ্ডিয়া’ পুস্তক-রচনায়।

সুতরাং আমি যখন ‘কমারসিয়াল গেজেট’ পত্রিকায় (১৯৩২-১৯৩৬) কাজ করি তখন আমি যে মাত্র অসংখ্য অর্থনৈতিক প্রবন্ধ লিখছিলাম, তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের অনুশীলনও করছিলাম।



ইউনিভারসিটি ছেড়ে আসবার পর আর ওখানে যাই না। কয়েক বছর পরে একদিন গেলাম, পুরানো মাস্টারমশাইদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে। জীবনকৃষ্ণ গণ নামে নৃতত্ত্ব বিভাগের এক ছাত্র আমাকে ধরে বসল। বলল, আমি স্বামীজীর বাড়ির সামনেই থাকি, স্বামীজির ছোট ভাই ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মশাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি একদিন যাব। পরের রবিবারে গেলাম। বাড়িতে ঢুকতেই ডানদিকের ঘরটাতে থাকেন ভূপেনবাবুর দাদা মহেন্দ্রবাবু। মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে চাই? ভূপেনবাবুর নাম করলাম। একটু তাচ্ছিল্যের স্বরেই উনি আমাকে ওঁর বিপরীত দিকের ঘরটাতে বসতে বললেন। আমার স্বভাবই হচ্ছে, যে লোক তাচ্ছিল্য করে তার সঙ্গে আলাপ জমানো। সেজন্য পরের বার যখন গেলাম, মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ জমালাম। দেখলাম, উনি একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি ও অনেক কঠিন শাস্ত্রে ওঁর জ্ঞান আছে।

যাক্, ভূপেনবাবু এলেন। বললেন, সম্প্রতি কাগজে আপনার চিপ্রিয়ানির প্রতিবাদ পড়েছি। কিন্তু আমি তো এক মুশকিলে পড়েছি। সম্প্রতি বাংলা-

দেশের লোকের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের একটা সমীক্ষা করেছি। চুলের cross section থেকে দেখছি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের জাতির রং একটা নিগ্রো উপাদান রয়েছে। কিন্তু নিম্নবর্ণের ও আদিবাসীদের মধ্যে ওটা মোটেই নেই। আপনি তো চিপিয়ানির প্রতিবাদ করেছেন। এখন এ সম্বন্ধে কি বলতে চান? আমি বললাম, এটার কারণ তো খুবই সোজা। কি রকম? আমি তখন বললাম, মধ্যযুগে বাংলার মুসলমান সুলতানরা অনবরতই এদেশে হাবশী দাস আমদানি করেছে। মধ্যযুগে হিন্দু-নারী ধর্ষণ করা তো মুসলমানদের স্বভাবেই দাঁড়িয়েছিল। তাদের দাসরাও সেই সুযোগ নিত। যেহেতু উচ্চবর্ণের মেয়েরাই সুন্দরী, সেইহেতু এটা উচ্চবর্ণের মেয়েদের ওপরই সংঘটিত হত। সেই উচ্চবর্ণের মেয়েদের ওপর হাবশী দাসগণের ধর্ষণের কারণেই, উচ্চবর্ণের লোকদের চুলের মধ্যে আপনি নিগ্রো রঙের সন্ধান পেয়েছেন। উত্তর পেয়ে উনি খুবই সন্তুষ্ট হলেন। সেই থেকে আমি ওঁর শ্রদ্ধাভাজন হলাম। ওঁর 'রেসেস অভ ইণ্ডিয়া' বইখানা লেখবার সময় উনি অনবরত আমার পরামর্শ নিয়েছিলেন। এবং আমাকে দিয়েই উনি বইখানা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় সমালোচনা করিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলার উচ্চবর্ণের রক্তের মধ্যে যে নিগ্রো উপাদান আছে, এটা প্রকাশ্যে বলতে উনি কোনদিনই সাহস করলেন না, যদিও আমার লেখার মধ্যে আমি এটার উল্লেখ করেছি। তবে এই ঘটনার পরই উনি বাংলার ইতিহাসটা ভাল করে পড়লেন, এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে একখানা বাংলার ইতিহাস রচনা করলেন।

ঌ ঌ ঌ

একদিন 'কমার্সিয়াল গেজেট' অফিসে সতীশ মিত্তির এসে হাজির। সতীশ মিত্তির বাংলা সরকারের ডিরেকটর অভ্ ইণ্ডাস্ট্রিজ ও স্যার বিনোদ মিত্তিরের ছেলে। স্যার বিনোদ মিত্তির ছিলেন বিলাতের প্রিভি কাউনসিলের বিচারপতি। বিনোদ মিত্তিরের সহোদর স্যার প্রভাস মিত্তির বাংলা সরকারের শাসন-পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে বিলাতে যে দু'বার গোল টেবিল বৈঠক হয়েছিল, তাতে তিনি হিন্দু প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেছিলেন।

সতীশ মিত্তির ঘরে ঢুকেই একখানা বেশ মোটা লাল রঙের বই ক্ষেত্রবাবুর হাতে দিলেন। বইখানার ওপরে সোনার জলে বড় বড় অক্ষরে লেখা—A Recovery Plan for Bengal। ক্ষেত্রবাবুকে বইখানা দিয়ে বললেন, বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই বইখানা লিখে ফেলেছি। বইখানা সম্বন্ধে আপনার কাগজে ভাল করে একটা প্রবন্ধ লিখবেন।

ক্ষেত্রবাবু আমাকে ডাকলেন। আমি ক্ষেত্রবাবুর টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সতীশ মিত্তির আমাকে বললেন, তোমার কপিখানা আমি সঙ্গে আনিনি, অফিসে আলমারীতে রেখে এসেছি, তুমি আমার অফিসে গিয়ে ওখানা নিয়ে আসবে। আমি বললাম, বইখানা খুব ভালই হয়েছে। তিনি অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বইখানা তো এখনও বাইরে ছাড়া হয়নি, তুমি বইখানা কোথায় দেখলে ? আমি বললাম, আমি পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই বইখানা দেখেছি। পাণ্ডুলিপি তৈরি করে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আমাকে দিয়ে বইখানা দেখিয়ে নিয়েছিলেন। আমি আরও বললাম, হেমেন্দ্রপ্রসাদবাবু বলেই ও-রকম বই লেখা সম্ভবপর হয়েছে। কেননা, হেমেন্দ্রপ্রসাদবাবুর শুধু যে নানারকম দুষ্প্রাপ্য বই আছে তা নয়, ও'র বিশাল 'ক্লিপিং'-এর ফাইল বিশেষ মূল্যবান। অন্য লোকের পক্ষে ও রকম সুন্দর বইলেখা সম্ভবপর হত না। অন্যে তত তথ্য পাবে কোথায় ?

পরের দিন ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে ও'র অফিসে গেলে, উনি একখানা কপি আলমারী থেকে বের করে আমার হাতে দিলেন। দেখলাম তাতে লেখা আছে : 'আমার অনুজ অতুলকে আমার আন্তরিক ভালবাসার সঙ্গে দিলাম'।

সতীশ মিত্তির মশাই আমাকে ছোটভাইয়ের মতই মনে করতেন। আমিও ও'কে বড়দা বলে ডাকতাম। আমার ওপর ছিল ও'র অসাধারণ আস্থা। তিরিশের দশকে যখন 'বাসন্তী বটন মিল' স্থাপিত হয়, তখন ওর উদ্বোধন করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেই উপলক্ষে এক বিরাট প্যাণ্ডেল তৈরি করে বহু লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাদের আপ্যায়ন করবার জন্য কলকাতার এক বিশিষ্ট ক্যাটারারকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। আর সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের ভার সতীশ মিত্তির আমার ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। এ ভার ন্যস্ত করবার সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, অতুল, আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করি না।

ঠিক এরকম ভাবেই আমাকে বিশ্বাস করতেন নলিনীরঞ্জন সরকার। নলিনী-রঞ্জন সরকার যখন কলকাতার মেয়র হন, তখন পাঁচটা বড় বড় সংস্থা থেকে ও'কে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। সবই আমার কারসাজিতে হয়েছিল। অনুষ্ঠান গুলি সব নলিনীবাবুর পয়সাতেই হয়েছিল। আমার হাতেই আড়াই হাজার টাকা দিয়ে উনি বলেছিলেন, তুমি অপরের অগোচরে এই অভিনন্দন-অনুষ্ঠান-গুলির ব্যবস্থা করবে। আমি তৎকালীন কলকাতার সবচেয়ে বড় ক্যাটারার ইমপিরিয়াল রেস্টুরেন্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলাম।

নলিনীবাবু মেয়র হওয়ায় কলকাতার এক শ্রেণীর লোক বিশেষ ক্ষুব্ধ

হয়েছিল। তাদের চক্রান্তের ফলে শীঘ্রই দেখা গেল, প্রমথনাথ সরকার নামে এক অধ্যাপক আদালতে অভিযোগ করেছেন যে নলিনীবাবু তাঁর স্ত্রীর (নলিনীবাবুর ভাইঝি) সংগে ব্যভিচারে লিপ্ত। নলিনীবাবু অকৃতদার ব্যক্তি ছিলেন। সেজন্য সকলেই সেটা বিশ্বাস করল। সেই সময় থেকেই নলিনীবাবু 'বড় কাকা' আখ্যা পেলেন। বটতলার প্রকাশনী সংস্থাসমূহ নানারকম ছড়ার বই বের করে, জনসাধারণের আমোদের খোরাক যোগাল। যাক, আদালতে নলিনীবাবুকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি। বসবার জন্য তাঁকে একখানা চেয়ার দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা এসে নলিনীবাবুর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে গেল। নলিনীবাবুর কি হবে, এই নিয়ে লোকে জল্পনা-কল্পনা করছে, এমন সময় মামলাটা হঠাৎ খারিজ হয়ে গেল। কেননা, খুব রহস্যজনকভাবে পুরীগামী এক ট্রেনে প্রমথ সরকারের মৃতদেহ পাওয়া গেল।



মামলা মোকদ্দমার কথা বলতে গিয়ে, সে যুগের অনেক মামলার কথা আমার মনে পড়ে। কলেজে পাঠ্যাবস্থা থেকেই খবরের কাগজে মামলার রিপোর্ট পড়ার দিকে আমাদের ঝোঁক ছিল। তখনকার দিনে খবরের কাগজগুলোর দৈনিক পৃষ্ঠা সংখ্যা হত ২৪ থেকে ৩২। সেজন্য 'স্পেস' ভরাবার জন্য মামলার রিপোর্টগুলো বিশদভাবে ছাপা হত। মনে পড়ে, বিশের দশকের গোড়ায় আমরা কলেজের কয়েকজন ছাত্র 'লিজার-টাইম'-এ হেদুয়ায় গিয়ে বেঞ্চের ওপর বসে করিমগঞ্জে মুসলমানগণ কর্তৃক হিন্দুরমণী ধর্ষণের মামলার আদ্যোপান্ত রিপোর্ট পড়তাম। তারপর আবার পড়েছি তারকেশ্বরের মোহান্তর মামলা, তুলসী গোস্বামী ও লর্ড সিংহের মেয়ে রমলার ব্যভিচার-ঘটিত মামলা, ডানকুনি ট্রেন-দুর্ঘটনার মামলা, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে অরুণ সিংহ যখন বিলাতের হাউস অভ্ লর্ডস্-এ বসতে চাইলেন, তখন তিনি যে তাঁর পিতার বৈধ বিবাহের সন্তান তা প্রমাণ করবার মামলা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা—যে মামলায় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী বিভাবতী প্রকাশ্য আদালতে নিজ স্বামীকে অস্বীকার করেছিল।

এইসব চাঞ্চল্যকর মামলার মধ্যে দুটো মামলার কথা আমি এখানে বিশদভাবে কিছু বলতে চাই। প্রথমে বলি, ডানকুনি রেল-দুর্ঘটনার মামলা। এই রেল দুর্ঘটনায় বহু লোক প্রাণ হারিয়েছিল। তাদের আত্মীয়স্বজনদের ক্ষতিপূরণ এড়াবার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ নিকটস্থ এক মাঠে তাদের মৃতদেহ পুঁতে ফেলেছিল।

সে-সব মৃতদেহ মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছিল। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে 'ফরওয়ার্ড'' পত্রিকায় "রিয়েল হরিফাইড স্পেক্টেটর' এই বেনামীতে একখানা চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠি প্রকাশের জন্য সম্পাদক সত্যরঞ্জন বক্সি ও মুদ্রাকর পুলিনবিহারী ধর ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৫৩-ক ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হন। চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট রক্সবুরো (যিনি কোন মামলার 'প্রসিডিংস' পেস্কারদের লিখতে দিতেন না, নিজেই মামলা চলাকালীন এজলাসে বসে টাইপ করতেন) সত্যরঞ্জন বক্সির তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড দেন ও হাজার টাকা জরিমানা করেন। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারপতিরা ওই দণ্ড বর্ধিত করে সত্যরঞ্জন বক্সির ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও পুলিনবিহারী ধরের দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ডের রায় দেন। জরিমানার টাকা অবশ্য উভয়ক্ষেত্রেই বহাল থাকে। সংগে সংগেই সেক্রেটারী অভ্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া ও ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেল কর্তৃপক্ষ সত্যরঞ্জন বক্সি ও পুলিনবিহারী ধর এবং ফরওয়ার্ড পাবলিশিং লিমিটেডের বিপক্ষে হাইকোর্টে দেড় লক্ষ টাকা দাবি করে দুটি মামলা রুজু করে। বিচারপতি জাস্টিস্ বাকল্যাণ্ড এই দাবি মঞ্জুর করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এক ডিক্রি দেন। ডিক্রির টাকা আদায় না হওয়ায় ফরওয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানিকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হয় ও লুই ফ্রান্সিস্ ওয়াইলড্ স্মিথকে লিকুইডেটর নিযুক্ত করা হয়। ইতিমধ্যে কুঞ্জবিহারী সরকার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট রক্সবুরোর কাছে 'ডিক্লারেশন' দিয়ে "নিউ ফরওয়ার্ড'' পত্রিকার 'নাম' ব্যবহার করছে, এই অজুহাতে লিকুইডেটর ওয়াইলড্ স্মিথ সম্পাদক সুভাষচন্দ্র বসু ও মুদ্রাকর কুঞ্জবিহারী সরকারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে এর প্রচার বন্ধ করে দেন। তখন এঁরা "লিবার্টি'' নামে এক নতুন পত্রিকা বের করেন। এসবই ১৯২৯ সালে ঘটে।

এর দু-তিন বছর পরেই ঘটে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা। এই মামলার বিচারের সময় শরৎচন্দ্র বসু অসাধারণ নির্ভীকতার সংগে আসামীপক্ষ সমর্থন করেন। তার জন্য 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা তাঁকে গালিগালাজ করে। তৎপ্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেছিলেন, 'ব্রিটিশ সিংহের খোলসধারী এইসব কুকুর-বাচ্চাদের মন্তব্যে আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত নই'। ইংরেজ জজ গরম হয়ে উঠে বলেছিলেন, 'Please repeat what you say', ভেবেছিলেন, এই দাবড়ানিতে শরৎবাবু বোধ হয় কথাটা আত্মসাৎ করে নেবেন। কিন্তু শরৎবাবুর চরিত্রের দৃঢ়তা সেদিন শরৎবাবুকে টলাতে পারেনি। আরও উচ্চস্বরে তিনি তাঁর উক্তির পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। জজসাহেবের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। মাথা হেঁট করে টেবিলের ওপর কাগজের দিকে নজর ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। জেলখানার মধ্যেই শরৎবাবু 'লিগ্যাল কনসালটেশন'-এর নাম করে

আসামীদের শক্তিশালী বোমা, কার্তুজ ও রিভলবার দিয়ে তাদের জেলখানা থেকে পালিয়ে আসতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আসামীদের ফাঁসি অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু শরৎবাবু তাদের ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। অর্ধেক আসামী বেকসুর খালাসও পেয়েছিল।

১১১

স্টক একসচেঞ্জের চাকরিতে যেদিন যোগদান করলাম, সেদিন সেক্রেটারী ধীরেন চক্রবর্তী মশাই আমাকে ডেকে বললেন, দ্যাখ, এটা খুব খারাপ জায়গা, তুমি স্টক একসচেঞ্জের সদস্যদের সংগে বেশী মেলামেশা করবে না, বিশেষ করে একজনকে তুমি কিছুতেই আমল দিও না, সে লোকটার নাম হচ্ছে ভাদরমল ঝুনঝুনওয়ালা।

জায়গাটা যে খারাপ, সেকথা আমাকে আবার বললেন, আমার এক বন্ধু। আমার স্টক একসচেঞ্জে যোগদানের (অকটোবর ১৯৩৬) কয়েকদিন পরেই যামিনদা (যামিনী রায়) সমবায় ম্যানসনে তাঁর ছবির এক প্রদর্শনী করলেন। যামিনদা অনেক করে আমাকে ওখানে উপস্থিত থাকতে বললেন। আমি যখন ওখানে গেলাম, তখন দেখা হল নলিনী সরকার মশাইয়ের একান্ত সচিব জ্যোতিদার (জ্যোতি বসু) সংগে। জ্যোতিদা আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, শেষকালে ভবের তরী এমন ঘাটে ভিড়ালেন যেখানে ধনস্থানে শনিলাভ ঘটে! আমি জ্যোতিদাকে বললাম, আমি তো গিয়েছি চাকরি করতে, সুতরাং ধনস্থানে শনিলাভ ঘটুক, বা একাদশে বৃহস্পতির যোগ ঘটুক, তাতে আমার কিছু এসে যায় না।

যাহোক, স্টক একসচেঞ্জের চাকরিতে যোগদান করে, নিজের কাজেই মন দিলাম। ৪৬ দিন ভূতের মত পরিশ্রম করে রয়েল আট পেজি সাইজের হাজার পাতার একখানা বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ফেললাম। বইখানা তৈরি করতে গিয়ে আমাকে ৬০০ কোম্পানির দশ বছরের ব্যালানস্-শীট বিশ্লেষণ করে, প্রতি কোম্পানির দশ বছরের আয়, মুনাফা, মুনাফা বণ্টন, শেয়ারহোলডারদের কি ডিভিডেণ্ড দিয়েছে, এবং ওইসব কোম্পানির শেয়ারের দামের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য ইত্যাদি সংকলন করে, বইখানাতে দেখাতে হল। এরই মধ্যে সম্পন্ন করলাম এক গবেষণার কাজ। এযাবৎ স্টক একসচেঞ্জের কোন লিখিত ইতিহাস ছিল না। নানা সূত্র থেকে এবং বিশেষ করে অবসর-গৃহীত প্রাচীন সদস্যদের কাছ থেকে মুখে শোনা তথ্যের ভিত্তিতে স্টক একসচেঞ্জের একটা ইতিহাস রচনা করলাম। সেটাই ইয়ার-বুকের অগ্রভাগে সন্নিবিষ্ট করলাম।

বইখানা যখন বেরুল, তখন অভিনন্দন পেলাম সকলের কাছে থেকে, বিশেষ করে সাহেব সদস্যদের কাছ থেকে। প্লেস সিডনস্ অ্যাণ্ড গাফ কোম্পানির (শেয়ার-বাজারের সবচেয়ে বড় দালাল) বড়সাহেব স্যার ওয়ালটার ক্র্যাডক্ (তখন তিনি কলকাতার শেরিফ) নিজে এসে আমার করমর্দন করে আনন্দ প্রকাশ করে গেলেন। অথচ, এই ক্র্যাডক্ সাহেবই আমার নিয়োগের সময় ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন।

এই বিক্রির জন্য অগ্রিম টাকা নিয়ে গ্রাহকভুক্তি করার প্রথা আমিই প্রথম এদেশে প্রবর্তন করেছিলাম। দু' হাজার কপি বইয়ের অর্ডার আমরা আগেই পেয়ে গিয়েছিলাম। কথা ছিল তিন মাসের মধ্যে বই দেওয়া হবে। কিন্তু বই বেরুতে সাত আট মাস সময় লাগল। এতে আমরাও যেমন বিব্রত হয়েছিলাম, গ্রাহকরাও তেমনই বিরক্ত হয়েছিল। সুতরাং পরের বছরের জন্য আমরা ছাপাখানা পরিবর্তনের কথা ভাবছিলাম।

এমন সময় একদিন রাজপুত্রের মত চেহারা স্যুট-পরা এক ভদ্রলোক আমার অফিসে এসে হাজির হলেন। সংগে নিয়ে এসেছেন সেনট্রাল ব্যাংক অভ্ ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার এন. এল. পুরীর লেখা এক পরিচয়-পত্র। সেনট্রাল ব্যাংক অভ্ ইণ্ডিয়া স্টক একস্চেঞ্জেরই অন্যতম ব্যাংকার। সেজন্য চিঠিখানাকে গুরুত্ব দিলাম। পরিচয়-পত্র থেকে জানতে পারলাম, উনি ভারতের বৃহত্তম মুদ্রণ-প্রতিষ্ঠান লালচাঁদ অ্যান্ড সন্স-এর মালিক টেকচাঁদ। পুরী লিখেছেন যে এঁরা তিনপুরুষ ধরে গভর্নমেণ্টের একমাত্র মুদ্রাকর ছিলেন। সম্প্রতি এঁদেরই এক কর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় ওঁরা সরকারী সমস্ত মুদ্রণের কাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। সুতরাং ওঁদের এই অদৃষ্ট-বিপর্যয়ের মুহূর্তে স্টক একস্চেঞ্জে যদি ইয়ার-বুক ছাপার কাজটা ওঁদের দেন, তা'হলে তিনি বাধিত হবেন।

আমি ভদ্রলোকের কথাবার্তা ও অমায়িকতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হলাম। ওঁদের বিপদের কথাও আমার মনে ওঁদের প্রতি করুণার ভাব উদ্রেক করল। দ্বিতীয় বৎসরের বই ওঁদেরই ছাপতে দেওয়া হল। সংগে সংগে এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটল। আমাদের বই ছাপার অর্ডার পাবার পরই, ওঁরা সরকারী মুদ্রণের ঠিকাগুলো আবার পেতে আরম্ভ করলেন। এই উভয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে ভেবে টেকচাঁদ কথায় কথায় বলত, দ্যাখ তোমার সংস্পর্শে এসেই আমাদের অদৃষ্ট ফিরে গেল। সেজন্য টেকচাঁদের সংগে আমার বন্ধুত্বটা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হল। শেষকালে এটা অসাধারণ অন্তরংগতায় গিয়ে পৌঁছাল। টেকচাঁদ পাঞ্জাবী হলেও এক বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করেছিল, ত্রিপুরার রাজপরিবারের এক মেয়েকে। আমি টেকচাঁদের পরিবারে একেবারে আপনজন হয়ে গেলাম। দুপুরে ওঁদের

ছাপাখানায় গেলে, ওঁর পরিবারের সকলের সঙ্গে একত্র খেতে বসতাম। খেতে বসলেই প্রায় রান্নার কথা উঠত। টেকচাঁদ বলতেন,'তোমাদের বাংলাদেশের মেয়েদের কোন রান্নার বৈশিষ্ট্য নেই। আমি বলতাম, একমাত্র বাংলাদেশের মেয়েরাই চৌষট্টি রকম ব্যঞ্জন রাঁধতে জানে। আপনার দেশের মেয়েরা কি সুক্ত বা বিউলির ডাল রাঁধতে জানে? টেকচাঁদ বলতেন, ওসব 'অল ন্যাস্টি' জিনিস। তখন টেকচাঁদের স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, ও পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে আমাকে 'ডিফেণ্ড' করবার জন্য বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করতেন। মাঝখান থেকে খাওয়াটা বিলম্বিত ও পণ্ড হয়ে যেত।

টেকচাঁদের স্ত্রী আমাদের সঙ্গে খেতেন না। কেননা উনি হচ্ছেন ত্রিপুরার মেয়ে। সেই কারণে ওঁরা হচ্ছেন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ও নিরামিষাশী। উনি নিজের রান্না নিজে করতেন। সেজন্য আমি প্রায় ঠাট্টা করে ওঁকে বাংলাদেশের কিংবদন্তীর সেই বিধবা উপপত্নীর কথা বলতাম। একাদশীর দিন নাগর এসেছে। নাগরকে উপপত্নী বলছে, 'মুখপোড়া, আর যা করিস কর, কিন্তু মুখে মুখ দিসনি, আজ আমার একাদশী।' শুনে টেকচাদের বউ হো হো করে হাসতেন। টেকচাঁদ ভাল বাংলা বলতে পারতেন, কিন্তু এসব কৌতুকের কথার গূঢ়ার্থ বুঝতেন না। আমাদের হাসতে দেখে জিজ্ঞাসা করতেন, 'হোয়াট ইজ দ্যাট' আমি তখন ইংরেজিতে ওঁকে সব বুঝিয়ে বলতাম। তখন টেকচাঁদও হো হো করে হাসতেন।

লালচাঁদ অ্যাণ্ড সনস্ স্টক একস্‌চেঞ্জ ইয়ার-বুক একনাগাড়ে পঁচিশ বছর ধরে ছেপেছিল। আমার খাতিরে টেকচাঁদ নগণ্যমূল্যে ইয়ারবুকটা ছেপে দিতেন। অন্তরটা ছিল তাঁর খুবই প্রসারিত। আমার তো অনেকগুলি বই টেকচাঁদ বিনা পয়সাতেই ছেপে দিয়েছেন। কখনও কাগজের দাম বা বাঁধাই খরচ পর্যন্ত তিনি নেননি। কিন্তু মৃত্যুর একবছর আগে টেকচাদ আঘাত পেলেন স্টক একস্‌চেঞ্জের কাছ থেকে। স্টক একস্‌চেঞ্জ কমিটির কয়েকজন সদস্য টেকচাঁদের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতায় ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে, ছাপাখানা বদল করতে চাইল। টেকচাঁদ যে দামে বইখানা ছেপে দিতেন, তার ঠিক পাঁচগুণ দাম দিয়ে বইখানা অপর ছাপাখানায় ছাপাবার ব্যবস্থা করল। ছাপাখানা সম্বন্ধে আমার একটা মোটামুটি জ্ঞান আছে। আমি জানতাম যে দামে টেকচাঁদ বইখানা ছেপে দিতেন, তা তার উৎপাদন খরচের চেয়ে অনেক কম। তবুও টেকচাঁদের এই বইখানা ছাপবার প্রতি একটা মমতা ছিল। তার কারণ, তিনি ভাবতেন যে এই বইখানার অর্ডারই তাদের অদৃষ্ট ফিরিয়ে দিয়েছিল। কাকতালীয় বলুন, আর নাই বলুন, ঘটলও তাই। স্টক একস্‌চেঞ্জ ইয়ার বুক ছাপা বন্ধ করে দেওয়ায়, লালচাঁদ অ্যাণ্ড সনস্-এর কারবারের পতন ঘটল।

১১১

প্রথম বছর স্টক একস্‌চেঞ্জ ইয়ার-বুকের পাণ্ডুলিপিটা তৈরি হয়ে গেছে। পাণ্ডুলিপিটা এবার আর্টপ্রেসে পাঠানো হবে, এমন সময় একদিন একজন লোক আমার ঘরে ঢুকল, সঙ্গে দুজন লোকের হাতে প্রায় তিন-হাত উঁচু দুটো ঠোঙা। লোকটা ঠোঙাদুটো আমার ঘরের কোণে রাখতে বলল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সুরসাহেব (স্টক একস্‌চেঞ্জে আমি এই নামেই পরিচিত ছিলাম), আজ নতুন বাজারে গিয়েছি, ফলপটিতে গিয়েছি, নিউ· মার্কেটে গিয়েছি, সব বাজার থেকে সবচেয়ে বড় সাইজের যা কমলালেবু পেয়েছি, সব আপনার জন্য কিনে এনেছি। আমি ঠোঙাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এক একটা লেবু ঠিক বাতাবি লেবুর সাইজ।

আমি লোকটাকে চিনি না, অথচ লোকটার আমার প্রতি এত দরদ কেন, তা বুঝলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নাম কি ? লোকটা বলল, আমি স্টক একস্‌চেঞ্জের মেম্বর, আমার নাম ভাদরমল ঝুনঝুনওয়ালা। নামটা শুনেই আমি আঁতকে উঠলাম। স্মরণ করলাম, এই লোকটাকে আমল না দিতেই তো ধীরেন চক্রবর্তী মশাই প্রথম দিন আমাকে মানা করে দিয়েছিলেন।

তারপর ভাদরমল বলতে শুরু করল, আমার সমস্ত পরিবার দেশে থাকে। কয়েক মাস আগে আমার বড়ছেলের সেখানে মরণাপন্ন অসুখ হয়। দেশ থেকে আমার স্ত্রী, উটের জন্য বাড়তি খরচ দিয়ে, আমাকে দেশে যাবার জন্য টেলিগ্রাম করে। সে টেলিগ্রামটা পথে বেপাত্তা হয়ে যায়। আমি টেলিগ্রামটা পেলাম না। ছেলেটা মারা গেল। ডাকবিভাগের সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছে অভিযোগ করে এর কোন প্রতিকার পাইনি। বাজারের মেম্বরদের কাছ থেকে শুনলাম, আপনিই একমাত্র এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারেন। তাই আজ আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

লোকটার করুণ কাহিনী শুনে, আমি ধীরেন চক্রবর্তী মশাইয়ের কথা ভুলে গেলাম। সরকারের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিলাম। শীঘ্রই ভাদরমল তার অনুযোগের প্রতিকার পেল।

সেই থেকে ভাদরমল রোজ আমার ঘরে আসে, আর অনেকক্ষণ বসে গল্প করে। ক্রমশ আমাদের মধ্যে একটা নিবিড় হৃদ্যতা গজিয়ে উঠল। এমন হল যে ভাদরমল ইহজগতে আমাকে ছাড়া, আর কাউকে বিশ্বাস করত না। শুনলাম, ধীরেন চক্রবর্তীর ভাদরমলের ওপর খাপ্পা হবার কারণ, ভাদরমল ধীরেন চক্রবর্তীর স্টক একস্‌চেঞ্জে নিয়োগ ছ'মাস আটকে রেখেছিল।

বাজারের অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে ভাদরমলের অতীত জীবনের কাহিনীটা সংগ্রহ করলাম। শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলকাতার মারবাড়ী সমাজে ভাদরমলের পরিবারের স্থান ছিল সবার শীর্ষে। ভাদরমলের পিতামহ সিউদতরায় ছিল কলকাতার শ্রেষ্ঠ সোনা-রূপো-ও-শেয়ারের কারবারী লোক। শতাব্দীর সূচনায় ভাদরমলের পিতা প্রেমসুক কারবার দেখত। ভাদরমল তখন খুব ছেলেমানুষ। যেদিন হ্যারিসন রোডে প্রথম ট্রাম চলতে শুরু করল, সেদিন প্রেমসুক অফিস থেকে ঘোড়ার গাড়ি (তখন মোটরগাড়ির প্রবর্তন হয়নি) করে বাড়ি ফিরছিল। হ্যারিসন রোডে পেঁছানো মাত্র, ঘোড়াটা ট্রামের ঢং ঢং শব্দ শুনে ক্ষেপে উঠল। ঘোড়া জোতবার বোমটা গাড়ির ভেতর ঢুকে প্রেমসুকবাবুর বুকে মারল প্রচণ্ড আঘাত। সেখানেই প্রেমসুকবাবুর মৃত্যু ঘটল।

পুলিশ এল। বলল, ময়না তদন্ত হবে। লাশ ফেরত পেতে দু'একদিন দেরী হবে। প্রেমসুকবাবুর মত একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির লাশ বাসী হবে শুনে, কলকাতার সমস্ত মারবাড়ীসমাজ উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা ছুটে গেল বড়লাট লর্ড কার্জনের বাড়ি। বড়লাট তখন বাড়িতে নেই, রেসের মাঠে গেছেন 'ভাইসরয় কাপ' বাজির খেলা দেখতে। কলকাতার গণ্যমান্য মারবাড়ীরা সেখানেই গেল। বড়লাট নির্দেশ দিলেন, প্রেমসুকবাবুর শব ব্যবচ্ছেদ না করে, নিমতলা ঘাটেই করোনার কোর্ট বসিয়ে, লাশ যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। কলকাতার ইতিহাসে এরূপ ঘটনা, এই প্রথম ও এই শেষ।

এরকম বিখ্যাত ধনী পরিবারের ছেলে ছিল ভাদরমল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন শেয়ার-বাজারে মহাধুম পড়ে গিয়েছিল, তখন ভাদরমল অনেক পয়সা কামিয়েছিল। কিন্তু ভাদরমলের ঘাড়ে চেপেছিল কতকগুলি বদ নেশা। একটা হচ্ছে ঘোড়ার মাঠের নেশা, আর একটা হচ্ছে মেয়েমানুষের সখ। এই দুইয়ে মত্ত হয়ে ভাদরমল তার অর্জিত বৈভব সব নষ্ট করে ফেলেছিল। একসময় 'রেস'-এর মাঠে ভাদরমলবাবুর সতেরোটা ঘোড়া ছুটত। বাংলাদেশের এক বিখ্যাত রাজপরিবারের দুহিতাকে ভাদরমল রক্ষিতা হিসাবে রেখেছিল। সেই রাজ-দুহিতাকে ভাদরমল যে বাড়িখানা কিনে দিয়েছিল, তা এখনও আছে। কিন্তু সামনে পনেরো-বিশ বছরের মধ্যে ভাদরমল একেবারে কাহিল হয়ে গেল। বাজারে যা কিছু কেনাবেচা করে, সবেতেই তার লোকসান। শেয়ার-বাজারের ফাটকায় ভাদরমলবাবু শেষে সব খুইয়েছিল। আমার সঙ্গে ভাদরমলবাবুর যখন পরিচয় হয়, তখনও ভাদরমলের কিছু সংগতি ছিল। মনটা ছিল তার অত্যন্ত উদার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চোট ভাদরমল আর সামলাতে পারল না। একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। কিন্তু সংগতি না থাকলেও চেষ্টা করত নিজ পরিবারের পুরোনো

ঐতিহ্য বজায় রাখতে।

আমার সংগে পরিচয়ের দু-এক বছর পরেই ভাদরমলবাবু ছেলের বিয়ে দিল, রেংগুনের এক বিখ্যাত শিল্পপতির মেয়ের সংগে। ওই বিয়েতে আমি নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। দেখে অবাক, ভাদরমলবাবু ৬৪ রকম মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করেছে। পরের দিন দু'ঝুড়ি মিষ্টান্ন আমার বাড়িতেও পাঠিয়েছিল।

অত্যন্ত স্বাধীনচেতা লোক ছিল ভাদরমলবাবু। ছেলের বিয়ের পর ছেলে চলে গিয়েছিল রেংগুনে, শ্বশুরের কারবারে নিযুক্ত হয়ে। রেংগুন থেকে ছেলের শ্বশুর ভাদরমলবাবুকে লিখেছে, চলে আসুন আপনি রেংগুনে, আপনাকে আমি আমার কটন মিলের 'সোল এজেণ্ট' বানিয়ে দেব। ভাদরমল চিঠিখানা আমাকে পড়ে শুনাল, বলল, শালা বেয়াই ভেবেছে আমাকে 'সোল এজেণ্ট' বানিয়ে ওর গোলাম করে রাখবে!

অনেকদিন মুখ দেখে বুঝতাম, ভাদরমলের সেদিন খাওয়া হয়নি। কিন্তু আমার পক্ষে কোনদিনই জোর করে ওকে খাওয়ানো সম্ভবপর হয়নি। কারো সহৃদয়তার শরিক হবে, বা কারো কাছ থেকে টাকাপয়সা চাইবে বা নেবে, এটা ভাদরমলের নীতি ছিল না।

বিরাট ধনৈশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়ে, ভাদরমল সস্ত্রীক শেষ আশ্রয় নিয়েছিল দর্মাহাটার এক বাড়ির রাস্তার দিকের রকে। ওই রকের ওপরই ভাদরমল শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল।

জীবনে বরাবরই মনে মনে আবৃত্তি করেছি রবীন্দ্রনাথের এক কবিতার অংশ-বিশেষ: 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী, হে চির সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।' অনুভব করেছি, রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার মধ্যেই নিহিত আছে জগতের পরম সত্য।

পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা। এ বন্ধুর পন্থা অলক্ষ্যে নিয়তি কিভাবে রচনা করে চলেছে. তা মানুষের অবোধ্য। অদৃষ্ট যে তাকে কোথায় নিয়ে যাবে, তা সে আগে থাকতে বুঝতে পারে না। উদ্দাম যৌবনের উচ্ছৃংখলতার মধ্যে ভাদরমল যখন নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল, তখন কি সে জানত যে পরিণতিতে তাকে দর্মাহাটার এক বাড়ির রাস্তার দিকের রকে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে! না, প্রণব মুখার্জি জানতেন যে ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণের পর তিনি নিজে যাঁদের গদিতে বসিয়েছিলেন, তাঁদের হাতেই তাঁকে নেমে যেতে হবে লাঞ্ছনা ও অবমাননার চরম তলে!

ঌ ঌ ঌ

সমসাময়িককালে ভাদরমলের ঠিক বিপরীতটা ঘটেছিল বাঙ্গুর পরিবারের ইতিহাসে। শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক সুদর্শন তরুণ রিক্তহস্তে পাড়ি মেরেছিল সুদূর রাজস্থান থেকে কলকাতা শহরে ভাগ্যান্বেষণে। সঙ্গে ছিল একটা লোটা ও একখানা কম্বল। আর তার ছিল অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ও বৃহস্পতির আশীর্বাদ। থাকবার আশ্রয় না পেয়ে নিমতলার ঘাটে সিঁড়ির ওপরেই দু'তিন রাত কাটাল। নিমতলা ঘাটে তখন প্রত্যহ সকালে স্নান করতে আসতেন তখনকার দিনের কলকাতার শেয়ার-বাজারের বড় দালাল শ্রীনারায়ণ সোনী। ছেলেটি তাঁর নজরে পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদে জানলেন, ছেলেটি তাঁদেরই মাহেশ্বরী সম্প্রদায়ভুক্ত। ছেলেটিকে বাড়ি নিয়ে গেলেন এবং নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। যৌতুক-স্বরূপ দিলেন বেঙ্গল কোল কোম্পানির ৫০০ শেয়ার। এই ৫০০ শেয়ারই ছেলেটির অদৃষ্ট ফিরিয়ে দিল। এই শেয়ারগুলির সঙ্গে বাঁধা ছিল লক্ষ্মীর অঞ্চল। ধুলোমুঠি ধরে তো কড়িমুঠিতে পরিণত হয়। মাগনীরাম, রামকুমার, গোবিন্দলাল, নরসিংদাস এঁরা পরবর্তীকালে বাজারের প্রথম পর্যায়ের দালালের স্থান অধিকার করলেন। নরসিংদাসের আমলে বাঙ্গুররা হয়েছেন ভারতের শিল্পসাম্রাজ্যের অন্যতম অধিপতি।

ঌ ঌ ঌ

মানুষের নিয়তির কথা যখন ভাবি, তখন সব সময়েই মনে পড়ে আমার বন্ধু মাইকেলকে। মাইকেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, যখন আমাদের 'কমারসিয়াল গেজেট'-এর অফিস দু'নম্বর রয়েল একস্‌চেঞ্জ প্লেসে স্থানান্তরিত হয়। মাইকেল ছিল পাট ও চটের দালাল। বেশ দু'পয়সা রোজগার করেছিল দালালী কারবার থেকে। কিন্তু ত্রিশের দশকের গোড়ায় যখন দেখা দিল সারা বিশ্বের হাটে কালো ঘন মেঘ, মাইকেলের তখন বিশেষ কাজকর্ম ছিল না। অবসর সময়ে আমার অফিসে এসে গল্পগুজব করত। আজকের লোক মাইকেলকে ভুলে গিয়েছে। কিন্তু তখনকার লোক জানত মাইকেল পরিকল্পনা করেছিল, কলকাতা শহরে সে অনুষ্ঠিত করবে বিশ্বের বৃহত্তম প্রদর্শনী। একাজে সে কতটা অগ্রসর হয়েছে, তা জানাবার জন্য সে একদিন আমাকে আমন্ত্রণ জানালো তার বাড়িতে যাবার জন্য। চলে গেলাম ডায়মন্ড হারবার রোডের পাশে রিমাউন্ট রোডে মাইকেলের বাড়িতে। মাইকেল ও তার দুই মেয়ে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা

জানাল। মাইকেল বিপত্নীক। তার মেয়েরাই সংসারের কাজকর্ম করে ও তার পিতাকে তার কাজে সাহায্য করে। চা-টা খাবার পর মাইকেল ও তার মেয়েরা আমাকে নিয়ে গেল, প্রদর্শনীটা কি রকম হবে, তার 'মডেল' দেখাবার জন্য। পৃথক পৃথক ঘরে বিভিন্ন টেবিলের ওপর প্রদর্শনীর বিভিন্ন 'সেকশন'-এর 'মডেল'। সব দেখে তো আমি অবাক। আমাকে বলল, সংবাদপত্রে এর একটা প্রচার চাই। বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রতিবেদকদের সংগে করে এনে দেখালাম মাইকেলের প্রদর্শনীর 'মডেল'। সকলেই উল্লসিত হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রবন্ধ লিখল। তাতে মাইকেল ও তার মেয়েদের সংগে আমার একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠল।

মাইকেল ক'দিন আর আমার অফিসে আসছে না। একদিন তার বড় মেয়ে এসে আমাকে খবর দিল যে মাইকেল এক মোটর-দুর্ঘটনায় পড়ে বাড়িতে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। মাইকেলের আর চৈতন্য ফিরল না। কলকাতার বৃহত্তম প্রদর্শনীর পরিকল্পনার সেখানেই সমাপ্তি ঘটল। ভাবলাম, অদৃষ্টের এও এক পরিহাস!

এরকমভাবেই শেয়ার বাজারে ও শিল্পজগতে দেখেছি কত লোককে বড়লোক হতে। আবার রাতারাতি অনেককেই ধূলায় লুণ্ঠিত হতেও দেখেছি।



শেয়ার-বাজার হচ্ছে শাঁখের করাত। অদৃষ্টের চাকা এখানে দু'দিকেই ঘোরে। শেয়ার-বাজারে ঢোকবার সংগে সংগে ব্যাপারটা আমার চোখের সামনেই ঘটল। ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে আমি যেদিন চাকরিতে ঢুকলাম, সেদিন ইণ্ডিয়ান আয়রন শেয়ারের দাম ছিল ছ'টাকা বারোআনা। তখন ইণ্ডিয়ান আয়রনের প্রতি লোকের দারুণ আকর্ষণ। সকলেই ইণ্ডিয়ান আয়রন কিনছে। দামও ধীরে ধীরে উঠছে। বড়দিনের ছুটির আগে দাম উঠে দাঁড়াল আঠারো টাকা আট আনায়। তার মানে, তিন মাসে দাম বারো টাকা এগিয়ে গেল।

কিন্তু পরের তিন মাসে যা ঘটল, তা অভূতপূর্ব। প্রত্যহই ইণ্ডিয়ান আয়রনের দাম লাফাতে লাগল। দুনিয়ার সকলের কাছেই সেদিন ইণ্ডিয়ান আয়রন স্বর্ণতরু বলে মনে হয়েছিল—একবার নাড়া দিলেই টাকা ঝরে পড়বে। সেদিন দেখেছি, পথচারী অন্য কাজে ব্যবসাপাড়ায় এসে, যাবার পথে দু-চারশো ইণ্ডিয়ান আয়রন কিনেছে, আর ফেরবার পথে পাঁচ-সাতশো টাকা মুনাফা নিয়ে ঘরে ফিরেছে।

১৯৩৭ সালের প্রথম তিন মাস এভাবেই কাটল। সকলের কাছেই ইণ্ডিয়ান আয়রন সেদিন পরশমণি। তারপর এপ্রিল মাসের চার তারিখের কথা। বেলা সাড়ে এগারোটার সময় আমার ঘরে একজন দালাল ঢুকল কী একটা কাজে পরামর্শের জন্য। জিজ্ঞাসা করলাম, জী, আয়রনকা ভাও ক্যায়া? সে বলল, ৭৯ টাকা ১২ আনা। সংগে সংগে বিশেষ উৎসাহ ও উত্তেজনার সংগে বলল, দেখিয়ে না পনরো দিনকা বীচমে আয়রনকা ভাও সো রুপিয়াসে জিয়াদা হো জায়েগা। সে বলার সংগে সংগেই বাজার থেকে উঠল এক আর্তনাদের শব্দ। শব্দ শুনেই দালালটি বাজারের দিকে ছুটল। আমি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কী? উত্তর এল, নেপালের এক রানা ৮০,০০০ আয়রন বেচেছেন। আয়রনের দাম পড়ছে। দাম নেমে এল ৬০ টাকায়। প্রত্যেকেরই শেয়ার প্রতি বিশ টাকা করে লোকসান হল। সেদিনের কেনাবেচার ফলে মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াল আঠারো কোটি টাকা। কর্তৃপক্ষ লেনদেনের হিসাব চুকাবার জন্য বাজার দু'দিনের জন্য বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু এই দু'দিনের মধ্যে বাজারের দালালরা এমন সুষ্ঠুভাবে এই আঠারো কোটি টাকার ঘাটতি মেটাল, যে পরদিন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা এক প্রবন্ধ লিখে স্টক এক্সচেঞ্জকে অভিনন্দন জানাল।

এরকম ঘটনা শেয়ার-বাজারে আর একবার হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হাওড়া জুট মিলের শেয়ারের কেনাবেচার লড়াইয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে। এঁরা হচ্ছেন কলকাতার মারবাড়ী সমাজের বিখ্যাত 'নাথানী'-পরিবারের বলদেওদাস ও রামেশ্বরলাল। সেদিন বাজারে দাঁড়িয়ে এক ভাই ক্রমাগত হাওড়া জুট মিলের শেয়ার বেচে গেলেন, আর আরেক ভাই তা কিনে গেলেন। দিনের শেষে দেখা গেল এক ভাইয়ের কাছে অপর ভাইয়ের লোকসান দাঁড়িয়েছে ৯৪ লক্ষ টাকা। এক ভাই যখন অপর ভাইকে আলাহাবাদ ব্যাংকের ওপর ৯৪ লক্ষ টাকার চেক দিলেন, তখন ব্যাংকের ম্যানেজারের তো চক্ষু ছানাবড়া! তিনি টেলিফোন করে জেনে নিলেন চেকখানা ঠিক কিনা।

নাথানীরা দুধওয়ালা নামে পরিচিত। এঁরা শেয়ার-বাজার থেকে অনেক পয়সা কামিয়েছিলেন। টাকার সদ্ব্যয়ও করে গেছেন। ভারতের নানাস্থানে যে 'দুধওয়ালার ধর্মশালা', সেগুলি তাঁদেরই অবদান। কিন্তু উত্তরকালে লক্ষ্মী তাঁদের চঞ্চলা হলেন। ধনাঢ্যতা তাঁদের ম্লান হয়ে গেল।

শেয়ার-বাজারে এককালের অনেক আমীরই পরবর্তীকালে ফকির হয়েছেন। আমার বন্ধু ভাদরমল ঝুনঝুনওয়ালাই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

১১১

শেয়ার-বাজারে যে কত লোকের সংস্পর্শে এলাম তার ইয়ত্তা নেই। সব সময়েই নিজের মানসম্ভ্রম বজায় রেখে কাজ করে এসেছি। সকলেই আমাকে সমীহ হয়ে চলত। যত বড়ই বিত্তশালী দালাল হউক না, বা স্টক এক্সচেঞ্জের কমিটি মেম্বর বা প্রেসিডেণ্ট হউক না কেন, আমি না বললে কেউ আমার টেবিলের সামনে এসে আসনগ্রহণ করতে সাহস করত না, দাঁড়িয়েই থাকত। বাহিরের লোকও ঠিক অনুরূপ আচরণ করত। এই ধরুন না, অতুল্য ঘোষের কথা। স্টক এক্সচেঞ্জ ইয়ার-বুকে ছাপার জন্য হুগলি ব্যাংকের বিজ্ঞাপনের কপি, বা ব্লক বা প্রুফ সেই-ই নিয়ে এসে আমার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। কেননা সে জানত যে হুগলি ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেকটর ধীরেন মুখুজ্যে মশাই আমার বিশিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেদিন কে জানত যে এই অতুল্য ঘোষই একদিন রাজনীতির শীর্ষগগনে বিরাজ করবে। তা যদি জানা থাকত তো, সেদিন আমি কি অতুল্য ঘোষের সংগে ও-রকম ব্যবহার করতাম? হয়তো আমার সামনের চেয়ারে বসতে বলতাম।

অদৃষ্ট যে মানুষকে কখন তার যশ, মান ও খ্যাতির তুংগে নিয়ে যাবে তা সে আগে থাকতে জানে না। অতুল্য ঘোষই তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

ওই স্টক এক্সচেঞ্জেই আর যে এক ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছি তার কথা বলি।

১১১

সেটা আমি যে বৎসর (১৯৩৬) প্রথম স্টক এক্সচেঞ্জে ঢুকেছি সে-বৎসরের কথা। একদিন জে. এম. দত্ত মশাই আমার ঘরে এক ছোকরাকে নিয়ে এসে বললেন, এর নাম 'জ্যাকি', ভাল নাম যতীন চক্রবর্তী। দেশের কাজে লেগে আছে। দেখুন-না একে দিয়ে 'ইয়ার-বুক' এর কিছু কাজ করাতে পারেন কিনা? জ্যাকি সেই যে আমার ঘরে ঢুকল, আর নড়েচড়ে না। সেখানেই মৌরসী-পাট্টা গাড়ল। জ্যাকির মত আড্ডার আসর জমাতে আমি আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখিনি। জ্যাকি ইয়ার-বুক ডিপার্টমেন্টটাকে আড্ডার একটা মহাপীঠ করে তুলল। আড্ডায় যোগ দেয় আমার স্টেনোগ্রাফার গোপাল মিত্তির ও আমার অফিস অ্যাসিস্টাণ্ট গোপেশ্বর দাস। ভাদরমলবাবু কাছে বসে থাকে। সব দেখে আর শোনে। আমোদ-কৌতুক করাই হচ্ছে জ্যাকির প্রধান মূলধন। অকাতরে সবাইকে বিতরণ করে সেই মূলধন। একদিন জ্যাকি আমাকে খুব চেপে

ধরল। বলল, ল' (আইন) পড়ব ঠিক করেছি। তুমিও চল, দু'জনে একসঙ্গে ক্লাস করব। আমি বললাম, আমার আর এ-বয়সে শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে যোগ দেবার ইচ্ছা নেই। জ্যাকি নাছোড়বান্দা। কিন্তু আমি গেলাম না। অগত্যা জ্যাকিকে একলাই যেতে হল। জ্যাকি খুব মেধাবী ছেলে। প্রথম বিভাগে ল' পাস করল। মুখে মুখে সংস্কৃত ও বাংলা কবিতা রচনা করবারও ওর প্রতিভা ছিল। একদিন এক সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে জ্যাকি ঘরে ঢুকল। বললাম্, বস, বস, হল কি ? হঠাৎ সংস্কৃত কবিতার স্ফুরণ জেগে উঠল কেন ? জ্যাকি বলতে শুরু করল, আমরা মহাকবি কালিদাসের যে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' পড়ি, ওটা সংক্ষিপ্ত বই। কালিদাস খুব বড় করে ওটা লিখেছিলেন। পরে অনেক বাদসাদ দিয়ে ওটাকে ছোট করা হয়েছে। এরকম বাদ-দেওয়া একটা অংশ আজ আমি উদ্ধার করেছি। জান তো, রাজা দুষ্মন্ত যখন কণ্বমুনির আশ্রমের নিকট মৃগয়ায় গিয়েছিলেন, তখন কণ্বমুনি আশ্রমে ছিলেন না। আশ্রমে ছিল মাত্র শকুন্তলা, প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া। কণ্বমুনি আশ্রমে ফিরে এসে শকুন্তলাকে দেখতে না পেয়ে, প্রিয়ংবদা ও অনসূয়াকে শুধাচ্ছেন শকুন্তলাকে দেখছি না যে, শকুন্তলা কোথায় গেল ? তখন প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া বলছে, শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে গিয়েছে। কোথায় গিয়েছে ? তোমরা কি দেখলে ? তার উত্তরে কালিদাস যা লিখেছেন, তা আজকালকার 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সেটাই আমি আজ উদ্ধার করেছি। কালিদাস লিখেছিলেন— 'করে ধৃত্বা, বনে নীত্বা, চিতং কৃত্বা মহীতলে··· রাজা কৌতূহলে'। যদিও তার পরের অংশ সাধুভাষায় রচিত, তা হলেও তার মর্মার্থ অশ্লীল। সেজন্য জ্যাকি যা আবৃত্তি করেছিল, তা আর আমি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করতে পারলাম না।

এরকম একটা না একটা কবিতা জ্যাকি রোজই উদ্ভাবন করে। আমরা সকলে শুনে খুব আনন্দ পাই।

জ্যাকি আসে, যায়। নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্যাকি এল ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাস পর্যন্ত। তারপর আর জ্যাকি আসে না। খবর নিয়ে জানলাম, জ্যাকিকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, জ্যাকি এখন জেলখানায়।

লড়াইয়ের পর জ্যাকি মুক্তি পেল। প্রথমেই ছুটে এল আমার ঘরে। জেলখানায় থাকাকালীন শালাদের কিভাবে জব্দ করেছে, সেইসব গল্প করতে লাগল।

তারপর ট্রেড-ইউনিয়নিজম্ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য জ্যাকি বিলাত গেল। বিলাত থেকে ফিরে এসেই একগাদা বই আমার টেবিলের ওপর রাখল। বলল, বিলাত থেকে স্টক একস্চেঞ্জ সম্বন্ধে এই বইগুলো তোমার জন্য এনেছি।

জ্যাকি এখন পাকা ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট। একদিন বলল, স্টক একস্‌চেঞ্জের কর্মীদের নিয়ে খাড়া করে দাও একটা ট্রেড ইউনিয়ন। স্টক একস্‌চেঞ্জ কর্মীদের একটা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা হল। দেবেন সেন হল প্রেসিডেণ্ট। জ্যাকি আর আমি জয়েণ্ট সেক্রেটারী। স্টক একস্‌চেঞ্জের প্রেসিডেণ্ট বিশ্বম্ভরনাথ চতুর্বেদী আমাকে ডেকে বললেন, তুমি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন কর আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বাইরের লোককে এর মধ্যে ঢুকিও না। এসময় আমার বড় ছেলে মারা গেল। সব গোলমাল হয়ে গেল। ইউনিয়ন উঠে গেল।

বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন চালাতে গিয়ে জ্যাকি যখনই মুশকিলে পড়ত, তখনই আমার কাছে ছুটে আসত। বলে, ভাই, অমুক কোম্পানির ব্যালানস্‌ শীট বিশ্লেষণ করে বলে দাও, মালিকদের কোন্‌ ফ্রণ্টে আক্রমণ করা যায়। সব সময়ই আমি সাহায্য করেছি।

তারপর জ্যাকি বিধানসভায় ঢুকল। ঝামেলাটা বাড়ল আমার। দুনিয়ার যত ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের আমার ঘরে নিয়ে আসে। একই আবদার, কোম্পানির ব্যালানস্‌ শীটটা বিশ্লেষণ করে বলে দাও, কোম্পানিকে কোন্‌ দিক দিয়ে আক্রমণ করা যায়।

কাগজে পড়ে দেখি, জ্যাকি বিধানসভায় ঢুকেছে বটে, কিন্তু ওর কৌতুক করবার স্বভাবটা যায়নি। একবার গুজব রটল, বিধান ডাক্তার তার আইবুড়ো নাম ঘুচিয়েছে। জ্যাকি বিধানসভার মধ্যেই বিধান ডাক্তারকে বলল, স্যার, শুনেছি নাকি আপনি 'ইয়ে' করেছেন।

জ্যাকি মন্ত্রী হয়েছে। উল্লসিত হয়ে রাইটারস্‌ বিলডিং-এ ওকে অভিনন্দন জানাতে গেলাম। জ্যাকি আমাকে দেখেই ছুটে এল ঘরের বাইরে। ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে আমাকে বসালো ওর টেবিলের সামনে।

তারপর আর আমি যাইনি। পাছে লোকে ভাবে, আমি নিজের কোন স্বার্থের জন্য ওর কাছে গিয়েছি। তবে পরের স্বার্থে জ্যাকিকে যখন যা অনুরোধ করেছি, জ্যাকি সঙ্গে সঙ্গে সে অনুরোধ রেখেছে। এই সে-বছরের কথা। আমার সহকর্মী ড. চিত্রা দেব 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় চাকরি পেয়েছে বটে, কিন্তু কলকাতায় থাকার জায়গা নেই। নিরাশ্রয় অবস্থায় বিব্রত হয়ে পড়েছে। না আছে খাবার-শোবার জায়গা, না আছে ওর বইয়ের সংগ্রহ রাখবার। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র গ্রন্থাগারিক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই আমাকে বললেন, আপনি যতীন চক্রবর্তী মশাইকে লিখে চিত্রাকে একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করে দিন না। একটা চিঠি লিখে দিলাম জ্যাকিকে। চিত্রা একটা ভাল ফ্ল্যাট পেল।

বহুকাল পরস্পরের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ নেই, অথচ জ্যাকি আমাকে ভুলে

যায়নি। এই বছর দুয়েক আগে এক চিঠিতে জ্যাকি আমাদের সেই স্টক একসচেঞ্জের আড্ডার কথা মনে করিয়ে দিয়ে ওর 'nostalgic reminiscences'-এর উল্লেখ করেছিল। জীবনে জ্যাকির মত খুব কম মানুষের সংস্পর্শে আমি এসেছি।

১১১

স্টক একসচেঞ্জের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ যুগেই আমি স্টক একসচেঞ্জে ঢুকেছিলাম। ওটা ছিল স্টক একসচেঞ্জের ভারতীয়করণের যুগ। আগে স্টক একসচেঞ্জ মোটামুটি সাহেবদেরই শাসনাধীনে ছিল। প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হতেন সদস্যদের মধ্য থেকে। তবে তাঁরা মাত্র পদাধিকারীই হতেন। স্টক একসচেঞ্জের অফিস পরিচালনা করতেন মিস্টার ক্ল্যারিজ নামে একজন ফিরিঙ্গি। ইনি ছিলেন কলকাতার রানী ভবানী স্কুলের বিখ্যাত হেডমাস্টার ক্ল্যারিজের ছোট ভাই। ক্ল্যারিজ ছিলেন স্টক একসচেঞ্জের খুব কঠোর শাসক। তাঁর শাসন পদ্ধতির কঠোরতা প্রকাশ পাবে তাঁর এক অভ্যাস থেকে। এর জন্য স্টক একসচেঞ্জের ঠিকাদারকে প্রত্যহ সরবরাহ করতে হত দু'ডজন সাদা রুমাল। ক্ল্যারিজ সাহেব প্রতিদিন অফিসে যাবার আগে ওই রুমালগুলো সংগে নিয়ে যেতেন স্টক একসচেঞ্জের প্রতি তলার 'ল্যাভাটরি'তে। সেখানে গিয়ে তিনি ওই রুমাল দিয়ে পায়খানার 'প্যান'গুলোর ওপর ঘষতেন। যদি রুমালে সামান্য মাত্র দাগ পড়ত তো, তিনি মেথরদের জরিমানা করতেন। ব্যবহৃত রুমালগুলো অবশ্য মেথররাই পেত। ক্ল্যারিজ সাহেব অফিসের টেবিলের ওপরই শুতেন, এবং দিনের বেলা টিফিন টাইমে প্রচুর ভুট্টা খেতেন। শুনেছি অত্যধিক ভুট্টা খাবার ফলেই, তাঁর 'ব্লাড-প্রেসার' হয়েছিল, এবং এই 'ব্লাড প্রেসার' রোগেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। ক্ল্যারিজ সাহেবের মৃত্যুর পরই স্টক একসচেঞ্জ কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয়করণের। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে রায় বাহাদুর কেদারনাথ খাণ্ডেলবাল প্রথম ভারতীয় প্রেসিডেণ্ট ও ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীসত্যরঞ্জন মিত্র প্রথম অবৈতনিক ভারতীয় সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী প্রথম বেতনিক সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। কয়েক মাস পরে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে আমার নিয়োগ হয়। ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে 'প্লাটিনাম জুবিলি' উপলক্ষে স্টক একসচেঞ্জ যে স্মারকগ্রন্থ বের করে, তার গোড়ার দিকের একটা পাতায় আমাদের এই চারজনের ছবি ছাপা হয়। কেননা আমরাই হচ্ছি স্টক একসচেঞ্জ ভারতীয়করণের প্রথম চার হোতা।

আমার নিয়োগের দু'বছর পরেই আবার একজন সাহেবই প্রেসিডেণ্ট হলেন। তিনি হচ্ছেন প্লেস সিডনস অ্যাণ্ড গাফের বড়সাহেব ডবলিউ. আর. ইলিয়ট।

তার পরের বছর প্রেসিডেণ্ট হলেন জিতেন্দ্রমোহন দত্ত (জে. এম. দত্ত)। জিতেন বাবু পরপর চার বছর প্রেসিডেণ্ট রইলেন। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে বিশ্বম্ভরনাথ চতুর্বেদী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন, এবং তিনি ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ওই পদে বহাল রইলেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত চিরঞ্জীবলাল ঝুনঝুনওয়ালা, ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত চণ্ডালাল খাণ্ডেলবাল ও ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত শিওকিষেণ বাগলা স্টক একস্‌চেঞ্জের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন। ১৯৬৯ সালেই আমি স্বেচ্ছায় স্টক একস্‌চেঞ্জ থেকে অবসরগ্রহণ করি। সুতরাং সাতজন প্রেসিডেণ্টের আমলে আমি স্টক একস্‌চেঞ্জে কাজ করে এসেছি। আমি সকলেরই অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ছিলাম।

ꣻ ꣻ ꣻ

গোড়া থেকেই আমার লক্ষ্য ছিল কলকাতার স্টক একস্‌চেঞ্জকে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ স্টক একস্‌চেঞ্জের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তোলা। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি স্টক একস্‌চেঞ্জ ইয়ার-বুকখানাকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে তুলেছিলাম। বহুদিন যাবৎ এখানাই এদেশের একমাত্র ইয়ারবুক ছিল। মাদ্রাজ স্টক একস্‌চেঞ্জ তাদের ইয়ার-বুক বের করে ১৯৫৩ সালে, এবং বোম্বাই স্টক একস্‌চেঞ্জ ১৯৬৬ সালে।

আমার সমগ্র কর্মদশার মধ্যে আমি বোম্বাই স্টক একস্‌চেঞ্জকে আমাদের ছাপিয়ে এক পা-ও এগুতে দিইনি। আমার নিয়োগের কিছু পরেই বোম্বাই স্টক একস্‌চেঞ্জ থেকে এক চিঠি এল: 'আমাদের স্টক একস্‌চেঞ্জে কোম্পানিসমূহকে তালিকাভুক্তি করবার কোন নিয়মাবলী নেই, আপনাদের স্টক একস্‌চেঞ্জ যদি কোম্পানি-তালিকাভুক্তি করার নিয়মাবলী পাঠিয়ে সহায়তা করে, তাহলে আমরা সুখী হব।' কিন্তু আমাদেরও কোন নিয়মাবলী ছিল না। কোন কোম্পানির শেয়ারের কেনাবেচা যদি পরপর তিনদিন হত, তাহলেই আমরা সেই কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করে নিতাম। কমিটির নির্দেশে আমিই এদেশে প্রথম স্টক একস্‌চেঞ্জে কোম্পানি-তালিকাভুক্তি করার নিয়মাবলী প্রণয়ন করি। যদিও ১৯৫৭ সালে ভারত সরকার, এই সম্পর্কে সব স্টক একস্‌চেঞ্জেই এক নিয়ম রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এক সাধারণ নিয়মাবলী প্রবর্তন করলেন, তাহলেও সেটা মূলত আমার প্রণীত নিয়মাবলীর ভিত্তিতেই করা হল।

প্রেসিডেণ্ট চিরঞ্জীবলাল ঝুনঝুনওয়ালার আমলটাকেই আমি কলকাতা স্টক একস্‌চেঞ্জের স্বর্ণযুগ বলব। কলকাতা স্টক একস্‌চেঞ্জের গৌরব বাড়াবার জন্য,

চিরঞ্জীববাবুই প্রথম স্টক একসচেঞ্জের এক 'পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেণ্ট' সৃষ্টি করে আমাকে তার সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। ওই সময় আমি বিনিয়োগ কারীদের উপকারার্থে ইংরেজি ভাষায় ছ'সাতখানা পুস্তিকা রচনা করেছিলাম, যার বাংলা ও হিন্দী অনুবাদও ছাপানো হয়েছিল। আমি এটা শ্লাঘার বিষয় বলে মনে করি যে, জগতের এমন কোন স্টক একসচেঞ্জ ছিল না, যেখান থেকে ওগুলির জন্য সমাদর ও অভিনন্দন পাইনি। পুস্তিকাগুলি যাতে হাজার হাজার বিনিয়োগকারীর হাতে নিশ্চিত পৌঁছাতে পারে, তার জন্য স্টক একসচেঞ্জে একটা Addressograph (Adrema) মেশিনও কেনালাম।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে আমি চলে আসবার পর, কলকাতা স্টক একসচেঞ্জ তার শ্রেষ্ঠত্ব হারাল। এখন বোম্বাই স্টক একসচেঞ্জই এদেশের সবচেয়ে বড় স্টক একসচেঞ্জ বলে পরিগণিত।

শেষ করবার আগে একটা মজার কথা এখানে বলি। আজকাল যেমন অফিসে একজিকিউটিভদের টেবিলের ওপর একখানা কাঁচ পাতা থাকে, সেকালে তেমনই পাতা থাকত চামড়ার বাঁধাই-করা একখানা ব্লটিং প্যাড। আমি যখন প্রথম স্টক একসচেঞ্জে গেলাম, তখন আমার নতুন টেবিলের ওপর পাতা হল একখানা পুরোনো ব্লটিং প্যাড। শুনলাম সেখানা ক্ল্যারিজ সাহেবের টেবিলের ওপর পাতা থাকত। অনেকসময় ভাবি, বোধ হয় ওই প্যাডখানার সংস্পর্শে এসেই আমি উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ল্যারিজ সাহেবের মত কঠোর হয়েছিলাম, এবং আমার ইয়ার-বুক ডিপার্টমেণ্টকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম।



স্নানাহার ও শোবার সময় ছাড়া, আমি কখনও বাড়িতে থাকতাম না। সকাল-সন্ধ্যায় থাকতাম আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের মুখে বাগবাজার স্ট্রীটের ওপর এক চায়ের দোকানে, নাম 'নিশানাথ কেবিন'। ওই আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের ভেতরেই অবস্থিত ছিল 'অমৃতবাজার পত্রিকা' অফিস। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকমণ্ডলীর সব কর্মীই ওখানে আসতেন চা খেতে। তখন তাঁদের সঙ্গে বেশ মজলিস হত। ও'দের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আমার পুরানো বন্ধু, যেমন কালীবাবু, অবনীবাবু ও পবিত্রবাবু। এঁরা তখন সবে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় যোগ দিয়েছেন। কিন্তু এঁদের সঙ্গে আলাপ আমার অনেকদিনের। কালীবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়, উনি যখন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ও রয়টার-এ কাজ করতেন, আর অবনীবাবু ও পবিত্রবাবুর সঙ্গে আলাপ, ও'রা যখন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সঙ্গে

যুক্ত। কালীবাবু শেষ পর্যন্ত 'অমৃতবাজার পত্রিকা'তেই থেকে গিয়েছিলেন এবং চীফ রিপোর্টার হয়েছিলেন। অবনীবাবু ও পবিত্রবাবু পরে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় যোগ দেন। ওই নিশানাথ কেবিনে আরও আসতেন আমার পাড়ার বন্ধুরা ও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। শুধু আসতেন না তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নিয়মিত চা খেতেন সামনের 'স্বরাজ কেবিন'-এ, যদিও ওই চায়ের দোকানটায় কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির আনাগোনা ছিল না। মনে হয় তারাশংকরবাবুর মনের কোন নিভৃত কোণে একটা ক্ষোভ ছিল, এবং সেই কারণেই নিশানাথ কেবিনে তিনি চা খেতে আসতেন না। সেটা তিনি অসতর্কভাবে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, যখন আমি তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে। তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন, আমি আপনাদের পাড়ায় থাকি, অথচ আপনারা কেউই আমার কোন খোঁজ রাখেন না। যামিনদা (যামিনী রায়) ও তারাশংকরবাবু তখন আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে দুই পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন। উনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে যামিনদার বাড়ি আমি ঘন ঘন যাই, অথচ কখনও ওঁর বাড়ি যাই না। সেজন্যই বোধহয় সেদিন তিনি ওই কথা বলেছিলেন। যাহোক তিনি আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

'নিশানাথ কেবিন'-এ নিয়মিত দুবেলা খেতে আসতেন বিখ্যাত দ্বিকণ্ঠী গায়ক অনাথনাথ বসু ও সেতারী মুস্তাক আলি খান। মুস্তাক তখন অনাথদার বাড়িতেই থাকত। বহুদিন মুস্তাক অনাথদার বাড়িতেই থেকেছে। অনাথদার আমিই ছিলাম একান্ত সচিব। উনি এদেশের যত রাজা-মহারাজার ও রেডিয়োতে গান গাইবার মুজরা পেয়েছেন সবই আমার লেখালেখি ও অধ্যবসায়ের ফলে। আমি ছিলাম অনাথদার একজন ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত বন্ধু। সেজন্য আমার ওপর অনাথদার ছিল ভীষণ অনুরাগ। যখনই কলকাতার বাইরে থেকে অনাথদার কোন বিশিষ্ট বন্ধু আসতেন, অনাথদা আগে তাঁকে নিয়ে এসে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এভাবে পরিচিত হয়েছিলাম উত্তর ভারতের তৎকালীন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ দিলিপ বেদীর সঙ্গে। দিলিপ বেদীর সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতাও হয়েছিল। যখনই সে আমার কাছে আসত বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে এক ঠোঙা আঙুর নিয়ে আসত।

কত লোক যে 'নিশানাথ কেবিন'-এ আনাগোনা করত, তার ইয়ত্তা নেই। খুব জমাটি করে আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিত সেই মোটা জারমান সাহেব, যে এখানে এসেছিল 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বিরাট রোটারি মেশিনটা 'ফিট' করতে। এই উপলক্ষে সে অনেকদিন এখানে ছিল, এবং আমাদের সঙ্গে তার বেশ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। তবে সেটা ছিল হিটলারের যুগ। সেজন্য সাহেব দেশে যাবার পর ওর

সংগে আর যোগাযোগ রাখা সম্ভবপর হয়নি।

আমরা বন্ধুরা যারা দু'বেলা 'নিশানাথ কেবিন'-এ জড় হতাম, তাদের মধ্যে ছিল শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য, হীরেন মল্লিক, মদন দত্ত, কেদার সর্বাধিকারী ও প্রভাত সর্বাধিকারী। শ্যামাচরণের সংগে ছিল আমার হরিহরাত্মা সম্পর্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সে ছিল কৃতী ছাত্র, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র স্পোর্টস্ এডিটর ও পরে লাইব্রেরিয়ান হয়েছিল। শেষজীবনে সে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত তার কোন খবর পাওয়া যায়নি। হীরেন মল্লিকদের ছিল খড়ের ব্যবসা। শান্তিনিকেতনের সে প্রাক্তন ছাত্র। এখানে অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে, পরে দেশে গিয়ে স্কুল-মাস্টারী করে। মদন দত্ত পরে 'যুগান্তর' পত্রিকার চীফ অ্যাকাউনটেন্ট হয়েছিল। কেদার সর্বাধিকারী চাকরি করত টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টে। ওরই দাদা হচ্ছে প্রভাত সর্বাধিকারী। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। তিনটি বিষয়ে এম. এ.—ম্যাথামেটিকস্, ফিজিকস্ ও ইকনমিকস্। সে আমাকে 'ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস' শিখিয়েছিল; পড়াত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রফুল্ল সরকার মশাইয়ের মেয়েকে। পরে ওঁদের দুজনের বিয়ে হয়েছিল। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটুটে অধ্যাপনা করত।

হীরেন মল্লিকের ডাকনাম ছিল চণ্ডী। একদিন 'নিশানাথ কেবিন'-এ খুব জমাটি আড্ডা বসেছে। চণ্ডী জানালার ভেতর দিয়ে বাইরে রাস্তায় কাকে দেখতে পেয়েছে। দেখামাত্রই ঘরের ভেতর থেকে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, অঃ সাগর, অঃ সাগর! চকিতের মধ্যে মনে পড়ে গেল 'দেবী চৌধুরানী'র সাগর-এর কথা। সুতরাং প্রথম বুঝতে পারলাম না চণ্ডী যাকে ডাকছে, সে মেয়ে কি পুরুষ। চণ্ডী বেরিয়ে গিয়ে যখন তাকে ঘরের ভেতর নিয়ে এল, তখন বুঝতে পারলাম যে সে মেয়ে নয়, একজন তরুণবয়স্ক পুরুষ। চণ্ডী তাকে চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসিয়ে আমাদের বলল, এ আমাদের শান্তিনিকেতনের সহপাঠী সাগরময় ঘোষ, কালীমোহন ঘোষের ছেলে। সাগরময়বাবুর সংগে আমার সেই প্রথম পরিচয়। দ্বিতীয়বার সাগরময়বাবুকে দেখলাম, দশ বছর পরে যখন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যোগ দিলাম। তখন আমাদের 'বাণিজ্য বিভাগ' ও 'দেশ' পত্রিকার দপ্তর একঘরেই অবস্থিত। দু'জনেই তখন একঘরে বসি। সে কারণে আমার সংগে তখন সাগরময়বাবুর নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হল।

ঙ ঙ ঙ

'নিশানাথ কেবিন'-এর ঠিক উলটো দিকেই 'শিশিরকুমার ইনস্টিটুট'।

শিশির ইনস্টিটিউটের নীচের তলায় রাস্তার ধারের রকে বসত আর একটা আড্ডা। ওখানে সমবেত হয়ে আসর জমাত সুকোমলকান্তি ঘোষ, প্রফুল্লকান্তি ঘোষ (শত ঘোষ), কমলা ভট্টাচার্য ও ওর দাদা অনিল ভট্টাচার্য, মিহিরলাল গাঙ্গুলী, প্রভাতকুমার বসু (বসুদা), জ্যোতির্ময় নাগ (নাগু), সুধীরকুমার বসু, বগলা ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে। ওখান থেকেই ওরা মাঝে মাঝে চিৎকার করে নিশানাথ কেবিনকে বলত, সাতটা হাফ-কাপ চা দিয়ে যা। ওই রকেরই এক কোণে টেবিল-চেয়ার নিয়ে সকালবেলা বসত বগলা, মেম্বরদের বই ইসু করবার জন্য। শিশির ইনস্টিটিউটের মেম্বররা নিয়ত অভিনয় করত। অ্যামেচার দল হিসাবে সেযুগে ওদের অভিনয় কলকাতার সেরা অভিনয়ের খ্যাতি অর্জন করেছিল। নাটকগুলি লিখত বগলা। নাটক-লেখায় বগলার হাতেখড়ি ওখানেই। তারপর বগলা শিশির ইনস্টিটিউট ছেড়ে দিল। সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য নাটক লিখতে লাগল। বগলাকে কেউ আর 'বগলা' বলে না। বাঙলার নাটক-প্রেমিকদের কাছে বগলা পরিচিত হল ওর পোশাকী নামে—বিধায়ক ভট্টাচার্য। শিশির ইনস্টিটিউট ছেড়ে দিয়ে বগলা ভালই করেছিল। জনপ্রিয় নাট্যকার হিসাবে সে যশ, মান ও খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিল। অদৃষ্ট যে কখন কাকে কোথায় নিয়ে যায়, কেউ আগে থাকতে বলতে পারে না। বিধায়ক তার একটা দৃষ্টান্ত।

৩৫ ৩৫ ৩৫

আমিও শিশির ইনস্টিটিউটের মেম্বর। শিশির ইনস্টিটিউটেরই প্রয়াসে আমি বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছিলাম। অপর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী ছিল কার্তিকচন্দ্র মিত্র। সেক্রেটারী প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী। সভাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজী এলেন প্রদর্শনী উন্মোচন করতে। প্রদর্শনী উন্মোচন করে এসে বসলেন অফিস-ঘরে। অফিস-ঘরে তখন আমি একা। একান্তে বসে তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করবার একটা সুযোগ পেলাম। নেতাজীর পর সভাপতি হলেন স্যার হরিশঙ্কর পাল। আর আমরা যে যা ছিলাম, তাই রয়ে গেলাম। স্যার হরিশঙ্করের আমলেই বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনীর প্যাণ্ডেলে ঘটল সেই ভয়াবহ ও সর্বগ্রাসী অগ্নিকাণ্ড। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল, প্রতিমা সমেত। কিন্তু রাতারাতি নতুন প্রতিমা এল। যথারীতি পূজা চলল। কয়েক বছর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী থাকবার পর আমি কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হলাম। তারপর আমি নতুন বাড়ি তৈরি করে

সিঁথিতে চলে গেলাম। তখন থেকেই ওদের সঙ্গে আমার সক্রিয় যোগসূত্র ছিন্ন হল। তবে এখনও আমি ওদের জেনারেল কাউন্সিলের মেম্বর আছি।

ঌ ঌ ঌ

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঘটল মানুষিক প্রেমের এক অপূর্ব নিদর্শন। সম্রাট পঞ্চম জর্জের মৃত্যুর পর, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অষ্টম এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট অকৃতদার ব্যক্তি। হঠাৎ বলে বসলেন, তিনি শ্রীমতী সিমপসন নামে এক মার্কিনদেশীয় বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলাকে বিবাহ করবেন। এর ভীষণ বিরোধিতা এল ইংলণ্ডের সকল মহল থেকে। কি ঘটবে কেউ জানে না। একমাত্র কলকাতার 'অমৃতবাজার পত্রিকা'ই সেদিন লিখল যে বিরোধিতায় মাথা নত না করে, ওই মহিলাকেই বিবাহ করবার জন্য সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এর কয়েকদিন পরেই ঘোষিত হল যে সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করেছেন। সাত মাস পরে তিনি ওই বিধবাকে বিবাহ করেন। সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করবেন, আগে থাকতে এই 'স্কুপ' সংবাদ প্রকাশের জন্য চতুর্দিকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র জয়জয়কার পড়ে গেল। নানা জায়গা থেকে হাজার হাজার অভিনন্দনপত্র এল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সেগুলো কাগজে ছাপল। সর্বশীর্ষে ছাপা হল কলকাতার মেয়র নলিনীরঞ্জন সরকারের অভিনন্দনপত্র। তারপরই ছাপা হল আমার অভিনন্দনপত্রখানা। সেদিন তাঁদের স্তম্ভে দ্বিতীয় স্থান দিয়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' আমাকে এক অনন্যসাধারণ সম্মান দিয়েছিলেন।

ঌ ঌ ঌ

আমিও ছেলেবেলা থেকে এক অবিচ্ছেদ্য প্রেমে পড়েছিলাম। তবে সে প্রেম কোন মেয়ের সঙ্গে নয়। বইয়ের সঙ্গে। আগেই বলেছি যে স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় আমি স্কুল লাইব্রেরীর অনেক ইংরেজি বই পড়ে ফেলেছিলাম। কলেজে ঢুকেই আমি প্রথমে রবীন্দ্রনাথের সব বই পড়ে ফেললাম। তারপর পড়েছিলাম অনেক ইংরেজি বই। কলেজ জীবনে বই পড়ার আমার অসাধারণ নেশা ছিল। এম. এ. পড়বার সময়েও তাই।

আগেই বলেছি যে এম. এ. পড়বার জন্য আমাদের নানারকম পত্র-পত্রিকা ও দুষ্প্রাপ্য বই থেকে 'নোট' তৈরি করতে হত। এগুলো বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারস্ লাইব্রেরিতে পড়তাম। এরূপ পড়ার সময় একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। আমি খুব মন দিয়ে পড়ছি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, কে যেন পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছে। আমার তখন পড়ায় মন। সেজন্য ওটা গ্রাহ্যই করিনি। তারপর যখন আমার পঠিত বইটার ওপর অনবরত লোকটার ছায়া পড়ছে দেখলাম, তখন বিরক্ত হয়ে পিছন ফিরে লোকটাকে ধমকাতে উদ্যত হয়েছি, দেখি কিনা তিনি স্বয়ং উপাচার্য স্যার যদুনাথ সরকার। আমাকে উঠতে দেখে উনি বলে উঠলেন, পড় বাবা, পড়, ওরকম মন দিয়েই পড়, তবে কিছু শিখতে পারবে। তবে বড় হতে পারবে। ও'কে দেখে, আমি খুব লজ্জা পেলাম। আমি জানতাম যে উপাচার্য অবসর সময়ে একবার লাইব্রেরীতে এসে ঘুরে দেখে যান, ছাত্ররা কে কি বই পড়ছে। তবে সেদিন তিনি যে আমার পেছনেই এসে দাঁড়াবেন, তা আমি ভাবিনি।

১৯২৫ সাল থেকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (এখন জাতীয় গ্রন্থাগার) রিডিং রুমে রক্ষিত সব বইও পড়ে ফেলেছিলাম। এই কারণেই আমি এম. এ. পাস করবার পর ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ও ডঃ কালিদাস নাগ আমাকে যে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, তাতে দু'জনেই লিখেছিলেন 'He is the most widely read student among his contemporaries'।

নতুন বইও কিনতাম প্রচুর। নতুন বই কেনবার একটা সুবর্ণ-সুযোগ পেয়েছিলাম ত্রিশের দশকে। বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রতিঘাতে প্রপীড়িত হয়ে ইংলণ্ডের বিশিষ্ট প্রকাশকগণ তাদের নামী ও দামী বইগুলি নামমাত্র মূল্যে জগতের সর্বত্র বেচতে শুরু করেছিল। আরও উল্লেখনীয় যে এই দশকেই বেরিয়েছিল বেনস্ সিকস্-পেনি সিরিজ ও পেনগুইন-পেলিকানের বইসমূহ। এগুলি সবই কিনেছিলাম। এছাড়া, একবার-ব্যবহার করা সাহেবদের পরিত্যক্ত অসংখ্য বই ও পত্র-পত্রিকা কিনতাম আমি ও আমার বন্ধু শ্যামাচরণ ওয়েলিংটন ও ধর্মতলা স্ট্রীটের মোড় থেকে। ও-সময় ওখানকার বইওয়ালাদের (যথা ওয়াজির আলি, নুর আলি, রশিদ, আবদুল প্রভৃতি) সঙ্গে আমার বিশেষ প্রীতি ছিল। কিভাবে ও একবার প্রতারিত হয়েছিল, সে-কথা আমায় ওয়াজির আলি বলেছিল। প্রফুল্লবাবু নামে এক অচেনা ভদ্রলোক একদিন এসে ওকে তিনখানা বই দিয়ে বলেন, এই বইগুলো তোমার দোকানে রেখে বেচে দাও। তবে একটাকা দামের কমে বেচবে না, তুমি আট আনা রাখবে, আর আমাকে আট আনা দেবে। এক ঘণ্টার মধ্যেই বই তিন-খানা বিক্রি হয়ে গেল। দু'তিনদিন পরে প্রফুল্লবাবু এলেন। আমি ও'কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ বই আপনার কত কপি আছে? উনি বললেন, হাজার কপি। তারপর ওই হাজার কপি বই আমি ৫০০ টাকায় কিনে নিয়ে এলাম। সেই থেকে

ওই বই এক কপিও বেচতে পারিনি। তখন বুঝলাম, প্রথম দিনের ওই তিনজন খরিদ্দারই প্রফুল্লবাবুর নিজের পাঠানো লোক।

দুষ্প্রাপ্য বই হাতে এলে সব সময়েই ওরা আমার জন্য রেখে দিত। এতে ক্ষুণ্ণ হতেন কানাইলাল মুখোপাধ্যায় (পরবর্তীকালের ফার্মা কে. এল. এম.-এর প্রতিষ্ঠাতা)। কানাইবাবুর সংগে আমার ওখান থেকেই একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গজিয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে যখন মার্কিন সৈন্যবাহিনী ভারত ছেড়ে চলে যায়, তখন তারা তাদের Armed Forces Correspondence University-র যাবতীয় বইয়ের 'স্টক' ওয়েলিংটনের এইসব বইওয়ালাদের কাছে ওজন-দরে বেচে গিয়েছিল। সেগুলো আমরা নামমাত্র দামে ওদের কাছ থেকে পেতাম।

ওয়েলিংটনে যখন বই কিনতে যেতাম, তখন ওখানে অনেক গুণী-জ্ঞানী লোকের সংগে আমার সাক্ষাৎ হত। তাঁদের মধ্যে একজনকে আমি এখনও স্মরণ করি। নাম অমৃতলাল সরকার। এক সরকারী অফিসে চাকরি করতেন। অবসর সময়ে বাড়িতে নিরলসভাবে একখানা অভিধান সংকলন করতেন। তাতে ইংরেজি শব্দের ২৪ ভাষায় প্রতিশব্দ ছিল। আমি তো বহুকাল ওয়েলিংটনে আর যাইনি। জানিনা ভদ্রলোক এখনও বেঁচে আছেন কিনা।

আমার বইয়ের বিরাট সংগ্রহ, ১৯৪৭ সালে যখন আমার বাগবাজারের বাড়িতে আগুন লাগে, তখন সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এই বৃদ্ধবয়সে বইকেনা অভ্যাস আমার এখনও যায়নি। তবে বই এত দুর্মূল্য হয়েছে, বিশেষ করে বিলাতী বই, যে কোন বই কেনবার খুব ইচ্ছা হলেও সে ইচ্ছা অবদমিত রাখতে হয়। সেজন্য আমার প্রকাশকদের আমি নিজের লেখা বই যতদূর সম্ভব কম দাম করতে বলি।

ـــ ـــ ـــ

এর মধ্যে ঘটে গেল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে আমার বাবার মৃত্যু ঘটল। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বৎসর। কিন্তু তাহলেও ওঁর মৃত্যুটা আমাদের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। কেননা, ওঁর অটুট স্বাস্থ্য ও কর্মঠ জীবনের দিকে তাকিয়ে আমরা সবসময়েই ভাবতাম যে উনি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকবেন। মৃত্যুর দিনও উনি ঋজুভাবে হেঁটে ওঁর ডিসপেনসারিতে গিয়েছিলেন। রোগী দেখতে দেখতে হঠাৎ উনি ওঁর চেয়ার থেকে কাত হয়ে পড়ে যান। আমি তখন আমার বন্ধুদের সংগে 'নিশানাথ

কেবিন'-এ গল্প করছি। এমন সময় একজন ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে বলল, আপনি শিগ্গির আপনার বাবার ডিসপেনসারিতে যান, আপনার বাবা হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেছেন।

ত্বরিতবেগে আমি আমার বাবার ডিসপেনসারিতে চলে গেলাম ও বাবাকে তুলে নিয়ে বাড়িতে আনলাম। নীচের ঠাকুরদালানে একটা বিছানা করে বাবাকে শুইয়ে দিলাম। তখনকার দিনের বাগবাজারের অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার কৃষ্ণ-গোপাল ভট্টাচার্য সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসা শুরু করে দিলেন। অনেক ইনজেকশন দিলেন, অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। বেলা আড়াইটার সময় বাবা মারা গেলেন।

বাবা যতদিন জীবিত ছিলেন, নির্ভাবনায় ছিলাম। বাবার মৃত্যুর পর অত্যন্ত অসহায় বোধ করলাম। কিন্তু মনকে দৃঢ় করে বাবার অসমাপ্ত কাজগুলি সমাপ্ত করতে প্রবৃত্ত হলাম। এক বোন অবিবাহিতা ছিল, তার বিয়ে দিলাম। ছোট ভাইয়েরও বিবাহ দিলাম। তাকে কলেজে পড়াতে লাগলাম। কয়েক বছর পড়ানোর পর যখন দেখলাম যে তার আর পড়াশোনায় মন নেই, তখন তাকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' অফিসে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলাম।

এর মধ্যে ঘটে গিয়েছিল এক বিপদ। ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই নতুন বউমার মস্তিষ্কবিকার ঘটল। একেবারেই উন্মাদ হয়ে গেল। তখন আমি কাশিমবাজার এস্টেটের পৃষ্ঠপোষিত গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্বেদীয় মহাবিদ্যালয়ের কমিটি মেম্বর। কলকাতার শ্রেষ্ঠ কবিরাজরা সকলেই আমার পরিচিত। আমার অনুরোধে তাঁরা সকলেই ছুটে এলেন বউমার চিকিৎসার জন্য। আজ কৃতজ্ঞচিত্তে বলছি যে আমি তাঁদের কাছে গভীরভাবে ঋণী, কেননা তাঁদের সুচিকিৎসার ফলেই বউমা কয়েক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।

ঔ ঔ ঔ

এর কিছুদিন পরে একদিন বিকালে আমরা 'নিশানাথ কেবিন'-এ বসে গল্প করছি, এমন সময় 'যুদ্ধ লেগেছে, যুদ্ধ লেগেছে' বলে গগনভেদী চিৎকার করতে করতে হকাররা বেরুচ্ছে আনন্দ চ্যাটার্জি লেন থেকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বিশেষ সংখ্যা নিয়ে। একটা সংখ্যা কিনে নিয়ে দেখি জারমানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেছে। তারিখটা হচ্ছে পয়লা সেপটেম্বর ১৯৩৯ সাল। জারমানী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, এই ভয়ে ভীত হয়ে পোল্যাণ্ড সেই বছরেরই এপ্রিল মাসে ইংলণ্ড

ও ফ্রান্সের সঙ্গে এক চুক্তি করেছিল। ওই চুক্তির শর্ত ছিল যে জারমানী যদি পোলাণ্ড আক্রমণ করে তাহলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তার প্রতিরোধ করবে। সেই চুক্তি অনুযায়ী ৩ সেপটেম্বর তারিখে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জারমানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যা পরবর্তীকালে সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস পরিবর্তিত করে দিল।

বিশ্বযুদ্ধের কাহিনীটাই প্রথম এখানে বলি। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে জারমান সৈন্যবাহিনী ডেনমার্ক দখল করে নিয়ে, নরওয়ে আক্রমণ করে। তারপর ১০ মে ১৯৪০ তারিখে বেলজিয়াম এবং হল্যাণ্ড আক্রমণ করে। মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যে ক্ষিপ্রগতিতে 'ত্বরিত-যুদ্ধ' (ব্লিটজ্‌ক্রিগ্) চালিয়ে বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ড অধিকার করে নেয়। তখন ফ্রান্সের মধ্যে প্রবেশ করে, ২২ জুনের মধ্যে ফ্রান্সেরও পতন ঘটায়। তার আগেই এপ্রিল মাসে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স বেগতিক দেখে ফ্রান্সের রণক্ষেত্র থেকে সৈন্য অপসারণ করে। ওইসব সৈন্য ডানকার্ক বন্দর থেকে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে মিত্রবাহিনীর এই প্রত্যাবর্তন ঘটে যে তখনকার দিনের খবরের কাগজে বেরিয়েছিল যে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী, আদি মানব আদম যে বেশে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল, সেই বেশেই তারা ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল। জারমানরা বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ করে এই প্রত্যাবর্তনকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ইংরেজ বিমানবাহিনী তাদের সে চেষ্টা বিফল করে দেয়।

ফ্রান্সের রণাঙ্গনে মিত্রবাহিনীর এই বিপর্যয়ের কারণটা এখানে বলি। জারমানীর সঙ্গে ফ্রান্সের কোনদিনই বনিবনা ছিল না। সেজন্য জারমান ফরাসী সীমান্ত সুরক্ষিত করবার জন্য ফরাসী দেশের সমর-সচিব আঁদ্রে ম্যাজিনো ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে সুইটজারল্যাণ্ডের সীমান্ত থেকে শুরু করে ফ্রান্সের সমগ্র পূর্বসীমান্তে এক অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য দুর্গমালা ('ম্যাজিনো লাইন' নামে খ্যাত) নির্মাণ করেন। ফ্রান্সের পরিকল্পনা ছিল যে ওই দুর্গমালা বেলজিয়ামের সমগ্র সীমান্ত পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করবে। কিন্তু বেলজিয়াম এতে বাদ সাধল। বেলজিয়াম তার সীমান্তে এই দুর্গমালা বিস্তৃত করতে দিল না। অথচ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দুর্ধর্ষ জারমান সৈন্যবাহিনী মাঠে টেবিলের ওপর বিবস্ত্রা করে ফেলে ব্যাপকভাবে বেলজিয়ান মেয়েদের ধর্ষণ করেছিল। সে যাই হোক, বেলজিয়াম তার সীমান্তে 'ম্যাজিনো লাইন' বিস্তৃত করতে না দেওয়ায়, 'ম্যাজিনো লাইন'-এর ওই দিকটাই অরক্ষিত রয়ে যায়। জারমানরা ওই দিক দিয়েই ফ্রান্সে প্রবেশ করে, মিত্রবাহিনীর বিপর্যয় ঘটায়।

ফ্রান্স করায়ত্ত করবার পর জারমান চ্যানসেলর হিটলারের সেন্যবাহিনী ব্রিটেন

আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু ব্রিটিশ বিমানবাহিনী জারমানদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করে। ইংলন্ডের লোকরা সে-সময় অদ্ভুত মনোবল দেখায়।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে জারমানী পূর্বদিকে আক্রমণ চালায় ও যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস দখল করে। তারপর ২২ জুন ১৯৪১ তারিখে ফিনল্যান্ড, হাংগেরী ও রুমেনিয়ার সংগে সম্মিলিত হয়ে রাশিয়ার ২000 মাইল ব্যাপী সীমান্তে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে, জারমানরা ভলগা অতিক্রম করে লেনিনগ্রাড ও মস্কোর উপকণ্ঠে পৌঁছায়। সেখানে কয়েক মাস যাবৎ প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। রাশিয়ার নাভিশ্বাস ওঠে। সেদিন যদি ইংরেজ ও আমেরিকা রাশিয়ার পক্ষে না থাকত, তাহলে সোভিয়েট রাশিয়া ও কমিউনিজম্-এর নাম জগতের ইতিহাস থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে যেত।

ইতিমধ্যে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ১০ জুন তারিখে ইটালি জারমানীর পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে যোগদান করে। কিন্তু মিত্রপক্ষের হাতে তারা উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকায় বিপর্যস্ত হয়। তারপর মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী টিউনিসিয়া থেকে সিসিলি আক্রমণ করে ও ইটালিতে অবতরণ করে। ১৯৪৩ সালের সেপটেম্বর মাসে ইটালি মিত্রপক্ষের সংগে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ৬ জুন ১৯৪৪ তারিখে মিত্রপক্ষীয় সৈন্য নরম্যান্ডিতে (ফ্রান্সে) অবতরণ করে ও ২৫ অগস্ট তারিখে প্যারিস নগরী পুনরুদ্ধার করে। ব্রিটিশ ঘাঁটিসমূহের ওপর জারমানগণের উড়ন্ত বোমা ও 'রকেট' নিক্ষেপ সত্বেও, মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জারমানীর যুদ্ধ-পূর্ব সীমান্তে গিয়ে পৌঁছায় এবং ২৮ এপ্রিল তারিখের মধ্যেই এলবা নদীর তীরে রুশবাহিনীর সহিত মিলিত হয়। ৭ মে ১৯৪৫ তারিখে জারমানী আনুষ্ঠানিকভাবে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করে।

ইতিমধ্যে জাপানও যুদ্ধে যোগদান করেছিল, সে কাহিনী আমি পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিবৃত করছি।

১১১

লড়াইয়ের সময়কার এক চমকপ্রদ ঘটনা হচ্ছে—ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে ভারত থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান। যুদ্ধের সূচনায় হিটলারের হাতে মার খেয়ে ইংরেজ যখন নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত, নেতাজী তখন ভাবলেন যে ইংরেজকে ভারত থেকে হটাবার সেটাই হচ্ছে মাহেন্দ্রক্ষণ। নেতাজী ভিক্ষা করে স্বাধীনতালাভের আশাবাদী ছিলেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে স্বাধীনতা লাভ করতে হলে, ইংরেজকে সম্মুখসমরে পরাস্ত করতে হবে। এর জন্য চাই

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সুদক্ষ সেনাবাহিনী। দেশের মধ্যে এ কাজটা হতে পারেনা ভেবে তিনি বিদেশে গিয়ে কাজটা করবেন ঠিক করে ফেলেছিলেন।

কিন্তু ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি বিদেশে যাবেন কি করে ? গোপনে তিনি শলাপরামর্শ করতে লাগলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পার হয়ে, বিদেশে যাবার পরিকল্পনাটা যখন তাঁর প্রায় তৈরি হয়ে গেছে, ঠিক সেই সময় ইংরেজ তাঁকে হলওয়েল মনুমেণ্ট ভাঙা আন্দোলনের ব্যাপারে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সী জেলে রাখে।

জেলের মধ্যে তিনি সংগী পেলেন অনেক বিপ্লবী নায়ককে—হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্যরঞ্জন বকসী, মণীন্দ্রকিশোর রায় প্রভৃতি। তাঁদের সংগে শলাপরমর্শ করে তিনি অনশন শুরু করলেন। অনশন শুরু করবার পর তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র বসু সরকারের ওপর চাপ দিতে লাগলেন, তাঁর মুক্তির জন্য। মুক্তি তাঁকে দেওয়া হল বটে, কিন্তু তাঁকে রাখা হল অন্তরীণ করে, তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে। তাঁর ওপর নজর রাখবার জন্য ইংরেজ নিযুক্ত করল অসংখ্য সাদা—পোশাকী গোয়েন্দা। কিন্তু সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি অন্তর্হিত হলেন ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসের ১৮ তারিখে।

ꩰꩰꩰ

মনে হল, কে যেন বেরিয়ে গেল একখানা মোটরে করে রাত্রি সওয়া একটার সময় তাঁর এলগিন রোডের বাড়ি থেকে। এ তো সুভাষ নয়। এ তো একজন শ্মশ্রুধারী পাঠান যুবক। মোটর তীরবেগে ছুটতে লাগল। চালক সুভাষের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার শিশির বোস। গিয়ে উঠলেন তাঁরা ধানবাদে সুভাষের আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র অশোক বোসের বাংলোতে। সেখান থেকে মোটরে করে রাত দুপুরে গোমো জংশন স্টেশনে গিয়ে উঠলেন দিল্লি-কালকা মেলে। পেশোয়ার ক্যানটন-মেণ্ট স্টেশনে গিয়ে নামলেন। যেসকল বিশ্বস্ত লোকদের সংগে তিনি আগে থাকতেই যোগাযোগ করে রেখেছিলেন তারা নিয়ে গেল তাঁকে সীমান্তের দুর্গম পথ অতিক্রম করে কাবুলে। কাবুলে গিয়ে সুভাষ ইংরেজের শত্রুপক্ষীয় বিদেশী দূতাবাসসমূহের সংগে সংযোগ স্থাপন করলেন। তারপর তিনি পাড়ি মারলেন জারমানীর অভিমুখে।

এদিকে কেউই অনুমান করতে পারল না, সুভাষ কোথায় ? প্রায় এক বৎসর পর তাদের সকলের চমক ভাঙল যেদিন বার্লিনের 'আজাদ হিন্দ রেডিও' থেকে তিনি পরিচিত কণ্ঠে বললেন, 'আমি সুভাষ বলছি।' নেতাজীকে সেদিন বলতে

শুনলাম, 'এতকাল আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য বিষয় শোনাবার সুযোগ ছিল না। শত্রুপক্ষ যে অপবাদই দিক, আমি জানি আপনারা তা বিশ্বাস করেন না। আমি আমার কাজ করে চলে যাব, কে কি বলে না বলে, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। অক্ষশক্তির আক্রমণ থেকে নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষা করবার জন্য ব্রিটিশ যদি আজ আমেরিকার দ্বারস্থ হতে লজ্জা না পায়, তাহলে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অপর কোন জাতির সাহায্যপ্রার্থী হওয়া আমার পক্ষে অন্যায়ও নয়, অপরাধও হতে পারে না। আপনারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি থাকুন। আমি যেভাবে ব্রিটিশ সরকারকে বিভ্রান্ত করে ভারত থেকে চলে এসেছি, ঠিক সেইভাবেই যথাসময়ে আপনাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হব। যে সুযোগ আসছে, সেটা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। সেজন্য নিজেরা জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে অবিলম্বে সংঘবদ্ধ হোন। চাই ঐক্য ও একাগ্রতা।' (আমার 'কালের কড়চা', ১৯৭৪ থেকে উদ্ধৃত)।

জারমানীতে সুভাষচন্দ্র এক অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করেছিলেন। ওদিকে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই রাসবিহারী বসু জাপানে গিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় একটা অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গড়ে তুলেছিলেন। সুভাষ যখন জারমানীতে, রাসবিহারী তখন বয়োবৃদ্ধ। তরুণ সুভাষকে তিনি আহ্বান করলেন তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করবার জন্য।

জারমানী থেকে সুভাষ গেলেন সাবমেরিন যোগে জাপানে। সেখানে গিয়ে তিনি গঠন করলেন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। জাপানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' আক্রমণ হানল সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশের ওপর। তাসের বাড়ির মত টলমল করে পড়ে যেতে লাগল গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিসমূহ। নেতাজী এসে উপস্থিত হলেন আসাম সীমান্তে। ধ্বনি তুললেন: "দিল্লী চল। লালকেল্লায় গিয়ে স্বাধীন ভারতের পতাকা তোল।' ইতিমধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। প্রচার করা হল যে ফরমোসার তাইহোকু বিমানবন্দরে এক বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষের মৃত্যু ঘটেছে। সেই থেকেই সুভাষের আর কোন সংবাদ নেই।

ℒℒℒ

যুদ্ধ শেষ হবার আগেকার ঘটনা। বোমার আঘাতে জাপানী ফৌজ বিধ্বস্ত করল রেঙ্গুন শহর। ধ্বংস হতে যতটুকু বাকি ছিল, তা ইংরেজ নিজ হাতেই ধ্বংস করল 'পোড়ামাটি নীতি' (scorch-earth policy) অবলম্বন করে। ব্রহ্মদেশ রক্ষা করা অসম্ভব দেখে ইংরেজ রব তুলল 'পালাও, পালাও'। যারা

ভারতে এসে আশ্রয় নিতে চাইল, তাদের তারা ভারতে পাঠিয়ে দিল। তারপর এল সরকারী কর্মচারীদের পালা। তাদের তারা ভারতে পাঠিয়ে দিল। কেবল ভুলে গেল আমার বড়ভায়রাভাইকে। আমার বড়ভায়রাভাই ছিলেন রেংগুন কাসটমস্-এর প্রধান রাসায়নিক-বিশ্লেষক। রেংগুন যাবার আগে তিনি ছিলেন কলকাতা কাসটমস্-এর রাসায়নিক-বিশ্লেষক। তার আগে তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রাসায়নিক বিভাগের রীডার। তিনি ছিলেন লনডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্-সি.।

ব্রহ্মদেশ আক্রান্ত হবার পরই তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতার শ্যামবাজারে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে। কেবল নিজেই রয়ে গিয়েছিলেন একটা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজ করবার জন্য। রেংগুন শহরের যখন পতন ঘটল, তখন ব্রহ্মদেশে লবণের অভাব ঘটবে দেখে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে পাঠিয়েছিল ব্রহ্মদেশের উত্তর-পূর্বে চীন সীমান্তের কাছে, লবণ-উৎপাদনের জন্য একটা কেন্দ্র স্থাপন করতে। এদিকে ইংরেজ যখন ব্রহ্মদেশ থেকে পালিয়ে এল, তখন ওঁর কথা একেবারেই ভুলে গেল।

রেংগুন শহর পতনের পর, ব্রহ্মদেশের বাকি অংশেরও পতন ঘটল। কিন্তু আমার বড়ভায়রাভাই প্রথমে এ সংবাদ পাননি। তাঁরা মনের আনন্দে লবণ তৈরীর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তারপর যখন খবর পেলেন যে সমগ্র ব্রহ্মদেশের পতন ঘটেছে ও আসামের লেডো পর্যন্ত অংশ মিত্রপক্ষীয় সৈন্যের দখলের বাইরে চলে গেছে, তখন তিনি প্রাণরক্ষার জন্য ভারতের দিকে রওনা হলেন। দিনের বেলায় জংগলের মধ্যে লুকিয়ে থাকতেন, আর রাত্তিরে হাঁটতে শুরু করতেন। এইভাবে তিনমাস পরে আসামে এসে পেঁছিলেন। সেখানে এসে তাঁর পরিচয় ও উপস্থিতি জানালে, সরকার বিমানে করে তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়।

তিনমাস জংগলের ভেতর দিয়ে আসার ফলে, ওঁর পোশাক ময়লা হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছিল। মুখে মস্ত দাড়িগোঁফ বেরিয়েছিল ও পায়ে 'ম্যাগট' হয়েছিল বলে লাঠির ওপর ভর দিয়ে হাঁটতে হচ্ছিল।

আমার বড়ভায়রাভাই খুব কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। এরূপ দুর্দশার মধ্যেও তিনি রসিকতা করবার ইচ্ছা পরিহার করতে পারলেন না। তিনি পাগলের ভান করে, লাঠির ওপর ভর দিয়ে শ্বশুরবাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত হলেন।

তাঁর লম্বা দাড়িগোঁফ ও ছেঁড়া-ময়লা পোশাক দেখে আমার শ্যালিকা তো ওঁকে চিনতেই পারলেন না। তিনি ছেলেদের বললেন, ওরে, দরজায় একটা পাগল এসেছে, লাঠি নিয়ে এসে মেরে তাড়িয়ে দে। পাছে রসিকতটা বাস্তব তামাশায় গিয়ে দাঁড়ায়, এই ভেবে আমার ভায়রাভাই আত্মপ্রকাশ করলেন। তখন আমার

শ্যালিকা জিভ কেটে, এগিয়ে গিয়ে স্বামীর পায়ের ধুলো নিয়ে ওঁকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন।

১১১

লড়াই তখন সবে ছয়-সাত মাস শুরু হয়েছে, একদিন স্টক একস্‌চেঞ্জ অফিসে আমার টেবিলের ওপর টেলিফোনটা বেজে উঠল! রিসিভারটা তুলে কানে দিতেই শুনলাম অপর প্রান্ত থেকে এক ইংরেজ সাহেব জিজ্ঞেস করছেন:

—ইজ দ্যাট মিস্টার এ. কে. সুর?

—ইয়েস্।

—মিস্টার সুর, আই অ্যাম্ মিস্টার মার্টিন, কমিশনার অভ্ দি প্রেসিডেনসী ডিভিসন। আই হ্যাভ সাম্ আরজেণ্ট এরাণ্ড্ উইথ ইউ। উইল ইট্ বি ইউর কনভিনিয়েনস্ টু সী মি অ্যাট এনি টাইম টুডে?

—আর ইউ ফ্রী নাউ?

—ইয়েস্, আই অ্যাম ফ্রী, আর ইউ কামিং জাস্ট নাও?

—ইয়েস্, আই অ্যাম কামিং প্রেজেণ্টলি।

আমাদের স্টক একস্‌চেঞ্জের লায়নস্ রেঞ্জের গলিটা যেখানে নেতাজী সুভাষ রোডে গিয়ে পড়েছে, তার অদূরেই কালেকটরি অফিসের বিলডিং। ওই কালেকটরি অফিসের বিলডিং-এর দোতলাতেই মিস্টার মার্টিনের অফিস।

দু'মিনিটের মধ্যেই মিস্টার মার্টিনের অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম, ঘরে মিস্টার মার্টিন ছাড়া আর একজন সাহেব বসে আছেন।

আমাকে বসতে বলে মিস্টার মার্টিন বলতে শুরু করলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পরই ভারত সরকার মনে করেন যে এই যুদ্ধে ভারতে বিমান-আক্রমণ হতে পারে। সেজন্য সরকার এখানে বিমান-আক্রমণ রোধ করবার জন্য একটা সংগঠন করতে চান। কলকাতা শহরে এরূপ সংগঠন তৈরি করবার ভার দেন কলকাতা করপোরেশনের ওপর। কয়েক মাস পরে কলকাতা করপোরেশন সরকারকে জানিয়ে দেন যে, তাঁদের দ্বারা এ-কাজ করা সম্ভবপর হবে না। এ কারণে সরকার বিপদে পড়েছেন। আমি শুনেছি যে বাগবাজার অঞ্চলে সমাজসেবী ও সংগঠক হিসাবে আপনার সুনাম আছে। আপনি কি কলকাতা, হাওড়া ও ২৪-পরগনা জেলায় বিমান-আক্রমণ-প্রতিরোধক সংস্থা সংগঠনে সরকারকে সহায়তা করতে পারেন?

আমি বললাম, আমি মাত্র এক শর্তে এ-কাজ হাতে নিতে পারি। সে শর্ত হচ্ছে

আমি এটা সমাজসেবার কাজ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি, এবং এর জন্য এক পয়সাও পারিশ্রমিক নেব না।

তখন তিনি সেখানে উপবিষ্ট দ্বিতীয় সাহেবটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, ইনিই এ-আর-পি সংস্থার প্রধান। এ'র নাম মিস্টার আর. সি. পলার্ড। নামটা শুনেই আমি আঁৎকে উঠলাম। কেননা, কয়েক বছর আগে সন্ত্রাসবাদ-দমনে উনি বেশ দুর্নাম অর্জন করেছিলেন। সে যাই হোক, মিস্টার মার্টিন ও'র নাম করামাত্রই উনি ও'র হাতখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি ও'র সঙ্গে করমর্দন করলাম। তারপর থেকে আমাদের উভয়ের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

১১১

আমি সমাজসেবা করবার নেশার ঝোঁকে কাজটা করব বলে স্বীকৃত হয়েছিলাম। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখলাম যে আমার ওপর যে এলাকাটা ন্যস্ত করা হয়েছে সেটা খুব কম নয়। গঙ্গার এপারে বিজপুর (কল্যাণীর নিকট) থেকে বজবজ পর্যন্ত ও অপর পারে বাঁশবেড়িয়া থেকে বাউড়িয়া পর্যন্ত। সে যাই হোক, সকাল ছ'টা থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত ও বিকাল পাঁচটা থেকে রাত্রির দশটা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ওই বিরাট এলাকার নানা জায়গায় প্রশিক্ষণমূলক বক্তৃতা দিয়ে আমি এক বছরের মধ্যেই ওই এলাকার মধ্যে বিমান-প্রতিরোধক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে সরকারকে সাহায্য করলাম। শুধু পুরুষ নয়, মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকার দলও গঠন করলাম। তার মধ্যে পার্ক স্ট্রীটের দলের ছবি এখনও আমার বাড়িতে ঝুলানো আছে। এসব বক্তৃতা আমাকে ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দিতে দিতে হত। অনেক সময় হাস্যকর ব্যাপার ঘটত ও বিভ্রাটের মধ্যে পড়তাম। আলিপুর অঞ্চলে চীফ ওয়ার্ডেন সত্যশঙ্কর ঘোষাল একবার ভুকৈলাসের রাজবাড়িতে একটা ক্লাসের আয়োজন করলেন। ক্লাসে উপস্থিত হল এক রোমান ক্যাথলিক মঠের জন পঞ্চাশ সন্ন্যাসিনী (nuns)। আমি তো ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে শুরু করলাম। বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু লক্ষ্য করলাম যে মেয়েগুলো পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করছে। দেখে মনে হল, ওরা আমার কথা কিছুই বুঝছে না। তখন আমি মঠাধ্যক্ষার কাছ থেকে জানতে পারলাম যে ওরা মাত্র ইটালিয়ান ভাষা জানে, ইংরেজি বোঝে না। সুতরাং আমাকে সেখানেই ক্লাস শেষ করে দিতে হল। আর একবার এরকম বিভ্রাট ঘটল পার্ক সারকাসে দিলখুসা ইনস্টিটিউটে। আমি হিন্দিতে বলে যাচ্ছি, কিন্তু ওরা কিছুই বুঝছে না। জিজ্ঞেস করে জানতে

পারলাম যে ওরা বিশুদ্ধ হিন্দি বোঝে না, মাত্র উর্দু বোঝে। তখন আমাকে উর্দুতে বলা শুরু করতে হল। এখানে বলা দরকার যে হিন্দি ও উর্দুর মধ্যে তফাত একমাত্র শব্দের। দু'ভাষার ব্যাকরণ একই। একটা দৃষ্টান্ত দিলে এটা বুঝতে পারা যাবে। মনে করুন, আমি বলতে চাই : 'আজ আমি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আপনাদের কাছে কিছু বলতে চাই।' বিশুদ্ধ হিন্দিতে এর রূপ হবে : 'আজ হাম্ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে লিয়ে কুছ বলনে মাংতে হেঁ।' আর এর উর্দুরূপ হবে : 'আজ হাম্ তামাম দুনিয়াকে হালত্‌কে লিয়ে কুছ বলনে মাংতে হেঁ।'

এ-আর-পি প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে যেমন এরকম হাস্যকর ব্যাপার ঘটেছে, তেমনই আবার বিপজ্জনক মরণ-বাঁচনের ঘটনাও ঘটেছে। এসব প্রশিক্ষণ দেবার সময় প্রায়ই আমাকে প্রকৃত বোমা ব্যবহার করে 'ডেমনস্ট্রেশন' দিতে হত। এসব বোমায় 'ইগনাইটার' থাকত না। সেজন্য দিয়াশলাই জেবলে ওগুলোকে জ্বালিয়ে দিতে হত। বোমা ব্যবহার করবার সময় হিসাবের সামান্য ভুল হলে, বিপদ অবশ্যম্ভাবী ছিল। একবার রিপন স্ট্রীট ট্রেনিং সেনটার-এ এরকম 'ডেমনস্ট্রেশন' দেবার সময় আমার বোধ হয় এক সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশ সময়ের ভুল হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বোমাটা প্রায় আমার হাতের মধ্যেই জ্বলে উঠেছিল। আমি লাফিয়ে পশ্চাদপসরণ করেছিলাম বলেই সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম। সেদিন সঙ্গেসঙ্গেই মনে হয়েছিল 'রাখে হরি মারে কে'। আবার মাঝে মাঝে যুদ্ধে ব্যবহৃত গ্যাসের 'ডেমনস্ট্রেশন'-এর সময়ও দু-একজন গ্যাসে আক্রান্ত হত। তাদের চিকিৎসা করে সুস্থ করতে হত।

১১১

আমার এ-আর-পি'র কাজে বিশেষ সহায়তা পেয়েছিলাম 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সেক্রেটারী বলাইবাবুর (সুনীলকান্তি ঘোষ) কাছ থেকে। এ-আর-পি'কে জনপ্রিয় করবার জন্য তাঁরই উদ্যোগে বাগবাজারে শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের নীচের তলার ঘরে স্থাপিত হয়েছিল 'এ-আর-পি ক্লাব'। এ ক্লাবের যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁরা সকলেই স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি। যাঁরা দুবেলা ক্লাবে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুনীলকান্তি ঘোষ, কিরণচন্দ্র বসু, রায় সাহেব অহিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কুমার গাঙ্গুলী, হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার ঘোষ, নীলমণি মিত্র, শৈলেন্দ্রনাথ নিয়োগী, রায় শম্ভুলাল বসু, ডঃ সুধীর দেব, মদন দত্ত, রায় বাহাদুর আশুতোষ ঘোষ, ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য

প্রমুখ। এঁদের একটু পরিচয় এখানে দেওয়া দরকার। কিরণচন্দ্র বসু ছিলেন শ্যামপুকুর অঞ্চলের চীফ এ-আর-পি ওয়ার্ডেন ও আলিপুরের প্রাক্তন সরকারী উকিল, রায় সাহেব অহিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র-মেম্বারের একান্ত সচিব, বিজয়কুমার গাংগুলী ছিলেন হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারী ও বাগবাজারের স্বনামখ্যাত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বংশধর, হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পরে হয়েছিলেন আলিপুরের সরকারী উকিল, বসন্তকুমার ঘোষ ছিলেন বীমা লাইনের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, নীলমণি মিত্র ছিলেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারের প্রধান কর্মচারী, শৈলেন্দ্রনাথ নিয়োগী ছিলেন এক ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থার মালিক, শম্ভুলাল বসু ছিলেন নন্দলাল বসুর বংশধর, ডঃ সুধীর দেব ছিলেন শোভাবাজার রাজবাড়ির ছেলে, মদন দত্ত পরে 'যুগান্তর' পত্রিকার চীফ অ্যাকাউনটেণ্ট হয়েছিলেন, আশুতোষ ঘোষ ছিলেন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, আর পশুপতি ভট্টাচার্য ছিলেন ডাক্তার ও সাহিত্যিক। এ-আর-পি ক্লাবের সেক্রেটারী ছিলেন সুনীলকান্তি ঘোষ ও অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারী আমি। আমিই ক্লাবটা পরিচালনা করতাম এবং সব সময়েই ওখানে থাকতাম।

ऽऽऽ

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ সম্বন্ধে সে-সময় এদেশে বা বিদেশে কোন বই ছিল না। আমিই এ-সম্বন্ধে একখানা বই (Rapid Training in A. R. P.) লিখি এবং তার জন্য সমর দপ্তরের GHQ থেকে প্রশংসালাভ করি।

আমাদের সংগে দেখা করবার জন্য পুলিশ কমিশনার ফেয়ারওয়েদার সাহেব ও ডেপুটি কমিশনার নর্টন জোনস্ সাহেব প্রায়ই আসতেন। এছাড়া, একদিন বাঙলার গভর্নর স্যার জন হারবার্ট সাহেবও এসেছিলেন।

আমার কাজের জন্য সরকার আমাকে সম্রাটের জন্মদিনে সম্মানিত করতে চায়। কিন্তু আমি তাতে অসম্মত হই। সরকারকে আমার শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিই। এছাড়া, শিক্ষাদানের ব্যাপারে আমার নানা জায়গায় যাওয়া-আসার দরুন গাড়িভাড়া বাবদ সরকার ৬০০০ টাকার একটা বিল তৈরি করে, আমাকে সেটা নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। তাতেও আমি অসম্মত হই। পরে চাপে পড়ে স্বাক্ষর করি বটে, কিন্তু পিছনে লিখে দিই, 'এটা কোন সৎকর্মে ব্যয়িত হউক'।

বিভিন্ন সিনেমায় প্রদর্শনের জন্য সরকার এ-সময় একখানা ফিলম্-ও তৈরি করেন। ওই ফিলম্-এ আমার ভূমিকা ছিল প্রধান শিক্ষকের। ফিলম্খানা

এদেশের সব সিনেমায় কিছুদিন যাবৎ দেখানো হয়েছিল।

এ-সময় বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ বিষয়ে আমি যাদের শিক্ষাদান করেছিলাম, তার মধ্যে ছিল সরকারী নানা অফিস, রেলওয়ে ও বেঙ্গল চেম্বার অভ্ কমার্স-এর কর্মিবৃন্দ ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাবৃন্দ।

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে এ-আর-পি সংস্থা যখন বৈতনিক সংস্থায় পরিণত হয়, তখন আমি ও আমাদের ক্লাবের সকল সদস্যই ওই বৈতনিক সংস্থা থেকে নিজেদের বিযুক্ত করি। কিন্তু আমাদের ক্লাবটা থেকে যায়, এবং আমরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ সম্বন্ধে প্রচারকার্য চালিয়ে যাই। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন সিঁথির বাড়িতে চলে যাই, তখন ক্লাবটা উঠে যায়।

~ ~ ~

লড়াইয়ের সময় এ. আর. পি ক্লাবটাই ছিল আমার প্রাণের স্পন্দনকেন্দ্র। ওখানেই অবসর সময়ে আমি আমার সারস্বত সাধনা করতাম। ওখানে বসেই অনাদি পালের অনুরোধে আমি হিন্দুমহাসভার মুখপত্র 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার জন্য অসংখ্য অর্থনৈতিক প্রবন্ধ লিখেছি। আবার ওখানে বসেই লিখেছি আমার 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' ও 'টাকার বাজার' বই দুখানা। ইনসিওরেনস্ ফিলড্-ওয়ার্কারস্ অ্যাসোসিয়েশনের অনুরোধে ওখানে বসেই লিখেছি 'গভর্নমেণ্ট সিকিউরিটিজ—হাউ সেফ্ আর দে'। রণাঙ্গণে মিত্রশক্তির যখন বিপর্যয় ঘটছিল, তখন জীবন বীমা করা সম্বন্ধে লোকের আস্থা একেবারেই নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল কেননা বীমা কোম্পানিসমূহের বিনিয়োগের এক সিংহভাগ গভর্নমেণ্ট সিকিউরিটিজ বা কোম্পানির কাগজে বিনিযুক্ত হত। আমার বইখানি জীবন-বীমার প্রতি লোকের আস্থা আবার ফিরিয়ে আনে। সেজন্য ওই বইখানি লেখার জন্য আমি ইনসিওরেনস্ কোম্পানিসমূহের কাছ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন পাই। এ সময় ওই এ-আর-পি ক্লাবে বসে আরও পাঁচখানা বই ইংরেজিতে লিখি। তার মধ্যে প্রথমখানা হচ্ছে—Statistics : How to handle them ? (১৯৪০)। বহুকাল যাবৎ 'স্ট্যাটিসটিকস্' সম্বন্ধে এখানাই একমাত্র পুস্তক ছিল। এখানা প্রকাশ করেছিল বোম্বাইয়ের বিখ্যাত প্রকাশক ডি. বি. তারাপুরওয়ালা অ্যাণ্ড সনস্। এ-সময় আমি একখানা বিখ্যাত বই লিখি, যার নাম Savings and Investment in India। রয়েল কমিশন থেকে আরম্ভ করে ভারতের অর্থনীতি-বিদ্দের ধারণা ছিল যে ভারতের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকার বেশি নয়।

আমি বিনিয়োগের সূত্রসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখাই যে গুপ্ত সঞ্চয় ছাড়া, মাত্র বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রতিবৎসর ২০০ থেকে ৩০০ কোটি টাকা বিনিযুক্ত হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তখন 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন'-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বইখানি পড়ে আমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তৃতীয় বইটির নাম India's Natural Resources। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে এখানাই এদেশে লিখিত পূর্ণাঙ্গ বই। চার নম্বর বইয়ের নাম হল Investment Banking in India (১৯৪৬)। ভারতের মূলধনের বাজারকে সক্রিয় করে তোলবার জন্য 'ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক' স্থাপনেব প্রয়োজনীয়তার কথা এই বইখানাতে বলি। বহুকাল পরে আজ তা 'ম্যানেজমেন্ট ব্যাংকিং'-এর রূপ নিয়েছে। পাঁচ নম্বর বইটির নাম Profit Hunting on the Stock Exchange (১৯৪৫)। এই বই ১২০ কপি কিনেছিলেন নেপালের রানারা ও ৫৬ কপি দ্বারভাঙ্গার মহারাজা। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। এই বই হাজার হাজার বিনিয়োগকারীকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে যখন শেয়ার-বাজারের পতন ঘটে।

১১১

মাত্র এ-আর-পি নিয়েই যে আমি সমাজসেবার কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তা নয়। এ সময় আমি Boy Scouts-এরও একটা দল গঠন করেছিলাম। আরও, এ সময় আমি সেন্ট জন অ্যামবুলেন্সের সেক্রেটারী মিসেস্ আর. এম. ব্রাউন-এর অনুরোধে উক্ত সংস্থায় যোগ দিই। শিশিরকুমার ইনস্টিটুটের উদ্যোগে সেন্ট জন অ্যামবুলেনস্ ব্রিগেড-এর একটা ডিভিসন গঠন করি। ওই ডিভিসনের আমি ছিলাম ডিভিসনাল সুপারিনটেনডেন্ট। তার মানে, আমার ছিল Captain-এর rank, কাঁধের ওপর তিনটা star। আমার সমান rank ছিল ডিভিসনাল সারজন ডঃ সুধীর দেবের। আমরা প্রথম সেবাকার্যে লিপ্ত হই আড়িয়াদহ আদ্যাপীঠের মহোৎসবে। এছাড়া, বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনীতে আমরা প্রতিবৎসর মোতায়েন থাকতাম। এখনও মনে পড়ে, বাগবাজার দুর্গোৎসবে আমাদের সেবাকার্যের কথা। কত মেয়ের ওখানে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা করেছি। ভিড়ের চাপে কত মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। তারপর কত মেয়ে পরিচিত বা অপরিচিত ছেলের সংগে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে সিদ্ধির কুল্পি খেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। এদের সকলকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে, আমরা তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি, বা আত্মীয়স্বজনের কাছে সমর্পণ করেছি। সে-যুগে

যেখানেই জনতার সমাবেশ হত, সেখানেই আমাদের শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের 'সেন্ট জন অ্যামবুলেনস্ ব্রিগেড ওভারসীজ' সেবামূলক কাজে লিপ্ত থাকত। মিসেস ব্রাউন আমাদের কাজে খুব সন্তুষ্ট। শীঘ্রই ডাক এল এক বড় কাজের জন্য। বিমান-নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে যারা রেংগুনে আহত হয়েছিল, তাদের কৃষ্ণনগরে সংগঠিত অস্থায়ী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের ওপর ন্যস্ত হল। সমস্ত কাজটাই সুষ্ঠুভাবে আমার অধীনে হয়েছিল। মিসেস ব্রাউন আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। আমাদের কাজ দেখে সেদিন তিনি প্রশংসামুখর হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু সেন্ট জন অ্যামবুলেনসের আসল কাজটা এককভাবে আমার ঘাড়ে এসে চাপে। এটা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দিয়ে দল গঠন করা। এ প্রশিক্ষণের কাজে ডাক্তারদেরই নিযুক্ত করা হত। যদিও আমি ডাক্তার নই, তা হলেও এ প্রশিক্ষণের কাজটা মিসেস ব্রাউন আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন। হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে আমি প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দিলাম ও তারা সকলেই সার্টিফিকেট পেল। সেন্ট জন অ্যামবুলেনসের ওই সার্টিফিকেটে প্রথম সই করতেন বাঙলার গভর্নর স্যার জন হারবার্ট, পরে শিক্ষক হিসাবে আমার সই। যারা এই সার্টিফিকেট লাভ করল, তারা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে এক বিশেষ ভাতা পেল।

শিক্ষক হিসাবে আমি সুনাম অর্জন করার ফলে, আমার কাছে এবার গুরুতর দায়িত্ব পালনের আহ্বান এল। যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য নার্স তৈরি করতে হবে। এ-সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণের জন্য মিসেস ব্রাউন আমাকে পাঠালেন লেডি ডফরিন হাসপাতালে। লেডি ডফরিন হাসপাতালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। সুতরাং কাজটা আমার ঘাড়ে চেপে গেল।

একটা কথা এখনও বলিনি। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রায় একহাজার কর্মীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেবার সময় শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য আমি দু'খানা বই লিখেছিলাম। বই দু'খানার নাম হচ্ছে First Aid in Nutshell ও 'প্রাথমিক চিকিৎসার অ আ ক খ'। বই দু'খানা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'ই ছাপিয়েছিলেন এবং ওঁরাই ওখানা প্রকাশিত করেছিলেন বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

~ ~ ~

৭ আগস্ট ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ। বাঙলার ইতিহাসে এতবড় দুর্দিন আর কখনও

আসেনি। সেদিন ইন্দ্রপতন ঘটল। রবি অস্ত গেলেন। কিছুদিন যাবৎ রবীন্দ্রনাথের শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁকে ইনভ্যালিড চেয়ারে করে শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর জোড়াসাকোর বসতবাড়ির দোতলায় অবস্থিত নিজ কক্ষে আনা হয়েছে। তিনি মূত্রাশয়ের রোগে ভুগছিলেন। ৩০ জুলাই তারিখে তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচার করা হল। দু'দিন ভাল রইলেন। তারপর অবনতি ঘটল। ৭ আগস্ট তারিখে বেলা ১২টা ৩০ মিনিটের সময় তাঁর দেহাবসান ঘটল। সমস্ত কলকাতা শহর উদ্বেলিত হয়ে শেষ দর্শনের জন্য জোড়াসাঁকোয় ছুটল। স্টক একসচেঞ্জ কমিটিকে অনুরোধ জানালাম স্টক একসচেঞ্জ বন্ধ করে দিতে। কিন্তু সে অনুরোধ বিফল হল। অথচ পরে বিড়লাদের গুরুর মৃত্যুতে স্টক একসচেঞ্জ বন্ধ রাখা হল পুরো একদিন।

একাই বেরিয়ে পড়লাম জোড়াসাঁকোর উদ্দেশে। দেখলাম, সিঁড়ি দিয়ে উঠছে কাতারে কাতারে লোক। তাদের সঙ্গেই উঠলাম। দেখলাম কবির চেহারার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। মনে হচ্ছে তিনি ঘোর নিদ্রায় মগ্ন। বাঙলার একজন অলোকসামান্য প্রতিভাদীপ্ত জীবনের অবসান ঘটল।

৯ ৯ ৯

লড়াইয়ের সময়কার এসব কাজের মধ্যেই আমাকে কয়েকবার কলকাতার বাইরে যেতে হল।

১৯৪২ সালে একদিন স্টক একসচেঞ্জ অফিসে বসে কাজ করছি, এমন সময় কলকাতা পুলিসের ডেপুটি কমিশনার সত্যেন মুখার্জি ও পাটনার সুপারিনটেনডেন্ট অভ্ পুলিস আমার ঘরে এসে হাজির। সত্যেনবাবু পাটনার সুপারিনটেনডেন্ট অভ্ পুলিসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, হাজারিবাগে এক আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইবুনাল বসেছে। এঁরা আপনাকে সেখানে বিশেষজ্ঞ হিসাবে রাজসাক্ষী মেনেছেন। আমি তো শুনে স্তম্ভিত। বললাম, ব্যাপারটা কি খুলে বলুন, তারপর আমি সাক্ষীর সমন গ্রহণ করব। পাটনার ওই পুলিস কর্মচারীই বলতে শুরু করলেন। কয়েকজন লোক এক প্রতারণামূলক চক্র গঠন করে সারা ভারতের গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিরক্ষর গ্রামবাসীদের যার যা সঞ্চয় ছিল, তা বের করে নিয়ে এসেছে এই লোভ দেখিয়ে যে তারা প্রতি ১০০ টাকার পরিবর্তে ৪০ টাকা মুনাফা পাবে। আমরা মনে করি, সেটা সম্ভবপর কিনা, সে বিষয়ে সারা দেশে আপনার চেয়ে বড় এমন কোন বিশেষজ্ঞ নেই যিনি এ বিষয়ে প্রামাণিক সাক্ষ্য দিতে সক্ষম। সেজন্যই আপনার শরণাপন্ন

হয়েছি। বললাম, আমার দারুণ কাজের চাপ, এ-আর-পি আছে, সেন্ট জন অ্যামবুলেনস্ আছে, স্টক একসচেঞ্জ আছে, আমি কি করে যাই? কিন্তু ওই পুলিস অফিসার নাছোড়বান্দা। সুতরাং আমাকে যেতেই হল।

ঽ ঽ ঽ

হাজারিবাগ চলেছি। ভোর চারটের সময় ট্রেন থেকে নামলাম হাজারিবাগ রোড স্টেশনে। ওখান থেকে যেতে হবে ৪৫ মাইল দূরে খাস হাজারিবাগে, রেলের সংগে বন্দোবস্ত করা 'লাল মোটর' বাসে। বাইরে এসে দেখি, বাসখানা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনের সামনেই। ভোরের ঠাণ্ডায় গা-টা শিরশির করতে লাগল। সেজন্য চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে নিলাম। বাসখানার সামনে এসে দেখি, আমি পৌঁছানর আগেই বাসখানা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আমি চাদরখানা গায়ে জড়াবার আগেই বাসের কনডাকটর দেখেছিল আমার সামরিক পোশাক। লড়াইয়ের যুগে সামরিক পোশাকের অনেক খাতির। কনডাকটর আমাকে বলল, আপনি চলে যান সামনে ফার্স্ট ক্লাসে। সামনে ফার্স্ট ক্লাসের দরজায় গিয়ে দেখি, ভেতরে আগে থাকতেই একটা আসন দখল করে নিয়েছে একজন জাঁদরেল চেহারার গোরা সাহেব। আমি ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় ও ভেতর থেকে হিন্দিতে বলে উঠল, ইয়ে ফার্স্ট ক্লাস হ্যায়। বোধ হয়, আমার চাদর-গায়ে-দেওয়া কৃষ্ণকায় চেহারা দেখেই ও নিজ মাতৃভাষা পরিহার করে আমাকে হিন্দিতে ওইরূপ সম্ভাষণ করল। উত্তরে আমি ইংরেজিতেই বললাম, আই নো দ্যাট। তখন সাহেব আমাকে ইংরেজিতেই বলল, শো মি ইওর টিকেট। আমি উত্তরে বললাম, হু দি ডেভিল অন্ আরথ্ আর ইউ টু আসক্ মি ফর মাই টিকেট। আমি আর বাক্যব্যয় না করে, ভেতরে উঠে ওর পাশেই একটা আসন দখল করলাম।

বাস চলতে আরম্ভ করল। এক ঘণ্টা পরে হাজারিবাগে গিয়ে পৌঁছাল। আমি ডাকবাংলোয় থাকব। নতুন লোক, কোথায় কি জানি না। লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ডাকবাংলোয় গিয়ে পৌঁছালাম। গায়ের চাদরখানা তখন খুলে ফেলেছি। ডাকবাংলোয় গিয়ে দেখি, মালীরা তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। সেজন্য আমার সহযাত্রী সাহেবটি ডাকবাংলোর বারান্দায় পায়চারি করছে। আমি বারান্দায় ওঠামাত্রই খটাশ করে জুতার শব্দ হল, এবং সাহেব আমাকে স্যালুট করে বসল। আমার কাঁধে ও তিনটা 'স্টার' দেখেছে। আমি দেখলাম, ওর কাঁধে মাত্র একটা 'স্টার'। সুতরাং সামরিক রীতি অনুযায়ী ও আমাকে স্যালুট করতে বাধ্য।

তারপর দু'জনের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হল। জানলাম, উনি রামগড়ে যাচ্ছেন, শত্রুপক্ষীয় ধৃত বন্দীদের রাখবার জন্য সেখানে একটা শিবির তৈরির কাজে। আমি কি কারণে হাজারিবাগে এসেছি শুনে আমার প্রতি ও'র আরও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

ডাকবাংলোর দরজা খোলার পর আমরা একই ঘরে দু'জনে আশ্রয় নিলাম। তখন দু'জনের মধ্যে খুব ভাব। অনেক গল্প-গুজব করা হল। বেলা দশটার সময় খাওয়া-দাওয়ার পর উনি যাত্রা করলেন রামগড় অভিমুখে, আর আমি আদালতের উদ্দেশ্যে।

১১১

আদালতে পৌঁছে দেখি, আদালত-প্রাঙ্গণে লোক গিজগিজ করছে। সরকারী উকিলের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, আদালত বসবে বেলা একটায়। এখনও অনেক সময় আছে। এই কথা বলে তিনি আমাকে নাজিরের ঘরে নিয়ে গিয়ে একখানা চেয়ারে বসতে বললেন। আমি সবেমাত্র বসেছি, এমন সময় এক বুড়ী এসে আমার দু'টো পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে দিল। কোনরকমে তো বুড়ীকে ধরে তুললাম। তারপর সে আমাকে এক করুণ কাহিনী শোনাল। বন থেকে কাঠকুটো সংগ্রহ করে এনে, শহরের বাজারে বেচে সারাজীবনে সে যে অর্থ উপার্জন করেছিল, তা থেকে সে ষাট টাকা সঞ্চয় করেছিল। এই দুশমনরা তাকে লোভ দেখিয়ে তার সারাজীবনের সঞ্চিত সেই ষাট টাকা বের করে নিয়ে এসেছে। আমাকে বলল, আপনি আমার সেই ষাট টাকা উদ্ধার করে দিন। কি বলে যে ওকে সান্ত্বনা দেব, তা বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে তাকে আশ্বাস দিলাম যে আমি যখন এই মামলা সম্পর্কে দ্বিতীয়বার হাজারিবাগ আসব, তখন আমি নিজেই তাকে ষাট টাকা দেব। এরকম কাহিনী আরও অনেকের কাছ থেকে শুনলাম।

আদালত বসবার সময় হয়ে এল। নাজিরের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরের প্রাঙ্গণে দেখলাম, আসামীদের আদালতে হাজির করবার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একটা প্রায় একশো হাত লম্বা দড়ির দু'ধারে আসামীরা চলেছে। হাতকড়া লাগানো হাতের একটা হাত দড়ির সঙ্গে বাঁধা। প্রথম আসামীকে দেখেই চিনতে পারলাম। লোকটা আমাদের স্টক একসচেঞ্জের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফাটকা খেলত।

আদালত বসল। সরকারী উকিল আমার পরিচয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদের পর প্রশ্ন করলেন, আপনার এমন কি কোন বিনিয়োগের সূত্র জানা আছে যে মূল-

ধনের নিরাপত্তা বজায় রেখে যা থেকে নিয়মিতভাবে বার্ষিক শতকরা ৫০ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড পাওয়া যায় ? আমি বললাম, না। এমন সময় হাকিম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা মিস্টার সুর, বলুন তো, আপনি স্টক একস্‌চেঞ্জে কতদিন চাকরি করছেন ? আমি বললাম, মাত্র সাত বছর। আপনার তা হলে মাত্র সাত বছরের অভিজ্ঞতা ! মন্তব্যটা তিনি এমন এক তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন যে আমাকে 'আদালত অবমাননা' রক্ষা করে একটা কঠোর প্রত্যুত্তর দিতে হল। হাকিম আমার ওপর বেশ রুষ্টই হলেন। তিনি যে আমার ওপর বেশ রুষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ পেল, আমি যখন দিনের শেষে তাঁর কাছে আমার যাওয়া-আসা ও থাওয়া-থাকা বাবদ ১২৭ টাকার একটা বিল পাস করাতে নিয়ে গেলাম। ওটাই আমার প্রকৃত খরচ। কিন্তু হাকিম ওটা কেটে ৯২ টাকা করে দিলেন ! সরকারী উকিলকে বললাম, হাকিম যদি এরকম করেন, তা হলে আমার পক্ষে জেরার সময় হাজির হওয়া সম্ভবপর হবে না।

সরকারী উকিল বললেন, আসামীপক্ষ একজন খুব নামজাদা ব্যারিস্টার নিযুক্ত করেছে। খুব শক্ত জেরা হবে। ও জেরায় একমাত্র আপনিই উত্তীর্ণ হতে পারবেন। আমরা তো কলকাতা হাইকোর্টের কথা জানি। যখনই কোম্পানি-ব্যাপার সংক্রান্ত কোন জটিল মামলায় কোন পক্ষ হাইকোর্টের সেরা ব্যারিস্টার অশোক সেনকে (বর্তমানে ভারত সরকারের আইন-মন্ত্রী) নিযুক্ত করেছে, তখনই প্রতিপক্ষ আপনাকে সাক্ষী মেনেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রতি মামলাতেই আপনি অশোক সেনের কঠিন জেরায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। সেই কারণেই তো আমরা আপনাকে এই মামলায় সাক্ষী মেনেছি।

ডাকবাংলোয় ফিরে দেখলাম, আমার পাশের ঘরেই একজন সাহেব আশ্রয় নিয়েছেন। আমি ফেরামাত্রই তিনি আমার ঘরে এলেন। পরিচয় দিলেন তিনি কলকাতার এক বিখ্যাত ইংরেজ ফার্মের 'সেলস্‌ রিপ্রেজেনটেটিভ'। গল্প জুড়ে দিলেন। সবই মেয়েমানুষ সংক্রান্ত গল্প। কোথায় কি করেছেন, সেই সব গল্প। বললেন, ভারী সুখের জায়গা হচ্ছে মণিপুর। আপনি একবার জোরে শিস দিন। সঙ্গে সঙ্গেই একটা অর্ধ-বিবস্ত্রা মেয়ে এসে হাজির হবে। সাহেবের গল্প শুনতে শুনতে অনেক রাত্তির হয়ে গেল। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন প্রাতঃকালে কলকাতা রওনা হলাম।

ঌ ঌ ঌ

মাস চারেক পরেই জেরার দিনে উপস্থিত থাকবার সমন পেলাম। এবার পরামর্শ

করবার জন্য সরকারী উকিল একদিন আগেই যেতে বলেছিলেন। হাজারিবাগে পৌঁছে দেখি ডাকবাংলোয় কোন ঘর খালি নেই। বিহার সরকারের মন্ত্রীরা এসে সব ঘর দখল করেছেন। অগত্যা সরকারী উকিল আমাকে এক হোটেলে নিয়ে গিয়ে তুলে দিলেন। সন্ধ্যার পরেই হোটেলের ম্যানেজার আমার ঘরে এলেন, তৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী আমার নাম-ধাম, পরিচয় ইত্যাদি খাতায় লিখে নেবার জন্য। সব লেখা হয়ে গেলে আমাকে বললেন, একলা ঘরে বসে কি করবেন, চলুন না নীচের ঘরে তাসখেলা হচ্ছে, দেখবেন। ও'র সংগে আমি নীচের ঘরে এলাম। দেখলাম, কয়েকজনে মিলে তাস খেলছে। তার মধ্যে একজনকে দেখলাম, সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান। পরনে ফিনফিনে কোঁচানো ধুতি ও গায়ে গিলে-করা ফাইন আদ্দির পাঞ্জাবি। আমরা যেতেই উনি ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকালেন। ম্যানেজার বললেন, দু-তিন দিনের জন্য ইনি একটা কাজে এখানে এসেছেন, ঘরে একলা বসে ছিলেন, সেজন্য ও'কে আপনাদের তাসের আড্ডায় নিয়ে এলাম। উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাস খেলতে জানেন ? কি জানি ও'দের কি মতলব, তা বুঝতে না পেরে বললাম, না। উনি বললেন, তা হলে বসে আমাদের খেলা দেখুন। তারপর খেলা শেষ হয়ে গেলে, উনি আমার সংগে গল্প করতে বসলেন। দেখলাম, কলকাতায় এখন আগস্ট বিপ্লব কিরকম চলছে, তা জানবার জন্য উনি খুব উদ্‌গ্রীব।

রাত্রে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। ভোর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে পেলাম, হোটেল-বাড়িটার চারদিকে ভীষণ কলরব, আর আমার ঘরের বাইরের বারান্দায় বুটের শব্দ, কারা আনাগোনা করছে। কিছুক্ষণ পরেই আমার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। প্রথমটা ভয় পেয়ে গেলাম। তারপর ম্যানেজারের গলা পেয়ে দরজাটা খুলে দিলাম। দেখে অবাক—সারজেণ্ট, পুলিস ইত্যাদি। ঘরের ভেতর ঢুকে ওরা আমার ঘরটা সার্চ করল। তারপর আমার পরিচয় নিল। পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। কিন্তু যাকে ওরা খুঁজতে এসেছিল, সে আগে থাকতেই হোটেল ছেড়ে পালিয়ে গেছে। পরে ম্যানেজারের কাছে শুনলাম, কাল রাত্রে তাসের আড্ডায় গিলে-করা পাঞ্জাবি-পরা যে ভদ্রলোকের সংগে আলাপ করেছিলাম, তিনি হচ্ছেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। নাম ভাঁড়িয়ে উনি এখানে আত্মগোপন করে ছিলেন।

ა ა ა

যথাদিনে আদালতে উপস্থিত হলাম। আগে থাকতেই ঠিক করে এসেছিলাম যে, আদালত বসবার আগেই হাকিমের সংগে একটু দহরম-মহরম করে, প্রথমবারের

ক্ষতিটা সুদেশুদ্ধ আদায় করে নেব। হলও তাই। হাকিমের সঙ্গে এমন সম্প্রীতি স্থাপন করলাম যে দিনের শেষে ও'র কাছে-যখন ৪৫০ টাকার একটা বিল পেশ করলাম, উনি চোখ-কান বুজিয়েই সেটা সই করে দিলেন।

১১১

হাজারিবাগ থেকে ফিরে দেখি আমার বাগবাজারের বাড়ির গলির মুখে রসিকবাবুর রকে আমাদের যে আড্ডা বসত, সেখানে একজন নতুন লোক জুটেছে। রসিকবাবু মানে রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। অনন্যসাধারণ পণ্ডিত। বৈষ্ণবশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। বৈষ্ণবদের কাছে ও'র বাড়িটা ছিল একটা পীঠস্থান। আর ও'র বাড়ির নীচের রকটা ছিল কুমার মিত্তিরের খিস্তি-খেউড়ের সাধনপীঠ। পাড়ার যত 'বকা' ছেলের আড্ডা। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলাম আমি। বয়সে আমাদের সকলের চেয়ে বড় বলে আমরা সকলেই ওকে কুমারদা বলে ডাকতাম। কুমারদা ছিল মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনেতা। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে যখন মিনার্ভা থিয়েটার পুড়ে যায় এবং নতুন বাড়ি তৈরি হতে থাকে, তখন কুমারদার মাধ্যমেই আমি মিনার্ভা থিয়েটারের নট-নটীদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। (৭২ পৃষ্ঠা দেখুন)। হাস্যরসাত্মক নাটকে অভিনয়ের জন্য কুমারদার বেশ সুনাম ছিল। কিন্তু যেদিন অভিনয় থাকত না, সেদিন রাত্তিরে মদ খেয়ে মত্ত অবস্থায় কুমারদার অন্য মূর্তি। একখানা কাটারি হাতে নিয়ে কুমারদা গলির এ-মোড় ও-মোড় ছুটোছুটি করত ছোটভাইকে কাটবে বলে। কুমারদার মুখে খিস্তি-খেউড়ের গল্প ও ছড়া শুনতে পাড়ার ছেলেদের খুব ভাল লাগত। সেজন্য বাই-লেন (আমাদের গলিটার নাম) থেকে বেরিয়ে কুমারদা যখন রসিকবাবুর রকে এসে বসত, তখন পাড়ার ছেলেরা পিলপিল করে এসে রকে বসত। পাড়ার প্রবীণরা বা সজ্জন ব্যক্তিরা সকলেই কুমারদার রকটা এড়াত এবং ওদিকে তাকাতই না। এহেন কুমারদার রকে আমি একজন যুবককে দেখলাম, হাজারিবাগ থেকে ফিরে এসে। যুবকটিও বেশ মজাদার গল্পগুজব করত, এবং শীঘ্রই সকলের প্রিয় হয়ে উঠল। কোথায় থাকে, কোথায় খায়-দায়, তা কেউই জানত না। তখন আগস্ট বিপ্লব চলছে। আমাদের বাই-লেনের মুখে দেওয়ালের গায়ে রাত্তিরে কারা হাতে-লেখা সাইক্লোস্টাইল-করা সংবাদপত্র লাগিয়ে দিয়ে যায়। তাতে মেদিনীপুরে যে-সব ঘটনা ঘটছে, তা লেখা থাকত। একদিন আমাদের পাড়াতেও একটা মিটিং হল। ওই মিটিং-এ কুমারদার আড্ডার ওই নতুন যুবকটিও একটা খুব জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিল। তার পরের দিনই পুলিস এল বাড়ি-বাড়ি সার্চ করতে। কিন্তু ওই যুবকটি

সংগে সংগে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। শুনলাম, ও হচ্ছে রামমনোহর লোহিয়া। কুমারদার আড্ডার ওপর পুলিস কোনদিন নজর দেবে না, এই ভেবেই ও ওভাবে নিজেকে আত্মগোপন করেছিল। সব শুনে কুমারদা বলল, ব্যাটা, আমার চেয়েও ভাল অভিনয় করে গেল!

ꣷ ꣷ ꣷ

কুমারদাদের পরিবার ছিল খুব সম্ভ্রান্ত পরিবার। কুমারদারই এক দাদা সুরেন মিত্তিরমশাই ছিলেন ভেটেরিনারী কলেজের প্রিন্সিপাল। তিনি ঘোড়ায় চেপে নিজ কর্মস্থলে যেতেন। আমরা যখন আমাদের শ্যামবাজারের ভিটাচ্যুত হয়ে, বাই-লেনে বাড়ি (৩১ নং বাগবাজার স্ট্রীট) কিনে ওখানে গিয়ে বসবাস শুরু করলাম, তখন সুরেন মিত্তির মশাই বহুকাল হল মারা গিয়েছেন। কিন্তু রোজ রাত্তিরে আমরা বাই-লেনের ইট-বাঁধানো গলিটায় ঘোড়ায় খুরের শব্দ শুনতাম। লোকে বলত, সুরেন মিত্তির রোজ রাত্তিরে ঘোড়ায় চেপে ও'র বাড়ি দেখতে আসেন।

বাই-লেনটা ছিল মাত্র চার-হাত চওড়া একটা সরু গলি। দোতলায় আমার শোবার ঘর। আমার শোবার ঘরের জানালার উল্টোদিকে চার-হাত অন্তরেই ছিল প্রখ্যাত অভিনেতা জহর গাঙ্গুলীর শোবার ঘরের জানালা। সেজন্য ওদের সংগে আমাদের বেশ অন্তরংগতা ছিল। আমার স্ত্রী ও জহরের স্ত্রী দু'দিকের দুই জানালায় বসে সব সময়েই গল্প করত।

ꣷ ꣷ ꣷ

আমি আর একবার এ-আর-পি'র কথায় ফিরে আসছি। জাপান যখন অক্ষশক্তির হয়ে যুদ্ধে নামল, ইংরেজ প্রমাদ গুনল। ভাবল, এবার কলকাতায় নির্ঘাত বিমান-আক্রমণ হবে। সেজন্য এ-আর-পি'-র তৎপরতা বেড়ে গেল। শহরের সর্বত্র 'ব্যাফল-ওয়াল' তোলা হল। বিমান-আক্রমণের সময় আশ্রয় নেবার জন্য স্থানে স্থানে 'শেলটার' করা হল। কলকাতাকে নিষ্প্রভ করা হল আলোক নিয়ন্ত্রণ করে। বাড়ির আলোগুলো সব ঠুলি-চাপা দেওয়া হল। রাস্তার আলোর বেলাতেও তাই করা হল। বাড়ির সার্সীর কাঁচগুলোর ওপর কাগজ সেঁটে দেওয়া হল। এককথায় আলোক-নিয়ন্ত্রণের একটা ঘটা পড়ে গেল। সব জায়গাতেই আলোর ওপর ঘোমটা দেওয়া হল, যাতে ওপর থেকে বা বাইরে থেকে কোন আলো

না দেখা যায়। ঠিকভাবে আলোক-নিয়ন্ত্রণ হয়েছে কিনা, তা দেখবার জন্য 'লাইটিং রেস্ট্রিকটার' নামে একদল এ-আর-পি স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হল। তাদের ওপর তদারকি করবার জন্য আমাকে 'চীফ লাইটিং রেস্ট্রিকটার' নিযুক্ত করা হল। চীফ লাইটিং রেস্ট্রিকটার হয়ে আমি আমার অধীনস্থ লাইটিং রেস্ট্রিকটারদের নির্দেশ দিলাম, ঠিকভাবে আলোক-নিয়ন্ত্রণ হয়েছে কিনা দেখবার জন্য তাদের যদি কোন বাড়ির ভেতর যেতে হয়, তা হলে তারা ভুলক্রমেও যেন মেয়েদের সঙ্গে কোনরকম অশালীন বা অশোভন আচরণ না করে।

আলোক-নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হবার পর সবচেয়ে মুশকিলে পড়ল বিয়ে-বাড়ির লোকরা। আলো ছাড়া বিয়ে হবে কি করে? লোকজনকেই বা কি করে খাওয়ানো যাবে? হোগলা দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করলে অবশ্য এটা সম্ভবপর হত। কিন্তু হোগলা দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কেন বন্ধ করা হয়েছিল, তা আমি পরের অনুচ্ছেদে বলব।

বিয়ে-বাড়ির লোকরা সব ছুটে এল আমার কাছে। বলল, আপনি আমাদের একটা মুশকিল-আসান করুন। সকলকেই আশ্বাস দিলাম, আমি নিজে বা আমার স্বেচ্ছাসেবকরা দাঁড়িয়ে থেকে আপনাদের কাজ যাতে স্বাভাবিকভাবে সুসম্পন্ন হয়, তা করে দেব, তবে বিপদ-সংকেত বা 'সাইরেন' বাজামাত্রই আপনাদের সব আলো নিভিয়ে দিতে হবে। সকলেই তাতে রাজী হল, এবং আমাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাল।

আমার স্বেচ্ছাসেবকরা সকলেই ভদ্রপরিবারের সন্তান ও অধিকাংশই শিক্ষিত ছিল। কিন্তু এ-আর-পি যখন বৈতনিক সংস্থা হল, এবং পদত্যাগ করলাম, তখন আমার সঙ্গে আমার স্বেচ্ছাসেবকরাও সকলে ওই সংস্থা থেকে নিজেদের বিমুক্ত করল।

১১১

যখন বৈতনিক সংস্থা গঠিত হল, তখন নানা শ্রেণীর ও নানা চরিত্রের বেকার যুবকরা তাতে যোগ দিল। গঠিত হবার পর কয়েকদিনের মধ্যেই খবরের কাগজে সংবাদ বেরুল যে জোড়াসাঁকো এলাকায় এ-আর-পি কর্মীরা আলোক-নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে হয়েছে কিনা, তা পরিদর্শন করবার নাম করে বাড়ির অন্তঃপুরে ঢুকে মেয়েদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করছে। এর প্রতিবাদে আমি একটা মস্ত বড় বিবৃতি দিলাম। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, উর্দু সব ভাষারই কাগজে সে বিবৃতিটা বেরুল।

বিবৃতিটা পড়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন হেস্টিংস অঞ্চলের এক রাজভক্ত রায়বাহাদুর চীফ ওয়ার্ডেন। সে সময় কলকাতায় চীফ ওয়ার্ডেনদের একটা কাউনসিল স্থাপিত হয়েছিল। কলকাতার পুলিস কমিশনার ফেয়ারওয়েদার সাহেব তার চেয়ারম্যান ছিলেন। উত্তেজিত হয়ে ওই রাজভক্ত রায়বাহাদুর অভিযোগ করলেন যে আমার বিবৃতিটা সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধবিরোধী কাজ এবং ওই কারণে আমাকে ডিফেনস অভ্ ইণ্ডিয়া রুলে অভিযুক্ত করা হউক। তিনি তাঁর অভিযোগটা 'প্রস্তাব' আকারে কাউনসিলে পেশ করলেন। কিন্তু কৌশল করে ফেয়ারওয়েদার সাহেব প্রতি মিটিং-এই ওই প্রস্তাবটা মুলতুবী রাখতে লাগলেন। গোড়ার দিকে রায়বাহাদুর গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে ফেয়ারওয়েদার সাহেবের ওপর চাপ দিতে লাগলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে তাঁর চাপ দেওয়া নিষ্ফল ও বৃথা, তখন তিনি ওই প্রস্তাব সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। প্রায় পাঁচ মাস পরে তাঁর আনীত প্রস্তাবটি খারিজ হয়ে গেল।

১১১

আগের অনুচ্ছেদে বলেছি যে কলকাতায় হোগলা দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এটা ঘটেছিল এক মর্মন্তুদ অগ্নিকাণ্ডের জেরে। কলকাতার ইতিহাসে এরকম নিদারুণ ও শোকাবহ অগ্নিকাণ্ড শহরের বুকে আগে আর কখনও ঘটেনি, পরেও নয়। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৪২ সালের ৮ নভেম্বর রবিবারে। ৫-এ হালসীবাগান রোডে অবস্থিত 'আনন্দ আশ্রম' প্রাঙ্গণে কালীপূজা উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী এক আমোদপ্রমোদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। হোগলা দিয়ে এক প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছিল। ঘটনার দিন প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবিদ বিষ্ণু ঘোষ তার দলবল নিয়ে ব্যায়াম-কৌশল দেখাচ্ছিল। বিষ্ণু ও ওর দলের তখন শহরে খুব জনপ্রিয়তা। সেজন্য একহাজারের ওপর মেয়ে, পুরুষ ও শিশু ওখানে জড়ো হয়েছিল। আমিও ওই দলের মধ্যে ছিলাম। দেরিতে গিয়েছিলাম বলে আমি ও আমার সঙ্গীরা গেটের কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। সেজন্যই সেদিন পৈতৃক প্রাণটা বেঁচে গিয়েছিল।

বেলা তখন পৌনে চারটা হবে। বিষ্ণুর দল বেশ সুশৃঙ্খলভাবেই তাদের ব্যায়াম-কৌশল দেখাচ্ছিল। সকলে মুগ্ধনয়নে দেখছিল বিষ্ণুর তেরো-বছরের ছেলে কেষ্টর ব্যায়াম-কৌশল। এমন সময় মণ্ডপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে লোক চিৎকার করে উঠল 'আগুন, আগুন'! মণ্ডপের দক্ষিণ দিকটা জ্বলে উঠল। লেলিহান অগ্নিশিখা ক্রমশ অগ্রসর হতে লাগল। আমি ও আমার সঙ্গীরা ছুটে

গেট দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর দেখলাম, ভেতরের সব লোকই গেটের দিকে ছুটে আসছে। ওখানে জমাট ভিড়। পুরুষরা অধিকাংশই পাঁচিল টপকিয়ে বেরিয়ে এল। পিছনে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে আটক হয়ে পড়ল মেয়ে ও শিশুরা। ১১৯ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল। আহতদের মধ্যে ত্রিশজনকে কারমাইকেল (আর. জি. কর) মেডিকেল কলেজে ও নয়জনকে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হল। তাদের মধ্যেও বারোজন কারমাইকেল কলেজে ও দু'জন মেডিকেল কলেজে মারা গেল। বিষ্ণুর ছেলে কেষ্টও ওই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে প্রাণ হারাল। সমস্ত শহরে বয়ে গেল শোকের স্রোত। কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল। কর্তৃপক্ষ আইন জারি করল যে এর পর আর কেউ হোগলার মণ্ডপ তৈরি করতে পারবে না। সেই থেকেই শহরে হোগলার মণ্ডপ তৈরি করা বন্ধ হয়ে গেল।

ꣻ ꣻ ꣻ

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দটাকে বিধাতা যেন বেঢপেই তৈরি করেছিলেন। ওই বছরটাতে একটার পর একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল। আগস্ট মাসে ঘটল 'আগস্ট বিপ্লব'। নভেম্বর মাসে হালসীবাগানের অগ্নিকাণ্ড। আর ডিসেম্বর মাসে জাপানী বিমানের প্রথম আক্রমণ। হালসীবাগানের অগ্নিকাণ্ডের কথা তো এইমাত্র বললাম। এবার বলব 'আগস্ট বিপ্লব' ও জাপানী বিমান আক্রমণ সম্বন্ধে।

ꣻ ꣻ ꣻ

প্রথমেই বলি আগস্ট বিপ্লবের কথা। কংগ্রেস প্রথমে যুদ্ধে সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু সরকার তাতে সাড়া দিল না। পরে সরকার নিজেই ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস্-এর মারফত যুদ্ধে কংগ্রেসের সাহায্য প্রার্থনা করল। কংগ্রেস এখন বেঁকে দাঁড়াল। ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের সংঘর্ষ হল। আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হল। সেদিন সমস্ত দেশবাসী আত্মবলে বলীয়ান হয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—'করেংগে ইয়ে মরেংগে'। সরকার নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করলেন। বিক্ষুব্ধ দেশবাসী সংগ্রাম শুরু করল ইংরেজের বিরুদ্ধে। ওই সংগ্রামই 'আগস্ট বিপ্লব' নামে আখ্যাত। একে 'আগস্ট বিপ্লব' বলা হয়, এই কারণে যে, এই বিপ্লব শুরু হয়েছিল কলকাতায় পনেরো আগস্ট তারিখে। সেদিন জনতা 'করেংগে ইয়ে মরেংগে' ধ্বনি তুলে চতুর্দিকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে লাগল। পুলিস উত্তেজিত জনতার ওপর লাঠিচার্জ করে তাদের স্তব্ধ করবার

চেষ্টা করল। তাতে জনতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তখন পুলিস তাদের ওপর গুলি চালাতে লাগল। কিন্তু ফল উল্টো হল। টেলিফোন ও ট্রামের তার কাটা হল। ট্রাম পোড়ানো হল। চতুর্দিকে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হল। স্কুল, কলেজ ও ইউনিভারসিটি বন্ধ হয়ে গেল। সরকার নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করল। অনেকে অন্তরালে গিয়ে গা-ঢাকা দিল ও আসল কাজ শুরু করে দিল। বিক্ষোভ নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর, বগুড়া, মালদহ, নদীয়া, বরিশাল, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বর্ধমান, দিনাজপুর, দার্জিলিং সকল স্থানেই চলল জনসাধারণের উত্তেজনা ও পুলিসের অকথ্য অত্যাচার। সব জায়গাতেই সরকারী সম্পত্তির ওপর হামলা চলল। সরকারী ঘর-বাড়ি, রেলগাড়ি প্রভৃতি পোড়ানো হল। কোথায় কি ঘটছে, তার সঠিক খবর পেতাম আমাদের বাই-লেনের মোড়ে দেওয়ালে সাঁটা হাতে-লেখা সাইক্লোস্টাইল-করা সংবাদপত্র থেকে। রোজ সকালে উঠে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমার প্রথম কাজ ছিল ওই কাগজটা পড়া। রাত্রে ওখানা কারা লাগিয়ে দিয়ে যেত, জানতাম না। পরে জেনেছিলাম ওগুলো রাত্রে দেওয়ালে সেঁটে দিত রামমনোহর লোহিয়া, যে কুমারদার আড্ডার মধ্যে দিব্যি মিশে গিয়েছিল।

ওই দেওয়ালের সংবাদপত্রে পড়তে লাগলাম মেদিনীপুর থেকে প্রেরিত চাঞ্চল্যকর সংবাদ। সেখানেই ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করল। সতীশচন্দ্র সামন্তের অধিনায়কত্বে বিপ্লবীরা সেখানে প্রতিষ্ঠিত করল এক বিকল্প স্বাধীন সরকার। নিজস্ব ডাকঘর, থানা-পুলিস, কোর্ট-কাছারি সবই স্থাপিত হল। প্রায় দেড় বৎসর ইংরেজ শাসন সেখানে বিলুপ্ত হল। ইংরেজ চালাল অমানুষিক অত্যাচার ও ব্যাপক নারীধর্ষণ। পুলিসের গুলি অগ্রাহ্য করে অপূর্ব দেশপ্রেম ও সাহস দেখাল মাতঙ্গিনী হাজরা। সত্তর-বৎসর-বয়স্কা এই বীরাঙ্গনা মহিলা ললাটে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় জাতীয় পতাকা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে মৃত্যুবরণ করল।

১১১

২০ ডিসেম্বর ১৯৪২। জাপানী বিমান প্রথম কলকাতায় হানা দিল। চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত শান্ত রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে যখন তীব্র শব্দে সাইরেন বেজে উঠল, তখন শহরের অনেকেই শয়ন করেছিলেন এবং অনেকে শয্যাগ্রহণ করবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। সাইরেন বাজবার কিছুক্ষণ পরেই শোনা গেল জাপানী বিমানের গুড়গুড় শব্দ। এ মিত্রপক্ষীয় বিমানের পরিচিত শব্দ নয়। এ শব্দটার

মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তখন থেকেই লোক জাপানী বিমানের শব্দের সংগে পরিচিত হল। প্রথম দিন যখন বিমান-আক্রমণ হল, তখন সিনেমা হাউসগুলোতে চিত্র-প্রদর্শন চলছে। সাইরেন বাজামাত্রই চিত্র-প্রদর্শন বন্ধ হয়ে গেল এবং দর্শকরা লবীতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। রাস্তায় যে-সব ট্রাম চলছিল, সেগুলো সংগে সংগেই থেমে গেল, এবং যাত্রীরা অন্যান্য পথচারীদের সঙ্গে কাছাকাছি বাড়িতে আশ্রয় নিল। বিমানগুলো প্রায় আধঘণ্টা ধরে কলকাতার ওপর ঘুরতে লাগল। কলকাতা ও উপকণ্ঠে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটা বোমা ফেলল। আক্রমণকারী বিমানগুলোকে বাধা দেবার জন্য ব্রিটিশ পক্ষের জঙ্গী বিমানগুলো আকাশে টহল দিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন আকাশ-যুদ্ধ হল না। তারপর আক্রমণকারী বিমানগুলো চলে গেল। প্রথম দিনের বিমান-আক্রমণে জনসাধারণের মনোবল অটুট রইল, এবং পরদিন স্বাভাবিকভাবেই কাজকর্ম চলল।

কিন্তু তারপর বিমান-আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করল। কলকাতা শহরে ও উপকণ্ঠে বোমা পড়তে লাগল। যেদিন হাতিবাগানে বোমা পড়ল, সেদিন মনে হল যেন আমাদের বাগবাজারের বাড়ির দেওয়ালের পাশে বোমা পড়ছে। বোমার সে কি আওয়াজ! কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম হল।

লোকের মনোবল ভেঙে পড়ল। লক্ষ লক্ষ লোক কাতারে কাতারে গ্রান্ড ট্রাংক রোড দিয়ে পায়ে হেঁটে বাঙলার বাইরে যেতে শুরু করল। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। গ্রান্ড ট্রাংক রোডে এত ভিড় যে তিলার্ধ জায়গা রইল না। সকলেই চলেছে উত্তরমুখে। যাবার সময় অনেকে গরু-মোষ ইত্যাদি একটাকা দু'টাকা দামে বা বিনামূল্যে অপরকে দিয়ে গেল।

সকলেই যখন পালাচ্ছে, তাই দেখে আমার পরিবারের সকলের মনোবল ভেঙে পড়ল। তারাও পালাতে চায়। আমি নৌকাযোগে সকলকে চন্দননগরে আমার মাসীর বাড়ি রেখে এলাম। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, আমার মাসীর বাড়ির ছাদেও বোমার টুকরো এসে পড়েছে! তবুও কলকাতার তুলনায় সেটাকে বেশি নিরাপদ বলে মনে করলাম। কলকাতায় শুধু আমি ও আমার মা রয়ে গেলাম।

১১১

পরের বছর কলকাতায় আবার এক নিদারুণ দৃশ্য দেখলাম। কলকাতার রাজপথ মৃত ও মৃতকল্প লোকে ভরে গেল। মন্বন্তর এসেছে। গ্রামের হাজার হাজার নিঃস্ব ও বুভুক্ষু নরনারী সামান্য অন্নের প্রত্যাশায় রাজধানীতে ছুটে এল। কিন্তু রাজধানীতে খাদ্য কোথায়? চাউল দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়

রাজধানীর লোকই অর্ধ-অনশনে দিন কাটাচ্ছে। ফলে যারা অন্নের প্রত্যাশায় রাজধানীতে ছুটে এসেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই না খেতে পেয়ে রাজধানীর ফুটপাথের ওপরই তাদের শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল। কলকাতার হাসপাতালগুলো মৃতকল্প ব্যক্তিতে ভরে গেল। কিন্তু বহুদিন বুভুক্ষিত থাকায় তারা এমনভাবে পীড়িত হয়ে পড়েছিল যে তাদের বাঁচানো সম্ভবপর হল না। কলকাতার রাস্তাঘাটে অলিতে গলিতে বুভুক্ষু নরনারীর দল ভাঁড় হাতে 'মা, ফ্যান দাও' বলে চিৎকার করতে লাগল। সরকারী ও বে-সরকারী লংগরখানা খোলা হল তাদের খিচুড়ি খাওয়াবার জন্য। এরকম একটা লঙ্গরখানা আমাদের স্টক একসচেঞ্জও খুলল শিয়ালদহের অদূরে ২৬ নং ডিকসন লেনের বাড়িতে। আর আমরা বাগবাজারে এ-আর-পি ক্লাবের সদস্যরাও প্রতিদিন এক এক জন সদস্যের ব্যয়ে ২৫০ জন স্ত্রী-পুরুষকে ভাত-ডাল-তরকারি খাওয়াবার ব্যবস্থা করলাম। এর জন্য এক এক জন সদস্যের দু'শো টাকা করে খরচ হত। প্রায় দু' মাস ধরে এরকম অবস্থা চলল। এই দু'মাসের মধ্যে আমার পালা এল পাঁচ-সাত দিন। এই মন্বন্তরে বাঙলাদেশে কয়েক লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল।

৯ ৯ ৯

বহুক্ষেত্রে মা-বাপের মৃত্যু হওয়ায় বা অন্য কারণে মা-বাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসহায় শিশুরা কাঁদতে লাগল। এরকম একটা ছেলেকে আমি আমার বাড়িতে তুলে নিয়ে এলাম, এবং তাকে পুত্রবৎ পালন করতে লাগলাম। ছেলেটার নাম ছিল ট্যানা। প্রায় একবৎসর আমার তত্ত্বাবধানে থাকবার পর ছেলেটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। হঠাৎ একদিন ছেলেটা নিরুদ্দিষ্ট হল। হাসপাতাল ও থানায় থানায় খবর নিলাম। কোন হদিসই পাওয়া গেল না। তারপর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। বেতার মারফত ঘোষণা করালাম। কিছুতেই কিছু হল না। তারপর দু'বছর কেটে গেল। একদিন দেখি কোন এক পরবের দিন বাগবাজার স্ট্রীট ধরে ট্যানা চলেছে ওর মায়ের সংগে গংগাস্নান করবার জন্য।

৯ ৯ ৯

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের মন্বন্তরটা ছিল মানুষের সৃষ্ট। আগের বছরটা ছিল বাঙলাদেশের ইতিহাসে এক অত্যন্ত সুফলার বছর। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে মেদিনীপুরে ধান বিক্রি হয়েছিল মাত্র চোদ্দ-আনা মণ। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের

৮ মার্চ তারিখে রেংগুন শহরের পতনের পর, ইংরেজ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে, এদেশে মার্কিন সৈন্যবাহিনীকে ডেকে আনলেন। এক বিরাট মার্কিন সৈন্যবাহিনী এদেশে এল, তাদের খাওয়াবার জন্য সরকার ব্যস্ত হলেন চাউল-সংগ্রহে। চাউল-সংগ্রহের ভার দেওয়া হল মুখ্যমন্ত্রী সুরাবার্দি কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত ইসপাহানি কোম্পানির ওপর। দেশের যেখানে যত চাউল ছিল, ইসপাহানি কোম্পানি সব কিনে নিয়ে চাউল 'কর্নার' করল। ফলে ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের বর্ষাকালে চাউলের দাম গগনস্পর্শী হল। এ সময় খোলা বাজারে চাউলের মূল্যের ক্রমিক উর্ধ্বগতিটা খুবই বিস্ময়কর। সরু ফাইন চামরমণি চাউল, যা বরাবর মধ্যবিত্ত সমাজের প্রধান খাদ্য ছিল, তার দাম ছিল সাড়ে তিনটাকা মণ বা খুচরা ছ'পয়সা সের। জুন মাসের গোড়ার দিকে একদিন দাম একলাফে সাড়ে চারটাকা হল। দু'দিন পরে দাম সাড়ে ছ'টাকা, এক সপ্তাহ পরে বারো টাকা, তারপর আঠারো টাকা, আটাশ টাকা, আটত্রিশ টাকা। কয়েক সপ্তাহ পরে দাম গিয়ে পৌছাল ৫৬ টাকা। আমাদের যৌথ সংসার। চালের প্রয়োজন খুবই বেশি। মা বললেন, কোথাও থেকে চাল সংগ্রহ কর। আমার বন্ধু হুগলি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ধীরেন মুখার্জিকে ধরে ও'দের হাটখোলার গুদাম থেকে বারো বস্তা চাল সংগ্রহ করলাম প্রতি মণ ৫৬ টাকা দরে। আর এক বন্ধু ব্যবসায়ী মানিক দাসকে ধরে এক বস্তা চিনি সংগ্রহ করলাম প্রতিবেশিদের ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বণ্টনের জন্য। যে চিনিটা মানিক দাস দিল, তার সবটাই জলে ভেজা। কিন্তু তখন চিনির এমনই আকাল যে সকলে পয়সা দিয়ে সেই চিনিই কিনে নিয়ে গেল। সব জিনিষেরই আকাল, সব জিনিষই দুষ্প্রাপ্য। এই মন্বন্তর সম্বন্ধে মাইকেল এডওয়ার্ডস তাঁর 'দি লাস্ট ইয়ারস অভ্ ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া' সংজ্ঞক বইয়ের ১২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—'It was authoritatively rumoured that Suhrawardy had made a handsome profit out of the sufferings of his fellow countrymen.'

১১১

জিনিসপত্তর যে মাত্র দুষ্প্রাপ্য হল তা নয়, অতি দ্রুত মূল্যবৃদ্ধিও ঘটল। সরকার প্রথমে মূল্য-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে সফল না হওয়ায়, ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে রেশনিং প্রথা চালু করলেন।

আগের অনুচ্ছেদে যে-সব কথা বলেছি, তা থেকে পাঠকের মনে একটা ভুল ধারণা হবে যে ওই আকালের সময় আমি খুব সুখেই ছিলাম। কিন্তু তা নয়।

আমার ছেলেদের এ-সময় ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। ওদের সকলকেই সব জিনিসপত্তর, লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়ে মাথাপিছু সামান্য পরিমাণে কিনতে হত। ভোর চারটের সময় থেকেই লাইন পড়ে যেত। সেজন্য ওদের মা ওদের ভোর চারটের আগেই ঘুম থেকে তুলে দিত। কেননা, যারা লাইনের শেষে দাঁড়াত, তারা সেদিন আর কোন জিনিসই পেত না।

আমার চার ছেলেই লাইনে গিয়ে দাঁড়াত। বড়ছেলে লক্ষ্মী, মেজছেলে বুয়া, সেজছেলে কালু ও ছোটছেলে ভুতো। ভুতোর তখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স। কিন্তু পাঁচ বছরের শিশু হলে কি হবে, লাইনে দাঁড়াবার জন্য ভুতোরই ছিল সব-চেয়ে বেশী উৎসাহ। ছেলেমানুষ বলে, ওর বড়দা বলত, ভুতো, তুই আমাদের সামনে দাঁড়া। ভুতো বলত, না, আমি তোমাদের সকলের পেছনে দাঁড়াব, কোন্ ব্যাটা আমাকে হটায় দেখি। ভুতো খুব সাহসী ও জেদী ছেলে ছিল। ছেলে-বেলায় ও এমন দুরন্ত ছিল যে আমার স্ত্রী দোতলার বারান্দার রেলিং-এর সঙ্গে ওর পা বেঁধে রেখে, নিজে সংসারের কাজকর্ম করত।

আমার ছেলেদের একবার চালের লাইনে দাঁড়িয়ে, পরে আবার আলুর লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হত। এইভাবে অনেকদিন ওদের একটা লাইনের পর আর একটা লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। তারপর ওদের কষ্ট দেখে, আমার মা যখন আমাকে চাল সংগ্রহ করতে বললেন, তখন আমি ধীরেন মুখুজ্যের সহায়তায় গোপনে বারো বস্তা চাল কিনলাম। তখন থেকে আমার ছেলেদের আর চালের লাইনে দাঁড়াতে হত না। তবে আলুর লাইন, চিনির লাইন প্রভৃতিতে দাঁড়াতে হত।

রেশনিং চালু হবার পর কষ্ট আমাদের বেড়েই চলল। চাল, চিনি, গম কোনটাই মানুষ পেট ভরে খেতে পারে সে পরিমাণ দেওয়া হত না। অবশ্য এখনও দেওয়া হয় না। সেজন্য গ্রামের মেয়েরা গোপনে শহরে যে চাল নিয়ে আসে, শহরের লোকরা তাদের প্রয়োজনীয় চাল, তাদের কাছ থেকে কিনে নেয়। কিন্তু লড়াইয়ের সময় গোরা পল্টনের ভয়ে গ্রামের মেয়েরা শহরে আসত না। ফলে, লোককে অর্ধাশনেই থাকতে হত। আর যারা পারত তারা নিজেরা গিয়ে নিকটস্থ গ্রাম (যেমন নিমতা, বিরাটি ইত্যাদি) থেকে ঝুঁকি নিয়ে এবং গোপনে চাল কিনে আনত। ঝুঁকি নিয়ে ও গোপনে, এজন্য বলছি যে প্রকাশ্যভাবে আনলে পুলিসের লোকরা তা কেড়ে নিত।

সকলের চেয়ে বেশী মুশকিল হয়েছিল কাপড়ের রেশনিং হওয়ায়। রেশনিং কুপন দিয়ে সারা বৎসরে মোট পাওয়া যেত মাথাপিছু মাত্র পাঁচ গজ কাপড়। মেয়েদেরই সবচেয়ে বেশী কষ্ট হত। একখানা শাড়ির মাপই তো পাঁচ গজ। সারা

বৎসর সেই একখানা শাড়িতেই কাটাতে হত। সায়া ব্লাউজ তো শিকেয় উঠে গেল। পুরুষদের অবস্থাও তথৈবচ। একখানা ধুতি পরে সারা বৎসর চালায় কি করে? সে-সময় থেকেই লোক লুংগি ও প্যান্ট পরা শুরু করল। তারপর আমাদের মতো লোক যাদের অফিসে স্যুট পরে যেতে হত, তাদের দুর্দশার আর অন্ত রইল না। গ্রীষ্মকালের স্যুটের পরই, শীতকালের স্যুটের বালাই ছিল। এ সময় থেকেই লোক কোট ও 'ওয়েস্ট-কোট' পরা ছেড়ে দিল। সাধারণ ফুল-শার্টের পরিবর্তে হাওয়াই শার্ট পরতে লাগল। কিন্তু তা হলেও এসব বানাবার কাপড় কোথায়? পুরাতন প্যান্ট-শার্ট 'রিপু' করিয়েই অফিসে যেতে লাগলাম। একদিন আমার স্টক একসচেঞ্জের মেম্বর লেব্র সাহেব আমার রিপু-করা শার্ট দেখে আমাকে বলল, মিস্টার সুর, আমার স্টকে কিছু আগেকার কেনা সিল্কের শার্টিং আছে, আমি কাল তোমাকে দশ গজ কাপড় এনে দেব, এক টাকা বারো আনা করে প্রতি গজের দাম পড়বে। আমি সাহেবকে অশেষ ধন্যবাদ জানালাম। তার পরের দিনই সাহেব আমাকে দশ গজ সিল্কের শার্টিং এনে দিল।



কিন্তু মুশকিলে পড়ল আমার স্টক একসচেঞ্জ, কাগজের রেশনিং নিয়ে। সরকার 'পেপার কনট্রোল অর্ডার' জারি করে বলল যে ইয়ার-বুক-জাতীয় গ্রন্থ আর প্রতি-বৎসর বের করা চলবে না, মাত্র তিন বছর অন্তর একবার বের করতে হবে।

এই অর্ডার জারি হওয়ার ফলে স্টক একসচেঞ্জ খুব বিপাকে পড়ল। তিন বছরের পুরোনো খবর শেয়ার-বাজারের দালালদের কাছে মিশরের 'মমি'র মতো। সে খবর তাদের কোন কাজেই লাগবে না। সুতরাং কাজের বই হিসাবে ইয়ার-বুকের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হলে, বইখানা প্রতিবৎসরই বের করতে হবে। অর্ডারটা প্রবর্তিত হয়েছে 'ডিফেনস অভ ইন্ডিয়া রুলস' অনুযায়ী। সুতরাং এ অর্ডার পরিবর্তন করানো শিবের অসাধ্য। এসব জেনেও স্টক একসচেঞ্জ কমিটি আমার সংগ্রামী মেজাজের ওপর নির্ভর করে বসল। বলল, সুরসাহেব দিল্লী গিয়ে ভারত সরকারের সংগে লড়াই করে, ইয়ার-বুক যাতে প্রতিবৎসর বেরোয়, সে সম্বন্ধে 'অর্ডার' করিয়ে নিয়ে আসুক। এক কথায়, ওঁরা আমার ওপর এক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার চাপিয়ে দিলেন। খুব দ্বিধাগ্রস্ত মনে দিল্লী যাত্রা করলাম।

আগেই বলেছি, ১৯৪৪ সালে দিল্লী গিয়ে নটরাজনের ওখানেই উঠেছিলাম। নটরাজন ও নটরাজনের বউ আমাকে পেয়ে খুব খুশী। কিন্তু আমার দিল্লীতে

উপস্থিতির কারণ শুনে, আমাকে খুব দমিয়ে দিল। বলল, পেপার কনট্রোলার একজন পারসি। তিনি অত্যন্ত কড়া লোক। এই ক'দিন আগে বোম্বাইয়ের বেনেট কোলম্যানের তরফ থেকে একজন সাহেব এসেছিলেন টাইমস্ অভ্ ইন্ডিয়া ইয়ার-বুকের জন্য। ক'দিন ঘোরাঘুরি করে ফিরে গেছেন, কোন অনুমতি পাননি। তবে তোমার কথা স্বতন্ত্র। তুমি তো বরাবরই ফন্দিবাজ। দ্যাখ, তুমি যদি লোকটাকে কাৎ করতে পার। আমি নটাকে (আমি নটরাজনকে 'নটা' বলেই ডাকতুম) বললুম, ভাই, অনুমতি তো আমাকে কোনরকমে করিয়ে নিয়ে যেতে হবেই, তা না হলে স্টক একস্‌চেঞ্জ কমিটির কাছে আমার মান-ইজ্জত কিছুই থাকবে না। নটরাজনের বউ বলল, তুমি আমাকে একমাসের মধ্যে ইংরেজি শিখিয়ে যে অসাধ্য সাধন করেছ, তাতে আমার বিশ্বাস তুমি ওই অফিসারকে ঠিক কাৎ করতে সক্ষম হবে।

এরকম জল্পনা-কল্পনা করেই দু'তিন ঘণ্টা কাটল। তারপর নটরাজনের বউ বলল, নাও এবার খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়, তোমাকে তো কাল সকালেই কুরুক্ষেত্রের রণাংগনে অবতীর্ণ হতে হবে! 'বউ' এরকম কৌতুক করতেই সব সময় ভালবাসত।

১১১

দিল্লীর সেক্রেটারিয়েট বিলডিং-এ আমার এই প্রথম আবির্ভাব। বাড়িটা যে একটা গোলকধাঁধা তা আমার আগে কোন ধারণা ছিল না। রিসেপশন অফিসারকে বললাম, আমি ক্যালকাটা স্টক একস্‌চেঞ্জ থেকে আসছি, পেপার কনট্রোলারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। রিসেপশন অফিসার এক বাইশ-চব্বিশ বছরের ছোকরা। আমার সংগে ভালই ব্যবহার করল। আমাকে বসে অপেক্ষা করতে বলল। আমি বসে বসে দেখতে লাগলাম, রিসেপশন অফিসার টেলিফোন রিসিভারটা তুলে পেপার কনট্রোলারের সংগে অনেকক্ষণ ধরে বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে (উর্দুতে) ধ্বস্তাধ্বস্তি করে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা করানোর অনুমতি পেল। তখন আমাকে ডেকে বলল, আপনি এই চাপরাশির সংগে চলে যান। তারপর নিজের মনেই গজরাতে লাগল, কলকাতা থেকে এতদূরে একজন লোক এসেছে, উনি তার সংগে দেখা করবেন না! চাপরাশি আমাকে দোতলায় কোথা দিয়ে যে কোথায় নিয়ে গেল, তা আমার মতো লোকও বুদ্ধিহত হয়ে গেল।

পেপার কনট্রোলার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি চাই? আমি আমার কাজের কথা বললাম। উনি আমাকে বললেন, ডিফেনস্ অভ্ ইন্ডিয়া রুলের কোন অর্ডার নাকচ করবার ওঁর কোন ক্ষমতা বা অধিকার নেই।

আমি বললাম, যেরকম করে হোক আপনাকে একটা অনুমতি দিতেই হবে, তা না হলে আমার চাকরি থাকবে না।

উনি আমাকে বললেন, যেটা আমার ক্ষমতার বাইরে, সেটা আমি কি করে করি বলুন? তাতে আপনার চাকরি থাকুক, আর নাই থাকুক।

তারপর লোকটি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, চা খাবেন? আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, কিন্তু কাজটা আপনাকে করে দিতেই হবে।

আমি চা-পানের পর উঠে পড়লাম। আসবার সময় শুধু বলে এলাম, আগামী কাল আমি আবার আসছি, আপনি দয়া করে আপনার সংগে দেখা করবার অনুমতি দেবেন।

১১১

বাড়ি ফিরতে নটরাজনের বউ আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝে নিল যে প্রথম 'রাউন্ড' যুদ্ধে আমি পরাহত। তবুও মুখ টিপে হাসতে হাসতে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কি হল? আমি উত্তর দিলাম, 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্', আজ আমি লোকটার প্রকৃতিটা বুঝে নিয়েছি, আমি কাজ হাসিল করে তবে কলকাতায় ফিরব।

হাসতে হাসতে নটরাজনের বউ বলল, বোধ হয় আমাকে আঘ্রাণ করে করে তোমার ধারণা হয়ে গেছে যে সকলকেই তুমি মাত্র আঘ্রাণ করে তার মনের গতি-প্রকৃতিটা বুঝতে পার।

—তা নয়। আমি বুঝে নিয়েছি যে লোকটা আমার প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ নয়। যদি সম্পূর্ণ বিরূপ হত, তাহলে আমাকে চা খেতে বলত না, বা আগামী কাল ও'র সংগে দেখা করবার অনুমতি দিত না।

নটরাজনের বউ বলল, তোমাকে তো আমি চিনি. তুমি লোক পটাতে ওস্তাদ, বুঝতে পারছি তুমি লোকটাকে পটিয়ে এসেছ। আচ্ছা বল তো, কি করে তুমি লোককে পটাও?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তুমি তো নিজেই পটেছ। তুমি তো নিজেই বিলক্ষণ জান, কি করে আমি লোককে পটাই।

সমস্ত রাত্রি আর ঘুম হল না। ভাবতে লাগলাম, আগামী কাল পেপার কনট্রোলারকে গিয়ে কি বলব! একটা 'আইডিয়া' মাথায় এসে গেল। সেটা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরের দিকে একটা স্বপ্ন দেখলাম, আমার 'আইডিয়া'টা সফল হয়েছে, কনট্রোলার আমাকে 'পারমিট' দিয়েছে।

সকালবেলা নটরাজনের বউকে বললাম, আজ তুমি তোমার গৃহদেবতার কাছে

প্রার্থনা কর, আমার স্বপ্ন যেন সফল হয়। ও জানতে চাইল, স্বপ্নটা কি? আমি বললাম, সে আমি তোমাকে পরে বলব।

পরদিন কনট্রোলারের সামনে উপস্থিত হতেই, উনি বললেন, বলুন আপনার আর কি বলবার আছে। আমি বললাম, আচ্ছা তিন বছর পর আপনারা আমার ইয়ার-বুক ছাপাবার জন্য পুরো কাগজ দেবেন তো?

—হ্যাঁ, আপনি পুরো কাগজই পাবেন।

—তবে, একটা কাজ করুন না, আমাকে ওই কাগজটা তিন ভাগ করে, প্রতি-বছর এক এক ভাগ দিন না।

—সেটা সম্ভবপর হবে কিনা, তা আমাকে আন্ডার সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

—তা, আপনি একটু দয়া করে জিজ্ঞাসা করুন না!

উনি উঠে চলে গেলেন। মিনিট পনেরো পর ঘুরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আপনাদের ইয়ার-বুকে কত পাতা বিজ্ঞাপন থাকে? আমি বললাম, ৪৫ পাতা। তখন উনি বললেন, যদি প্রতিবৎসর আপনারা মাত্র ১৫ পাতা বিজ্ঞাপন ছাপেন, তাহলে আপনার প্রস্তাবমতো আপনাকে 'পারমিট' দিতে পারি। আমি বললাম, আমরা রাজী আছি, আপনি তাই দিন। উনি বললেন, তাহলে কাল এসে আপনি 'পারমিট' নিয়ে যাবেন।

আমি ওঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে চলে আসছিলাম, উনি বললেন, বসুন, একটু চা খেয়ে যান।

আমি আবার বসে পড়লাম। উনি তখন বলতে লাগলেন, দেখুন আপনাকেই আমরা প্রথম 'পারমিট' দিলাম। আপনার কথা বলবার একটা ঢঙ আছে, সেই ঢঙে অভিভূত হয়েই আমি আপনার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলাম। এযাবৎকাল আপনার মতো চালাক লোকের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়নি।

আমি তখন ওঁর সংগে গল্প করতে শুরু করলাম। বললাম, ইওরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট স্যার চ্যাপমান-মর্টিমার বলতেন, ক্লাইভ স্ট্রীটে মাত্র চারজন চালাক লোক আছে। তাদের মধ্যে তিনি আমার নাম করতেন। শুনে, উনি বললেন, 'হি ওয়াজ ডেড্ রাইট।'

৯৯৯

বাড়ি ফিরতেই নটরাজনের বউ জিজ্ঞাসা করল, কি হল? আমি বললাম, তোমার ঠাকুর তোমার কথা শুনেছে। ও বলল, কি রকম? আমি বললাম, তুমি তো

সকালে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলে আমি যাতে 'পারমিট'টা পাই। ও বলল, তুমি ঠিক উল্টোটা বললে, আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, তোমার দর্প যাতে চূর্ণ হয়। আমি বললাম, সে আমি জানি, তুমি কি প্রার্থনা করেছিলে। শুনে ও হো হো করে হাসতে লাগল।

পরদিন আমি কনট্রোলারের কাছে গিয়ে 'পারমিট'টা নিয়ে এলাম।

রাত্রে স্যুটকেসে কাপড়-জামা তুলছি, নটরাজনের বউ এসে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে তুমি কি কালই চলে যাচ্ছ? বললাম, হ্যাঁ। স্টক একস্চেঞ্জ কমিটি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

পরদিন সকাল থেকেই দেখলাম, ওর চোখটা ছলছল করছে। যখন টাঙ্গায় উঠলাম, তখন ও কেঁদেই ফেলল। টাঙ্গা থেকে নেমে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে, ওকে শান্ত করে আমি আবার টাঙ্গায় উঠলাম।

স্টক একস্চেঞ্জ কমিটি আমার সাফল্যে খুব উৎফুল্ল হল। একজন মেম্বর বলল, কিন্তু পনেরো পাতা বিজ্ঞাপনে আমাদের আয় তো অনেক কমে যাবে। আমি বললাম, মোটেই না, এবার আমরা বিজ্ঞাপনের জন্য তিনগুণ হারে Luxury rate নেব। সকলে হেসে উঠে বলল, সাবাস! সাবাস!

সে-বছর ইয়ার বুকের কাজটার জন্য আমাকে অসাধারণ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। বন্ধু টেকচাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে এক typographical miracle দ্বারা ইয়ার-বুকে আগের বছরে যে-সব তথ্য ছিল, সবই এক-তৃতীয়াংশ space-এর মধ্যেই দিয়ে দিলাম। বইয়ের দাম একই রইল। বিজ্ঞাপন থেকে সমান আয় হল। কাগজ ও ছাপার খরচ কমে যাওয়ায় স্টক একস্চেঞ্জের সেবার ভাল লাভই হল।

১১১

দিল্লী থেকে ফেরবার পরই আমার কলকাতার বাড়িতে ঘটল এক দুর্ঘটনা। আমার মেয়ে সুষমার বয়স তখন দু'বছরও হয়নি। পুজোর কিছু পূর্বে সে ঠাকুরদালানের ওপর খেলা করছিল। ঠাকুরদালানের নীচে উঠানে লোহার কড়ায় কি একটা সিদ্ধ হচ্ছিল। খেলা করতে করতে সুষমা হঠাৎ ঠাকুরদালান থেকে সেই কড়ার মধ্যে পড়ে গেল। আমার স্ত্রী নিকটেই ছিল। আমার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে তুলে ফেলল। কিন্তু সুষমার সমস্ত শরীরটা এক বিরাট ফোসকায় পরিণত হল। সুষমার চেহারা পাঁচ-সাত বছরের মেয়ের মতো দেখতে হয়ে গেল। আমি তখন বাড়ি ছিলাম না। আমি খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে এসে সুষমার

অবস্থা দেখে কাঁদতে শুরু করে দিলাম। ছেলেপুলেদের কারুর অসুখ-বিসুখ করলে আমি খুবই অস্থির হয়ে পড়তাম। সেদিক থেকে আমার স্ত্রী ছিল খুব শক্ত। আমার স্ত্রী আমাকে ডাক্তার ডাকতে বলল। আমি আমার বন্ধু শর্মা ডাক্তারকে (ডাঃ জ্যোতির্ময় শর্মা) ডেকে নিয়ে এলাম। শর্মা ডাক্তার যে শুধু নিষ্ঠার সঙ্গে চিকিৎসা করতেন, মাত্র তা নয়। গরীব লোকদের কাছ থেকে তিনি ভিজিট পর্যন্ত নিতেন না এবং অনেকসময় তাদের বিনামূল্যে ওষুধ পর্যন্ত দিতেন।

শর্মা ডাক্তার এসে অতি যত্নসহকারে সুষমার শরীরের সমস্ত ফোসকা ছাড়িয়ে দিল। মাংসের দোকানে ঝুলানো পাঁঠা যেরূপ দেখায়, সুষমার শরীরটা সেরূপ হয়ে গেল। তাই দেখে আমি তো আকুল হয়ে পড়লাম। শর্মা ডাক্তার আমাকে প্রবোধ দিল। বলল, আপনি ভাববেন না, ও শীগ্গির ভাল হয়ে যাবে।

আমি বললাম, দেখুন ডাক্তারবাবু, আমার কালো মেয়ে, আপনি এমনভাবে চিকিৎসা করুন, যেন গায়ের কোন জায়গায় পোড়া দাগ না থাকে। আর একটা কথা, পনেরো দিন পরে বাড়িতে দুর্গাপুজো। আমার মেয়ে যাতে পুজোর পূর্বেই নিরাময় হয়ে যায়, আপনাকে সেটা করতে হবে।

শর্মা ডাক্তার রোজই আসত এবং নিজের হাতে ব্যাণ্ডেজ খুলে ওষুধ লাগিয়ে দিয়ে যেত। অন্য কাউকেই সুষমার গায়ে হাত দিতে দিত না। বলত, হাত দিলেই সেপ্টিক ঘা হয়ে যাবে এবং পরে পোড়া দাগ থেকে যাবে।

শর্মা ডাক্তারের এমনি হাতযশ যে পুজোর পূর্বেই সুষমা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেল ও পরে সুষমার গায়ে পোড়ার চিহ্নমাত্র রইল না।



নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর 'তরুণের স্বপ্ন' বইয়ে (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১২) বলেছেন, 'কুটীর-শিল্প যদি চালাইতে চান, তবে একটা কাজ করা দরকার। একটি উপযুক্ত যুবককে কাসিমবাজার polytechnic অথবা ওইজাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানে কিছু কাজ শিখাইয়া লইতে হইবে।' নেতাজী যে 'পলিটেকনিক'-এর কথা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে 'কাসিমবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিট্যুট'। এটা বাগবাজারে অবস্থিত, এবং কাসিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অনুদানে প্রতিষ্ঠিত। পলিটেকনিক ইনস্টিট্যুট বিলাতের শিক্ষাপদ্ধতির একটা প্রধান অঙ্গ। কিন্তু ভারতে পলিটেকনিক ইনস্টিট্যুট বাগবাজারেই প্রথম স্থাপিত হয়েছিল। এটার পরিকল্পনার জনক ছিলেন ক্যাপটেন পেটাভেল নামে এক সাহেব। কিন্তু

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থানুকূল্য না থাকলে এটা কোনদিনই রূপায়িত হত না।

ঌঌঌ

মাত্র কাসিমবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিট্যুটই যে কাশিমবাজার এস্টেট গড়ে তুলেছিল, তা নয়। বাঙলাদেশের বহু বিদ্যায়তনেই কাসিমবাজার এস্টেটের অনুদান ছিল। এসব অনুদানের সূচনা মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মশাইয়ের আমলেই ঘটেছিল। যে-সব বিদ্যায়তনে কাসিমবাজার এস্টেটের অনুদান ছিল, সে-সব বিদ্যায়তনের কমিটিতে কাসিমবাজার এস্টেটের মনোনীত কোন ব্যক্তি থাকতেন। তিরিশের দশকে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র আমাকে গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্বেদিক কলেজের কমিটিতে মনোনয়ন করেন। সেই সময় থেকেই কাসিমবাজার এস্টেটের সংগে আমার সম্পর্ক। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের পুত্র শ্রীশচন্দ্রের আমলে এ সম্পর্ক বিশেষ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

ঌঌঌ

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের দানশীলতা বাঙলাদেশে এক প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়েছিল। আজ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে যে জমিটার ওপর 'বংগীয় সাহিত্য পরিষদ' নির্মিত, ওটা মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রেরই দান। তাঁর দানশীলতার সুযোগ নিয়ে অনেকেই তাঁকে প্রতারিত করত। কিন্তু তিনি এমনই ভালমানুষ ছিলেন যে একবার প্রতারিত হয়েছেন জেনেও সেই লোককে পুনরায় দান করতেন। একবার একটা ঘটনা আমার সামনেই ঘটেছিল। সে ঘটনাটাই আমি এখানে বিবৃত করছি। একজন লোক একটা চিনির কল স্থাপন করবে বলে ওঁর কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা অনুদান নিয়ে যায়। পরে ওই লোকটার আবার আবির্ভাব ঘটল। আমি তখন মহারাজার সামনে বসে। লোকটাকে মহারাজা দূর থেকে দেখে, আমাকে বললেন, লোকটা একবার আমার কাছে মিছে কথা বলে বিশ হাজার টাকা নিয়ে গিয়েছিল, আবার বোধ হয় কিছু টাকার প্রত্যাশায় এসেছে। লোকটা ওঁর সান্নিধ্যে আসা-মাত্রই উনি ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি গো, তোমার চিনির কলের কি হল ? লোকটা নির্বিকারভাবে বলল, হুজুর, বিশ হাজার টাকায় ওটা সম্পূর্ণ করতে পারিনি, আরও কিছু টাকার প্রয়োজন। মহারাজা বললেন, সে তো আমি আগেই জানতাম, তা আর বিশ হাজার টাকা নিয়ে গিয়ে চিনির কলটাকে এখন চালু কর। এই

বলে, উনি লোকটাকে আরও বিশ হাজার টাকা দিলেন।

ऽऽऽ

রোজই সকালে তিনি এক বাক্স টাকা নিয়ে বসতেন। বাক্সের টাকা নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত স্নানাহার করতেন না। অত্যন্ত দয়ালু লোক ছিলেন। আর একদিনের কথা বলি। বাড়ির ভেতরে উঠল এক তুমুল গোলমাল। মনে হল কতকগুলো লোক একটা লোককে ধরে মারছে, আর সে লোকটা বলছে, আমাকে আর মারবেন না, আমি এ-কর্ম আর করব না। মহারাজা শশব্যস্ত হয়ে ওদের ডেকে পাঠালেন। বাড়ির সরকার-গোমস্তা সকলে বাড়ির একটা চাকরকে ধরে নিয়ে এল। বলল, হুজুর, একে রোজ খাবার কিনতে পাঠানো হয়, ও রাস্তায় রসগোল্লার রসটা চুষে খেয়ে সেই এঁটো রসগোল্লা বাড়িতে নিয়ে আসে। চাকরটা তখনও কাঁদছে। মহারাজা চাকরটাকে বললেন, বাবা, ও জিনিস আর করিসনি, ওতে পাপ হয়। আর সরকার মশাইকে বললেন, বুঝলেন না, ওর রসগোল্লা খাবার সাধ হয়েছে, তা আজ থেকে ওর রোজ আট আনা করে রসগোল্লার বরাদ্দ করে দেবেন। মহারাজার বিচারে সকলে তো স্তম্ভিত। চাকরটা পর্যন্ত!

এভাবে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী দু'হাতে ধন বিলিয়ে গেছেন। ও'র মৃত্যুর পর দেখা গেল যে সমস্ত কাসিমবাজার এস্টেটটাই দেনার দায়ে ডুবে গেছে। ও'র পুত্র মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর অক্ষয় কীর্তি যে তিনি পিতৃঋণ শেষ কপর্দক পর্যন্ত পরিশোধ করেছিলেন। তবে ও'র বাড়ির ভেতরকার বসবার ঘরে একটা সাইনবোর্ড ঝুলানো ছিল : 'টাকা ধার চাহিয়া আমাকে লজ্জায় ফেলিবেন না।'

ऽऽऽ

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয় ছিল ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে, ওঁদের মাইনিং ব্যবসায়সূত্রে। কিন্তু কাসিমবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটুটের সেক্রেটারী হবার পর থেকে ও'র সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এমনকি ও'র পারিবারিক দুর্যোগ ও ঝঞ্ঝাটসমূহের বিষয় নিয়ে উনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন। ও'র মৃত্যুকাল পর্যন্ত ও'র সঙ্গে আমার এই সম্পর্ক ছিল। সেজন্য ও'র মৃত্যুর পর আমি কাসিমবাজার এস্টেটের মনোনয়ন আর নিইনি। আমি স্কুলই ছেড়ে দিয়েছিলাম।

১১১

আমি যে ক'বছর কাসিমবাজার স্কুলের সেক্রেটারী ছিলাম, সে ক'বছর আপ্রাণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করেছি স্কুলটার উন্নতির জন্য : কিন্তু স্কুলটার সমস্যার অন্ত ছিল না। সেজন্য সরকারী মহলে ওই স্কুলটা 'The Problem School of Bengal' নামে অভিহিত হত। আমি যখন প্রথম সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়ে স্কুলটার ভার গ্রহণ করলাম, তখন স্কুলটা পতনের সম্মুখীন। অথচ মাত্র কয়েকবছর আগে এই স্কুলের ছাত্র যতীন রুদ্র (বাঙলা সরকারের 'ট্র্যানস্লেটর' মন্মথ রুদ্র মশাইয়ের ছেলে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন একজন দক্ষ শিক্ষাবিদ ললিতমোহন ভট্টাচার্য। ললিতবাবু ছিলেন নিয়মানুবর্তিতার এক সচল প্রতীক। সেজন্য তিনি যতদিন প্রধান শিক্ষক ছিলেন, ততদিন স্কুল সুষ্ঠুভাবেই পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অবসরগ্রহণের পর, স্কুলটা শিক্ষকমহলের কূটনীতির শিকার হয়ে দাঁড়ায়। আমি যখন স্কুলের সেক্রেটারী হলাম, তখন গিয়ে দেখলাম যে গুপ্তবাবু নামে এক শিক্ষক একটা দল পাকিয়ে স্কুলের বিরুদ্ধে এক কুৎসিত 'প্রপাগাণ্ডা' চালাচ্ছে। কাসিমবাজার স্কুলের গর্ব ছিল ওর 'টেকনিক্যাল' প্রশিক্ষণ-বিভাগ যা নেতাজী সুভাষেরও বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। বস্তুত বাঙলাদেশে কাসিমবাজার স্কুলই ছিল একমাত্র স্কুল যেখানে সাধারণ শিক্ষাগ্রহণের সংগে 'টেকনিক্যাল' বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল।

কাসিমবাজার স্কুলের এই অভিনব শিক্ষাপদ্ধতির সূচনা হয়েছিল, আমি সেক্রেটারী হবার প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে। আগেই বলেছি যে এই অভিনব শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন একজন সাহেব, নাম ক্যাপটেন পেটাভেল। তিনিই উদ্বুদ্ধ করেছিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাগবাজারে এই স্কুল স্থাপন করতে। ক্যাপটেন পেটাভেল ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত রয়েল ইঞ্জিনিয়ার (R.E.)। স্কুলটা স্থাপিত হয়েছিল নন্দলাল বসু লেনের একটা ভাড়া বাড়িতে। সেই বাড়িটাতেই পরবর্তীকালে বাস করতেন নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। ওই বাড়িটার সংলগ্ন ছিল কলিকাতা করপোরেশনের এক বিরাট মাঠ এবং ওরা তার এক কোণে করোগেটেড টিনের একটা আদর্শ গোশালা (মডেল কাউশেড্) স্থাপন করেছিল। তারপর সেটা উঠে গিয়েছিল। শুধু পড়ে ছিল তার মাঠটা ও গোশালার টিনের ছাউনিটা। ওই টিনের ছাউনিটাতেই ছিল কাসিমবাজার স্কুলের 'টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট'।

ভাড়া-করা যে বাড়িটাতে মূল স্কুলটা স্থাপিত হল, তারই ওপরতলায় ক্যাপটেন পেটাভেল নিজে বাস করতেন। তাঁর সেবা করত, তাঁর এক পালিতা কন্যা, নাম মিস ম্যাথিয়ুস। পেটাভেল সাহেব ছিলেন স্কুলের অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপাল। আর ম্যাথিয়ুস নীচের ক্লাসের ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা দিত। তখন ও‍ঁদের কারো সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু পরে অবসরগ্রহণের পর পেটাভেল সাহেব যখন পুণায় চলে গিয়েছিলেন, তখন ও‍ঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপ হত। কেননা ক্যাপটেন পেটাভেলই ছিলেন 'ব্রেড্ অ্যান্ড ফ্রীডম' পত্রিকার ঘোষিত সম্পাদক, যার সম্পাদনার কাজ কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইয়ের অফিসে আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছিল।

ক্যাপটেন পেটাভেলের শিক্ষার আদর্শ মহাত্মা গান্ধী অবলম্বন করেছিলেন যখন তিনি তাঁর ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেন।

'ব্রেড্ অ্যান্ড ফ্রীডম্' সম্পাদনার সময় আমি আর একজন সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, তাঁর নাম স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন। তিনি সুন্দরবনের গোসাবা অঞ্চলে স্থাপন করেছিলেন এক আদর্শ খামার। সেখানে গো-পালন থেকে মুরগী-পালন পর্যন্ত খামার সম্পর্কিত সব কিছু ব্যাপারই ছিল, এবং সে সম্বন্ধে প্রশিক্ষণও দেওয়া হত। আর কাসিমবাজার স্কুলে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং থেকে শুরু করে 'কারপেনট্রি' ও বেত-বোনার কাজ শেখানো হত। বস্তুত সে-যুগে যখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙালীর ছেলেকে গোলামী পরিহার করে ব্যবসায়ে মন দেবার জন্য চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছিলেন, তখন ক্যাপটেন পেটাভেল ও স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের মতো ভারতপ্রেমিক দরদী সাহেবরাই নতুন বাঙলা তৈরী করবার জন্য বাঙালী ছেলেদের ব্যবসায়িক নানা বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। আজ আমরা তাঁদের সকলকেই ভুলে গিয়েছি। ভুলে তো যাবই। কেননা বাঙালী হচ্ছে একটা অকৃতজ্ঞ জাত। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি যে বাঙালীর শিরা-উপশিরায় অকৃতজ্ঞতার রক্তই প্রবাহিত হয়।

ふふふ

কাসিমবাজার স্কুলের কথা বলতে গিয়ে, আমার কলমটা একটু বিস্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এখন আমি কাসিমবাজার স্কুলের কথাতেই আবার ফিরে আসছি। আমি যখন কাসিমবাজার স্কুলের সেক্রেটারী হলাম, তখন দেখলাম যে কাসিম-বাজার স্কুল নানা সমস্যায় বিধ্বস্ত। আশু ধ্বংসের হাত থেকে স্কুলকে বাঁচানো

এক অতীব দুরূহ কাজ। বলা বাহুল্য যে যেখানে স্কুলের এক শিক্ষকগোষ্ঠী স্কুলের বিরুদ্ধে কুৎসিত আন্দোলনে মত্ত হয়ে স্কুলকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে স্কুলের কর্তৃপক্ষকে পদে পদে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সে বিরোধিতাকে ভ্রূক্ষেপ না করে, আমি আমার সাহসী ও সংগ্রামী মন নিয়ে অটলচিত্তে আমার কর্তব্যসাধনের পথে এগিয়ে গেলাম। কমিটির মধ্যে দু'একজন সদস্যকে আমার কর্তব্যপালনের পথে সহায়ক পেলাম। সেদিন আমাকে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করেছিল মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী মশাইয়ের আমার ওপর পরম আস্থা। কিন্তু তাহলে, হবে কি? দুষ্কৃতকারী শিক্ষকগোষ্ঠী বাগবাজারের লোককে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল কাসিমবাজার রাজ-পরিবারের বিরুদ্ধে। অকৃতজ্ঞ বাগবাজারবাসীরা সেদিন ভুলে গিয়েছিল যে কাসিমবাজার রাজপরিবারের এমন কোন পিতৃদায় ঘটেনি যে, সে-যুগের মুদ্রামানের হিসাবে চার-লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাগবাজারে এসে একটা আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করবার।

ડ ડ ડ

লক্ষ্য করলাম, স্কুলের অবনতির মূলে শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি, এবং ওই দলাদলির ভেতর ছাত্রদের লিপ্ত হওয়া। অনুসন্ধানে জানলাম শিক্ষকদের মধ্যে এই দলাদলির প্রধান কারণ প্রাক্তন কমিটির পক্ষপাতিত্ব। যে-সব শিক্ষক কমিটির প্রিয়পাত্র, তাদের তাঁরা মোটা হারে বেতন বৃদ্ধি করে গেছেন এবং বাকি শিক্ষকদের দাবী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন বা নামমাত্র বেতন বাড়িয়েছেন। আমি দেখলাম, এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে শিক্ষকদের বেতন-হারের একটা 'গ্রেড' তৈরী করে দেওয়া এবং প্রতি শিক্ষককে তার কর্মকাল অনুযায়ী ওই গ্রেড-এর মধ্যে স্থাপন করা। আমার পরিকল্পনা শিক্ষকমণ্ডলী বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করল, এবং উত্তর কলকাতার সমস্ত স্কুলের মধ্যে কাসিমবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটই একমাত্র স্কুল যেখানে শিক্ষকদের বেতনহারের গ্রেড সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করা হল। পরে অন্যান্য সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আন্দোলন করে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে গ্রেড প্রবর্তন করালেন।

শিক্ষকদের সন্তুষ্ট করবার পর, আমি ছাত্রদেরও সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করলাম। ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করে, তারা যে-সব খেলাধুলোর সাজ-সরঞ্জাম কিনতে চায়, তা কিনে দিলাম। ফলে, ছাত্ররা স্কুলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিবর্তে খেলাধুলোয় মত্ত হয়ে গেল।

তারপর মনোযোগ দিলাম স্কুলের টেকনিক্যাল বিভাগকে সঞ্জীবিত করার

দিকে। এটাই ছিল কঠিন সমস্যা। স্কুলের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টটা চলত কলিকাতা করপোরেশনের অর্থসাহায্য দ্বারা। শিক্ষক ও ছাত্রদের আন্দোলনের ফলে যে বিশৃংখল অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, তাতে করপোরেশন তাদের অর্থসাহায্য বন্ধ করে দিয়েছিল। চার-পাঁচ বৎসর অর্থসাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, টেক-নিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কাজও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং শিক্ষকদেরও নিয়মিত বেতন দেওয়া সম্ভব হয়নি। মধ্যে লোকনাথ বল করপোরেশনের এডুকেশন অফিসার ছিলেন। তিনি বাগবাজার পল্লীরই লোক। কিন্তু তিনিও স্কুলকে এই বিপত্তির হাত থেকে উদ্ধার করতে পারেননি।

১১১

খবরাখবর নিয়ে জানলাম যে মাত্র এক ব্যক্তিই আমাদের এই বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। তিনি হচ্ছেন করপোরেশন কাউনসিলে সরকার-মনোনীত সদস্য সালাউদ্দিন। তৎকালীন মুসলিম সরকারের মনোনীত সদস্য বলে, করপোরেশন কাউনসিলে সালাউদ্দিন-এর ছিল সবচেয়ে বেশী প্রভাব। কিন্তু সালাউদ্দিনের কাছে গিয়ে দরবার করাই এক গুরুতর ব্যাপার। কেননা, সময়টা ছিল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার যুগ। হিন্দুরা মুসলমান পাড়ায় যেত না, এবং মুসলমানরা হিন্দু পাড়ায় আসত না। সালাউদ্দিন থাকতেন জোড়া-গির্জার পিছনদিকে এক মুসলমান পল্লীর মধ্যে এক সরু গলির ভেতর। স্কুলের স্বার্থে আমি সেখানেই যাব স্থির করলাম। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী মশাই আমাকে যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি গেলাম।

আমি অদৃষ্টবাদী। সেজন্য সেদিন অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করেই ওপাড়ায় গিয়েছিলাম। সেদিন আমার জীবনের এক অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওই অগ্নিপরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হলাম। দেখলাম ওটা অত্যন্ত ঘনবসতি মুসলমান পল্লী। আমাকে ওই পল্লীর মধ্যে দেখে সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে পরস্পর কি বলাবলি করছে। বেশ ভয়ার্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু তখন আর ফেরবার উপায় নেই। সুতরাং এগিয়েই চললাম। তারপর সেই সরু গলিটা পেলাম। ভাবলাম, একবার সালাউদ্দিন সাহেবের বাড়ি পৌঁছাতে পারলেই আমি নিরাপদ। কিন্তু গলিটা এঁকেবেঁকে চলেইছে। অনেকক্ষণ পরে সালাউদ্দিন সাহেবের বাড়ির নম্বর পেলাম। বাড়িটার গেট বন্ধ। গেটে ধাক্কা দিতে একজন দাড়িওয়ালা লোক গেটটা খুলে দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কাকে চান? বললাম, সালাউদ্দিন সাহেবকে। লোকটা আমাকে

সালাউদ্দিন সাহেবের কাছে নিয়ে গেল।

আমার পরিচয় পেয়ে সালাউদ্দিন সাহেব তো অবাক। বললেন, আপনি এই হিন্দু-মুসলমান 'টেনসন'-এর সময় এখানে এসেছেন কেন? বললাম, স্কুলের দায়ে, স্কুলের স্বার্থে। বললাম, রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে এসেছি—'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন' নিয়ে। সালাউদ্দিন সাহেবকে স্কুলের কথা আদ্যোপান্ত সব বললাম। উনি আমার সততায় বিশ্বাস করলেন। আশ্বাস দিলেন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। উনি কথা রেখেছিলেন। কয়েক মাস পরেই বকেয়া টাকাটা সবই পেলাম।

টাকাটা হাতে আসবার পর প্রথমেই শিক্ষকদের পাওনা টাকা চুকিয়ে দিলাম। নতুন উৎসাহে তারা টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টটাকে আবার সঞ্জীবিত করে তুলল।

সেলাইয়ের কাজ শেখাবার জন্য একটা নতুন বিভাগ খুললাম। চারটা 'সিঙ্গার' স্যুয়িং মেশিন কেনা হল। যেদিন সিংগার স্যুয়িং মেশিন কোম্পানি মেশিনগুলো ডেলিভারী দিয়ে গেল, সেদিন রাত্তির আড়াইটার সময় স্কুলের দরওয়ান তেওয়ারী, মথুর ও যমধারী আমার বাড়ির জানালার তলায় এসে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করল, 'সেক্রেটারীবাবু, সেক্রেটারীবাবু'। আমি ঘুম থেকে উঠে জানালায় এসে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে? বলল, কাল যে চারটা মেশিন এসেছিল, সেগুলো সব চুরি হয়ে গেছে। একটা চিঠি লিখে ওদের হাত দিয়ে থানায় পাঠিয়ে দিলাম 'ডায়েরি' করবার জন্য।

সকালে স্কুলে গিয়ে দেখি যে তখনও পুলিস আসেনি। পাড়ার যত দুষ্কৃতকারী, তাদের সর্দার হচ্ছে দুঃখীরাম। দুঃখীরাম আমার খুব অনুগত। একবার 'নোট' জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল। আমিই তাকে বাঁচিয়েছিলাম। দুঃখীরামকে ডেকে বললাম, দ্যাখ দুঃখীরাম, আমি বলছি না যে তোমার লোকেরা মেশিনগুলো চুরি করেছে। কিন্তু তোমাকে মেশিনগুলোর তল্লাস করতে হবে। আমি চাই, মেশিনগুলো যেন তিনদিনের মধ্যে স্কুলে এসে পৌঁছায়।

তিন দিনের দিন সকালবেলা স্কুলের দরওয়ানরা এসে খবর দিল, কে বা কারা বস্তায় করে মেশিনগুলো স্কুলের গেটের সামনে রেখে গেছে।

কাসিমবাজার স্কুলের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। যখন স্কুলের সেক্রেটারী পদ গ্রহণ করেছিলাম, স্কুলটা ছিল দেউলিয়া। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে যখন পদত্যাগ করে চলে এসেছিলাম, তখন স্কুলের সংরক্ষিত তহবিলে আঠারো হাজার টাকা রেখে এসেছিলাম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, শেষ পর্যন্ত স্কুলটাকে শিক্ষকদের দলাদলির হাত থেকে মুক্ত করতে পারিনি। ফলে, স্কুলের ক্রমশই অবনতি ঘটে। পরে যাঁরা স্কুলের কর্তৃপক্ষ হলেন, তাঁরা নেতাজীর সাধের 'টেকনিক্যাল

ডিপার্টমেন্ট'টাই তুলে দিলেন। টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণের যুগে এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে ?

১১১

১৯৪৬ সালের পয়লা এপ্রিল (অল ফুলস্ ডে) তারিখে আমি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে কর্মে যোগদান করি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে সংযোগ অবশ্য আমার অনেকদিনের। এ সংযোগটা ঘটেছিল ওই পত্রিকার বাণিজ্য-সম্পাদক যতীন ভট্টাচার্যের মাধ্যমে। যতীন ভট্টাচার্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যোগদানের পূর্বে শিক্ষানবীশ হিসাবে 'কমারসিয়াল গেজেট' পত্রিকায় কাজ করত। সেইসূত্রে পরবর্তীকালে যতীন ভট্টাচার্য প্রায়ই 'কমারসিয়াল গেজেট' পত্রিকা অফিসে আসত। সেখানেই ওর সংগে আমার ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব হয়। বন্ধুত্বটা বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছিল, যখন যতীন ভট্টাচার্য দুপুরবেলা খাবার জন্য আমাকে প্রায়ই ওর ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মেসে নিমন্ত্রণ করত। ওর সংগে দেখা করবার জন্য আমি একদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে আসি। মনে হয় সেটা ১৯৩৩ সাল হবে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিস তখন বর্মন স্ট্রীটে অবস্থিত। চিৎপুর রোড দিয়ে বর্মন স্ট্রীটে ঢুকলে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র যে প্রথম 'গেট'টা পড়ত, সেটা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেই সামনে পড়ত একটা উঠান। ওই উঠান থেকে একটা সিঁড়ি খাড়া উঠে গিয়েছিল দোতলার একটা ঘরে। ওটাই ছিল সম্পাদকমণ্ডলীর ঘর। ঘরটার পশ্চিমদিকে একটা বড় টেবিল পাতা ছিল। সেই টেবিলটায় বসতেন প্রফুল্লকুমার সরকার। শান্তশিষ্ট নিরীহ ও নির্বিকার ভদ্রলোক। তিনিই ছিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ঘোষিত সম্পাদক। তারপর থেকে আমি যতবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে গিয়েছি, আমি কোনদিনই তাঁকে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে দেখিনি, তবে তিনি সম্পাদকীয় নির্দেশ দিতেন। শুনেছি ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র যখন সূচনা হয়, তখন থেকেই প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধটা লিখতেন সত্যেন মজুমদার। আর বাকি প্রবন্ধগুলো লিখত সম্পাদকমণ্ডলীর অপর ব্যক্তিরা। লোকে জানত সত্যেন মজুমদারই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক। আমার যতটা মনে আছে ৬৬-সংখ্যা থেকে প্রফুল্ল সরকারের নাম সম্পাদক হিসাবে ছাপা হয়েছিল। প্রফুল্ল সরকার মশাইকে প্রায়ই দেখেছি ইংরেজিতে লিখিত অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো পাঠ করতে ও সেইসব প্রবন্ধের সারাংশের ভিত্তিতে বাংলায় প্রবন্ধ লিখতে। তবে বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে ও'র একটা মোটামুটি

জ্ঞান ছিল। সেজন্য বৈষ্ণবধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ উনি প্রায় লিখতেন। 'ক্ষরিষ্ণু বাঙলা' সম্বন্ধে একটা মৌলিক রচনাও উনি লিখেছিলেন। সেটা পড়ে আমাকে শুনিয়েছিলেন এবং আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন। আমি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বইখানার একটা প্রশংসাসূচক সমালোচনাও লিখেছিলাম।

সম্পাদকমণ্ডলীর অপর ব্যক্তিরা প্রফুল্লবাবুর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সারি সারি টেবিলে বসতেন। দক্ষিণ দিকের সারিতে মাত্র দু'জন বসতেন। প্রথম সত্যেন মজুমদার ও দ্বিতীয় বাণিজ্য-সম্পাদক যতীন ভট্টাচার্য। আর উত্তর দিকে তিন-খানা টেবিল ছিল। প্রথম টেবিলটায় বসতেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারপর অরুণ মিত্র ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। প্রথম দিনেই এঁদের সকলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গিয়েছিল।

একদিন প্রফুল্ল সরকার মশাই বিবেকানন্দবাবুকে বললেন, এবারকার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শারদীয়া সংখ্যার জন্য অতুলবাবুকে দিয়ে মহিষমর্দিনী মূর্তির বিবর্তন সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লেখান না কেন? প্রফুল্ল সরকার মশাইয়ের এরূপ বলবার কারণ, আগের দশকে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় প্রতিবৎসরই শারদীয়া সংখ্যায় দুর্গাদেবী সম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধই সর্বাগ্রে ছাপা হত। এখন প্রফুল্ল সরকার মশাই বিবেকানন্দবাবুকে ওরূপ বলায়, বিবেকানন্দবাবু বললেন, আপনি বলবার আগেই আমি অতুলবাবুকে ওরকম একটা প্রবন্ধ লিখতে বলেছি। প্রফুল্ল-বাবু শুধালেন, তুমি আবার ওঁকে কোথায় পেলে যে ওঁকে লিখতে বললে? তখন বিবেকানন্দবাবু বললেন, আমার জ্ঞাতিভাই নীহার মুখুজ্যের বাসায়। সেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় শহরের বিশিষ্ট তরুণ বুদ্ধিজীবীদের একটা বৈঠক বসে। সেখানে উপস্থিত থাকেন মুকুল গুপ্ত, দেবেন ঘোষ, সুধাংশুবিকাশ রায়চৌধুরী, অতুল-বাবু ও আরও অনেকে। পরবর্তীকালে মুকুল গুপ্ত হয়েছিল বাঙলা সরকারের ডিরেকটর অভ্ ইণ্ডাস্ট্রিজ, দেবেন ঘোষ বাঙলা সরকারের ডিরেকটর-জেনারেল অভ্ এমপ্লয়মেন্ট ও সুধাংশুবিকাশ রায়চৌধুরী জীবন-বীমা করপোরেশনের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সুধাংশুবিকাশ সম্বন্ধে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মহলের অভিমত ছিল যে, সে তার সহপাঠী বুদ্ধদেব বসুর চেয়েও বেশী প্রতিভাধর ছিল। আর মুকুল গুপ্তের সংস্পর্শে এসে আমি তৎকালীন কলকাতার প্রখ্যাত চণ্ডু-'স্মাগলার' বাতাসীমণিকে চিনেছিলাম। বাতাসীমণি এমন চতুর 'স্মাগলার' ছিল যে, কলকাতার দুর্দান্ত পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবও কোনক্রমে তাকে অভিযুক্ত করতেন পারেনি। বাতাসীমণির বাড়ি ছিল হ্যারিসন রোড় ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের সংযোগস্থল থেকে দু'তিনখানা বাড়ি উত্তরে আমহার্স্ট স্ট্রীটের ওপর। মুকুল গুপ্ত থাকত বাতাসীমণির বাড়ির একেবারে

ওপরতলার একটা ঘরে। আমি প্রায়ই মুকুল গুপ্তের ওই ঘরে যেতাম। বাতাসীমণি একতলার নীচের ঘরে থাকত। তার সংসার বলতে ছিল মাত্র এক সুন্দরী যুবতী মেয়ে। আমি যখনই মুকুল গুপ্তের ওখানে যেতাম, ওই মেয়েটাকে দেখতাম। কিন্তু মেয়েটা যে আমাকে লক্ষ্য করে, এটা জানতে পারলাম যখন একদিন মুকুল গুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি, এবং সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছি, এসময় মেয়েটি আমাকে বলল, মুকুলবাবু তো এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।

ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে শুরু করেছিলাম। মহিষমর্দিনী প্রসঙ্গ থেকে একেবারে বাতাসীমণির প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। যাক্ প্রবন্ধটা লিখেছিলাম। আমার লিখিত 'শিল্পে মহিষমর্দিনী' প্রবন্ধটা বেরিয়েছিল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ১৭ আশ্বিন ১৩৪২ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যায়। সেই প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছিলাম, কিভাবে দ্বিভুজা মহিষমর্দিনী দশভুজায় পরিণত হল। বোধ হয়, আমার পূর্বে আর কেউ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেনি।

~ ~ ~

যদিও সূচনায় সুরেশচন্দ্র মজুমদারই 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাহলেও চারজন এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এ চারজন স্বত্বাধিকারী হলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার, প্রফুল্লকুমার সরকার, মৃণালকান্তি ঘোষ ('অমৃতবাজার পত্রিকা'র) ও রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মশাই তাঁর স্বত্ব বেচে দেন। পরবর্তী ১৬ বৎসর তিনজন স্বত্বাধিকারীই রইলেন। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে মৃণালকান্তি ঘোষ মশাইও তাঁর স্বত্ব ৪০০০ টাকায় বেচে দেবার পর, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মাত্র দু'জন স্বত্বাধিকারী থাকলেন—সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও প্রফুল্লকুমার সরকার।

~ ~ ~

এই সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে এক সংঘর্ষ বাধল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র। পরিণতিতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সিদ্ধান্ত নিল এক ইংরেজি পত্রিকা বের করার, নাম 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'; আর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বের করল এক বাংলা পত্রিকা 'যুগান্তর'। এ সময় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকমণ্ডলীরও এক পরিবর্তন ঘটল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বাণিজ্য-সম্পাদক যতীন ভট্টাচার্য 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক হল।

আর সহকারী সম্পাদক হল বিনয়ভূষণ মুখোপাধ্যায় ('যাযাবর')। বিনয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়কে আমি আগে থাকতেই চিনতাম। সে এক ভারী মজার ব্যাপার। 'কমারসিয়াল গেজেট' অফিসে যাবার জন্য আমি প্রত্যহ ওয়েস্ট এন্ড ওয়াচ কোম্পানির দোকানের (পরে যেখানে লিমটন ওয়াচ কোম্পানির দোকান হয়) কোণে ট্রাম বা বাস থেকে নামি। একদিন নেমেছি, এমন সময় একজন যুবক আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। দু'জনে কথা বলতে বলতে 'কমারসিয়াল গেজেট' অফিসের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। যুবকটি আমাকে বলল, আমার নাম বিনয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়, আমি পাট শিল্প সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছি, প্রবন্ধটা আপনাদের কাগজে ছেপে দিতে হবে। ওই প্রবন্ধটা ছাপবার পর থেকেই ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। সেনট্রাল অ্যাভেন্যু ও বউবাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থলের উত্তরে পূর্বদিকের গলিটার ভেতরে একটা বাড়ির তিনতলার এক ঘরে বিনয় মুখুজ্যে তখন থাকত। আমার যতটা মনে আছে ওর সঙ্গে ওর এক বোনও থাকত। আমি ওর ঘরে বহুবার গিয়েছি। আমি লক্ষ্য করতাম, ও এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। এই প্রতিভার শক্তিতেই পরবর্তীকালে ও বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেকে 'যাযাবর' ছদ্মনামে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার বাণিজ্য-সম্পাদক নিযুক্ত হলেন 'কমারসিয়াল গেজেট' পত্রিকার আমার প্রাক্তন সহকর্মী নৃপেন গুহ, আর সহকারী সম্পাদক অনিলেশ্বর রায়। শীঘ্রই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধল। নৃপেনবাবু আমার কাছে অনুরোধ করে পাঠালেন, মহাযুদ্ধ যদি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া শেয়ার-বাজারের ওপর কিভাবে প্রতিফলিত হবে, এই সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ দিন। আমি প্রবন্ধটা লিখে দিলাম। প্রবন্ধটা তার পরের দিনই 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এ ছাপা হল। এর কিছুদিন পরেই নৃপেনবাবু মারা গেলেন।

নৃপেনবাবু মারা যাবার পর সুরেশবাবু সচেষ্ট হয়ে উঠলেন আমাকে বাণিজ্য-সম্পাদক নিযুক্ত করবার জন্য। স্টক একস্‌চেঞ্জ-এর 'সারভিস্ রুলস্' অনুযায়ী ওটা আমার পক্ষে করা অসম্ভব ছিল। সেজন্য আমি সুরেশবাবুর ওই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলাম। কিন্তু সুরেশবাবু আশা ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। দীর্ঘ চার বৎসর তিনি লোকের পর লোক পাঠাতে লাগলেন, আমাকে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এ যোগদান করবার জন্য। একসময় বিশ্বভারতী প্রকাশন-সংস্থার অধ্যক্ষ পুলিনবিহারী সেনও এলেন, আমাকে সম্মত করাবার জন্য। কিন্তু কেউই আমাকে সম্মত করাতে পারলেন না। তবুও সুরেশবাবু আশা ছাড়লেন না। ও পদটা উনি খালিই রেখে দিলেন। সহকারী সম্পাদক মনোরঞ্জন গুহ মশাই

কাজটা দেখতে লাগলেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। তবুও সুরেশবাবু কৃতসংকল্প যে আমাকে উনি 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় নিয়ে যাবেনই। যখন তিনি দেখলেন যে, সোজাপথে তাঁর কাজ সিদ্ধ হবে না, তখন তিনি বাঁকাপথ ধরলেন।

একদিন স্টক একসচেঞ্জ অফিসে একটা টেলিফোন পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে বলছেন? অপর প্রান্ত থেকে উত্তর এল, আমি অমল হোম বলছি। আমি আগেই বলেছি যে অমল হোমকে আমি আমার নিজের বড়ভাই বলেই মনে করতাম, এবং সেরকম শ্রদ্ধা ও ভক্তিই করতাম। উনিও আমাকে ছোট-ভাইয়ের মতোই স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন। সেজন্যই ওঁর লিখিত বইগুলিতে আমার নামই 'প্রকাশক' হিসাবে ছাপা আছে। অমলদা আমাকে বললেন, অতুল, আগামী কাল অফিস যাবার আগে তুমি একবার আমার বাড়ি ঘুরে যেতে পারবে? বললাম, নিশ্চয়ই যাব। ভাবলাম বোধ হয় কিছু লেখবার কাজ আছে সেজন্যই উনি আমাকে ডেকেছেন।

যাঁরা দেশবন্ধু পার্কের সামনে ওঁর বাড়িতে গিয়েছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে যে রাস্তা থেকে দরজা দিয়ে উঠলেই ওঁর বসবার ঘর। আর দরজার সামনের টেবিলেই উনি বসেন। আমি দরজা দিয়ে উঠেই ওঁকে জিজ্ঞাসা করছি, দাদা, কি ব্যাপার হঠাৎ ডেকে পাঠালেন? কিন্তু নিমেষের মধ্যে এক নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল। আমি জানতাম না যে অমলদার বসবার ঘরের দুয়ারের বাম-দিকের দেওয়ালের আড়ালেই সুরেশবাবু লুকিয়ে আছেন। আমি ঘরে ঢোকা-মাত্রই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আর্তস্বরে বলে উঠলেন, অতুলবাবু, আমাকে বাঁচান! আমি ওঁকে নিবৃত্ত করে বসালাম। তখন অমলদা বলতে শুরু করলেন, অতুল, তুমি সুরেশবাবুকে আর নিরাশ কোরো না। অমলদার কথা কোনদিন আমি অমান্য করিনি। সুতরাং আমাকে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় যোগদান করতেই হল। তবে ঠিক হল যে আমার যোগদানের ব্যাপারটা ওঁরা গোপন রাখবেন, যাতে স্টক একসচেঞ্জের কর্তৃপক্ষরা না জানতে পারে। কিন্তু এসব খবর গোপন থাকে না। শীঘ্রই এটা স্টক একসচেঞ্জের কর্তৃপক্ষের কানে গেল। যেহেতু আমি স্টক একসচেঞ্জে পূর্ণ-সময়ের কর্মচারী (হোল-টাইম অফিসার), সেই হেতু স্টক একসচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ আমার 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এ যোগদানের ব্যাপারটাকে নীতিগতভাবে গর্হিত অপরাধ বলে ধরে নিলেন, এবং পরবর্তী পনেরো বৎসর আমার বেতনের বৃদ্ধিহার (ইনক্রিমেন্ট) বন্ধ করে দিলেন। লজ্জায় এটা আর সুরেশবাবুকে বললাম না। পরে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধে যখন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করলাম

(তার মানে, একসঙ্গে তিনটা চাকরি করতে লাগলাম) তখন স্টক একস্‌চেঞ্জ কমিটির সদস্য প্লেস্‌ সিডনস্‌ অ্যান্ড গাফ্‌ কোম্পানির বড়সাহেব মিস্টার জে. এল. এস্‌প্লেনের সহানুভূতিপূর্ণ উদ্যম ও চেষ্টার ফলে আমার বেতনবৃদ্ধিহার অতীতের বকেয়া পাওনা সমেত আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।

১১১

'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এ যোগদান করে স্থান পেলাম কদমতলার সিঁড়ির পাশে দোতলার ঘরটাতে। ঘরটা খুবই ছোট, বোধ হয় দশ হাত লম্বা ও আট হাত চওড়া। কিন্তু ছোট হলে কি হবে? ওই একটা ঘরের মধ্যেই দু'টা দপ্তর। একটা 'দেশ' পত্রিকার দপ্তর, ও আরেকটা 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বাণিজ্য-বিভাগের দপ্তর। ঘরের মধ্যে ছ'খানা টেবিল পাতা, পরস্পর সংলগ্ন করে। তিনখানা টেবিল 'দেশ' পত্রিকার, আর তিনখানা আমাদের বাণিজ্য-বিভাগের। তবে সব টেবিলের অধিকারী সব সময় উপস্থিত থাকত না। সেজন্য বাইরের লোক এলে বসবার জায়গা পেত। টেবিলের সামনে বসবার চেয়ারগুলো পিছনের দেওয়ালের সঙ্গে একেবারে ঠেকানো ছিল বলে, ভেতর থেকে কারুকে বাইরে যেতে হলে, বা বাইরে থেকে ভেতরে আসতে হলে, চেয়ার-অধিকারীদের দাঁড়িয়ে উঠে তাকে পথ দিতে হত। আর চেয়ার-অধিকারীরা যদি সবাই উপস্থিত থাকত, তাহলে বাইরের অতিথিকে ঘরের প্রবেশপথে দাঁড়িয়েই কথাবার্তা বলতে হত।

'দেশ' পত্রিকার তিনখানা টেবিলের একখানাতে বসতেন কানাইলাল সরকার, আর দু'খানাতে সাগরময় ঘোষ ও অদ্বৈত মল্লবর্মণ। কানাইবাবু তখন ছিলেন 'দেশ' পত্রিকার ম্যানেজার বা সম্পাদকীয় তত্ত্বাবধায়ক। সাগরময়বাবু সহকারী সম্পাদক ও অদ্বৈতবাবু সাব-এডিটর। বঙ্কিম সেন মশাই তখন ছিলেন 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক। তিনি যখন অফিসে আসতেন, তখন অন্য কোন ঘরে বসতেন। বর্মণ স্ট্রীটের মোড়েই ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে তাঁর পায়ের ওপর দিয়ে ট্রাম চলে যায়, ফলে তাঁর একটা পা কাটা যায়। সেজন্য তিনি খুব কমই আসতেন।

আমাদের বাণিজ্য-বিভাগের তিনটা টেবিলের মধ্যে একটা আমার জন্য নির্দিষ্ট হল। আর একটাতে আমার বিপরীত দিকেই বসতেন অনিলেশ্বর রায়। ধারের দিকে আর একখানা চেয়ার পাতা ছিল, কিন্তু কোন টেবিল ছিল না; অনিলেশ্বরবাবু ও আমার জোড়া-লাগানো টেবিলেই সে টেবিলের কাজ সেরে নিত। এ চেয়ারটায় প্রথম বসত নির্মল রায়, পরে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের এক

ভাই, ও আরও পরে কানাইলাল বসু। নির্মল রায় সিটি কলেজে অধ্যাপকের চাকরি পেয়ে চলে গেল। আর নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের ভাইকে আমি পরামর্শ দিলাম বি. সি. এস. পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষায় পাস করে সেও সরকারী চাকরিতে চলে গেল। আর কানাইলাল বসু তখন সবে বি. কম. পাস করেছে। একদিন সুরেশবাবু তাকে আমার কাছে নিয়ে এসে বললেন, অতুলবাবু, এ আমার ভাগনে কানাই, একে আমি আপনার হাতে সমর্পণ করলাম, আপনি একে শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করে দেবেন। আর একজন সাব-এডিটর সুধীর গাংগুলী রাত্তিরে কাজ করত।

১১১

যেদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে যোগদান করলাম, সেদিনই আমার অন্তরংগভাবে আলাপ হয়ে গেল কানাইলাল সরকার মশাইয়ের সংগে। সুরেশবাবু কিভাবে আমাকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় নিয়ে গেছেন, সেটা আদ্যন্ত কানাইবাবুর জানা ছিল। সেজন্য আমার সম্বন্ধে কানাইবাবুর ছিল একটা কৌতূহল। তারপর উনি যখন আমার কাছ থেকে শুনলেন যে ওঁর বাবা ডাক্তার সরসীলাল সরকার মশাই ছিলেন আমার গুরুভাই (কেননা আমরা উভয়েই ছিলাম অধ্যাপক বিনয় সরকার মশাইয়ের বংগীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সদস্য), তখন কানাইবাবুর সংগে আমার প্রীতিটা বর্ধিত হল। কানাইবাবু সম্বন্ধে আমারও খুব কৌতূহল হল। ওঁরই মুখে শুনলাম উনি বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ছাত্র ছিলেন। বেনারসে থাকাকালীন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানতেন। রাখালদাসের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ওঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তারপর যখন জানলেন যে আমিও মহেঞ্জোদাড়োতে ছিলাম, তখন আমার কাছ থেকে মহেঞ্জোদাড়ো সম্বন্ধে অনেক কিছু পরম আগ্রহের সংগে শুনতেন।

'দেশ' পত্রিকার একজন কর্মীর প্রতি আমার খুব মায়া-মমতা জাগ্রত হয়েছিল। সে হচ্ছে অদ্বৈত মল্লবর্মণ। অত্যন্ত সততার সংগে মুখ নীচু করে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করত। কিন্তু ওর মুখখানা ছিল অত্যন্ত বিষণ্ণ ও বিষাদময়। ও যেরকম নিরলসভাবে কাজ করত, তাতে ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করে ওর কাজে বিঘ্ন ঘটাতে চাইতাম না। একদিন ঘরের মধ্যে আমরা মাত্র দু'জনেই আছি। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, অদ্বৈতবাবু, চা খাবেন? ও বলল, না, আমি চা খাই না। ওর সংগে আমার সেই প্রথম কথা। সুতরাং সুযোগটা নিলাম ওর বিষয়ে জানবার জন্য। তারপর সে শোনালো আমাকে এক করুণ কাহিনী। কুমিল্লার

ব্রাহ্মণবেড়িয়ার গোকর্ণ গ্রামে ওর জন্ম। কলকাতায় এসে প্রথম 'নবশক্তি' পত্রিকায় কাজ করত। তারপর এসেছে 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে। থাকে কলকাতার এক ঘিঞ্জি পাড়ার স্যাঁতসেঁতে একটা ঘরে। নিজেই রেঁধে খায়। সকালবেলা ভাত চাপিয়ে দেয়, হাঁড়ির মধ্যে কয়েকটা আলু ফেলে দেয়। আর কিছু রাঁধবার ওর অবকাশ ঘটে না। অর্ধেক ভাত সকালে খেয়ে অফিসে আসে, আর অবশিষ্ট অর্ধেক ভাত রাত্তিরে গিয়ে খায়। অফিসে নিরলস পরিশ্রম ছাড়া, বাড়িতে অবশিষ্ট সময় লেখার কাজে অতিবাহিত করে। লিখে গেছে এক অদ্বিতীয় উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'।

ওকে বলতাম, এরকমভাবে থাকলে আপনি তো মারা পড়বেন। বিষণ্ণবদনে কেবল একবার হাসত। শেষপর্যন্ত হলও তাই। অকালে ক্ষয়রোগে মারা গেল। ওর মৃত্যুটা আমাদের সকলকে শোচনীয়ভাবে আঘাত করেছিল।

১১১

আমাদের পাশের ঘরটাতেই ছিল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র লাইব্রেরী। আর তার পাশের ঘরে 'রবিবাসরীয়' বিভাগ। তখন 'রবিবাসরীয়'র কাজ দেখতেন যতীন সেন ও মন্মথ সান্যাল। তারপর ও-লাইনে আর কোন ঘর ছিল না। ঘর যেখানে শেষ হয়ে গিয়েছিল, সেখানে ছিল ওপরতলার প্রস্রাবাগার।

তখন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র লাইব্রেরিয়ান ছিলেন 'নীলদর্পণ'-এর রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্রের দৌহিত্র হরিপ্রসাদ বসু। আর তাঁর সহকারী ছিল বিভূতিভূষণ বসু। হরিপ্রসাদবাবু ছিলেন অকৃতদার ব্যক্তি। ভারী আমুদে ও গল্পবাজ লোক। অবসরসময়ে আমরা আসতাম হরিপ্রসাদবাবুর ওখানে গল্প শোনবার জন্য। আরও আসতেন পাশের ঘর থেকে যতীনবাবু ও মন্মথবাবু। মাঝে মাঝে সুবোধ ঘোষও আসতেন।

হরিপ্রসাদবাবুর নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াটা একটা রহস্যজনক ব্যাপার। একদিন অফিসে গিয়ে শুনলাম, হরিপ্রসাদবাবু গতকাল অফিস থেকে বাড়ি ফেরেননি, অনেক খোঁজা হয়েছে, কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি! কথাটা শুনলাম হরিপ্রসাদবাবুর দাদার মুখ থেকে। তিনি ছিলেন স্টেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের অধিকর্তা। তিনি এসেছিলেন আমাদের কাছে খোঁজ করতে, আমরা কিছু জানি কিনা, এবং গত কয়েকদিন আমরা ওঁর কোন মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম কিনা। আমরা বললাম, গত কয়েকদিন যাবৎ আমরা ওঁকে একটু অস্থিরচিত্ত অবস্থাতেই দেখেছি। উনি এমনি আমোদপ্রিয় ও গল্পবাজ লোক ছিলেন। কিন্তু

গত কয়েকদিন যাবৎ ওঁকে বিশেষ গল্পগুজব করতে দেখিনি। উনি অনেকটা গুম হয়ে বসে থাকতেন।

সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত হরিপ্রসাদবাবুর আর কোন হদিশ পাওয়া গেল না। অনেকে বলল, তিনি নাকি হাওড়া ব্রিজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

১১১

সাড়ে চারটার সময় স্টক একস্‌চেঞ্জ অফিসের ছুটি হয়। তারপর ওখান থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে আসি। বেলা সাড়ে চারটের সময় সব অফিসেরই একসঙ্গে ছুটি হয়। ও-সময় পরিবহণের অবস্থা খুবই খারাপ। সেজন্য স্টক একস্‌চেঞ্জ অফিস থেকে হেঁটেই 'আনন্দবাজার' অফিসে আসি। আমার হাঁটবার পথ হচ্ছে লায়নস্‌ রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে ব্রাবোর্ন রোড ধরে ক্যানিং স্ট্রীট। তারপর ক্যানিং স্ট্রীট ধরে চিৎপুর রোডে পড়ি। চিৎপুর রোডে নাখোদা মসজিদের সামনে দিয়ে, সিঁদুরিয়াপাটির মোড় পার হলেই ডানদিকে প্রথম মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, আর তারপরেই বর্মণ স্ট্রীটের গলি। গলির বাঁ-দিকে প্রথম বাড়িটাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিস। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে প্রত্যহই ওই পথে আসি। জুলাই মাসের মাঝামাঝি নাগাদ একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, মসজিদের মুয়াজ্জিনের মতো একজন লোক ক্যানিং স্ট্রীটের রাস্তায় চিৎকার করে উভয়পার্শ্বস্থ মুসলমান দোকানদারদের উত্তেজিত করছে। অফিসে এসে অনিলেশ্বরবাবুকে বললাম। অনিলেশ্বরবাবু বললেন, ও কিছু নয়। তারপর জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে গেল যখন ৫ অগস্ট তারিখ নাগাদ মুসলিম লীগ ঘোষণা করল যে আগামী ১৬ অগস্ট তারিখে ওরা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস পালন করবে। ১৫ অগস্ট তারিখ পর্যন্ত আমি নিয়মিতভাবে ক্যানিং স্ট্রীটের ভেতর দিয়েই 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে এসেছি। তবে লক্ষ্য করেছি যে ওই অঞ্চলে ওই দিনের আবহাওয়াটা কিছু উত্তপ্ত। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কেননা ১৬ অগস্ট তারিখে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিনটা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়, তার জন্য সুরাবর্দি সরকার ওই দিনটা ছুটির দিন বলে ঘোষণা করেছে। সুরাবর্দি সরকার ছিল—মুসলিম লীগ সরকার। সরকার নিজেই যখন ওই দিনটা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়, তার জন্য ছুটি দিয়েছে, তখন সন্দেহ করবার তো কোন কারণ থাকতে পারে না। মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাও সকলকে অনুরোধ করেছেন যে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিনটা যেন শান্তিপূর্ণভাবে

পালিত হয়। বস্তুত, লাহোরে ওই দিনটা শান্তিপূর্ণভাবেই পালিত হয়েছিল। কলকাতায় কিন্তু ওই দিনটায় রক্তগঙ্গা বয়ে গেল। সকাল থেকেই উন্মত্তের মতো ক্ষিপ্ত মুসলমান জনতা হিন্দুদের ওপর হামলা চালিয়ে হিন্দুদের দোকানপাট ঘরবাড়ি সব আক্রমণ করল। লুটপাট, খুনজখম করল ও আগুন লাগাল। চতুর্দিকে নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তাতে ইন্ধন যোগাল 'ভারত' পত্রিকা। 'ভারত' পত্রিকায় ভয়াবহ খবর বেরুতে লাগল। শহরে ভীষণ 'টেনসন' সৃষ্টি হল। মুসলমান-প্রধান অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত যে-সব হিন্দুবাড়ি ছিল, সে-সব বাড়ির বাসিন্দাদের স্থানান্তরিত করবার জন্য হিন্দু স্বেচ্ছাসেবকের দল ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তা করাও দুষ্কর হয়ে উঠল, কেননা মুসলমানরা তাদেরও ছুরির আঘাতে নিহত ও আহত করল। ইতিমধ্যে 'ভারত' পত্রিকায় খবর বেরুতে লাগল যে অমুক পাড়ায় মুসলমানরা হিন্দু মেয়েদের স্তন কেটে দিয়ে বিবস্ত্রা অবস্থায় রাস্তার ধারের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দিয়েছে। হিন্দুরা আর শান্ত থাকতে পারল না। তাদের মাথাতেও খুনের নেশা জেগে উঠল। তারপর শহরে তিন-চারদিন সম্পূর্ণ অরাজকতা প্রকাশ পেল। আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছুই রইল না। পথেঘাটে লোক লোককে খুন করতে লাগল, কেউ তাদের রক্ষা করবার নেই। এমনকি এসপ্লানেডের মোড়ের মতো জায়গায় মুসলমানরা স্যার যদুনাথ সরকারের ছেলেকে খুন করল। মুসলমানরা হিন্দুপাড়া আক্রমণ করে বেপরোয়া লুট-তরাজ, খুন জখম ও মেয়েদের অপহরণ করতে লাগল। এর প্রকোপ বেশি পরিমাণে ঘটল কলুটোলা, কলাবাগান, রাজাবাজার, ইনটালি, মানিকতলা, উলটাডাঙা, পার্ক সার্কাস প্রভৃতি মুসলমান-প্রধান অঞ্চলের সংলগ্ন হিন্দুপল্লীতে। বিশেষ করে বিপর্যস্ত হল কলুটোলা অঞ্চলের বাসিন্দা শেয়ার-বাজারের দালালরা। তাদের বাড়ি আক্রমণ করে সিন্দুক-আলমারি ভেঙে মুসলমানরা যথাসর্বস্ব লুট ক'রে নিয়ে গেল। দু'এক জায়গায় হিন্দুরাও এর প্রতিশোধ নিল। মনে পড়ে গেল গুরুমুখী ভাষার এক প্রবচন—'তেনু কাড্‌ডু, তো মৈনা কাড্‌ডু'। মানে, তুমি করতে পার, আমি করতে পারি না! শহরের সর্বত্রই একটা ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি হল। মুসলমানরা হিন্দুপাড়া থেকে পালাতে লাগল। হিন্দুরা মুসলমানপাড়ার সন্নিহিত অঞ্চল থেকে পালিয়ে এল। তাদের স্থান দেওয়া হল হিন্দুপাড়ার মধ্যে অবস্থিত স্কুলবাড়িসমূহে। এদিকে হাসপাতালগুলো শত শত নিহত ও আহত ব্যক্তিতে ভরে গেল। বাজার-হাট ও দোকানপাট বন্ধ রইল। রাস্তা জনশূন্য। লোক-চলাচল নেই। সমস্ত যোগাযোগ এবং পরিবহণ ছিন্ন হয়ে গেল।

এইভাবেই মহানগরী তিনদিন তাণ্ডবলীলার 'শ্রীক্ষেত্র' হয়ে দাঁড়াল!

তারপর মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেব শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে নিয়ে বেরুলেন, শহরে শান্তিস্থাপনের জন্য। কিন্তু আসলে মনে হল, এটা হিন্দু অঞ্চল থেকে বিপর্যস্ত মুসলমানদের উদ্ধার করবার এক অভিযান। কেননা, আমাদের বাগবাজার অঞ্চলে লক্ষ্য করলাম, সুরাবর্দি'র আবির্ভাবের সংগে সংগে গৃহবন্দী মুসলমান নরনারীরা পুলিস-বেষ্টিত হয়ে তাঁর গাড়ির পিছনে মিছিল করে ওই অঞ্চল ত্যাগ করল।

মারামারি-কাটাকাটির তীব্রতা কমল বটে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হল না। শহরটা দুটো ক্যাম্পে পরিণত হল—মুসলমানপাড়া ও হিন্দুপাড়া। হিন্দুর মুসলমানপাড়ার ভেতর দিয়ে যাবার উপায় নেই, গেলেই খুন। হিন্দুপাড়াতেও তথৈবচ। ট্রাম-বাস চলাচল তো ব্যাহত হলই, নিজের গাড়িতেও লোকের বড় রাস্তা দিয়ে যাবার উপায় রইল না। কেননা, পথে মুসলমানপাড়া পড়লেই, মুসলমানরা গাড়ি থামিয়ে আরোহীদের খুন করতে লাগল।



এরকম পরিস্থিতিতে অফিস যাওয়া খুব মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। আমি এবং আমার বড়ছেলে লক্ষ্মী তখন দুজনেই অফিসে কাজ করি। আমরা দু'জনে বাগবাজার থেকে বেরিয়ে চিৎপুর রোড ধরে কটন স্ট্রীট পর্যন্ত এগিয়ে, কটন স্ট্রীটের ভেতর দিয়ে ক্লাইভ স্ট্রীটে পড়ে, অফিসে গিয়ে পৌঁছাতাম। আসবার সময়ও ঠিক ওই পথেই কটন স্ট্রীটের শেষে পৌঁছে, বর্মণ স্ট্রীটে ঢুকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসের প্রথম গেটটা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতাম। দ্বিতীয় গেটটা দিয়ে ঢুকতাম না, কেননা ও-গেটটা নিরাপদ ছিল না। ও-গেটটার সামনেই ছিল মুসলমানদের একটা মসজিদ। একদিন 'প্রেস ট্রাস্ট অভ্ ইন্ডিয়া'র এক পিওন টেলিগ্রাম বিলি করতে এসে ভুল করে ওই গেটটার সামনে যাওয়া-মাত্রই একজন মুসলমান ওই মসজিদ থেকে বেরিয়ে ছুরির আঘাতে ওর পেট ফাঁসিয়ে দিল। আমরা দোতলার বারান্দা থেকে দেখলাম লোকটার রক্তাপ্লুত দেহ রাস্তায় পড়ে আছে। এ ছাড়া, যে পথটা দিয়ে আমরা আসতাম, সে পথটাও সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল না। ক্লাইভ স্ট্রীট ও ক্যানিং স্ট্রীটের সংযোগস্থলটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। ওখানে মুসলমানরা ছুরি-মারা ছাড়া, হিন্দুদের লক্ষ্য করে প্রায়ই বোমা নিক্ষেপ করত। একদিন আমি ও লক্ষ্মী অফিসের ফেরত ওই পথে চলেছি, হঠাৎ ওখানে পুলিসের গুলির আওয়াজ শোনা গেল। তাতে যে 'প্যানিক' সৃষ্টি হল, তাতে যে যেদিকে পারল, ছুটে নিকটস্থ বাড়িতে ঢুকে আশ্রয়

নিল। লক্ষ্মীর সংগে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। দু'জনেই ভীষণ দুর্ভাবনার মধ্যে পড়লাম। তারপর খানিক পরে যখন অবস্থা শান্ত হল, তখন বেরিয়ে এসে দু'জনে দু'জনকে দেখতে পেলাম।

এরকম অবস্থা প্রায় একবছর স্থায়ী হয়েছিল। মাঝে মাঝে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে যখন কাজ করছি, হঠাৎ অনিলেশ্বরবাবু নিউজ ডিপার্টমেন্ট থেকে খবর নিয়ে আসতেন যে 'কারফিউ' জারি হয়েছে। তখন বাড়ি-ফেরা একটা গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়াত। 'কারফিউ'-এর সময় পুলিস পথে লোক দেখতে পেলে তাদের গুলি করত। সেজন্য হঠাৎ 'কারফিউ' জারি হলে আমরা সরু সরু গলির ভেতর দিয়ে বাড়ি ফিরে আসতাম।

একবছর এরকম ভাবেই চলল। তারপর ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের কালীপুজোর ভাসানের দিন আবার দাঙ্গা লাগল বেলগেছিয়া অঞ্চলে। সকাল থেকেই মুসলমানরা হিন্দুদের খুন করছে, এ খবরটা আমাদের বাগবাজার অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলেই আমার ভগিনীপতির এক ডাক্তারখানা ছিল। তাকে আমরা সেদিন ডাক্তারখানায় যেতে মানা করলাল। সে বলল, ওখানকার মুসলমানরা সব আমার রোগী, তারা আমার কোন ক্ষতি করবে না। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সে নিজ ডাক্তারখানায় গেল। বেলা এগারোটার সময় খবর পেলাম আমার ভগিনীপতি নিজ ডাক্তারখানার মধ্যেই খুন হয়েছে ও আর. জি. কর হাসপাতালে তার লাশ পড়ে আছে। কিন্তু আর. জি. কর হাসপাতালটাও দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সেখানে যাব কি করে? 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সাহায্য করল তাদের একখানা 'ভ্যান'-গাড়ি দিয়ে। হাসপাতালে গেলাম। ইমারজেনসী বিভাগ বলল, সার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্টের দোতলার বারান্দায় শায়িত ১২নং লাশ আপনার ভগিনীপতির। কিন্তু সেখানে গিয়ে ১২নং লাশের মুখের কাপড় তুলে দেখি, সে আমার ভগিনীপতি নয়। তখন সেখানে যতগুলো লাশ ছিল, সবগুলির মুখের কাপড় তুলে, আমি আমার ভগিনীপতিকে সনাক্ত করলাম। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম, তাঁরা যেন লাশটা 'মরগ্'-এ না পাঠান, আমি এখনই লাশ ছেড়ে দেবার জন্য পুলিসের অর্ডার নিয়ে আসছি।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ভ্যানটাকে আর আটকে রাখলাম না। শ্যামবাজারের মোড়ে ওটাকে ছেড়ে দিয়ে, ছুটলাম সারকুলার রোডে পুলিসের উত্তরবিভাগীয় ডেপুটি কমিশনার খাঁ বাহাদুর মহম্মদ ইসমাইলের অফিসে। খাঁ বাহাদুর তো কিছুতেই লাশ ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজী করালাম। তিনি অর্ডার দিলেন চিৎপুর থানার ওপর, লাশ ছেড়ে দেবার জন্য। কিন্তু চিৎপুর থানায়

যাই কি করে ? ওখানেও তো দাংগা চলছে। এমন সময় একজন সহৃদয় পুলিস সার্জেন্ট আমাকে বললেন, আমার ছুটি হয়ে গিয়েছে, আমি বাড়ি ফিরছি, আমার বাড়ি পাইকপাড়ায়, আমি আপনাকে পুলিসের গাড়ি করে চিৎপুর থানায় নিয়ে যাচ্ছি। উনিই আমাকে চিৎপুর থানায় নিয়ে এসে, লাশ খালাসের অর্ডার করিয়ে, আর. জি. কর হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। তাঁকে চিনি না, কিন্তু আজ সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

ইতিমধ্যে আমার আত্মীয়স্বজন সকলে শববহনের জন্য খাট নিয়ে এসে আমার জন্য হাসপাতালে অপেক্ষা করছিল। আমরা শব বহন করে হাসপাতাল থেকে বেরুচ্ছি, এমন সময় হাসপাতালের সামনেই, কালীপ্রতিমা ভাসান দিয়ে ফিরছে, এমন একটা লরির ওপর মুসলমানরা ছুঁড়ে মারল এক বোমা। আমরা তখন সকলেই শোকসন্তপ্ত, সুতরাং ও-ঘটনাকে ভ্রুক্ষেপ না করেই 'বল হরি, হরি বোল' বলতে বলতে অগ্রসর হলাম শ্মশানঘাটের দিকে।



দাংগার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল শেয়ার-বাজার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই শেয়ার-বাজারে একটা 'বুম' এসেছিল। কিন্তু সেটা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। মিত্রশক্তির বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়ের খবর শেয়ার-বাজারের দালাল ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অভিভূত করে তুলল। শেয়ারের দাম ক্রমাগতই পড়তে লাগল। পরিস্থিতি এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছাল যে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ২০ মে তারিখ থেকে শেয়ার-বাজারের কর্তৃপক্ষ তিনমাসের জন্য বাজার বন্ধ করে দিল। কিন্তু বাজার পুনরায় খোলার পরও অবস্থার কোন উন্নতি ঘটল না। তখন ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে স্টক একসচেঞ্জ কমিটি বাধ্য হল সব শেয়ারের নিম্নতম মূল্য বেঁধে দিতে। এসময় ভারত সরকারও কোম্পানির কাগজের নিম্নতম মূল্য বেঁধে দিল। কিন্তু এতে শেয়ারের মূল্য-পতন রুদ্ধ হল না। লোক বাজারের মাধ্যমে কেনাবেচা বন্ধ করে দিল বটে, কিন্তু বাজারের বাইরে নিম্নতম মূল্যের তলায় কেনাবেচা করতে লাগল। বাজারের ওপর চরম আঘাত এল যখন ব্রহ্মদেশ থেকে ইংরেজকে পালিয়ে আসতে হল, এবং তার পদাংকে কলকাতা শহরে জাপানীরা বোমা ফেলতে লাগল। তারপর গোদের ওপর বিষফোড়া-স্বরূপ বাজারের ভাবমূর্তিকে একেবারে নষ্ট করে দিল, সরকার যখন 'অতিরিক্ত মুনাফা কর' (EPT) স্থাপন করলো। এভাবে যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত বাজারে মন্দার ঢেউই চলল। কিন্তু যুদ্ধের পর বাজারে প্রকাশ পেল এক উত্তাল তেজীভাব।

এই অসাধারণ তেজীভাব প্রকাশের মূলে ছিল মোটামুটি তিনটি কারণ—(১) যুদ্ধের আওতায় যারা দু'পয়সা কামিয়েছিল, তারা তাদের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করবার জন্য ছুটে এল শেয়ার-বাজারে ; (২) সরকার কর্তৃক শতকরা সাড়ে তিন-টাকা সুদ হারের কোম্পানির কাগজগুলি শতকরা তিনটাকা হারের কোম্পানির কাগজে পরিবর্তিত করার ফলে লোকের ধারণা হল যে, সরকার 'সস্তা-মুদ্রানীতি' (cheap money policy) অনুসরণ করবেন ; এবং (৩) বিদেশে EPT পরিত্যক্ত হওয়ায়, এখানেও EPT পরিত্যক্ত হবে, এই ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হল। এসবের ফলে বাজারে এবেলা-ওবেলা শেয়ারের দাম বাড়তে লাগল। শেয়ারের দাম ঊর্ধ্বতম স্তরে গিয়ে পৌঁছাল ঠিক হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পূর্বে। কিন্তু দাঙ্গার পর শেয়ার-বাজার একেবারে শুয়ে পড়ল। এই পটভূমিকাতেই দেশ স্বাধীনতা-লাভ করল ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ অগস্ট তারিখে। এসময় পরিত্যক্ত EPT-র আবার পুনর্আবির্ভাব ঘটল BPT-রূপে। তাতে পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল। এসময় রিজার্ভ ব্যাংক তপশীলভুক্ত ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ দিল তারা যেন শেয়ারের বিপক্ষে আর টাকা ধার না দেয়। সংগে সংগে গুজব রটল সরকার 'ডিভিডেন্ড লিমিটেশন' আইন প্রণয়ন করবেন, শিল্পসমূহকে জাতীয়-করণ করবেন, ইত্যাদি। লোকের চিন্তাধারাকে এসময় আরও বিব্রত করে তুলল সরকারী মহলের কর্তাব্যক্তিদের পরস্পর-বিরোধী উক্তিসমূহ। এসময় স্টক একসচেঞ্জে আমার কাজের বহর অতিমাত্রায় বেড়ে গেল। কমিটির তরফ থেকে সরকারের কাছে পেশ করবার জন্য সুদীর্ঘ প্রতিবেদনসমূহ রচনা করা ছাড়া, রিজার্ভ ব্যাংকও আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল নানারকম কাজ। তার অন্যতম হচ্ছে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ অগস্ট তারিখের পরে শেয়ারের মূল্যহ্রাসের ফলে বিনিয়োগকারীরা কি পরিমাণে বিপর্যস্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেটা টাকার অঙ্কে হিসাব করে তাদের কাছে পেশ করা। এরকম কাজ এদেশে আমিই প্রথম করলাম।

১১১

এরই মধ্যে আমার ব্যক্তিগত জীবনে এক বিপর্যয় ঘটল। আমার বড়ছেলে লক্ষ্মী, যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় আমার অফিস যাওয়ার সাথী ছিল, তাকে আমি হারালাম। জগদ্ধাত্রীপুজোর সময় লক্ষ্মী আমার মেয়ে সুষমাকে চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী ঠাকুর দেখাতে নিয়ে গেল। তারপর কয়েকদিনের জন্য মিহিজামে বেড়াতে গেল। মিহিজাম থেকে ফিরে এসে লক্ষ্মী হঠাৎ পীড়িত হয়ে পড়ল। পাড়ার ডাক্তার কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য থেকে আরম্ভ করে অনেক ডাক্তারই তার

চিকিৎসা করলেন। এমনকি কলকাতার তখনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক অমল রায়চৌধুরীও এলেন। অমল রায়চৌধুরী বললেন, লক্ষ্মী কোন অজ্ঞাত জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তখনকার দিনে পেনিসিলিন খুব দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ওষুধ ছিল। তাও প্রয়োগ করা হল। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। কয়েকদিন রোগভোগের পর ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী ইংরেজি নববর্ষের দিন লক্ষ্মী ২৪ বৎসর বয়সে মারা গেল। সেজন্যই ইংরেজি নববর্ষের দিনটা আমার জীবনে একটা অত্যন্ত বিষাদময় দিন।

ಽ ಽ ಽ

আগেই বলেছি যে ইংরেজি ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১ এপ্রিল তারিখে আমি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে যোগদান করি। কদমতলার পূর্বদিকের যে ঘরটায় আমি বসি, ঠিক ওর কোনাকুনি দক্ষিণদিকের ঘরটায় সুরেশবাবু বসতেন। দক্ষিণদিকে সুরেশবাবুর ঘরটা ছিল ঠিক মাঝখানে। আমাদের পূর্বদিকের বারান্দাটা ঘুরে দক্ষিণদিকের ওই বারান্দাটাতেই গিয়ে মিশেছিল। দক্ষিণদিকের বারান্দার প্রথম ঘরটা ছিল যারা 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডাড''-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখত, তাদের বসবার ঘর। ওই ঘরটায় তখন বসত সুধাংশু বসু, অমর নন্দী, মিহির সেন, মনোরঞ্জন গুহ, বিজনবাবু, মণীন্দ্র রায় প্রমুখেরা। দ্বিতীয় ঘরটায় বসতেন ডক্টর শশধর সিংহ। সম্পাদকীয় সমস্ত কাজের তত্ত্বাবধান তিনিই করতেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লিখতেন। তিনি খুবই বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। পরে তিনি ভারত সরকারের পাবলিকেশনস্ বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ওঁর পরের ঘরটাই ছিল 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডাড''-এর ঘোষিত সম্পাদক হেমচন্দ্র নাগের ঘর। বহুদিনের দেশসেবক ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী। আমি যখন 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড''-এর বাণিজ্য-সম্পাদক নিযুক্ত হই, তখন তাঁর বেশ বয়স হয়েছিল। সেজন্য তিনি চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে অধিকাংশ সময়ই ঘুমোতেন। তার পরের ঘরটা ছিল কে. পি. টমাসের ঘর। তিনি অত্যন্ত রসিক ব্যক্তি ছিলেন, এবং 'হোমা' এই ছদ্মনামে প্রত্যহ 'থটস্ ফর দি লো ব্রাউ' শীর্ষক এক 'ফিচার' চালাতেন। তার পরের ঘরটাই ছিল সুরেশবাবুর ঘর। প্রতিদিন বিকালে ওখানে হেমন্তকুমার বসু ও হরিদাস ঘোষকে আসতে দেখা যেত। তার পরে আরও দু'তিনখানা ঘর ছিল। তার মধ্যে একখানা ঘরে বসতেন অশোককুমার সরকার। ওই ঘরে বসে অশোকবাবু তখন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংস্থার হিসাবের খাতাসমূহ অডিট করতেন।

তারপরই ছিল আগেকার যুগের সম্পাদকীয় মণ্ডলীর ঘর, যে ঘরটার কথা আমি আগে বলেছি। কিন্তু আমার সময়ে ও-ঘরটা খালি পড়ে ছিল। তখন ওটা যাতায়াতের পথ হিসাবে ব্যবহৃত হত। ও-ঘরটা পার হয়ে গেলেই পড়ত একটা মস্ত বড় হল্‌ঘর। ওই হল্‌ঘরের দক্ষিণদিকে বসতেন জেনারেল ম্যানেজার ও চীফ অ্যাকাউনটেণ্ট সুধীন দাশগুপ্ত ও তাঁর সংলগ্ন টেবিল-গুলিতে তাঁর সহকারীরা, যথা যোগেন সেন, কেদার বসু ও চন্দ্র নাগ। চন্দ্র নাগের মেয়েই 'অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো'র সংবাদ-ঘোষিকা সুপরিচিতা ইভা নাগ। আর কেদারবাবুর ছেলে এখন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'চীফ অভ্ ব্যুরো' সুনীল বসু।

সুধীনবাবুর সামনের দিকের হল্‌টা দরমা দিয়ে ঘেরা। ওখানে নিউজ এডিটর রসরাজবাবু, রিপোর্টার পবিত্রবাবু, অবনীবাবু, মণীন্দ্রবাবু ও সাব-এডিটর দুর্গেশবাবু, অশ্বিনী গুপ্ত ও অন্যান্যদের বসবার ঘর। আজ যাঁরা প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রিত বিশাল প্রাসাদ দেখেন, তাঁদের কাছে বর্মণ স্টীটে রসরাজবাবুর মতো (তিনি 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার চাকরি ছেড়ে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় এসেছিলেন) নিউজ এডিটরকে দরমা দিয়ে ঘেরা ঘরে বসে কাজ করতে হত, এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার বলে মনে হবে।

এই হল্‌ঘরের নীচের তলায় ছিল ছাপাখানা। ছাপাখানার উল্লেখযোগ্য সরঞ্জামের মধ্যে ছিল গোটা-চারেক ইংরেজি ও গোটা-দুই বাংলা লাইনোটাইপ মেশিন, আর 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার পরিত্যক্ত যে রোটারি মেশিনটা 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা বেচে দিয়েছিল, সেই রোটারি মেশিনটা। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এটা কিনে নিয়েছিল।

১১১

আগেই বলেছি যে আমাদের কদমতলার ঘরটা ছিল সুরেশবাবুর ঘরটার কোনাকুনি। সুরেশবাবু ও'র ঘরে বসে দেখতে পেতেন আমাদের ঘরে কে আসছে, ঘর থেকে কে বেরুচ্ছে। রোজই একটা মজার ঘটনা ঘটত। যখনই আমি প্রস্রাব করবার জন্য ঘর থেকে বেরুতাম, তখনই দেখতাম অপরদিক থেকে সুরেশ-বাবু প্রস্রাব করবার জায়গায় এসে হাজির হতেন। আমি ও'কে প্রথম পথ দিতাম। তারপর ও'র পরে আমি প্রস্রাব করে ফিরে দেখতাম উনি দাঁড়িয়ে আছেন আমার অপেক্ষায় কথা বলবার জন্য। ওখানে দাঁড়িয়েই আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হত, অনেকসময় পনেরো-বিশ মিনিট ধরে। অফিসের অন্যান্য সকলেই ভাবত

আমাদের মধ্যে কি কথা হয়, এতক্ষণ ধরে ! কেননা, আমি কোনদিনই অপরের কাছে প্রকাশ করতাম না, আমাদের মধ্যে কি কথা হয়।

কেননা কথাগুলো ছিল সবই গোপনীয়, পরিকল্পনার কথা। কিভাবে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড''-এর প্রচার-সংখ্যা বাড়ানো যায়, কিভাবে একে জনপ্রিয় করা যায়, এইসব কথা নিয়েই আমাদের মধ্যে আলোচনা হত। 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড''-এর তখন প্রচার-সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪০০। কিন্তু প্রচার-সংখ্যা মাত্র ২৪০০ হলে কি হবে ? সরকারী মহল (তখনও ব্রিটিশ সরকার এদেশে বহাল) কাগজখানাকে খুবই গুরুত্ব দিত। সুরেশবাবু বলতেন, আপনাকে চিন্তা করতে হবে কিভাবে কাগজখানাকে ব্যবসায়ী-মহলে ও ছাত্রমহলে আবশ্যকীয় কাগজে পরিণত করা যায়, কিভাবে দেশের জনসাধারণকে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে, ইত্যাদি। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র পুজো-সংখ্যায় আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। ওই প্রবন্ধটা পড়ে উনি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং কাগজখানা সযত্নে ওঁর টেবিলের দেরাজের মধ্যে রেখেছিলেন। একদিন তিনি ওই প্রস্রাব করবার জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে আমাকে ওঁর ঘরে নিয়ে গেলেন, এবং দেরাজ থেকে ওই কাগজখানা বের করলেন। প্রবন্ধটার নাম ছিল WHEN HITLER FALLS। তারপর উনি বলতে আরম্ভ করলেন, এই প্রবন্ধটায় আপনি অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ; আপনার ভবিষ্যদ্বাণী মেলে কিনা, তা দেখবার জনাই আমি কাগজখানা রেখে দিয়েছি। আপনার ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে। আপনি লিখেছিলেন, এ যুদ্ধে হিটলারের পরাজয় সুনিশ্চিত। তখন ইংরেজ সরকারও জোর করে এ-কথা বলতে পারেনি। তখন আমাদের দেশের লোক জিনিসপত্তরের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতায় প্রপীড়িত হয়ে ভাবছিল যে যুদ্ধাবসানে তাদের সব মুশকিলের আসান ঘটবে, কিন্তু আপনি লিখেছিলেন যে মূল্যহ্রাস তো দূরের কথা, যুদ্ধান্তে এমন মূল্যস্ফীতি ঘটবে যে, লোক ত্রাহি ত্রাহি রব তুলবে। আশ্চর্যজনকভাবে এসবই তো ঘটেছে এবং আপনার ভবিষ্যদ্বাণী সবই মিলে গেছে। আমি সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি শেয়ার-বাজারে যা ঘটেছে, তা দেখে। আপনি এপ্রিল মাসে যখন আমাদের এখানে আসেন, তখন তো শেয়ার-বাজারের রমরমা অবস্থা। রোজই শেয়ারের দাম উঠছিল। তারপর তো দাম উঠতে উঠতে শেয়ার-বাজার আগুন হয়ে উঠল। জুলাই মাসের শেষের দিকে আপনাদের শেয়ার-বাজারের এক দালাল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। শেয়ার-বাজার সম্বন্ধে আমাদের কাগজে যা লেখা হচ্ছিল, তার তারিফ করছিল। সে আমায় বলে গেল, সুরেশবাবু, দেখবেন এবার পুজোর আগে শেয়ার-বাজারে এমন 'বুম' আসবে

যে, শেয়ার-বাজারের ইতিহাসে কখনও তা ঘটেনি। আপনাকে ওর কথাগুলো বলবার আর ফুরসত পাইনি। তারপর আমাদের কাগজ পড়ে তো আমার চক্ষু ছানাবড়া! আপনি তারিখ দিয়ে লিখেছেন যে ১৫ অগস্ট তারিখের পর শেয়ার-বাজার ভেঙে পড়বে এবং ভীষণ মন্দা আসবে। আচ্ছা, মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর প্রস্তাব তো গৃহীত হল ৫ না ৬ অগস্ট তারিখে। তার আগে আপনি কি করে লিখলেন যে ১৫ অগস্টের পর বাজার ভেঙে পড়বে? আমি বললাম, আমার ওই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর কোন সম্পর্কই ছিল না, যদিও কাকতালীয়ভাবে ১৬ অগস্ট তারিখে বাজার ভেঙে পড়বার ওটা একটা প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি যে চার্ট তৈরি করি, সে চার্টের ইঙ্গিত অনুযায়ীই আমি ওই ভবিষ্যদ্বাণী করেছি। সুরেশবাবু তো সব শুনে অবাক। প্রসঙ্গত এখানে বলি যে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন 'বিজনেস্ স্ট্যাণ্ডাড'' পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়, তখন শেয়ার-বাজার মন্দার ঢেউয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। কিন্তু ওই পত্রিকার প্রথম দিনের প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে ৬ জুলাই তারিখের পর থেকে বাজারে আবার 'বুম' আসবে। প্রথম দিন কাগজে ওটা পড়ে, আমাদের জেনারেল ম্যানেজার অরূপ সরকার বলেছিলেন, এই সাংঘাতিক মন্দার বাজারে আপনি বুমের স্বপ্ন দেখছেন কি করে? উত্তরে বলেছিলাম, এরকম ভবিষ্যদ্বাণী আমি গত ত্রিশ বছর যাবৎ 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডাড''-এ নিয়তই করেছি। বলা বাহুল্য, ঠিক ৬ জুলাই তারিখ থেকে শেয়ার-বাজার দিক-পরিবর্তন করে আবার 'বুম'-এর দিকে জয়যাত্রা শুরু করল।

ꕥ ꕥ ꕥ

ওই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সুরেশবাবুর সঙ্গে নানারকম আলোচনা হয়। ইদানীং ওঁর ভাবনা কিভাবে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডাড'' পত্রিকার মাধ্যমে দেশের লোককে দেশের অর্থনীতির সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো যায়। যুদ্ধের পূর্বে অর্থনীতি সম্বন্ধে দেশের সাধারণ লোকের কোন মাথাব্যথাই ছিল না। সাধারণ লোক ও-জিনিসটা বুঝতে চাইতও না, আর বুঝতে পারতও না। বুঝতে চাওয়ার কোন প্রয়োজনও ছিল না, কেননা লোকের জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল খুব সহজ, সরল ও সুখময়। তারা সুখেই দিন কাটাত। শতাব্দীর গোড়া থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত নিত্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্তরের খুচরা দাম মোটামুটি একই ছিল। সুতরাং অর্থনীতির চর্চা করে লোক কেন ঝামেলা বাড়াতে

যাবে? তা ছাড়া, ছাত্রসমাজের কাছ থেকে তারা শুনত যে ওটা একটা কঠিন ও নীরস শাস্ত্র। বস্তুত অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় খুব কম ছেলেই স্নাতক পরীক্ষার জন্য অর্থনীতি নিত। অর্থনীতির বিষয়বস্তুটা যে খুব নীরস ও দুরূহ, এটাই ছিল তাদের ধারণা। এর একমাত্র কারণ ছিল, মাস্টারমশাইরা এটাকে সরস ও 'ইনটারেস্টিং' করতে জানতেন না।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রকোপে পড়ে, সাধারণ লোক যে-সব উৎকট সমস্যার সম্মুখীন হল, তাতে অর্থনীতির জ্ঞান ও চর্চা অপরিহার্য হয়ে পড়ল। কিন্তু সে সম্বন্ধে তাদের কোন প্রস্তুতিই ছিল না। এই প্রস্তুতিটা তৈরি করে দেওয়াই সুরেশবাবুর উদ্দেশ্য ছিল। সেজন্যই তিনি প্রত্যহ আলোচনার সময় আমাকে বলতেন যে এমন একটা উপায় নির্ধারণ করুন, যার দ্বারা আমরা সাধারণ লোকের কাছে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির মূল তত্ত্বগুলোর সঙ্গেও তাদের পরিচয় ঘটাতে পারি। তাঁর অপর লক্ষ্য ছিল দেশের লোকের মধ্যে অর্থনীতির চর্চা বাড়ানো। সেজন্য তিনি বলতেন, 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এ এমন কিছু বের করা চাই যাতে ছাত্রসমাজ উপকৃত হবে এবং পাঠ্যবিষয় হিসাবে অর্থনীতিটা পড়ে আনন্দ পাবে। মোট কথা, তিনি এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চাইতেন, দেশের লোক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো বুঝবে, এবং ছাত্রসমাজে অর্থনীতিটা জনপ্রিয় হবে।

ℒ ℒ ℒ

অনেক ভাবনাচিন্তার পর আমরা স্থির করলাম যে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর সঙ্গে ECONOMIC SUPPLEMENT নামে একটা বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রতি সপ্তাহে যোগ করে এটা করা যেতে পারে। সেই সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত হল। ঠিক হল প্রধান প্রবন্ধটা লিখব আমি, আর বাকী প্রবন্ধগুলো লেখানো হবে দেশের বিদগ্ধ লেখকদের দিয়ে। এই পরিকল্পনা নিয়েই আমরা আরম্ভ করলাম আমাদের ECONOMIC SUPPLEMENT। এরকম অর্থনৈতিক ক্রোড়পত্র এদেশে এক অভিনব ব্যাপার হল। বস্তুত অর্থনীতিকে জনপ্রিয় করে তোলবার কৃতিত্ব এদেশে একমাত্র 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-ই দাবী করতে পারে। প্রথমেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে যেহেতু দেশের ১০০ জন লোকের মধ্যে ৮২ জন (তখনকার দিনের পরিস্থিতি) গ্রামে বাস করে, সেজন্য গ্রামের অর্থনীতি ও তার উন্নয়নের প্রতিই আমরা প্রথম জোর দেব। এ সম্বন্ধে

লেখবার ভার সুরেশবাবু আমার ওপর দিলেন।

'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর প্রথম 'ইকনমিক সাপ্লিমেন্ট' বেরুল ১৬ জুন ১৯৪৯ তারিখে। প্রথম দিনে প্রথম প্রবন্ধের প্রথম বাক্য হল—'We have won our political freedom, but our economic freedom has with increasing tempo receded from us.' এটাই হল আমাদের 'ইকনমিক সাপ্লিমেন্ট'-এর মূলমন্ত্র। কি করে আমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে পারি, তার মানে, কি করে দেশকে দারিদ্র্যের নাগপাশ থেকে বিমুক্ত করতে পারি, সেই ভাবনাচিন্তাকে মুদ্রিত রূপ দেওয়া, এটাই হল আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যেহেতু দেশের ৮৭ শতাংশ (তৎকালীন পরিস্থিতি) লোক গ্রামে বাস করে, সেহেতু গ্রামীণ সমাজকে কিভাবে সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে পারা যায়, এই বিষয় সম্বন্ধেই পর পর সপ্তাহে লিখে ফেললাম ২৬টা প্রবন্ধ। বিশ বছর পরে যখন প্রবন্ধগুলো একত্রিত করে বই আকারে হুবহু ছাপা হল, তখন সেগুলো পড়ে বিস্মিত হলেন বিশ্বের একজন সেরা অর্থনীতিবিদ। তিনি হচ্ছেন দারিদ্র্য-বিশারদ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ডঃ গুনার মিরডাল। বইখানা পড়ে, মুগ্ধ হয়ে, তিনি আমাকে এক অভিনন্দনপত্র পাঠালেন। ওই অভিনন্দনপত্রে তিনি লিখলেন—'You were remarkably ahead of your time'। সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন উপহারস্বরূপ তাঁর কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনা।



ডঃ গুনার মিরডালের 'You were remarkably ahead of your time' বলবার কারণ ছিল। আমার প্রবন্ধগুলির গোড়ার দিকেই আমি বলেছিলাম, যেহেতু যুদ্ধের সময় সেনানিবাস স্থাপনের জন্য বনজঙ্গল ও গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে, সেহেতু তার প্রতিঘাত গিয়ে পড়বে বারিপতনের ওপর, এবং তা কৃষিকর্মকে ব্যাহত করবে। সেজন্য বলেছিলাম যে নতুন গাছ রোপণের জন্য একটা 'বন-মহোৎসব' অনুষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমি একথা বলবার দু-চারদিনের মধ্যেই সরকার দেশের সর্বত্র 'বন-মহোৎসব' অনুষ্ঠিত করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। কিন্তু আর যে-সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করবার প্রয়োজনীয়তার কথা লিখলাম, সে-সব বিষয় সম্বন্ধে সরকার সম্পূর্ণ নির্বিকার ও নীরব রইলেন। আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল, দেশের জনসংখ্যা সীমিত করবার জন্য সরকারীভাবে একটা 'breed less' অভিযান চালানো একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে সরকার সম্পূর্ণ চুপ করে গেলেন। পনেরো বছর

পর ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে সরকার প্রথম birth control বা জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে প্রচার-কার্য চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে ওই বিষয় সম্বন্ধে প্রচারকার্যের পেছনে কোন ঐকান্তিক প্রয়াস লক্ষিত হল না। এ বিষয়ে সরকারের সচেষ্ট হতে আরও দু-চার বছর সময় লাগল।

আমার তৃতীয় প্রস্তাবটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি লিখেছিলাম যে যেহেতু ইংরেজ আমলে গ্রামীণ শিল্পসমূহ অবলুপ্তির সম্মুখীন হয়েছিল, সেহেতু কৃষিই গ্রামীণ জনসমাজের একমাত্র আয়ের সূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এটাই গ্রামীণ দারিদ্র্যের একটা প্রধান কারণ। সেহেতু প্রস্তাব করেছিলাম যে গ্রামে কর্মনিযুক্ততা সৃষ্টি করবার জন্য ব্যাপকভাবে কুটির-শিল্প স্থাপন করে ও সহজলভ্য গ্রামীণ উপাদান ব্যবহার করে জ্যাম, জেলি, সিরাপ, মাখন, বিস্কুট, ছুরি, কাঁচি, তাঁত-বস্ত্র, জুতা, কাঠের আসবাবপত্র, দড়ি, খেলনা ইত্যাদি ও বৃহৎ শিল্পের আনু-ষঙ্গিক অংশ নির্মাণ কার্যে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। কিন্তু পরবর্তী বিশ বৎসর এ-বিষয়ে সরকারী কোন প্রচেষ্টাই লক্ষিত হল না। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে কারভে রিপোর্টের পরই এ-বিষয়ে সরকার সক্রিয় হয়ে উঠলেন।

ঽঽঽ

ওই সময় আমি যে-সব প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তার মধ্যে একটা প্রবন্ধ সম্বন্ধে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। ওই প্রবন্ধে আমি সরকার-পরিবেশিত চাউল উৎপাদনের পরিসংখ্যান ব্যবহার করে দেখিয়েছিলাম যে মানুষকে যদি দু'বেলা পেট ভরে খেতে দেওয়া হয় (রেশনিং প্রথা চালু থাকার দরুন যা সম্ভবপর হত না) তা হলেও বেশ কিছু পরিমাণ চাউল উদ্বৃত্ত থাকে। আমি হিসাব-নিকাশ করে ওই উদ্বৃত্ত চাউলের পরিমাণ নির্ধারণ করলাম, এবং প্রবন্ধের শিরোনাম দিলাম : 'Where goes the missing crop ?'

প্রফুল্ল সেন মশাই সে-সময় বাঙলার খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন। প্রবন্ধটা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ছুটে এলেন তিনি সুরেশবাবুর কাছে। প্রবন্ধটা প্রকাশ করার জন্য সুরেশবাবুর কাছে অনুযোগ করলেন। সুরেশবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমাকে বললেন, অতুলবাবু শুনুন, প্রফুল্লবাবু কি বলছেন। সব শুনে, আমি প্রফুল্লবাবুকে বললাম, 'আমি তো সরকারী পরিসংখ্যানই ব্যবহার করেছি, এখন বলুন আমার হিসাব-গণনার মধ্যে কোন ভুল আছে কি-না ?' প্রফুল্লবাবু বললেন, আমি হিসাব-গণনার মধ্যে কোন ভুলের কথা বলছি না। বললাম, তবে কিসের কথা বলছেন ? উনি বললেন, ওই পরিসংখ্যানের কথা।

বললাম, ও তো আপনাদেরই পরিবেশিত পরিসংখ্যান। তখন তিনি হাসতে হাসতে বললেন, আপনারা তো জানেন না, আমরা তিন রকমের পরিসংখ্যান রাখি। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সে আবার কি? তখন তিনি বললেন, আমরা এক রকম পরিসংখ্যান সাধারণের কাছে পরিবেশনের জন্য ব্যবহার করি, দ্বিতীয় রকম পরিসংখ্যান আমরা রাখি আমাদের নিজের ব্যবহারের জন্য, আর তৃতীয় রকম পরিসংখ্যান হচ্ছে, যা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাই। এই কথা শুনে একটা হাসির রোল পড়ে গেল।

ঌ ঌ ঌ

তারপর কি ঘটল জানি না। কিছুদিন পর কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী রফি আহমেদ কিদওয়াই দেশ থেকে রেশনিং প্রথা তুলে দিলেন। রেশনিং বজায় রাখবার সপক্ষে সকলেরই যুক্তি ছিল যে হঠাৎ রেশনিং তুলে দিলে, বাজারে চাউল দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ হয়ে উঠবে। কিন্তু সে যুক্তি নস্যাৎ করে দিয়ে, রেশনিং উঠে যাবার পর চাউলের দাম ক্রমাগতই পড়ে গেল, এবং বাজারে চাউল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে লাগল। কয়েক বছরের মধ্যে চাউলের দাম ত্রিশ টাকা মণ থেকে পনেরো টাকা মণে নেমে গেল। তখন আবার 'লেভি' প্রথা চালু করবার কথা তোলা হল। 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর 'ইকনমিক সাপ্লিমেন্ট'-এ লিখলাম, 'লেভি' প্রথা চালু করলেই চাউলের দাম আবার ঊর্ধ্বগতি লাভ করবে, এবং দেশের মধ্যে ইনফ্লেশন বাড়বে। হলও তাই। চাউলের দাম হইহই করে বেড়ে গেল, এবং সরকার আবার অছিলা পেল রেশনিং প্রথা পুনরায় চালু করবার। তখন থেকেই রেশনিং আবার চালু হয়ে আছে। ইনফ্লেশনও ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছে।

ঌ ঌ ঌ

প্রফুল্ল সেন মশাই যেমন আমার বিপক্ষে সুরেশবাবুর কাছে এসে অনুযোগ করেছিলেন, তেমনই আমার বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী সরদার বল্লভভাই প্যাটেল। সুরেশবাবু তখন সংসদের সদস্য, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তখন তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেবার সরদার প্যাটেল সুরেশবাবুকে বললেন, আপনার কাগজের এই লোকটাকে (মানে, আমাকে) আপনি তাড়িয়ে দিন, লোকটা কাগজে যা-তা লিখছে। এই 'যা-তা' জিনিসটা কি, সে সম্বন্ধে আমি আগে বলে নিই, তারপর যা ঘটল, পরে

বলব। এই 'যা-তা' জিনিসটা যা আমি লিখেছিলাম, তা হচ্ছে, প্রথম, পাকিস্তানের সঙ্গে একটা বাণিজ্যিক চুক্তি করা দরকার, আর দ্বিতীয়, টাকার মূল্য হ্রাস করা প্রয়োজন। দুটোই পরে ঘটল, কিন্তু সেদিন আমার এই দূরদর্শিতামূলক অপরাধের জন্য সরদার প্যাটেল সুরেশবাবুকে বলেছিলেন, এ লোকটাকে আপনি তাড়িয়ে দিন!

ꩰ ꩰ ꩰ

সুরেশবাবু সেবার দিল্লি থেকে ফিরে এসে, সমস্ত ঘটনাটাই আমাকে বললেন। বললেন, আর একটু হলে সরদার প্যাটেল আমাকে বেকায়দার মধ্যে ফেলে দিতেন, যদি না সেখানে ফিনানস্ ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী পি. সি. চ্যাটার্জি (ইনি পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অভ্ ইণ্ডিয়ার গভর্নর হয়েছিলেন) উপস্থিত থাকতেন। পি. সি. চ্যাটার্জি সরদার প্যাটেলকে বললেন, আমি অতুলবাবুকে চিনি, আজ যদি সুরেশবাবু ওঁকে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' থেকে বের করে দেন, কাল উনি শরৎবাবুর (শরৎচন্দ্র বসুর) 'নেশন' কাগজে যোগ দেবেন, এবং 'নেশন'-এর মেজাজ অনুযায়ী উনি 'নেশন'-এ আরও তীব্র ভাষায় লিখবেন। তখন সরদার প্যাটেল বিরত হলেন। পরে অবশ্য আমি সরদার প্যাটেলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, এবং তিনি আমার অনেক উপকার করেছিলেন।

ꩰ ꩰ ꩰ

'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর 'ইকনমিক সাপ্লিমেন্ট' সমসাময়িককালের সংবাদপত্র পরিচালনা ও সম্পাদনার ওপর এক বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করল। আমাদের সাপ্লিমেন্ট-এ প্রকাশিত অর্থনৈতিক প্রবন্ধসমূহের জনপ্রিয়তা অন্যান্য সংবাদপত্রসমূহের চোখ খুলে দিল। এযাবৎকাল দৈনিক পত্রিকাসমূহে রাজনৈতিক প্রবন্ধই প্রাধান্য পেত। যখন তারা বুঝতে পারল যে অর্থনৈতিক প্রবন্ধও দৈনিক পত্রিকার সম্পাদনার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করতে পারে, তারাও অর্থনৈতিক প্রবন্ধ ছাপতে লাগল। দু-একটা পত্রিকা আমাদের দেখাদেখি 'অর্থনৈতিক ক্রোড়পত্র'ও বের করা শুরু করল, কিন্তু সম্পাদনার গলদের জন্য তাদের সে প্রয়াস বেশিদিন স্থায়ী হল না।

আমাদের 'ইকনমিক সাপ্লিমেন্ট'-এর সাফল্যের পিছনে ছিল দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা এবং দেশের বহু অর্থনৈতিক

লেখকের সক্রিয় সহযোগিতা। গোড়ার দিকে যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছিলাম তাঁদের মধ্যে ছিলেন অমর্ত্য সেন, জে. এন. তালুকদার, নবগোপাল দাস, মনকুমার সেন, পরেশ চ্যাটার্জি, অনিলকুমার বসু, এল. কে. ঝা, কে. এন. রাজ, প্রিয়তোষ মৈত্র, হিমাংশু রায়, ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ ও আরও অনেকে। এর মধ্যে কয়েকজন পরবর্তীকালে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের লেখাগুলো যে মাত্র জনসমাজকে আকৃষ্ট করেছিল তা নয়। ছাত্রসমাজও লেখাগুলো ভীষণ আগ্রহের সংগে পড়ত। ফলে, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড''-এর প্রচারসংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেল। সুরেশবাবু খুব খুশি। নিজের দূরদর্শিতার জন্য গর্ববোধ করেন। শীঘ্রই কানাই সরকার মশাই 'ডেভেলপমেন্ট অফিসার' নিযুক্ত হলেন। 'ডেভেলপমেন্ট অফিসার' হবার পর কানাইবাবুর প্রথম কীর্তি হল একখানা বড় আকারের 'এগ্রিকালচার' বা কৃষি সম্বন্ধে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনা। পরবর্তীকালে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' শত শত বিশেষ সংখ্যা বের করেছে, কিন্তু সেদিনের 'এগ্রিকালচার' সম্বন্ধে বিশেষ সংখ্যাই ছিল ওইসব বিশেষ সংখ্যার অগ্রদূত। 'এগ্রিকালচার' সম্বন্ধে ওই বিশেষ সংখ্যার রূপদান ও সম্পাদনার ভার দেওয়া হল আমার ওপর। বিশেষ সংখ্যাটি দেশের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগালো, বিশেষ করে আমার একটা স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ। ওই প্রবন্ধে আমি সরকারকে উদ্বুদ্ধ করলাম এদেশে জাপানী জাতের ধান চাষ প্রবর্তনের জন্য। তখন (১৯৫২) এদেশের লোক, এমনকি কৃষি-বিশারদরাও এ-জাতের ধানের নাম শোনেনি। সুতরাং চতুর্দিক থেকেই কৌতূহলী লোকেরা জিজ্ঞাসা করে পাঠাতে লাগল, জাপানী ধান, সে আবার কি? আমি আগেই বলেছি যে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে সুরেশবাবু যখন আমার ওপর 'ইকনমিক সাপ্লিমেন্ট' পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন, তখন থেকেই আমি গ্রামীণ উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছিলাম। উপলব্ধি করেছিলাম, কৃষিই হচ্ছে গ্রামের জীবন। গ্রামের লোকের এটাই হচ্ছে কর্ম, ধর্ম ও স্বর্গ। সুতরাং কৃষির উন্নতি ঘটাতে হলে একর-প্রতি ফলন বাড়াতে হবে। সেজন্য জগতের যে-সব দেশে একর-প্রতি ফলন বেশি, সে-সব দেশের কৃষি-সংস্থাসমূহের সংগে সংযোগ স্থাপন করলাম। জাপানের সংগে সংযোগ-স্থাপনের পর ম্যানিলায় অবস্থিত ইনটারন্যাশনাল রাইস ইনস্টিটুটের বিষয় অবগত হলাম। কিনে ফেললাম ওদের একগাদা বই। ওইসব বই থেকেই IR-জাতীয় ধানের বিষয় অবগত হলাম। তারই ভিত্তিতে এ-সম্বন্ধে 'এগ্রিকালচার' সম্বন্ধে বিশেষ সংখ্যায় আমার প্রবন্ধটা লিখেছিলাম। এখন জিজ্ঞাসু লোকদের সেইসব বইয়ের সন্ধান দিলাম। সরকারী মহলকেও যথাযথ তথ্য সরবরাহ করলাম। ফলে, শীঘ্রই এদেশে IR-জাতীয় ধানের

চাষ শুরু হল এবং তাতে এদেশের কৃষিজীবী সমাজ উপকৃত হল।

ঌ ঌ ঌ

আমার লেখাগুলো পড়বার জন্য লোকের যেরকম আগ্রহ দেখতাম, তাতে মনে হয় আমি খুব বিচক্ষণতা ও দক্ষতার সঙ্গেই 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর 'ইকনমিক সাপ্লিমেন্ট'টা চালিয়েছিলাম। মোট ত্রিশ বছর আমি ওটার সম্পাদনা করেছিলাম। গোড়ার দিকে 'By Our City Editor' এই উপনামে লিখতাম। পরে যখন নিরঞ্জন মজুমদার 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হলেন, তখন তাঁর অভিলাষ অনুযায়ী 'যম' (Yama) ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলাম। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে মিস্টার এ. এল. ডায়াস্ যখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে অভিষিক্ত হলেন, তখন এখানে আসামাত্রই তিনি এক চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন—'আমি Yama-লিখিত প্রবন্ধসমূহের খুব অনুরাগী পাঠক। কিন্তু এতদিন জানতাম না Yama কে? এখন জানলাম।...আপনার সঙ্গে আমার এক বিষয়ে মিল আছে। আপনি ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন, আমিও ইতিহাসের ছাত্র। এখানে আসবার পর আমি আপনার 'হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অভ্ বেংগল' বইখানা পড়ে খুবই উপকৃত হয়েছি। আপনি আমার শুভেচ্ছা জানবেন।'

ঌ ঌ ঌ

আমি আবার 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর প্রসঙ্গে ফিরে আসব। ইতিমধ্যে আমি আমার পারিবারিক জীবনের কথা কিছু বলতে চাই। আমার বাবার মৃত্যুর পর সমস্ত সংসারের ভার আমার কাঁধে এসে পড়েছিল। মস্ত বড় যৌথ সংসার। সংসারে মা ছাড়া, আমি ও আমার স্ত্রী ও ছেলেপুলে, মেজভাই ও তার স্ত্রী এবং ছেলেপুলে, ছোটভাই তখনও কলেজে পড়ে, এক অনূঢ়া ভগিনী, আর এক ভগিনী ও ভগিনীপতি এবং তাদের ছেলেপুলে আমাদের সংসারেই থাকত। আবার যুদ্ধের সময় আর এক ভগিনী ও ভগিনীপতি আর তাদের ছেলেপুলেরা আমাদের ঘাড়েই এসে পড়ল। আমাকেই সব সামলাতে হল। অনূঢ়া বোনের বিবাহ দিলাম। ছোটভাইয়েরও বিবাহ দিলাম। বিবাহের পরই নতুন বউমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটল। তাকে নিয়ে কয়েক মাস বেশ নাস্তানাবুদ হলাম। কলকাতার বিচক্ষণ চিকিৎসকদের দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে তাকে ভাল করে তুললাম। এদিকে ছোটভাইকে কলেজে পড়াতে লাগলাম। কয়েক বছর কলেজে পড়বার

পর, সে যখন আর পড়তে চাইল না, তখন আমার বিশিষ্ট বন্ধু 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সেক্রেটারী বলাইবাবুকে (সুনীলকান্তি ঘোষ) বলে তাকে 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'য় চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলাম। কিন্তু স্বস্তি পেলাম না। যে ভগিনীপতি আমাদের বাড়িতে থাকত, সে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় খুন হল। তারপর নানারকম পারিবারিক কলহের উদ্ভব ঘটল। আমার বড়ছেলে লক্ষ্মী মারা যাবার পর এই কলহ তুঙ্গে উঠল। অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে উঠল যে আমি বাধ্য হলাম বাড়ি ছেড়ে বিশ্বকোষ লেনে গিয়ে বাস করতে। ঘটনাটা একটু খুলেই বলা দরকার। লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর আমি যখন একেবারে মুষড়ে পড়েছি, তখন আমার মা আমাদের আলাদা করে দিলেন। আমার স্ত্রী বাধ্য হয়ে আমাদের জন্য আলাদা রাঁধতে আরম্ভ করল। কিন্তু আমার স্ত্রীকে রাঁধবার জন্য কোন ঘর দেওয়া হল না। আমার স্ত্রী উঠানেই রাঁধতে আরম্ভ করল। একদিন এমন এক নিদারুণ ঘটনা ঘটল যে পাড়ার লোকেরা ছুটে এল। আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। যারা এল তাদের মধ্যে ছিল নির্মল সাহা। আমাদের বাড়ির একখানা বাড়ির পরেই যতীন সাহা মশাইয়ের বাড়ি। নির্মল যতীন সাহার দৌহিত্র। এক-সময় ও মামার বাড়িতেই থাকত। তখন ও নানারকম অনুষ্ঠান-সভা করত। ওই-সব সভায় আমাকেই সভাপতি করত। তা ছাড়া, ও আমার মেজছেলে বদ্রির বন্ধু। আমাদের বাড়িতে সংঘটিত ওই নিদারুণ দৃশ্য নির্মল আর সহ্য করতে পারল না। আমার হাত ধরে সে আমাকে বলল, মেসোমশাই, আপনার আর এখানে থাকা উচিত নয়, আপনি আমাদের বাড়ি চলে আসুন।

বদ্রি আমাদের ঘরে চাবি লাগিয়ে দিল। আমরা সকলে নির্মলদের বাড়ি চলে গেলাম। সেই থেকে আমি পৈতৃক-ভিটাচ্যুত হলাম।

নির্মলদের বাড়ি গেলাম বটে, কিন্তু সেখানে থাকবার জায়গার খুবই অকুলান। নির্মলরা বিশ্বকোষ লেনের একটা বাড়ির দোতলায় মাত্র দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করত। বাড়িখানা অবশ্য স্বতন্ত্র। নীচের তলায় কোন ঘর ছিল না, মাত্র একটা উঠান ছিল। নির্মলরা যে দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়েছিল, তাতে নির্মলদেরই থাকার পক্ষে সঙ্কুলান হত না। নির্মলদের পরিবারে ছিল নির্মলের মা ও বাবা, দুই বোন মীরা ও ইরা, ও এক বিবাহিতা পিসী যার স্বামিগৃহে কোন স্থান ছিল না। ঝোঁকের মাথায় নির্মল আমাদের ডেকে এনেছিল, কিন্তু বাসস্থানের অভাবের কথা ভাবেনি। যা হোক, নির্মলের বাবা ও মা অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের দুরবস্থা দেখে, ওই দু'খানা ঘরের মধ্যে একখানা ঘর আমাদের ছেড়ে দিলেন। তার মানে, একখানা ঘরে নির্মলদের সমস্ত পরিবার বাস করতে লাগল, আর অপর ঘরখানায় আমার পরিবার। আমার পরিবারে তখন আমি ও আমার

স্ত্রী, চার ছেলে ও এক মেয়ে এবং আমার স্ত্রীকে গৃহস্থালীর কাজে সাহায্য করবার জন্য আমাদের কাছে এসে ছিল আমার শালার মেয়ে। এক কথায়, আমরা উভয় পরিবারই অমানুষিক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করতে লাগলাম। কোন লোক দেখা করতে এলে, নীচে সদরের সামনে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা কইতাম। বস্তুত ওইখানে দাঁড়িয়েই অশোক শাস্ত্রী, সুরেশ মজুমদার প্রমুখদের সঙ্গে বহুদিনই কথাবার্তা বলেছি।

১১১

যখন পারিবারিক কলহ শুরু হয় তখন, আমার বড় ছেলে লক্ষ্মী বেঁচে। ঠাকুর-মা'র হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য, সে জীবিতকালেই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সিঁথিতে একখণ্ড জমি কিনতে। যেদিন ভিতপুজো হল, সেদিন লক্ষ্মীর কি আনন্দ! ভিতপত্তন হওয়া পর্যন্ত লক্ষ্মী দেখে গিয়েছিল। তারপর আমরা তাকে অকালে হারাই।

ভিত তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর মৃত্যু ঘটায়, আমি এটাকে অশুভ বলে মনে করলাম। ঠিক করলাম, ওখানে আর বাড়ি তৈরি করব না, ভিত-সমেত জমিটা বেচে দেব। কথাটা আমার জমির সংলগ্ন জমির মালিক প্রাণশংকরবাবুর কানে গিয়ে পৌঁছাল। একদিন তিনি আমাদের বাগবাজারের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, শুনলাম আপনি জমিটা বিক্রি করতে মনস্থ হয়েছেন। যদি বিক্রি করেন, আমাকে দেবেন। জমিটা আমি প্রাণশঙ্করবাবুকেই বেচে দিলাম।

১১১

এর চার মাস পরেকার কথা। আমরা তখন নির্মলদের বাড়িতেই থাকি। জায়গার অকুলানের জন্য আমার ছেলে বদ্রি রাত্রিতে নেবুবাগানে ওর জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি শুতে যায়। একদিন ভোরবেলা ও তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখল, লক্ষ্মী যেন এসে ওকে ধাক্কা দিয়ে তুলে বলছে, আমি তো চলে এসেছি, তা তোরা তো রয়েছিস। বাবা ঘর-ছাড়া হয়েছে, তোরা বাবাকে জমিটা বিক্রি করা থেকে বিরত করতে পারলি না! আমি ওই জমিটার ওপর যে আমগাছটা আছে, সেখানেই আছি। তোরা বাবাকে আবার ওখানে বাড়ি করতে বল।

আমি শুনে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম।

প্রাণশংকরবাবু ছিলেন হাইকোর্টের কনসালটিং ইঞ্জিনীয়ার। আমি দুপুর-

বেলা স্টক একস্‌চেঞ্জ অফিস থেকে বেরিয়ে প্রাণশঙ্করবাবুর অফিসে গিয়ে আদ্যোপান্ত সব কথা বললাম।

প্রাণশঙ্করবাবু আমাকে বললেন, আমি এটা জানতাম। আপনি যে তখন পুত্রশোকে কাতর হয়ে জমিটা বিক্রি করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সেটা বুঝতে পেরেই আমি জমিটা নিয়ে আটকে রেখেছিলাম, পাছে অন্য কোন অবাঞ্ছনীয় লোক জমিটা কেনে ও প্রতিবেশীরূপে এসে হাজির হয়। ও-জমি আপনার ছিল এবং এখনও আপনারই আছে।

একথা বলে প্রাণশঙ্করবাবু জমির কোবালা বাতিল করে দিলেন এবং মূল্য ফেরত নিয়ে জমিটা আমাকে আবার ফিরিয়ে দিলেন। আমি দ্বিতীয়বার আবার ভিতপুজো করে ওখানে বাড়ি তৈরি করা শুরু করলাম।



নির্মলদের বাড়িতে আমরা ছ'মাস ছিলাম। ইতিমধ্যে সিঁথির বাড়ি তৈরি হল। ছোট একতলা বাড়ি। দু'খানা শোবার ঘর, একখানা বসবার ঘর, রান্নাঘর ও বাথরুম, এবং একটা ছোট দালান ও বাড়ির পিছনে ছোট একটু বাগান।

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি একদিন আমরা নূতন বাড়িতে এলাম। তখন সবই তছনছ অবস্থা। গুছিয়ে উঠতেই ক'দিন কেটে গেল।

সিঁথি তখন জনবিরল জায়গা। সারাদিনে বাড়ির সামনের রাস্তা (কালীচরণ ঘোষ রোড) দিয়ে মাত্র পাঁচ-সাতজন লোক যেত। সবই চেনামুখ। তখনকার দিনে সিঁথির লোকদের বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের মোড়ে এসে ৩০-এ বাসে উঠতে হত। সিঁথির ভেতরে বাস যেত না। সিঁথির রাস্তাটা ছিল খুব খারাপ। সুরকির রাস্তা এবং মাঝে মাঝে ছ'ইঞ্চি থেকে এক ফুট পরিমাণ গভীর গর্ত। বর্ষার দিনে গর্তগুলো জলে ভরে থাকত। ওপর থেকে বোঝা যেতনা সেখানে গর্ত আছে কিনা। সব সময়েই ভয় হত, গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে পা না ভেঙে যায়।

আমার বাড়িখানা ছিল খুব নিরালা। চতুর্দিকে মাঠ ময়দান ও বাগানবাড়ি। সন্ধ্যা হলেই শিয়াল ডাকত এবং দিনের বেলায় যখন তখন এখানে-সেখানে বিষধর সাপ দেখা যেত।

বাজার করতে আসতে হত শ্যামবাজারে। বরানগরের বাজারে কেউ যেত না। খাবারের দোকানেরও অভাব ছিল। বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত এলে তাদের আপ্যায়ন করবার জন্য বাসে করে এসে শ্যামবাজার থেকে খাবার কিনে নিয়ে যেতে হত।

সবচেয়ে মুশকিল হল ছেলেদের লেখাপড়া নিয়ে। মেজছেলে স্কুল ফাইনাল

পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল। পরের দুই ছেলে বাগবাজারে কাসিমবাজার স্কুলে পড়তে লাগল। বাসে করে তারা আসে যায়। মেয়ে সুষমা ও ছোটছেলে শঙ্কর স্থানীয় সি. ই. এম. জেড. মিশন স্কুলে ভর্তি হল। ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়বার পর সুষমা ভর্তি হল দমদম নাগেরবাজারে ক্রাইস্ট চার্চ স্কুলে। স্কুলের অধ্যক্ষা মিস ম্যামানকে বলে তার জন্য স্কুল-বাসের ব্যবস্থা করে দিলাম। শঙ্কর ভর্তি হল বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে।

বন্ধুবান্ধবেরও অভাব। সিঁথির মোড় থেকে আমার বাড়ি যাবার পথের মাঝখানে শীতলাতলার সামনে ছিল রবি চৌধুরীর বাড়ি। রবি চৌধুরী ছিল 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বার্তা-সম্পাদক। আমার খুব পুরোনো বন্ধু। রবিবাবুর মা আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন। আমাদের তিনি নিজের ছেলে-মেয়ের মতোই দেখতেন, এবং প্রতিদিন আমাদের বাড়ি আসতেন।

আর একজন আমার স্ত্রীকে মা বলে ডাকতেন এবং সব সময়ে এসে পুত্রশোকে কাতরা আমার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতেন। আমার স্ত্রীও তাঁকে পিতৃতুল্য মনে করত। তিনি হচ্ছেন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট জজ অনুকূল সান্যাল মশাই। এরকম দেবতুল্য লোক আমি জীবনে কখনও দেখিনি। তাঁর এক পুত্র ফণি সান্যাল ছিল সেন্ট পলস্ কলেজের অধ্যাপক, ও অপর ছেলে মণি সান্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দু'জনেই অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন।

একদিন অনুকূলবাবু সুপুরুষ এক যুবককে এনে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, এ আমার জামাই সমরেন বাগচি। এখন এ চন্দননগরের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। বাগচি মশাই পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জুডিসিয়াল সেক্রেটারী ও হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। সান্যাল মশাইয়ের মৃত্যুর পর আমি এবং আমার স্ত্রী খুবই আঘাত পেয়েছিলাম।

ঌ ঌ ঌ

নিঃসঙ্গতা এড়াবার জন্য অধিকাংশ সময় কাটাতাম আমার সংলগ্ন প্রতিবেশী প্রাণশঙ্করবাবুর বাড়িতে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে, মুখ-হাত ধুয়ে প্রথম গীতাপাঠ করতাম। উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারিত আমার গীতাপাঠ অনেককেই চমৎকৃত করত। আমার গীতাপাঠ একটা শোনবার মত জিনিস ছিল। শুদ্ধ উচ্চারণ ও পাঠভঙ্গীর জন্য আমার গীতাপাঠ অনেককেই আকৃষ্ট করত।

গীতাপাঠ শেষ করে, চা খেয়ে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর জন্য প্রবন্ধ লিখতে

প্রবৃত্ত হতাম। তখন প্রতিদিনই একটা করে প্রবন্ধ লিখতে হত। নিজ হাতে লিখতে আমি অশক্ত ছিলাম। সেজন্য টাইপরাইটারে লিখতাম। খবরের কাগজের এক কলম প্রবন্ধ লিখতে আমার আধঘণ্টা সময় লাগত। ক্ষিপ্রতার সংগে লেখার বৈশিষ্ট্য আমার এখনও বজায় আছে। তবে বাংলা-লেখা নিজ হাতে লিখতে হয় বলে, কিছু বেশি সময় লাগে।

প্রবন্ধ-লেখা শেষ হলে, প্রাণশংকরবাবুর বাড়িতে গিয়ে নানারকম গল্পগুজব করতাম। আমি তখন কলকাতার অনেকগুলো স্কুলের সেক্রেটারী কিংবা প্রেসিডেন্ট ছিলাম। স্কুলের কাজের ব্যাপারে, এরমধ্যে যদি কোন স্কুলের হেডমাস্টার বা হেডমিস্ট্রেস্ এসে পড়ত. আমার ছেলেরা আমাকে প্রাণশংকরবাবুর বাড়ি থেকে ডেকে আনত।

প্রাণশংকরবাবুর বাড়িতে ওঁদের অনেক আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব আসতেন। তাঁদের সংগে আমাদের বেশ একটা হৃদ্যতা গজিয়ে উঠেছিল। এ ছাড়া, রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজরাও আসতেন। কানাই মহারাজ প্রায়ই আসতেন। তখন তিনি পাথুরিয়াঘাটার রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধান করতেন। কানাই মহারাজের সংগে আমার বেশ প্রীতি ছিল। পরে কানাই মহারাজ (স্বামী লোকেশ্বরানন্দ) নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের সর্বাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। এখন তিনি গোল পার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটুট অভ্ কালচার-এর সেক্রেটারী। বেদান্ত ও ভারতীয় দর্শনে ওঁর অসাধারণ বুৎপত্তি।

ՖՖՖ

প্রাণশংকরবাবুর ওখানেই পরিচিত হলাম বাঙলাদেশের একজন বরেণ্য মনীষীর সংগে। তিনি হচ্ছেন প্রাণশংকরবাবুর বড়ভাই গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী। নিজ পরিবারবর্গের সংগে বনিবনা না হওয়ায়, তিনি তখন সিঁথিতে আমাদের বাড়ির দু-চারখানা বাড়ি পরে এক ভ্রাতুষ্পুত্রীর বাড়িতে থাকতেন। তাঁর সংগে আমাদের বেশ আত্মীয়তা হয়ে গিয়েছিল। সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর সংগে অনেক আলোচনা হত। একসময় তিনি 'নারায়ণ' পত্রিকা সম্পাদনায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহযোগী ছিলেন। তাঁর রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙলার ঊনবিংশ শতাব্দী', 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশী যুগ', 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাঙলায় বিপ্লববাদ' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রেখেছে।

সন্ধ্যার দিকে বৈঠকটা বসত আমাদের বাহিরের বসবার ঘরে। যাঁরা আসতেন,

তাঁদের অধিকাংশই কাসিমবাজার স্কুলের মাস্টারমশাইরা। এঁরা অনেক রাত্রির পর্যন্ত স্কুল সম্বন্ধে নানারকম আলোচনা করতেন। অনেকসময় বাস-চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে, তাঁরা পায়ে হেঁটেই বাগবাজারে ফিরে যেতেন।

১১১

এসময় আমার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল আমাদের পাশের বাড়ির বাসিন্দা নেত্যবাবুর সঙ্গে। নেত্যবাবুর জ্যোতিষশাস্ত্রে বেশ দখল ছিল। আমিও অনেককাল ধরে জ্যোতিষের চর্চা করে এসেছিলাম। সেজন্য আমাদের দু'জনের মধ্যে জ্যোতিষ সম্বন্ধেই প্রায় আলোচনা হত।

একদিন সকালে আমি সবেমাত্র গীতাপাঠ শেষ করে উঠেছি, এমন সময় খবরের কাগজখানা হাতে করে নেত্যবাবু আমাকে একটা দুঃসংবাদ দিতে এলেন। বললেন, দাদা, আপনার গুরুদেব অধ্যাপক বিনয় সরকার মশাই মারা গেছেন। আমি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাত্র তার আগের দিন আমি আমেরিকা থেকে বিনয় সরকার মশাইয়ের চিঠি পেয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, তিনি ভালই আছেন।

আগেই বলেছি যে বিনয় সরকার মশাইয়ের প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। আমাকেও বিনয় সরকার মশাই খুবই ভালবাসতেন। আমি পুলিস হসপিটাল রোডে তাঁর বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। সন্ধ্যার পর গেলে বিনয় সরকার মশাই আমাকে সান্ধ্যভোজন না করিয়ে ছাড়তেন না।

একবার লড়াইয়ের সময় সরকারী কাজে ব্যাপৃত থাকার দরুন আমি কিছুদিন তাঁর বাড়ি যেতে পারিনি। কিছুদিন পরেই অধ্যাপক সরকারের কাছ থেকে এক পত্র পেলাম। পত্রটা খুবই সংক্ষিপ্ত। তাতে মাত্র একটা বাক্যই লেখা ছিল—'কই তোমার টিকি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? বি'। আমি লক্ষ্য করতাম যে আমি ওঁর ওখানে না গেলে উনি স্বস্তিবোধ করতেন না।

যেদিন তিনি শেষবার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে গেলেন, তার আগের দিন অনেক রাত্রির পর্যন্ত আমার সঙ্গে উনি আলাপ-আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। নানা বিষয়ে সেদিন আমার সঙ্গে ওঁর কথা হয়েছিল। কথার মাঝখানেই তিনি আমার হাতে একখানা বই দিয়ে বললেন, আগে নেড়েচেড়ে দেখ, পরে একটা মজার কথা বলছি। দেখলাম বইখানার নাম হচ্ছে 'সোশ্যাল থট্ ইন বেঙ্গল'। বইখানার রচয়িতা হচ্ছে অধ্যাপক সরকারের মেয়ে ইন্দিরা।

হিন্দিতে একটা বচন আছে, 'গাগরী মে সাগর ভর দিয়া গায়া হ্যায়'। মানে, সাগরের সব জল একটা কলসীর মধ্যে ভরে দেওয়া হয়েছে। বইখানা দেখে ওই

বচনটাই আমার মনে পড়ল। দু'শতাব্দী ধরে বাংলাভাষায় উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, বইখানাতে সন, তারিখ অনুযায়ী তাদের পরিচয় ভাষ্যসহকারে দেওয়া হয়েছে। আমি বইখানা নেড়েচেড়ে ইন্দিরার কৃতিত্বের তারিফ করলাম।

অধ্যাপক সরকার বললেন, তবে একটা মজার কথা শোন। বইখানা লেখা হলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে ওখানা প্রকাশ করাবার জন্য রেজিস্ট্রার সতীশের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। বইখানা দেখেই সতীশ আমাকে বলল, আরে, ইন্দিরা এটা করেছে কি? এ তো দেখছি চক্রবর্তী চ্যাটার্জি কোম্পানির দোকানের একটা ক্যাটালগ বানিয়েছে! এটা আবার ইউনিভারসিটি প্রকাশ করবে কি?

ও ও ও

নিত্যবাবুর মুখে অধ্যাপক সরকারের মৃত্যুসংবাদ শুনে আমি শোকে খুব অভিভূত হয়ে পড়লাম। কয়েকদিন পরে, মৃত্যুর পূর্বে অধ্যাপক সরকার কর্তৃক প্রেরিত একখানা বই যখন আমার হস্তগত হল, তখন আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। এখনও আমার সিঁথির লেখবার ঘরের দেওয়ালে যে ছবিখানা টাঙানো আছে, সেটা হচ্ছে অধ্যাপক বিনয় সরকারের।

আর একজন মহান্ ব্যক্তি যিনি আমাকে গোপনে তাঁর বাড়ি ডেকে পাঠাতেন ও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি সম্পর্কে নানারকম আলাপ আলোচনা করতেন, তিনি হচ্ছেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। আমাদের মধ্যে যে আলাপ আলোচনা হত, তা আমরা উভয়ে কেউই কোনদিন অন্যের কাছে প্রকাশ করতাম না।

ডাক্তার রায় যে রবিবার মারা যান, ঠিক্ তার আগের রবিবারে তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। পূর্ব হতে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আমি সকাল এগারো-টায় ডাক্তার রায়ের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। ডাক্তার রায় বললেন, দেখ, গতকাল শনিবার রাইটারস্ বিলডিং থেকে বাড়ি ফেরার পর শরীরটা খারাপ হয়েছে। তুমি বৈকালে কি আর একবার আসতে পারবে? তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

আমি বৈকালে আবার গেলাম। ডাক্তার রায় দু'ঘণ্টা ব্যাপী আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন, মূলধনের পারস্পরিক কর্মকুশলতা বাড়ানো সম্পর্কে। হয়তো আরও অনেকক্ষণ আলোচনা করতেন, যদি না সে-সময় হঠাৎ লেডি রানু মুখুজ্যে কোন কার্য উপলক্ষে সেখানে এসে উপস্থিত হতেন। ডাক্তার রায় বললেন, আজ থাক্, তোমার সঙ্গে আর একদিন আলোচনা করব এবং সেদিন ভবতোষ দত্তকেও ডাকব।

সেই রাত্রেই ডাক্তার রায় যে বিছানা নিলেন, আর তিনি উঠলেন না। পরের রবিবারে তাঁর মৃত্যু ঘটল।

ডাক্তার রায়ের মৃত্যুর পর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'নিজস্ব প্রতিনিধি' রাইটারস্ বিলডিং-এ তাঁর বসবার ঘরে গিয়ে যা দেখেছিলেন, তা ৫ জুলাই ১৯৬২ তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ছাপা হয়েছিল : "এক কোণে গদি-মোড়া আরামকেদারা। হাত বাড়ালেই বইয়ের সারি। উপরে 'দি নিউ ইস্যু মার্কেট অ্যান্ড দি স্টক একস্‌চেঞ্জ'। এই বইখানিই তিনি শেষ পড়তে পড়তে উঠে এসেছিলেন।" বইখানি আমারই লেখা এবং আমার ডি. এস্‌-সি.-র থিসিস।

ডাক্তার রায়ের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে ১৯৬৩ সালে আমাকে একটা 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দেওয়া হউক। রবীন্দ্র-পুরস্কারের নিয়মাবলী অনুযায়ী বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষায় লিখিত বাঙলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে যদি কোন বই পেশ করা হয়, তা হলে সে বইখানার জন্য লেখককে একটা 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দেওয়া হবে। ডাক্তার রায় জানতেন যে আমার 'হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অভ্ বেংগল' সম্বন্ধে একখানা পুরোনো পাণ্ডুলিপি আছে। তিনি সেইখানাকেই সাম্প্রতিকতম গবেষণা-লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে আধুনিকতম করে আমাকে প্রকাশ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বইখানা ওঁর মৃত্যুর কয়েকমাস পরে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৩ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার'-এর বিচারকরা 'বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষায় রচিত' এই নিয়ম লঙ্ঘন করে বাংলাভাষায় লিখিত ভারতের সাধু-সন্ত সম্বন্ধে একখানা বইয়ের লেখককে সেই বিশেষ পুরস্কারটা দিলেন। সবই রাজনীতি ও ধরাধরির ব্যাপার।

যা হোক, সে-বৎসরই আমি জুরিখ থেকে ডি. এস-সি. উপাধি পেলাম। আন্তর্জাতিক পণ্ডিতমহলে আমি তখন অতিপরিচিত একজন অর্থনীতিবিদ। যেসকল বিশিষ্ট অর্থনীতিজ্ঞদের সংগে আমার পত্রালাপ হত, তাঁদের মধ্যে ছিলেন লর্ড কীনস্, অধ্যাপক কলিন ক্লার্ক, বিশ্ব-ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ইউজিন আর. ব্ল্যাক, প্রফেসর গুনার মিরডাল, কেমব্রিজের জি. আর. উইলিয়ামস্, অধ্যাপক বয়ার ও ইয়ামী প্রমুখ।

১১১

সিঁথির বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে আমার হাতের টাকা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। আমার খুব ভাবনা ছিল ঢালাইয়ের ছাদটা যদি পেটাই না করা হয়, তাহলে সামনের সালে গরমকালে ওটা হয়তো ফেটে যেতে পারে।

একদিন সকালে আমার বাড়ির সামনে একখানা মোটরগাড়ি এসে দাঁড়াল। আমি তো ঘরের ভেতর থেকে জানালা দিয়ে দেখে অবাক। স্বয়ং সুরেশচন্দ্র মজুমদার মশাই গাড়ি থেকে নামলেন। আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভেতর নিয়ে এলাম। তিনি বললেন, দমদমের বাগানে এসেছিলাম, মনে পড়ে গেল আপনি সিঁথিতে বাড়ি তৈরি করেছেন, তাই বিনোদ-কে বললাম, চল, অতুলবাবু কিরকম বাড়ি তৈরি করলেন একবার দেখে যাই।

আমি বাড়ি আর ওঁকে কি দেখাব? বাড়ি বলতে তো মাত্র আড়াই-কুঠরী ঘর। কিন্তু সুরেশবাবু খুব আগ্রহের সঙ্গে বাড়ির সবকিছু বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। পরে আমি ওঁকে ছাদে নিয়ে গেলাম। উনি বললেন, ছাদটা পিটিয়ে নেননি কেন? আমি বললাম, হাতে টাকা এলেই ওটা করে নেব। উনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ছাদটা পেটাতে ও চারদিকে পাঁচিল দিতে কত টাকা খরচ হবে? আমি বললাম, আনুমানিক সাড়ে তিন হাজার টাকা।

সেদিন অফিসে গিয়ে এক সুসংবাদ পেলাম। জেনারেল ম্যানেজার ও চীফ অ্যাকাউণ্টটেন্ট সুধীন দাশগুপ্ত মশাই আমার ঘরে এসে বললেন, মাহিনা-বৃদ্ধির অজুহাতে সুরেশবাবু আজ আপনাকে সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়েছেন। বলে-ছেন, অতুলবাবু যেন তাড়াতাড়ি ছাদটা পিটিয়ে নেন।

সিঁথির বাড়ি তৈরির ব্যাপারে এরকম দৈব ব্যাপার অনেকবার ঘটেছে। আমি যেমন-যেমন মাহিনা পেয়েছি তেমন-তেমন বাড়ি তৈরি করেছি।

মাসের গোড়ায় মাহিনা পেলেই, আমি কিছু টাকা বাড়ি-তৈরির কাজের জন্য আলাদা করে রাখতাম, মিস্ত্রিদের মজুরী দেবার জন্য।

একবার মাসের শেষে মিস্ত্রিরা আমাকে বলল, বাবু, সামনের সপ্তাহে আমাদের পরব। সামনের সপ্তাহের মজুরীটা আমাদের আগাম দিতে হবে।

আমি বললাম, ঠিক আছে, টাকাটা তোমরা আজই নিয়ে যেতে পার। তোমাদের টাকা আমি মাসের গোড়া থেকেই মজুত রাখি।

তারা তখন নিল না। বলল, আজ নিয়ে গেলে টাকাটা খরচ হয়ে যাবে, যেদিন দরকার হবে সেদিন নেব।

ঠিক তারপরই কয়েকজন আত্মীয়স্বজন বিয়ের নেমন্তন্ন করে গেলেন। বিয়ের লৌকিকতা করতে গিয়ে আমার হাতের সব টাকা খরচ হয়ে গেল।

মহা ফাঁপরে পড়লাম। মিস্ত্রিদের টাকা দেব কি করে?

আমি যখন বাগবাজারে থাকতাম, তখন আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই মাসের শেষের দিকে আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিত। আমি আমার ছেলেকে তাদের কাছে টাকার সন্ধানে পাঠালাম। কিন্তু আমার ছেলে নিরাশ হয়ে ফিরে

এল। ফিরে এসে বলল, তাঁরা সকলেই বললেন, তোমার বাবা তো জানেন মাসের শেষের দিকে আমাদের হাতে টাকা থাকে না, আমরা তো বরাবরই মাসের শেষের দিকে তোমার বাবার কাছ থেকে টাকা ধার নিতাম। তা মাহিনা পেলে সামনের মাসের গোড়ার দিকে টাকা দিতে পারি।

আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। মিস্ত্রিদের কি করে টাকা দেব, এই চিন্তায় ক'দিন আহার-নিদ্রাই ত্যাগ করলাম। চিন্তা করতে করতে একদিন এক ডবল-ডেকার বাসের ওপরতলায় বসে অফিস যাচ্ছি। হঠাৎ আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। সহযাত্রীরা ভাবল, লোকটার বুঝি মাথা খারাপ। আসলে আমার হাসবার কারণ, আমি চিন্তা করতে করতে হঠাৎ ভাবলাম, আচ্ছা আমি তো অফিস থেকে কিছু মাহিনা আগাম নিতে পারি। তাহলে তো সমস্যাটা চুকে যায়। কিন্তু এরূপ আগাম টাকা কখনও নিইনি বলে, ওটা আমার মনেই পড়েনি। এই সামান্য বুদ্ধিটা আমার মাথায় আগে যোগায়নি বলে, আমি নিজের মূঢ়তার কথা চিন্তা করেই হেসে উঠেছিলাম।

সেদিন অফিসে পৌঁছাবার পরেই আমার সামনে ডাকপিয়ন এসে হাজির হল। বলল, আপনার একটা মনি-অর্ডার আছে।

আমি বিরক্তির সঙ্গে বললাম, তা মনি অর্ডার নিয়ে আমার কাছে এসেছ কেন? আমার অ্যাসিস্টান্টদের কাছে নিয়ে যাও। তারা সই করে নেবে।

পিয়ন বলল, মনি-অর্ডারটা অফিসের নয়। আপনার নিজের ব্যক্তিগত, আপনার নিজের নামে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কত টাকার মনি-অর্ডার?

—১৪৯ টাকার।

আমি চমকে উঠলাম। কেননা, মিস্ত্রিদের দেবায় জন্য আমার ঠিক ১৪৯ টাকারই প্রয়োজন।

আমি তাড়াতাড়ি মনি-অর্ডার ফরমটা নিয়ে দেখলাম যে মনি-অর্ডারটা এসেছে ইনকাম-ট্যাকস্ ডিপার্টমেন্ট থেকে। আট বছর আগে আমি ১৪৯ টাকা অতিরিক্ত ট্যাকস্ দিয়েছিলাম এবং সেটাই তারা ফেরত দিয়েছে।

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কেননা, এই টাকা ফেরত পাবার জন্য আমি কোন দরখাস্ত করিনি।

আগে আগে আমি অতিরিক্ত যে ট্যাকস্ দিতাম, তা ফেরত পাবার জন্য দরখাস্ত করতাম। কিন্তু টাকা ফেরত পেতে গিয়ে আমাকে এত নাকাল হতে হত যে আমি দরখাস্ত করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। সেজন্য আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যাবৃত ও দৈব বলে মনে হল।

এই ঘটনার দু'মাস পরে একদিন আমি আবার বাসের দোতলায় বসে অফিস যাচ্ছি। রায়বাগানের কাছে একজন স্যুটপরা ভদ্রলোক বাসে উঠলেন। আমাকে সম্বোধন করে বললেন, মাস্টারমশাই নমস্কার, কেমন আছেন, আপনাকে ১৪৯ টাকা ফেরত পাঠিয়েছিলাম, তা পেয়েছেন তো ?

ভদ্রলোক ইনকাম-ট্যাকস্ অফিসার। ভদ্রলোক বললেন, আমাদের ওপর সরকারের নির্দেশ আছে যে, তামাদি হবার আগে (আট বছর পর তামাদি হয়ে যেত) অতিরিক্ত পেমেন্টের জন্য কত টাকা তামাদি হয়ে সরকারের খাজাঞ্চিখানায় জমা পড়বে, তার একটা হিসাব তৈরি করবার। আমি তালিকা তৈরি করতে গিয়ে দেখি যে আপনার ১৪৯ টাকা তামাদি হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য আমি তাড়াতাড়ি আপনার হয়ে দরখাস্ত করে, নিজেই আপনার নাম সই করে, ওই টাকাটা যাতে আপনি ফেরত পান তার ব্যবস্থা করি।

ভদ্রলোক আমাকে 'মাস্টারমশাই' বলে সম্বোধন করবার কারণ, আমি যখন এ.আর.পি-র চীফ ইনস্ট্রাকটর ছিলাম, তখন ইনকাম-ট্যাকস্ ডিপার্টমেন্টের কর্মীদেরও শিক্ষাদান করেছিলাম। সেইসূত্রেই আমি তাঁদের কাছে 'মাস্টারমশাই'।

৯৯৯

সিঁথির বাড়িতে আসবার কিছুদিন পরেই আমার ন'ছেলে ভুতোর (নন্দর) অন্তর্মুখী বসন্ত হয়। যন্ত্রণায় ভুতো ছটফট করত। নাক দিয়ে অনর্গল রক্ত পড়ত। আমার স্ত্রীর ভাবনার অন্ত ছিল না। দিনরাত শীতলা মাকে ডাকত ও ঘরে ধূপ-ধুনো জ্বালত ও গংগাজল ছিটাত। মায়ের দয়ায় ভুতো খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠল। আমার স্ত্রী তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

কিন্তু মায়ের প্রাণ তো ! দুর্বল ভুতো আবার যখন বাগবাজারে স্কুলে যাওয়া শুরু করল, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার স্ত্রীর মনে শান্তি থাকত না।

এ ছাড়া, আমার স্ত্রীর মনের অন্তস্তলে এক গভীর ক্ষত ছিল। সেটা হচ্ছে লক্ষ্মীকে হারাবার জন্য। আমার স্ত্রী প্রায়ই লক্ষ্মীর জন্য কাঁদত। আমার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতেন পাশের বাড়ির প্রাণশংকরবাবু ও তাঁর স্ত্রী। মাঝে মাঝে অনুকূল সান্যাল মশাই ও রবিবাবুর মা এসেও সান্ত্বনা দিতেন।

পুত্রশোকে কাতরা আমার স্ত্রীর শীঘ্রই ফিটের ব্যারাম দেখা দিল। প্রথম যেদিন ফিট হল, আমি আমার স্ত্রীর অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়লাম। ছুটে

গেলাম রবিবাবুর ভাই রমেনবাবুর কাছে একজন ডাক্তারের খোঁজে।

রমেনবাবু বললেন, দেখুন কাছাকাছি ডাক্তারের মধ্যে ডাক্তার নরেন ঘোষ আছেন। অবশ্য তাঁকে আমরা কখনও ডাকি না। তবে উপস্থিত বিপদে আপনি তাঁকে ডাকতে পারেন।

শীঘ্রই নরেনবাবু এসে আমার স্ত্রীকে সুস্থ করে তুললেন। তারপর যে আমার স্ত্রীর কতবার ফিট হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। প্রতিবারেই নরেনবাবু এসে চিকিৎসা করেছেন। নরেনবাবুর ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁকেই আমাদের গৃহচিকিৎসক নিযুক্ত করলাম। আমার বাড়ির কারুর অসুখ-বিসুখ হলে তিনিই চিকিৎসা করতেন।

১১১

কিছুদিনের জন্য আমার স্ত্রীর ফিটের ব্যারামের বিরাম এল, এক বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে।

একদিন বর্ষাকালে ভুতোর জ্বর হল। গা, হাত, পা, হাঁটু প্রভৃতিতে ভীষণ ব্যথা। আমি প্রথম ভেবেছিলাম যে, স্কুল থেকে আসবার সময় বৃষ্টিতে ভেজার দরুন বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। তখনকার দিনে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর সাধারণত তিনদিন স্থায়ী হত। চারদিনের দিন জ্বর ছেড়ে যেত। কিন্তু চারদিনের দিন ভুতোর জ্বর যখন ছাড়ল না, ডাক্তারবাবুকে খবর পাঠালাম। নরেনবাবু এসে দেখেশুনে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করলেন যে, ভুতো রিউমেটিক ফিভারে আক্রান্ত হয়েছে। আমি প্রমাদ গুনলাম। যাঁদের রিউমেটিক ফিভার সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, তাঁরা বুঝবেন না এ ব্যারামটার গুরুত্ব। এটা টি. বি.-র চেয়েও বিপজ্জনক ব্যাধি, কেননা এ ব্যাধিতে হার্টটাকে একেবারে নষ্ট করে দেয়।

ভুতোর রিউমেটিক ফিভার হয়েছে শুনে, আমি ভাবলাম, আজকালকার দিনে যেখানে আট-দশদিনেও ডাক্তাররা বুঝতে পারে না, জ্বরটা কি জ্বর, সেখানে চারদিনের দিন ডাক্তারবাবু কি করে বলেন যে এটা রিউমেটিক ফিভার। সেজন্য আমি ডাক্তারবাবুকে বললাম, একবার তাপস বোসকে কল্ দিয়ে পরামর্শ করলে ভাল হয়। তখনকার দিনে কনসালটিং ফিজিসিয়ান হিসাবে শ্যামবাজারে ডাক্তার তাপস বোসের খুব নামডাক ছিল। তাপস বোস এলেন। তিনিও সিদ্ধান্ত করলেন, যে এটা রিউমেটিক ফিভার।

কিন্তু জ্বরটা কি, তা জানলে কি হবে? জ্বরের ওষুধ কোথায়? রিউমেটিক ফিভারে যে স্পেসিফিক ওষুধ আছে, সেটা ভারতে আমদানী করা আমাদের

বুদ্ধিমান সরকার কিছুদিন আগে বন্ধ করে দিয়েছে! টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত সমস্ত শহরে তন্নতন্ন করে এমন কোন ডাক্তারখানা পাওয়া গেল না, যেখানে ওষুধটা পাওয়া গেল। তারপর দৈবক্রমে হাতিবাগানের একটা ছোট ডাক্তারখানায় ওষুধটার কয়েকটা ফায়েল পাওয়া গেল। নরেনবাবু বললেন, ওষুধটা যখন পাওয়া গেছে তখন রোগটা আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে। তিনি বেশি জোর দিলেন ভুতোর হার্টটাকে বাঁচাবার জন্য। আগেই বলেছি যে রিউমেটিক ফিভারে মানুষের হার্ট-কে চিরকালের মত পঙ্গু করে দেয়। হার্টটাকে বাঁচাবার জন্য ডাক্তারবাবু দু'বেলা পেনিসিলিন ইনজেকশন করতে লাগলেন। জ্বরটা কিন্তু সহজে বাগ মানল না।

তিনমাস কেটে গেল, তবুও জ্বর ছাড়ল না। একদিন ভুতোকে দেখতে এলেন কাসিমবাজার স্কুলের হেডমাস্টার যতীনবাবু। যতীনবাবু বললেন, তাঁর গ্রামে এক পীরসাহেব আছেন, তিনি ধুলোপড়া দেন, তাতে সব রোগ সেরে যায়। আমি সামনের শনিবার দেশে গিয়ে ধুলোপড়া এনে দেব। যতীনবাবু ধুলোপড়া এনে দিলেন। কিন্তু ধুলোপড়ার গুণও নস্যাৎ হয়ে গেল।

দুর্গাপুজো এগিয়ে আসছে। বাড়ির সকলেই আনন্দ করছে। একমাত্র ভুতো বিষন্নবদনে বিছানায় শুয়ে আছে। তাই দেখে আমার ছেলেমেয়েরা বলল, বাবা, এ বছর ভুতোদা পুজোর সময় নতুন কাপড়জামা পরতে পারবে না, আমরাও এ বছর নতুন কাপড়জামা পরব না। তুমি এ বছর পুজোর জন্য আমাদের কাপড়-জামা কিনবে না।

সে-বছর পুজোর সময় আর ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় কেনা হল না। পুজোর বিজয়ার দিন যখন বাড়ির সামনে দিয়ে বাজনা বাজিয়ে ঠাকুর বিসর্জন যেতে লাগল, ভুতো বিছানা থেকে শূন্যদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল!

ভুতো যাতে আনন্দ পায়, তার জন্য একদিন আমি ভুতোর জন্য একটা কলম কিনে নিয়ে এলাম। কলমটা হুবহু ঠিক 'শেফার' কলমের মতো। পরের দিন যখন হেডমাস্টার যতীনবাবু এলেন, ভুতো আনন্দ করে তাঁকে কলমটা দেখিয়ে বলল, দেখুন, বাবা আমাকে একটা 'শেফার' কলম কিনে দিয়েছেন। আমি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। সরলচিত্ত পুত্রকে প্রতারিত করেছি, এই অনুশোচনায় মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভুতোর আনন্দ দেখে প্রফুল্ল হয়ে উঠলাম।

শীতের মুখে একদিন ভুতোর জ্বর প্রথম ছেড়ে গেল। ভুতো শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু এই দীর্ঘ কয়েক মাস ভুতোর জন্য চিন্তায় জর্জরিত হয়ে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল।

১১১

সাতচল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে আমি কখনও অসুখে পড়িনি। এই প্রথম শক্ত ব্যায়রামে আমি শয্যাশায়ী হলাম। ডাক্তারবাবু এলেন। রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল, আমার রক্তে ইওসিনিফিল শতকরা ৮০ ভাগ হয়েছে। রক্তে এত বেশি ইওসিনিফিল কখনও মানুষের ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। সমস্ত রাত্তির আমি বিছানায় বসে কোলের ওপর একটা বালিশ নিয়ে তার ওপর ভর দিয়ে হাঁপাতাম, আর সাংঘাতিক কাশতাম। অনেক সময় মনে হত, আমি কাশতে কাশতে বুঝিবা হার্টফেল করব। এর ওপর আমার হল নিউমোনিয়া।

আমি অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমার মেজছেলে বদ্রি খুব বিব্রত হয়ে পড়ল। ছেলেমানুষ, কোন অভিভাবক নেই। অনেকে এসে তাকে অযাচিত পরামর্শ দিয়ে গেল, নরেন ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দিয়ে বাবাকে মেরে ফেলছ। বদ্রি খুব ঘাবড়ে গেল। কিন্তু আমি অচল ও অটল। বললাম, যদি মরতে হয় নরেন ডাক্তারের হাতেই মরব। অন্য ডাক্তার যেন ডাকা না হয়।

দু'মাস রোগভোগের পর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম। কিন্তু এরপর এল আমার স্ত্রীর পালা। ভুতোর অসুখের সময় আমার স্ত্রী সংসারের সমস্ত কাজকর্ম ছাড়া, ছ-মাস ধরে ভুতোর সেবা-শুশ্রূষা করেছে। তারপর ভুতো সুস্থ হবার পর, দু'মাস আমার সেবাশুশ্রূষা করেছে। এতদিন ধরে আমার স্ত্রী এসব ঝোঁকের মাথায় করে যাচ্ছিল। আমি ভাল হয়ে উঠবার পরই আমার স্ত্রী পড়ল বিছানায়। আমার স্ত্রীকে বাঁচানো দায় হল। যাহোক, ডাক্তারবাবুর চিকিৎসার ফলে আমার স্ত্রী ভাল হয়ে উঠল। কিন্তু তার নড়বার-চড়বার ক্ষমতা রইল না। ডাক্তারবাবু বললেন, হার্টটা খুব দুর্বল হয়ে গেছে। যে কোন সময় হার্টফেল করতে পারে। তিনি পরামর্শ দিলেন কোনরকমে একে বায়ুপরিবর্তনের জন্য বাইরে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে যাবার। অসম্ভব রক্তহীনতা ঘটেছিল। সেজন্য ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিলেন যে এমন জায়গায় নিয়ে যান, যেখানকার জলে লোহার পরিমাণ বেশি।

১১১

যখন আমার পারিবারিক জীবনে এসব বিপর্যয় ঘটছিল, তখন দেশের বৃহত্তর পট-ভূমিকায় ঘটছিল গুরুতর জাতীয় সংকট। এগুলো ঘটছিল আমার মেয়ে সুষমা আগুনে পুড়ে যাবার সময় থেকে। লড়াই থেমে গেল, আমরা একটা আন্তর্জাতিক

বিপর্যয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম বটে, কিন্তু সংগে সংগে এল এক নিদারুণ দুঃসংবাদ। খবর এল যে যুদ্ধবিরতির পর, জাপানে প্রত্যাবর্তনের পথে ফরমোসার তাইহোকু বিমানবন্দরে এক বিমান-দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষ নিহত হয়েছেন। কথাটা এদেশের লোক বিশ্বাস করল না। কেননা, ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে আর একবার তাঁর মৃত্যুসংবাদ 'রয়টার' প্রচার করেছিল। তখন প্রচারিত হয়েছিল যে টোকিও যাবার পথে এক বিমান-দুর্ঘটনায় সুভাষের মৃত্যু ঘটেছে। সংবাদটা ফরাসী বেতারেই প্রথম উল্লেখ করা হয়েছিল। তখন ফরাসী বেতারে বলা হয়েছিল যে তারা টোকিও থেকে ওই সংবাদ পেয়েছে। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ওই দুঃসংবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায়, ১৯৭৫-তেও দেশের লোক সুভাষের মৃত্যুসংবাদটা বিশ্বাস করল না। তারা ভাবল, সুভাষ বেঁচে আছে, কোথাও আত্মগোপন করেছে। দেশের কোন গুরুত্বপূর্ণ মোক্ষম সময়ে দেশকে সঞ্জীবিত করবার জন্য ফিরে আসবে।

সেদিন যখন তাইহোকু বিমানবন্দরে সুভাষের মৃত্যুসংবাদটা পড়লাম, তখন চলচ্চিত্রের মতো সুভাষের সমস্ত জীবনটাই চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। মনে পড়েছিল সেদিন ওটেন-ঘটিত ব্যাপারে প্রেসিডেনসী কলেজ থেকে সুভাষের বিতাড়ন, ওয়াট সাহেব কর্তৃক স্কটিশ চার্চেস কলেজে তাকে সাগ্রহে গ্রহণ, বিলাতে আই. সি. এস. পরীক্ষায় তার সাফল্য, কেমব্রিজ থেকে দর্শনে ট্রাইপস পাস, দেশে প্রত্যাগমন, সিভিল সার্ভিসের দাসত্বগ্রহণে অস্বীকার, ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ হওয়া, ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সংগে হাত মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের প্রবল বন্যায় আর্ত দেশবাসীর সেবাকরণ, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে 'ফরওয়াড'' পত্রিকার সম্পাদক পদ গ্রহণ, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা করপোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার পদে বৃত হওয়া, ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত কারারুদ্ধ হওয়া, ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচন, ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের পার্ক সার্কাস কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন, আবার সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ হওয়া, দু'বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন, মহাত্মা গান্ধীর সংগে মতবিরোধ, আবার সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ হওয়া, চিকিৎসার জন্য ইওরোপে প্রেরণ, গান্ধীবাদী নেতাদের সংগে মতানৈক্য, ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন, হলওয়েল মনুমেন্ট উৎপাটন, মহাজাতি সদন স্থাপন, দেশ থেকে অন্তর্ধান, জার্মানীতে যাওয়া, রাসবিহারী বসুর আমন্ত্রণে জাপান যাত্রা, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন, আসাম সীমান্ত পর্যন্ত বিজয় ইত্যাদি। সেদিন অনুভব করেছিলাম বাঙলামায়ের দীনতা। তাঁর প্রকৃত সেবক ও প্রতিভাশালী সন্তানরা তো সব এক এক করে চলে গেল। আশু মুখুজ্যে গেল ১৯২৪-এ, চিত্তরঞ্জন

১৯২৫-এ, যতীন্দ্রমোহন ১৯৩৩-এ, বীরেন শাসমল ১৯৩৪-এ, শরৎচন্দ্র ১৯৩৮-এ, রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১-এ। সুভাষও চলে গেল। রইল সবেধন নীলমণি শ্যামাপ্রসাদ। তারও রহস্যাবৃত অপমৃত্যু ঘটল ১৯৫৩-এ।

১১১

কে জানতো সেদিন সুসন্তানদের হারানো ছাড়া, শোকাতুরা বাঙলামায়ের কপালে আরও যন্ত্রণাদায়ক দুর্ভোগ আছে। সবই এক এক করে ঘটতে লাগল। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় নোয়াখালি ছারখার হয়ে গেল, কলকাতায় রক্তগঙ্গা বয়ে গেল, তারপর মায়ের অঙ্গচ্ছেদ ঘটল। স্বাধীনতার শর্ত হিসাবে বাঙলা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসে হাজির হল। আজও প্রশ্ন ওঠে, কেন এরকম হল? এর একমাত্র কারণ, আমাদের নেতারা তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা লাভ করে শাসনদণ্ড নিজেদের হাতে নেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল বলে। বাস্তব পরিস্থিতির কথা তারা ভুলে গিয়েছিল বা ভ্রূক্ষেপ করেনি। একসময় প্রকৃত পরিস্থিতিটা লক্ষ্য করে মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্না একটা বাস্তব প্রস্তাব করেছিল, খণ্ডিত দেশের দুই অংশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে জন-বিনিময় করা হোক। এ-সময় 'অমৃতবাজার পত্রিকা' একটা দেশব্যাপী poll গ্রহণ করেছিল। ওই poll-এর মূল প্রশ্ন ছিল—'Do you want a separate homeland for the Hindus?' ওই poll-এর উত্তরে দেশের অধিকাংশ লোকই ইতিবাচক উত্তর দিয়েছিল। কিন্তু এই প্রশ্নের মোল অর্থ বিকৃত করে দেশের নেতারা বললেন, দেশের অধিকাংশ লোকই চায়, দেশ দ্বিখণ্ডিত হোক। তাঁরা অস্বাভাবিক তৎপরতার সঙ্গে দেশ যাতে তাড়াতাড়ি দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে ও তাঁরা গদিতে বসতে পারেন, তার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরা একবারও বিবেচনা করলেন না যে সমস্যা আগে যা ছিল, তাই রয়ে গেল, দেশের খণ্ডিত দুই অংশেই দুই সম্প্রদায় রয়ে গেল। তাঁরা ওই poll-কে ভ্রূক্ষেপ না করে, আরও ভুল করলেন, ভারতকে secular state বলে ঘোষণা করে। অপরপক্ষে মুসলিম নেতারা বাস্তব সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করল। এভাবে চিহ্নিত হওয়ার ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুরা সেখানে নিরাপত্তার অভাবে দলে দলে পশ্চিম বাঙলায় ঢুকে পড়ল। দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে, পশ্চিম বাঙলা একে তো অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত হয়েছিল, এখন আগন্তুক উদ্বাস্তুদের জন্য এক কঠিন সমস্যার মধ্যে গিয়ে পড়ল।

১৯৪৭

দেশ দ্বিখণ্ডিত হলে, কি কি অর্থনৈতিক সমস্যা পশ্চিম বাঙলাকে বিব্রত করবে, সে সম্বন্ধে বলবার জন্য স্বাধীনতা-লাভের অনেক পূর্বেই 'কংগ্রেস সাহিত্য সংসদ' আমাকে আমন্ত্রিত করল তাদের এক অধিবেশনে মূল বক্তা হিসাবে বলবার জন্য। এ অধিবেশনটা হয়েছিল ওয়েলিংটন স্ট্রীটে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়িতে। আমার বক্তৃতাটা তাঁরা পরে ছাপিয়েছিলেন তাঁদের পত্রিকাতে। আমি সমগ্র পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করে যে পর্যালোচনা করেছিলাম, তাই স্বাধীনতা-লাভের পর অক্ষরে অক্ষরে ঘটল। আর একবার লোক আমার অর্থনৈতিক দূরদর্শিতার তারিফ করতে লাগল। আমি যে ভুল করিনি, এই অনুভূতি আমাকে অভিভূত করল। আমার জীবনে বারংবারই আমি আমার লেখার মধ্যে অর্থনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছি। এটাকে আমি বরাবরই আমার প্রতি ভগবানের অসীম করুণার নিদর্শনরূপে মনে করেছি।

১৯৪৮

তারিখটা হচ্ছে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারী। আগামী কাল আমার বড়ছেলে লক্ষ্মীর শ্রাদ্ধের দিন। পুত্রই পিতার শ্রাদ্ধ করে। কিন্তু অদৃষ্টবিপাকে আমাকেই পুত্রের শ্রাদ্ধ সম্পাদন করতে হবে! সমস্ত দিনটাই অত্যন্ত বিষণ্ণমনে কাজকর্ম করেছি। লক্ষ্মীর শ্রাদ্ধের জন্য কিছু ফুল ও মালা কিনতে হবে। সন্ধ্যা ছ'টার পরই 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছি। বর্মণ স্ট্রীট থেকে বেরুলেই সামনে ফুলপটিতে চন্দ্রর দোকান। চন্দ্র লোক ভাল। সেই আমায় বরাবর ফুল যোগায়। আমাকে খুব শ্রদ্ধা করে। কখনও দাম বেশি নেয় না। চন্দ্রর আচরণ ভারী বিচিত্র। আমার মেয়ের বিয়ের সময় চন্দ্র বায়না ধরল সে সমস্ত বাড়িটা ফুল দিয়ে সাজাবে। বলল, আপনার মেয়ের বিয়েও যা, আমার মেয়ের বিয়েও তাই, আমাকে ইচ্ছামতো ফুল দিয়ে বাড়িখানা সাজাতে দিন। ভাবলাম, চন্দ্র ব্যবসাদারি কথা বলছে। বললাম, চন্দ্র, মেয়ের বিয়েতে বহু টাকা খরচ হচ্ছে, আমাদের তো পুঁটিমাছের প্রাণ, ফুলটুল দিয়ে বাড়ি সাজাবার মতো বিলাসিতা করবার খরচ পাব কোথায়? চন্দ্র বলল, এত টাকাই যখন খরচ করছেন তখন নয় পাঁচ সাতশো টাকা ফুলের পেছনেই খরচ করলেন। বললাম, চন্দ্র, তামাশার কথা নয়, তুমি তো ফুল বেচবে, তোমার তাতে পয়সা হবে, কিন্তু আমার ওই অতিরিক্ত পাঁচ-সাতশো টাকার জন্য 'ত্রাহি ত্রাহি' রব করতে হবে। কিন্তু চন্দ্র

নাছোড়বান্দা। তাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারলাম না। বিয়ের দিন চন্দ্র এমন করে বাড়িটাকে সাজালো যে মনে হল বাড়িটা যেন ফুলের বাড়ি। শুধু তাই নয়। দেড় হাজারের ওপর অতিথির আপ্যায়নের জন্য বাড়ির পিছনে একটা মস্ত বড় প্যাণ্ডেল তৈরি করেছিলাম। চন্দ্র সেটাকেও ফুল দিয়ে মুড়ে দিল। তারপর অতিথিদের জন্য কয়েক ঝুড়ি মালা পাঠিয়ে দিল। আরও পাঠাল মেয়ের জন্য এক সেট ফুলের অলংকার। আমি তো চন্দ্রর কাণ্ডকারখানা দেখে, মনে মনে খুব শংকিত হয়ে উঠছি। কেবলই ভাবছি, চন্দ্র পাঁচ-সাতশো টাকার কথা বলেছিল, কিন্তু এ তো দেখছি-হাজার দু'হাজার টাকার ব্যাপার! বিয়ের পর চন্দ্র যখন বিল দিল, তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম। মাত্র পঞ্চাশ টাকার বিল। প্রথম তো আমি বিলটা দেখে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করলাম না। চন্দ্রকে বললাম, একি করেছ? চন্দ্র হাতজোড় করে বিনীতকণ্ঠে বলল, আমি ন্যায্য দামই ধরেছি, আপনি এ-সম্বন্ধে কিছু বলবেন না। চন্দ্রর সংগে এই ছিল আমার সম্পর্ক।



সেদিন চন্দ্রর দোকানে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীর শ্রাদ্ধের জন্য ফুল ও মালা কিনছি। দেখলাম, ফুল ও মালা দিতে গিয়ে লক্ষ্মীর জন্য চন্দ্রর চোখটা সজল হয়ে উঠেছে। চন্দ্র ফুল ও মালাগুলি শালপাতায় বেঁধে আমার হাতে দিয়ে, আমার সংগে কথা বলতে লাগল। লক্ষ্মীকে ও চিনত। ও লক্ষ্মীর জন্য শোক প্রকাশ ক'রে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, এমন সময় ঘটল এক অভাবনীয় ব্যাপার। দেখলাম রাস্তায় সমস্ত লোক ছুটছে ভয়ার্ত হয়ে যে যেদিকে পারছে সেদিকে। সংগে সংগে দোকানপত্তরগুলো পটাপট বন্ধ হয়ে গেল। আমিও ভয় পেয়ে গেলাম। চন্দ্রর সংগে কথা বলবার আর অবসর পেলাম না। ভাবলাম, আবার কি দাংগা বাধল! সামনে দাঁড়িয়ে ছিল একখানা রিকশা। রিকশাওয়ালাও পালাতে যাচ্ছিল। আমি রিকশাটাতে উঠে পড়ে বললাম, চল্ বাগবাজার। রিকশাওয়ালা আমাকে নিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। বেশ খানিক দূর যাবার পর রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ক্যা হুয়া? রিকশাওয়ালা বলল, বাবুজী, আপ্ শুনা নেহি —গান্ধীজী খুন হো গায়া।

পরের দিন খবরের কাগজে মহাগুরুনিপাতের বিশদ বিবরণটা পড়লাম। বেলা পাঁচটা পাঁচ মিনিটের সময় মহাত্মা গান্ধী দিল্লীর বিড়লাভবন থেকে বেরিয়ে শ্রীমতী আভা গান্ধী ও শ্রীমতী মানু গান্ধীর কাঁধে ভর দিয়ে প্রার্থনাসভার দিকে যাচ্ছিলেন। মঞ্চের কাছে পৌঁছেছেন, এমন সময় ৩০/৩৫ বৎসর বয়স্ক, খাঁকি

পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি জনতার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে রিভলবার দিয়ে গান্ধীজীকে লক্ষ্য করে চারবার গুলি ছোড়ে। গান্ধীজী সঙ্গে সঙ্গেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। ৩৫ মিনিট পর তার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। সরকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে, ১৩ দিন শোকদিবস পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। আততায়ী গ্রেপ্তার হয়েছে। নাম তার নাথুরাম বিনায়ক গডসে, জাতিতে মারাঠী হিন্দু। এই দুঃসংবাদের মধ্যেই লক্ষ্মীর শ্রাদ্ধ সম্পাদন করলাম।

১১১

আর একটা ঘটনা বিবৃত করবার উদ্দেশ্যে আমি আবার আমাদের সেই পুরানো এ. আর. পি. ক্লাবে ফিরে যাচ্ছি। আগেই বলেছি, এ. আর. পি. ক্লাবের সেক্রেটারী ছিলেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সুনীলকান্তি ঘোষ, আর আমি ছিলাম অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারী। সুনীলবাবু সকালে ও বিকালে দু'তিন ঘণ্টার জন্য ক্লাবে আসেন, আর বাকি সময় আমাকেই শ্মশান জাগিয়ে ক্লাবে বসে থাকতে হয়। এর মধ্যে মেম্বররা এলে, তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করি। তা না হলে বাকি সময় আমি ওখানে পড়াশোনা করি। আগেই বলেছি যে ওখানে বসেই আমি লিখেছিলাম হিন্দু মহাসভার মুখপত্র 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের জন্য আমার 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়', 'টাকার বাজার' ও বহু অর্থনৈতিক প্রবন্ধ। আরও লিখেছিলাম ইংরেজিতে 'হাউ সেফ্ আর গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ', 'সেভিংস্ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন ইন্ডিয়া', 'প্রফিট্ হান্টিং অন দি স্টক একসচেঞ্জ', 'ইন্ডিয়াজ ন্যাচারেল রিসোরসেস্', 'ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং ইন ইন্ডিয়া' ও ইংরেজিতে অসংখ্য প্রবন্ধ। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আমি এ. আর. পি. ক্লাবে বসে করছিলাম তা হচ্ছে ডক্টরেট পরীক্ষার জন্য পেশ করবার নিমিত্ত 'ভারতের মূলধনের বাজার' সম্বন্ধে একখানা থিসিস্ লেখা। ভারতের মূলধনের বাজারের গঠন ও কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে এসময় ভারতের অর্থনীতিবিদগণের বা পণ্ডিতমহলের কোন জ্ঞান বা ধারণাই ছিল না। তার কারণ ভারতের মূলধনের বাজারের গঠন ও কর্মপ্রণালী বিদেশের মূলধনের বাজার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। সেজন্য এ-সম্বন্ধে ইংলন্ড বা আমেরিকায় প্রকাশিত বইগুলো পণ্ডিতমহলের কোন কাজেই লাগত না। এর জন্য প্রয়োজন ছিল প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক জ্ঞান। স্টক একস্চেঞ্জে কর্মে নিযুক্ত থাকাকালীন এদেশে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে এদেশের মূলধনের বাজার ও তার কর্মপ্রণালীর সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত হয়েছিলাম। আমার প্রথম পরিচয়ের একটা রূপরেখা আমি 'ইন্ডিয়ান ইকনমিস্ট' পত্রিকায় ১৯৪২

খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশ করি। তখনই ভারতের অর্থনীতিবিদগণ আমাকে এ-সম্বন্ধে একখানা বড় মাপের বই লিখতে অনুরোধ জানান। তখনই আমি ডকটরেট পরীক্ষার জন্য পেশ করবার নিমিত্ত একখানা থিসিস্ লেখবার পরিকল্পনা করি। কিন্তু নানারকম পারিবারিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের জন্য এ. আর. পি. ক্লাবে বসে আমার পক্ষে ওই থিসিস্‌খানা সম্পূর্ণ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। ওখানা আমি সমাপ্ত করি ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে আমার সিঁথির বাড়িতে এসে। তার আগেই আমি ডকটরেট পরীক্ষার নিমিত্ত ওই থিসিস্ পেশ করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করেছিলাম।

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান হয়ে এসেছিলেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক, দ্বারিক ঘোষ। সিণ্ডিকেট কর্তৃক আমাকে অনুমতিদানের ব্যাপারে তিনিই ছিলেন প্রধান সহায়ক। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে থিসিস্‌খানা যখন সম্পূর্ণ করলাম, তখন অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। তাঁকে আমি থিসিস্‌টা পড়তে দিয়েছিলাম। তিনি থিসিস্‌টা পড়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন, এবং আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন থিসিস্‌টা তাড়াতাড়ি পেশ করবার জন্য। কিন্তু থিসিস্‌টা পেশ করবার পূর্বেই তিনি আমেরিকায় চলে গেলেন মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক হয়ে। ওই বৎসরই মিচিগানে তাঁর মৃত্যু হয় ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ তারিখে।

অধ্যাপক সরকারের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন অধ্যাপক সরোজকুমার বসু। তিনিই আমার থিসিসের ভাগ্যবিধাতা হয়ে দাঁড়ালেন। থিসিস্‌টার তিনজন পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন। এ তিনজন হচ্ছেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ. টি. কে. গ্রাণ্ট, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস. কে. মুরঞ্জন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সরোজকুমার বসু। এসব খবর আমি পেয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস থেকে। থিসিস্ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অফিস ছিল, তা দেখাশোনা করতেন কালীবাবু। কালীবাবুর সংগে আমার সম্প্রীতি ছিল। সেজন্য আমি মাঝে মাঝে কালীবাবুর কাছ থেকে খবর নিতাম, কোনো পরীক্ষক তাঁর রিপোর্ট পাঠিয়েছেন কিনা। ১৯৫০ সালের শেষের দিকে প্রথম রিপোর্ট এল এ. টি. কে গ্রাণ্ট-এর কাছ থেকে। কালীবাবু আমাকে রিপোর্টটা দেখালেন। কালীবাবু বললেন, এরকম প্রশংসাব্যঞ্জক রিপোর্ট খুব কম থিসিস্ সম্বন্ধে বিদেশ থেকে আসে। ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি অধ্যাপক মুরঞ্জনের রিপোর্টও এল। তাঁরও রিপোর্ট প্রশংসায় মুখরিত। কালীবাবু হাসতে হাসতে বললেন, আর কি, দুজনের রিপোর্ট যখন আপনার সপক্ষে, তখন ডকটরেট

তো আপনার মুঠোর মধ্যে।

আগেই বলেছি যে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দটা ছিল আমার জীবনের এক সঙ্কটময় বৎসর। ওই বছরেই আমার ছেলে নন্দর (ভুতোর) রিউম্যাটিক ফিভার নিয়ে নাস্তানাবুদ হয়েছিলাম। নন্দ ভাল হবার পর আমি পড়েছিলাম নিউমোনিয়ায়। তারপর বিছানায় পড়ে আমার স্ত্রী। এইসব কারণে, কালীবাবু যেদিন আমাকে বললেন, ডক্টরেট তো আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে, তারপর আমি আর কালীবাবুর সঙ্গে কোন সংযোগ রাখতে পারিনি। এদিকে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি যে দু'জন পরীক্ষক যখন আমার সপক্ষে রায় দিয়েছেন, তখন তৃতীয় ব্যক্তির রিপোর্টের পর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে সুসংবাদ পাব।

অসুখথেকে ভাল হয়ে উঠে, মার্চ মাসের গোড়ায় আমি যখন পুনরায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে গেলাম, আমাকে আমাদের সম্পাদক সুধাংশুবাবু বললেন, কিছুদিন আগে মানিকতলার বাজারে সরোজ বসুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, সে আমাকে বলেছিল যে অতুলবাবুকে বলবেন যে, সে যেন অতি অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করে। কথাটা শুনে আমি সেদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। প্রথমেই গেলাম কালীবাবুর কাছে। কালীবাবু বললেন, আপনার ডক্টরেট তো ভেস্তে গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল? কালীবাবু আমার ফাইলটা বের করে আমার হাতে দিলেন। বললেন, যা দ্যাখবার ফাইলে দেখুন। আমি বললুম, আপনি বলুন না কি হয়েছে। কালীবাবু বললেন, সরোজবাবু তো ভাল রিপোর্টই দিয়েছিলেন, রিপোর্টটা তো ওই ফাইলেই আছে। তিনটা রিপোর্টই আপনার সপক্ষে থাকায় ৫ ফেব্রুয়ারী তারিখের মিটিং-এ সিন্ডিকেট আপনাকে ডক্টরেট দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাবেন, এমন সময় সরোজবাবু প্রস্তাব করলেন যে ওটা এ মিটিং-এ মুলতুবী রাখা হউক, পরের মিটিং-এ আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। কালীবাবু বলতে লাগলেন, তারপর সরোজবাবু আমার অফিসে এসে ফাইলটা চেয়ে নিয়ে যান। ফাইলটা যখন ফেরত দিয়ে গেলেন তখন দেখলাম যে ও'র রিপোর্টের সবশেষে উনি যোগ করে দিয়েছেন 'Notwithstanding what is observed avove, I would recommend that the award be deferred for the time being'। আর ওই রিপোর্টের বাঁ-দিকের নীচের কোণে পিঁপড়ের ঠ্যাঙের মতো আকারের ছোট অক্ষরে লেখা আছে —'I agree. S.K.M'। ১২ তারিখের মিটিং-এ যখন ওই ব্যাপারটা পুনরায় উঠল, তখন দুজনের মত অনুযায়ী সিন্ডিকেট প্রস্তাব গ্রহণ করল যে উপস্থিতের মতো ওটা স্থগিত রাখা হউক। সব দেখেশুনে বুঝলাম, এটা vengeance-এর ব্যাপার। সুধাংশুবাবু মারফত উনি আমাকে ও'র সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন,

কিন্তু আমি যে তখন অসুস্থ, এটা না জেনেই উনি ভেবে নিয়েছেন যে আমি ইচ্ছা করেই ও'র সঙ্গে দেখা করিনি। এক নিমেষের মধ্যেই আমি ব্যাপারটা বুঝে নিলাম।

আমি ঘোর অদৃষ্টবাদী। সেজন্য ভেবে নিলাম, অদৃষ্টে নেই, তাই পেলাম না। কেবল দুঃখ হল এই যে বিশ্ববিদ্যালয় তার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করল, একটা সম্পূর্ণ নতুন বিষয় সম্পর্কে মৌলিক রচনাভিত্তিক থিসিসকে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য বিবেচনার বাইরে রেখে দিয়ে। ঠিক এই সময় এইরকমই এক ব্যাপারে এক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মামলা করে নিজ সপক্ষে রায় পেল সেজন্য আমার সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কলঙ্কিত ব্যাপারটা যখন আমার স্টক একসচেঞ্জের সলিসিটরস খৈতান কোম্পানির কানে গেল, তখন তারা আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এক মামলা রুজু করতে পরামর্শ দিল। কিন্তু যে বিশ্ব-বিদ্যালয় আমার alma mater, তার মানে, যাকে মা বলে স্বীকার করে নিয়েছি, তার বিরুদ্ধে মামলা করতে ঘৃণাবোধ করলাম।

মামলা করলে অবশ্য আমি জিতে যেতাম এবং অধ্যাপক সরোজ বসুর শাস্তি হত, কেননা, এর কিছুদিন পরে যখন অধ্যাপক মুরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হল, তখন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন যে সরোজ বসুর রিপোর্টের কোণে 'I agree. S. K. M.' এরূপ কিছুই তিনি লেখেননি। অধ্যাপক মুরঞ্জন বললেন, ওটা জালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি আরও বললেন, তোমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম ব্যাপার ঘটে, তা আমার জানা ছিল না।

সকলের চেয়ে মজার ব্যাপার হল, আমার ওই থিসিস অবলম্বন করে রিজার্ভ ব্যাংকের একজন অফিসার তার নিজের নামে একখানা বই মুদ্রিত করল, এবং অধ্যাপক সরোজ বসু 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রফেসর অভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স' পদে নিযুক্ত হলেন! আরও অবাক হবার মতো ব্যাপার, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র যখনই মূলধনের বা টাকার বাজার সম্বন্ধে কিছু অনুশীলন করতে চেয়েছে, তখনই নির্লজ্জভাবে সরোজ বসু তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবার জন্য!

ও'র মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আমার ছেলে বদ্রির এক বন্ধুর। ওই ঘটনার কয়েকমাস পরে আমরা যখন দেওঘর গিয়েছিলাম, তখন মেয়েটিও তার স্বামীর সঙ্গে দেওঘর গিয়েছিল। আমার ছেলের বন্ধু আমার স্ত্রীকে মাসীমা বলত। সেই সুবাদে সে তার স্ত্রীকে আমাদের বাসায় নিয়ে এসেছিল। আমি তাকে সব কথা বলেছিলাম। উত্তরে সে বলেছিল, আমি সব জানি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে আমি যাতে সুবিচার পাই, তার জন্য দু'-দু'বার

চেষ্টা করেছিলেন দু'-দু'জন উপাচার্য। ডঃ জ্ঞান ঘোষ যখন উপাচার্য হয়েছিলেন তখন তিনি চেষ্টা করেছিলেন, আমার ভায়রাভাই ডঃ মন্মথ নিয়োগীর অনুরোধে। ও'রা দু'জনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে সহকর্মী ছিলেন। কিন্তু ফাইলের অভাবে ডঃ ঘোষের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

দ্বিতীয়বার চেষ্টা করে আমার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স বিভাগের রীডার অধ্যাপক ডঃ বারীন বসু। তখন ডঃ সত্যেন সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ডঃ সেন আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমার ওই থিসিস সম্পর্কিত কোন কাগজপত্র বা ফাইল বা থিসিসের মূল কপি, এর কোনটাই আবিষ্কার করতে পারেননি। অনন্তকালের জন্য আমার থিসিস সম্বন্ধে সিন্ডিকেটের বিবেচনা স্থগিত হয়েই রইল! বিশ্ববিদ্যালয়ের কলঙ্ক আর মোচন হল না।

১১১

তখন আমি বিশ্বকোষ লেনে থাকি। একদিন দুপুরবেলা সুরেশবাবু এসেছেন আমার ৩১ নম্বর বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে। এর আগে সুরেশবাবু কয়েকবার আমার ওই বাড়িতেই এসেছেন। সেজন্য সুরেশবাবু জানেন আমি ওই বাড়িতেই থাকি। কিন্তু সেদিন এসে শুনলেন, আমি ওই বাড়িতে আর থাকি না। ও-বাড়ির সঙ্গে আমার বিবাদ। সেজন্য ও-বাড়ির কেউই সুরেশবাবুকে বলল না, আমি কোথায় থাকি। সুরেশবাবু ওখান থেকে চলে আসছেন, এমন সময় ও'র সঙ্গে দেখা হল আদ্য ভট্টাচার্যের। আদ্য আমাদেরই পাড়ার ছেলে। সে আবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কর্মী। আদ্য সুরেশবাবুকে পাড়ার মধ্যে দেখে ছুটে এল ও'র কাছে। সুরেশবাবু আদ্যকে বললেন, অতুলবাবুর খোঁজে এসেছিলাম, কিন্তু শুনছি তো উনি এখানে আর থাকেন না। তুমি জান অতুলবাবু কোথায় থাকেন?

আদ্যই সেদিন সুরেশবাবুকে আমার বিশ্বকোষ লেনের ঠিকানায় নিয়ে এসেছিল। আদ্য এসে ডাকছে, অতুলদা, অতুলদা! আমি নেমে এলাম। নেমে এসেই দেখি সামনে সুরেশবাবু। সুরেশবাবু বললেন, অতুলবাবু, এখনই আপনাকে অফিসে যেতে হবে, খুব জরুরী দরকার, একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে হবে, আমার গাড়িতেই আপনাকে যেতে হবে। তখন আনন্দবাজারে মাত্র দু'খানা গাড়ি ছিল। একখানা সুরেশবাবুর, আর আরেকখানা 'হোমা'র (কে. পি. টমাসের) নিজস্ব ব্যক্তিগত গাড়ি। আনন্দবাজারে তৃতীয় গাড়ি কিনি আমি। চতুর্থ গাড়ি কেনে সুধাংশু বসু ও পঞ্চম গাড়ি সুবোধ ঘোষ। সুরেশবাবুর গাড়িখানা চালাত বিনোদবাবু। এই বিনোদবাবুই পরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র জেনারেল ম্যানেজার

হয়েছিল। যাক সেসব কথা। এখন যা বলছিলাম, তাই বলি। সুরেশবাবুকে আমি বললাম, আমার তো এখনও স্নানাহার হয়নি, রবিবারে একটু বেলা করেই খাই, তা আপনি যান, আমি একটু পরেই যাচ্ছি। সুরেশবাবু বললেন, তা আমি অপেক্ষা করছি, আপনি স্নানাহার সেরে নিন। কিন্তু সুরেশবাবুকে বসাবো কোথায়? সুরেশবাবু তো জানেন না, আমি বিশ্বকোষ লেনে কিভাবে বাস করি! মাত্র দু'খানা পাশাপাশি ঘর, একখানাতে থাকেন ব্রজেনবাবুরা (নির্মলের বাবা), আর আরেকখানাতে থাকি আমি ও আমার পরিবার। সুরেশবাবুকে সব কথা খুলে বললাম। বললাম, আপনাকে বসতে দেবার জায়গা নেই, আপনি অফিস চলে যান, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে অফিসে পেঁছে যাব।

১১১

অফিসে পেঁছে দেখি সুরেশবাবুর ঘরে হুগলি ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেকটর ধীরেন মুখুজ্যেমশাই ও আমাদের 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর সম্পাদক সুধাংশু-বাবু। ধীরেনবাবুর সংগে আমার বহুকালের ঘনিষ্ঠতা। ধীরেনবাবুই বলতে শুরু করলেন, অনেকটা কংগ্রেসী বক্তৃতার ভাষায়। বললেন, অতুলবাবু, আজ বাঙালী জাতি এক ঘোরতর সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। ভারতের ব্যাংকিং জগৎ থেকে বাঙালীর নাম চিরতরে মুছে যাবার উপক্রম হয়েছে। শেয়ার-বাজারে মূল্য-পতনের ফলে ছোট ছোট ব্যাংকগুলো যারা আজেবাজে শেয়ারের বিপক্ষে টাকা ধার দিয়েছিল, সেগুলো বিপর্যয়ের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের টাকাই এইসব ব্যাংকে গচ্ছিত ছিল। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাংকের কথা স্মরণ করে তারা ক'দিন ধরে তাদের সব টাকা তুলে নিচ্ছে। ব্যাংকগুলোর ওপর অসাধারণ 'রান' হয়েছে। ব্যাংকগুলো কপাট বন্ধ করে দিয়েছে। অনেকগুলো আবার নিজেদের দেউলিয়া বলে ঘোষণা করেছে। আমানতকারীদের মনে ভীষণ 'প্যানিক' সৃষ্টি করেছে। আমরা যে ক'টা ভাল ব্যাংক আছি—যেমন হুগলি, বেংগল সেনট্রাল, কুমিল্লা ব্যাংকিং, কুমিল্লা ইউনিয়ন প্রভৃতির পক্ষেও এ অসাধারণ 'রান' সামলানো দায় হয়েছে। ভাল করে একটা 'এডিটরিয়াল' লিখে আমানতকারীদের মন থেকে ভয় দূর করুন, তাদের সংযত হতে বলুন, আর এ-মুহূর্তে আমাদের কি করা দরকার সে-সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব দিন। সুধাংশু-বাবু বললেন, একমাত্র অতুলবাবুরই ব্যাংকিং জগতের ব্যবহারিক জ্ঞান আছে, তিনিই এ-সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে সমর্থ।

ধীরেনবাবুর বলা শেষ হলে, আমি বললাম, আপনাদের ব্যাংকগুলো কি

অবস্থায় আছে, তা জানি না, তবে বেঙ্গল সেনট্রাল ব্যাঙ্কের কথা বলতে পারি। ওর ম্যানেজিং ডিরেকটর জে. সি. দাশ কখনও আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনদিন কোন পার্টিকে কোন শেয়ারের বিপক্ষে টাকা ধার দেন না। ওর অবস্থা খুবই ভাল। ওটাকে কেন্দ্র করেই আপনাদের যা কিছু করবার তা করতে হবে।

একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখলাম। আমানতকারীদের সংযত হতে বললাম। আর ছোট ছোট ভাল ব্যাংকগুলোকে সম্মিলিত হয়ে তাদের সংগতি জোরদার করতে বললাম। সেদিন যা লিখলাম, তারই পরিণতিতে 'ইউনাইটেড ব্যাংক অভ ইণ্ডিয়া'র জন্ম হল।

১১১

সিঁথির বাড়িতে যাবার পর আমার স্ত্রী ঘন ঘন লক্ষ্মীকে স্বপন দেখতে লাগল। বলল, ওর আত্মা ছটফট করে বেড়াচ্ছে, তুমি গয়ায় গিয়ে ওর পিণ্ড দিয়ে এস। গয়ায় এর আগেও আমি কয়েকবার গেছি, কিন্তু পিণ্ড দিতে কখনও যাইনি। সেজন্য ঠিক করলাম যে একলা যাব না, বিশ্বকোষ লেনের নির্মলের বাবা ব্রজেনবাবুকে সংগে নেব। ব্রজেনবাবু বললেন, গয়ার পাণ্ডারা বড় সুবিধের লোক নয়, তারা হামেশাই যাত্রীদের ওপর জুলুম করে, সেজন্য আপনি আপনার পাণ্ডার নামটা জেনে যাবেন। বাবা তো বহুদিন হল গত হয়েছেন, সুতরাং বাবার কাছ থেকে জানবার প্রশ্নই ওঠে না। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম। মা বলতে পারলেন না। তিনি পাণ্ডার নাম ভুলে গেছেন। আমার মনে পড়ল, একবার বাবার কাছ থেকে শুনেছিলাম যে গয়ার জমিদার বাগবাজারের পশুপতি বসু ও নন্দ বসুদের পাণ্ডাই আমাদের পাণ্ডা। সেজন্য বাগবাজারে এসে শম্ভুদার (রায় শম্ভুলাল বসু) কাছ থেকে পাণ্ডার নাম জেনে নিলাম।

গয়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলাম সন্ধ্যের সময়। খোঁজ করতেই পাণ্ডার ছড়িদারকে পাওয়া গেল। সে আমাদের সঙ্গে করে নিজেদের যাত্রীনিবাসে নিয়ে গেল। মস্ত বড় দোতলা বাড়ি। ভেতরে এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের চারদিকেই যাত্রীদের থাকবার জন্য ঘর, একতলা ও দোতলায়। ছড়িদার আমাদের দোতলায় নিয়ে গিয়ে বড়রাস্তার সামনের বারাণ্ডার মাঝখানের একখানা ঘর খুলে দিল। যাবার সময় ছড়িদার বলে গেল যে সে প্রাতঃকালেই এসে আমাদের পিণ্ডদান কার্য সমাধার জন্য নিয়ে যাবে। আমরা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে দেখলাম, ঘরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থাতেই আছে। আমরা আমাদের বিছানাপত্তর খুলে ফেলে পেতে নিলাম। তারপর একটু গড়িয়ে নিলাম ট্রেন-যাত্রার ক্লান্তি দূর

করবার জন্য। খানিক বাদে ঘর থেকে বারান্ডায় বেরিয়ে এসে দেখলাম, সামনেই রাস্তার অপর পারে এক পুরি-তরকারির দোকান। নেমে এলাম। ওই দোকানে বসে খাওয়া-দাওয়ার পর যখন ফিরে এলাম তখন লক্ষ্য করলাম যে ওই বাড়িটায় কম-সে-কম একশোখানা ঘর, কিন্তু সবই খালি, কোনটাতেই কোন যাত্রী নেই। আমরা অসময়ে এসেছি বলেই, যাত্রীর অভাব।

সকালেই ছড়িদার আসবে। সেজন্য আমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। কিন্তু একটা ঘটনা ঘটায় রাত্রিতে আমার মোটেই ঘুম হল না। শুয়ে পড়বার খানিক পরেই মনে হল কে যেন আমাদের মশারির চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কেবল প্রদক্ষিণ করার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। একবার ভাবলাম ব্রজেনবাবুকে ডাকি, আবার চিন্তা করলাম উনি বোধ হয় ঘুমুচ্ছেন, ওঁকে বিরক্ত করব না। নিজেই চুপ করে শুয়ে রইলাম। সমস্ত রাত্রিই এই কাণ্ড চলতে লাগল।

সকালেই ছড়িদার এসে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা খুলে দিলাম। তারপর তার সংগে বেরিয়ে পড়লাম পিণ্ড দেবার উদ্দেশ্যে।

বেলা দশটা-এগারোটা নাগাদ পিণ্ডকার্য সম্পন্ন হল। যাত্রীনিবাসে ফেরবার পথে ব্রজেনবাবু বললেন, কাল রাত্রিতে মোটেই ঘুমুতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ? উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ঘুমিয়েছিলেন ? আমি বললাম, না। তখন উনি বললেন, শোনেননি, সমস্ত রাত্তির আমাদের মশারির চারধারে কে পায়চারি করেছে ? তখন আমিও আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম।

যাত্রীনিবাসে ফিরে ব্রজেনবাবু বললেন, সব বেঁধেছেঁদে গোছগাছ করে নিন। আর এক মুহূর্তও আমরা এই ভূতুড়ে বাড়িতে থাকব না।

সামনের পুরি-তরকারির দোকানে ঢুকে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে ট্রেন ধরবার জন্য আমরা স্টেশনের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

৯৯৯

আগেই বলেছি যে ভুতো এবং আমার অসুখের পর যখন আমার স্ত্রী বিছানায় পড়ল, তখন তার অবস্থা হয়েছিল খুব সংকটজনক। ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ওকে এমন কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেখানকার জলে লোহার পরিমাণ খুব বেশি। আমার বাবার আমল থেকে আমরা বহুবার দেওঘরে গিয়েছি। দেওঘরের জলে লোহার পরিমাণ খুব বেশি। সেজন্য সিদ্ধান্ত করলাম

যে স্ত্রীকে নিয়ে দেওঘরেই যাব। দেওঘরে একখানা বাড়ি ঠিক করবার জন্য আমাদের পাণ্ডাকে চিঠি লিখলাম। উত্তরে পাণ্ডা জানাল যে দেওঘরে এখন বাড়ি পাওয়া খুবই কঠিন, তবে আপনি চলে আসুন, বাড়ি খুঁজে বের করা যাবে। পাণ্ডাকে আর আমার স্ত্রীর কথা লিখিনি, সেজন্য সে চিন্তা করে নিল আমরা সুস্থ শরীরেই দেওঘরে যাচ্ছি।

এদিকে আমি স্ত্রীকে নিয়ে দেওঘর যাচ্ছি শুনে, সুরেশবাবু অফিসে ভীষণ হইচই লাগিয়ে দিলেন। ক'দিন অফিসে এমন ব্যাপার ঘটল যে মনে হল আমার দেওঘর যাওয়াটাই 'আনন্দবাজার'-এর সবচেয়ে বড় খবর।

সুরেশবাবু ডেকে বললেন, রুগ্না স্ত্রীকে নিয়ে দেওঘর যাচ্ছেন, তা বাড়ি ঠিক করেছেন? বললাম, না, সেখানে গিয়ে ঠিক করে নেব। সুরেশবাবু বললেন, এই তো ভূপেনবাবু (আমাদের সারকুলেশন ম্যানেজার) গত পরশুদিন দেওঘর থেকে ফিরেছেন। উনি বলছিলেন দেওঘর খুব তাড়াতাড়ি 'ডেভেলপ' করে যাচ্ছে, ওখানে বহু সরকারী অফিস হয়েছে এবং ওইসব অফিসের কর্মচারীরা, দেওঘরে যে-সব বাড়ি 'চেঞ্জার'রা গিয়ে ভাড়া নিত, সেগুলোর বরাবরের জন্য ভাড়াটিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বাড়ি ঠিক না করে রুগ্না স্ত্রীকে নিয়ে দেওঘরে যাবেন না, বিপদে পড়বেন। আমি বললাম, তবে কি করি বলেন? সুরেশবাবু বললেন, আমি বলি কি, আপনি আমাদের যশিদির বাড়ির চাবি নিয়ে যান, যশিদিতে গিয়ে উঠুন। ওখানে বিছানাপত্তর বাসন-কোসন সবই আছে, আপনার কোন অসুবিধা হবে না। এই বলে, তিনি কানাই সরকারকে ডেকে যশিদির বাড়ির চাবিগুলো সব আমাকে দিতে বললেন। আমি চাবিগুলো নিলাম। যশিদিতে যাওয়াই ঠিক করলাম।

এদিকে আমার স্টক একসচেঞ্জ অফিসে সোহনলালবাবু (সোহনলাল দুধ-ওয়ালা) সব শুনে বললেন, রুগ্ন স্ত্রীকে নিয়ে যশিদিতে গেলে আপনি বিপদে পড়বেন, কেননা আপনার স্ত্রীর যা অবস্থা শুনেছি, হঠাৎ যদি ডাক্তার দরকার হয়, আপনি যশিদিতে কোন ডাক্তার পাবেন না। সোহনলালবাবু সদাশয় ব্যক্তি। একসময় ও'রাই ছিল শেয়ার-বাজারের সবচেয়ে বড় দালাল। যেমন পয়সা কামিয়েছেন, তেমনই সৎকাজে ব্যয় করেছেন। ভারতের নানা জায়গায় দুধ-ওয়ালার ধরমশালা নামে যে ধরমশালাগুলো আছে, সেগুলো সব ও'দের পয়সাতেই তৈরি। দেওঘরেও স্টেশনের সামনে ও'র নিজ বসতবাড়ির সংলগ্ন যে ধরমশালাটা আছে, সেটাও তাঁর। তিনি বললেন, আমি বলি কি, আপনি আমার ধরম-শালার দোতলার কোণে যে বড় ঘরটা আছে, ওখানেই গিয়ে উঠুন। তারপর যদি আপনার অসুবিধা হয়, আপনি অন্য কোন ব্যবস্থা করে নেবেন। আমি

আজই ধরমশালার ম্যানেজারকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। এই বলে, তিনি ধরমশালার ম্যানেজারকে একটা চিঠি লিখে জানালেন যে আমি দেওঘরে আমার রুগ্না স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছি, সে যেন সব ব্যবস্থা করে দেয়, যাতে আমার কোন অসুবিধা না হয়।

আমি ঠিক করলাম, সোহনলালবাবুর কথামতো দেওঘরেই গিয়ে উঠব, তারপর যদি কোন অসুবিধা হয়, যশিদিতে সুরেশবাবুর বাড়িতে চলে যাব।

বাড়ি সম্বন্ধে এইসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে টাকার কথাটা তার মোটেই ভাবিনি। যাবার আগের দিন যোগেনবাবুর (আমাদের অ্যাকাউনটেণ্ট) কাছে গিয়ে টাকার কথা বলতেই, যোগেনবাবু বললেন, কত টাকা চাই? আমি বললাম, হাজার টাকা। যোগেনবাবু বললেন, অত টাকা তো ক্যাশে নেই। তবে আপনার ঘাবড়াবার কিছু নেই। আপনি তো 'তুফানে' যাচ্ছেন, আমি কোনরকমে পাতিরামের কাছ থেকে টাকাটা সংগ্রহ করে, কাল সকালে কানাই বসু মারফত আপনাকে হাওড়া স্টেশনে টাকাটা পাঠিয়ে দেব।

মুশকিলটা দেখা দিল যাবার পূর্বমুহূর্তে। স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হবে কি করে? হার্টটা এত দুর্বল যে, যে-কোন মুহূর্তে হার্টফেল করতে পারে। তারপর রক্তহীনতার দরুন মোটেই নড়তে-চড়তে পারে না। ধরাধরি করে কোনরকমে তো ট্যাক্সিতে তুললাম। তারপর হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ইনভ্যালিড চেয়ারে করে নিয়ে গিয়ে গাড়ির কামরার ভেতর শুইয়ে দিলাম। এদিকে কানাই বসু এসে টাকাটা দিয়ে গেল।

তারপর গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। আমি আমার স্ত্রীর নাড়ি টিপে বসে আছি। এক এক বার নাড়ি এমন ক্ষীণ হয়ে দাঁড়াল যে মনে হল বুঝিবা এবার হার্টফেল করবে। সারা পথই অনবরত কোরামিন খাইয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ঈশ্বরের কৃপায় যশিদি গিয়ে পৌঁছালাম। আমার পাণ্ডাজীর সঙ্গে দেখা হল। সে আমাদের জন্যই যশিদিতে অপেক্ষা করছিল। আমার স্ত্রীর অবস্থা দেখে সে তো খুব ঘাবড়ে গেল। তাকে তাড়াতাড়ি একখানা ইনভ্যালিড চেয়ার আনতে বললাম। ইনভ্যালিড চেয়ারে করে ওভারব্রিজটা পার হয়ে দেওঘরের গাড়িতে গিয়ে চাপলাম। দেওঘরে গিয়ে পৌঁছালাম। স্টেশনের সামনেই সোহনলালবাবুর ধরমশালা। ইনভ্যালিড চেয়ারে স্ত্রীকে ধরমশালায় নিয়ে গেলাম। ধরমশালার ম্যানেজার তো সব দেখে অবাক। মনে মনে ভাবতে লাগল, শেষকালে সোহনলাল-বাবু কি ধরমশালায় মুমূর্ষু রোগী পাঠিয়ে দিলেন!

১১১

পরের দিন সকালবেলা পাণ্ডাজীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির খোঁজে। বড় বাড়ি চাই। কেননা, আমার সঙ্গে আছে অনেক লোক। আমার মা, আমার শাশুড়ী, আমার বোন ও তার ছেলে, তারপর আমার নিজের ছেলেপুলেরা, আমি ও আমার স্ত্রী। পাণ্ডাজী বলল, ক্যাস্টর টাউন একেবারে 'ফুল'। চলুন বমপাস্ টাউনের দিকে যাই। বমপাস টাউনের কোথাও খালি বাড়ি পেলাম না। তারপর ক্যাস্টর টাউনে একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা করবার জন্য ঢুকলাম। 'লক্ষ্মী-বাটী'র সামনে এসে দেখলাম একঘর 'চেঞ্জার' কলকাতায় ফেরবার জন্য লটবহর সব বের করছে। সামনেই বাড়ির মালি দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দেখে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কি বাড়ি খুঁজছেন? বললাম, হ্যাঁ। মালি বলল, ভেতরে আসুন, এইমাত্র আমাদের বাড়ির স্বতন্ত্র এক পার্ট খালি হয়ে গেল। ভেতরে ঢুকে দেখলাম, বাড়ির ওই পার্টটায় খুব বড় বড় চারখানা ঘর আছে, ভেতরে একটা উঠান ও একটা রান্নাঘরও আছে। এত সহজে যে বাড়ি যোগাড় হয়ে যাবে, তা কল্পনাতীত। আমার ওপর এই অসীম করুণার জন্য মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করলাম।

ধরমশালায় খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুরে আমরা 'লক্ষ্মীবাটী'তে এলাম। দেওঘরের জলবায়ুর গুণে আমার স্ত্রী শরীরে বল পেতে লাগল। পনেরো দিনের মধ্যেই আমার স্ত্রীর পক্ষে একমাইল পথ হাঁটা সম্ভবপর হল। তবে এসব পড়ে, কেউ যেন না মনে করেন যে দেওঘর এখনও ও-রকম স্বাস্থ্যকর জায়গা আছে! স্বাস্থ্যের দিক থেকে এখন ও-জায়গাটা জঘন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া, বাড়ি ভাড়া ও জিনিসপত্তরের দাম এখন অসম্ভব আক্রা। ১৯৫২ সালে যখন আমি আমার স্ত্রীকে দেওঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম, তখন দেওঘরের লোক খেত ইঁদারার জল। এই জলটাই ছিল সবচেয়ে উপকারী। এখন দেওঘরে কলের জলের প্রবর্তন হওয়ায় সাবেককালের ইঁদারাগুলো সব হেজে-মজে গেছে। তখন দেওঘরে আনাজ-পত্তর খুবই সস্তা ছিল। মাছ-মাংস চার আনা থেকে ছ'আনা সের, দুধ টাকায় আট সের, রাবড়ি বারো আনা সের, পেঁড়া একটাকা সের। তখন লোক দেওঘরে গিয়ে সস্তার এসব জিনিসপত্তর ও ইঁদারার জল খেয়ে স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করত। এখন আর সে উপায় নেই। এখন জিনিসপত্তরের দাম কলকাতার চেয়েও মাগ্যি। তা ছাড়া, মহকুমা শহর হবার পর থেকে দেওঘর খুব জনবহুল জায়গা হয়ে পড়েছে।

১১১

মাসখানেকের মধ্যেই আমার স্ত্রী বেশ চাংগা হয়ে উঠল। এখন সে নিজে-নিজেই বাইরে চলাফেরা করতে যায়। দেওঘর তার কাছে অতি পরিচিত জায়গা। আমার বাবার আমলে সে প্রতিবৎসরই দেওঘরে এসেছে। বাবা মারা গেছেন ১৯৩৭ সালে। আর এটা হচ্ছে ১৯৫২ সাল। এর মধ্যে এই পনেরো বছর দেওঘরে আসেনি। চাংগা হয়ে বেরোবার প্রথম দিনই তার নজরে পড়েছিল দেওঘরের এক ক্ষুব্ধ হবার মতো পরিবর্তন। ফিরে এসে সে-কথাই আমাকে বলল। বলল, সরকার করেছে কি? জিজ্ঞাসা করলাম, সরকার কি করেছে?

—দেখনি, দেওঘরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। রাস্তার দু'ধারে যে ইউক্যালিপটাস্ গাছগুলো ছিল, সেগুলো কেটে ফেলে, জায়গাটাকে একেবারে ন্যাড়াবুঁচো করে ফেলেছে। তোমার মনে পড়ে না, আগেকার দিনে সকালবেলা আমরা যখন দেওঘরে বেড়াতে বেরোতুম, ইউক্যালিপটাসের মধুর গন্ধ আমাদের মনে কি-রকম আনন্দসঞ্চার করত? ওগুলো তো বীজনাশক গাছ ছিল, ইউক্যালিপটাসের গন্ধে তো লোক রোগবিমুক্ত হত, তা ওগুলো সরকার কেটে ফেলল কেন?

বললাম, সেরেফ তোমার স্বাধীন সরকারের অর্থগৃধ্নুতা।

আমার স্ত্রীর একটা মহা গুণ ছিল, সে জানা-অজানা সকলের সংগে অতি সহজে মিশতে পারত। অল্পসময়ের মধ্যেই সে অপরকে আপনজন করে ফেলতে পারত। আজ প্রথম পথে বেরিয়েছে। সংগে সংগেই নানাজনের সংগে আলাপ করে ফেলেছে। সকলেই চেঞ্জার। কোথা থেকে কে এসেছে, তাদের নামধাম সবই জেনে এসেছে। সকলকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে আমাদের 'লক্ষ্মীবাটী'র বাসায় আসবার জন্য। তাদের মুখেই শুনে এসেছে, দু'জন সাধু এসে দেওঘরে দুটি আশ্রম করেছে। সেজন্য আমাকে বলল, চল না, একদিন আমরা ওই আশ্রম দুটো দেখে আসি।

—একজন আশ্রম স্থাপন করেছেন, বম্পাস্ টাউনের একেবারে শেষে। তিনি নাকি এবার খুব ঘটা করে নবদুর্গার পুজো করেছিলেন। সেজন্য লোক ওটাকে নবদুর্গা আশ্রম বলে। চেঞ্জাররা বলল, সন্ধ্যের পর ওখানে পুজো ও স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি হয়। সেটা নাকি দেখবার মতো একটা জিনিস। বহু লোকের সেখানে সমাগম হয়। চল না, আজ সন্ধ্যের সময় আমরা ওখানে যাই।

সন্ধ্যার পর ওখানে গেলাম। সাধুকে দেখলাম। দেখলেই ভক্তিশ্রদ্ধা হয়। নাম নরেন্দ্র ব্রহ্মচারী। দেশবিভাগের পর পূর্বপাকিস্তান থেকে এসে দেওঘরে

আশ্রম স্থাপন করেছেন।

আমরা যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছালাম, স্তোত্রপাঠ তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। মস্ত বড় হলঘর। বেদীর ওপর সংস্থিতা রয়েছেন দেবীমূর্তি। তারই সামনে মার্বেল-পাথরের মেঝের ওপর দু'ধারে সারিবন্ধ হয়ে কুশাসন পেতে বসেছেন শিষ্যবৃন্দ। দেখলাম সব শিষ্যই মাড়বারি। দু'চারজনকে চিনলাম। তারা আমার কলকাতার শেয়ার বাজারের সদস্য। দুই সারির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মচারী উদাত্তকণ্ঠে স্তোত্র উচ্চারণ করছেন, আর শিষ্যবৃন্দ সমস্বরে তাঁকে অনুসরণ করছে।

স্তোত্রপাঠ শেষ হবার পর শিষ্যবৃন্দ সব উঠে পড়ল। সকলেই নিজ নিজ কুশাসন গুটিয়ে নিয়ে বগলে রাখল। হাতে কোশাকুশি। দেখা হয়ে গেল আমার স্টক একস্‌চেঞ্জের ভাইস-প্রেসিডেন্ট চিরঞ্জীলাল ঝুনঝুনওয়ালার সঙ্গে। তিনিও স্তোত্রপাঠ করতে এসেছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, এই যে সুরসাহেব, কবে এলেন? বললাম, মাসখানেক হল।

আশ্রমের পাশেই ও'র মস্ত বড় বাড়ি। আমাদের নিয়ে গেলেন ও'র বাড়িতে। বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার স্ত্রীর। আমার স্ত্রী ওঁদের সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্য মেয়েমহলে চলে গেল। আমরা দু'জনে বসে গল্প-গুজব করতে লাগলাম।

চিরঞ্জীবাবু বলতে লাগলেন, দেখুন সুরসাহেব, এ-বাড়িটা আমরা লড়াইয়ের সময় তৈরি করেছিলাম। কলকাতায় যখন বোমা পড়ছিল, তখন আমরা পালিয়ে এসেছিলাম দেওঘরে। বম্‌পাস্‌ টাউনের শেষে বাঁ-দিকে যে বিরাট বাগান-ওয়ালা বাড়িটা দেখছেন ওটা হচ্ছে সুরজমল নাগরমলদের (বা জালানদের) বাড়ি। ওদের দেখাদেখিই আমরা এখানে একখানা বাড়ি তৈরি করবার সিদ্ধান্ত করি। তখন শহর শেষ হয়ে গিয়েছিল ওই সুরজমল নাগরমলদের বাড়ির পরেই। তারপর পড়ে ছিল মাইলের পর মাইল বিরাট প্রান্তর। এই প্রান্তরের মুখপাতেই আমরা খানিকটা জমি কিনে নিলাম। তারপর এই বাড়িটা তৈরি করলাম। আমাদের দেখাদেখি আরও দু'একজন বাড়ি তৈরি করল। প্রথম প্রথম আমাদের খুব ভয় করত। দূরের দেহাত থেকে সব দেওঘরে ডাকাতি করতে আসে, জানেন তো? আমি বললাম, দেওঘরে তো আমি ১৯১৪ সাল থেকে আসছি, দেওঘরের ডাকাতি সম্বন্ধে আমার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে। উনি বললেন, হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, যখন আরও দু'চারজন আমাদের পাশে বাড়ি তৈরি করল, তখন আমরা মনে খানিকটা বল পেলাম।

এমন সময় চিরঞ্জীবাবুর দাদা বেণীবাবু সেখানে এসে হাজির হলেন। বেণী-বাবু আমাকে দেখে বললেন, এই যে সুরসাহেব, কী ('কী' বলাটা ও'র মুদ্রাদোষ)।

ডাকাতির কথা হচ্ছিল ? (কী)। সে হলেও, ব্যাটারা কিছু নিয়ে যেতে পারত না। কেননা, বাড়ি তৈরি করবার সময় আমরা বাড়ির তলাতে (কী) একটা কুঠরী তৈরি করেছি, (কী) যাবতীয় টাকা-পয়সা ও মূল্যবান জিনিস ওখানে রাখি। চলুন, আপনাকে সে কুঠরীটা দেখাচ্ছি (কী)।

তারপর উনি টর্চটা হাতে করে আমাকে সেই চোর-কুঠরীটা দেখাতে নিয়ে গেলেন। বাইরে থেকে কিছু বুঝবার উপায় নেই, এমনভাবে কুঠরীটা তৈরি করা। ভেতরে ঢুকে দেখলাম, অনেকটা কলকাতার ব্র্যাবোর্ন রোডে ইউনাইটেড কমারসিয়াল ব্যাঙ্কের 'সেফ্ ভলট্'-এর কায়দায় তৈরি।

ফিরে এসে দেখি চিরঞ্জীবাবু আমার জন্য অনেক মিষ্টান্ন এনে হাজির করেছেন। সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে করতে আরও অনেক গল্পগুজব হল। কথা-প্রসঙ্গে বললেন, ও'রাই নরেন্দ্র ব্রহ্মচারীকে এখানে এনে বসতি করিয়েছেন, জনমানসে জায়গাটাকে আকৃষ্ট করবার জন্য। এদিকে কথা কইতে কইতে রাত্তির হয়ে যাচ্ছিল ; বললাম, আমার স্ত্রীকে ডেকে দিন, এবার বাড়ি ফিরব।



তার পরের দিন সকালে বেলা দশটা নাগাদ আমরা অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম দেখতে গেলাম। ক্যাস্টর টাউনের 'লক্ষ্মীবাটী' থেকে আশ্রমটা খুব বেশি দূরে নয়। ক্যাস্টর টাউনের শেষে যে প্রান্তরটা, সেই প্রান্তরের পথ দিয়ে গেলে আশ্রমটা খুব কাছেই পড়ে। আশ্রমে প্রবেশ করেই দেখলাম, সামনে ডানদিকে ফরাস পাতা রয়েছে। ফরাসের ওপর দু'চারটে তাকিয়া রয়েছে। ওখানেই তাঁর দরবারে ঠাকুর বিকালে তাঁর ভক্তবৃন্দকে দর্শন ও উপদেশ দেন। আমরা যাওয়ামাত্রই ঠাকুরের এক ঋত্বিক এসে জানালেন যে বিকালে ছাড়া ঠাকুরের দর্শন পাওয়া যাবে না। ও'কে বললাম, ঠাকুরকে গিয়ে বলুন যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র এক কর্মী ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতি ও'র দুর্বলতা আমি জানতাম। কেননা, দু'তিন বছর আগে দেওঘরে এসে আশ্রম-স্থাপনের পর থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মাধ্যমেই ও'র আশ্রম সম্বন্ধে প্রচারকার্য চলত। এই প্রচারকার্য চালাবার প্রধান সহায়ক ছিল আমাদের সাব-এডিটর জ্ঞানবাবু। ঠাকুরের মনের ওপর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নাম মন্ত্রের মতো কাজ করল। কেননা, একটু পরেই ওই ঋত্বিক ভদ্রলোক ফিরে এসে আমাকে জানালেন, ঠাকুর দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই আসছেন, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।

অল্পক্ষণ পরেই ঠাকুর এসে উপস্থিত হলেন। দেখলাম, পরনে কালোপাড়

কোঁচানো তাঁতের ধুতি পায়ের জুতা পর্যন্ত লুটোচ্ছে। গায়ে খুব মিহি গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, বেশ স্থূলকায় চেহারা, অনেকটা বাঙলাদেশের জমিদারদের মতো। উনি এসে ফরাসের ওপর একটা তাকিয়া পিছনে ও দু'পাশে দুটো তাকিয়ার ওপর হাত রেখে বসলেন। আমাদের নমস্কার করলেন, আমরাও করলাম। তারপর ভদ্রতার সঙ্গে আমাদের কুশল সংবাদ নিয়ে, আমাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। বললেন, এই পূজার সময় ও'র দু'লক্ষ শিষ্য এসেছিল। রেল কোম্পানি স্পেশাল ট্রেন দিয়েছিল। আমরা শিষ্যদের কাছ থেকে মাত্র পাঁচ টাকা করে দক্ষিণা নিয়েছিলাম, তারই মধ্যে যাতায়াতের রেলভাড়া, এখানে থাকা, খাওয়াদাওয়া সব খরচ। যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই চলে গিয়েছে, কিছু লোক এখনও আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, এ দু'লক্ষ লোকের থাকবার কি ব্যবস্থা করে-ছিলেন? উনি বললেন, আশ্রমের ভেতরেই বড় ময়দানটা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল, ওখানেই যে যা বিছানা এনেছিল, তাই পেতে শুয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি খেয়েছিল? উনি বললেন, খিচুড়ি। মাত্র? হ্যাঁ, আমাকে তো সকলে পূর্ণ যোগ্য জ্ঞান করে, সুতরাং ওটাই মহাপ্রসাদ হিসাবে সকলে খেয়েছিল।

—তা, এত চাল-ডাল কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন?

—সকলকেই বলা ছিল, কিছু চাল-ডাল সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। বুঝছেন না, সবই তো গ্রামের লোক, ওদের তো চাল-ডালের অভাব নেই, সকলেই যথেষ্ট পরিমাণ চাল-ডাল নিয়ে এসেছিল, আর যা ঘাটতি পড়েছিল, তা আশ্রম থেকেই দেওয়া হয়েছিল।

—আচ্ছা, এত লোকের সমাবেশ হয়েছিল, তা এদের মলমূত্রত্যাগের আপনারা কি ব্যবস্থা করেছিলেন?

উনি হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, আপনি হাসালেন, দেওঘরে মলমূত্রত্যাগের জায়গার অভাব। যান না পাণ্ডাপাড়ায়, দেখবেন পথে-ঘাটে সর্বত্রই মলমূত্র। এদেশের লোকের বাড়িতে পায়খানা থাকা সত্ত্বেও, এরা পায়-খানায় কখনও মলত্যাগ করে না। সকলেই মাঠ-ময়দানে যায় মলত্যাগ করতে। বলে, মাঠ-ময়দানে মলত্যাগ না করলে, এদের আরাম হয় না। বুঝলেন না, যস্মিন্ দেশে যদাচার। আর আমার শিষ্যদের তো সবাই পল্লীগ্রাম থেকে আসে। পল্লী-গ্রামে তো ওরা মাঠ-ময়দানেই মলত্যাগ করে। সুতরাং যারা এসেছিল, তারা সকলেই, আশ্রমের বাইরে যে বিশাল প্রান্তরটা দেখছেন, ওই প্রান্তরেই ও কাজটা নির্বিঘ্নে সেরে নিয়েছিল।

আমার প্রশ্নগুলো ও'র ভাল লাগছিল না। এদিকে আমার স্ত্রীও ও'র পরনে কোঁচানো ধুতি, গিলে-করা পাঞ্জাবি, এবং জমিদারী চালে ও'র বসবার কায়দা

দেখে ও'র ওপর বীতশ্রদ্ধই হয়ে পড়েছিল। উঠে পড়বার জন্য আমার স্ত্রী আমাকে চিমটি কাটছিল। সুতরাং, আজ উঠি বলে, আমি চলে এলাম।

ဢ ဢ ဢ

কয়েক বছর পরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে আমার কাছে এক মহিলা এসে হাজির। পরিচয় দিলেন তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম-বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী। এসেছেন আমার 'ইকনমিক সাপ্লিমেণ্ট'-এ এক প্রবন্ধ ছাপাবার জন্য। প্রবন্ধটা হাতে করে দেখলাম নাম ও'র পারুল চক্রবর্তী। প্রবন্ধটা পড়বার পর ও'কে বললাম যে, প্রবন্ধটা আমরা পরের সপ্তাহেই ছাপব। খুব খুশি হয়ে উনি আমার সঙ্গে গল্প করতে প্রবৃত্ত হলেন। তখন কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে জানালেন যে তিনি অনুকূল ঠাকুরের চার-নম্বর স্ত্রী। ঠাকুরকে উনি তালাক দিয়ে চলে এসে, এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারে কাজ করছেন। নিজ স্বামী সম্বন্ধে তিনি সেদিন আমাকে যে-সব কথা বলেছিলেন, তা এখানে লেখবার মতো নয়!

ဢ ဢ ဢ

সেবার দেওঘরে গিয়ে আর একজন সাধুর নাম শুনলাম। মোহনানন্দজী। তিনি বালানন্দজীর আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষ। বালানন্দ ব্রহ্মচারীকে জানতাম। আমার বাবার আমলে যখন দেওঘরে আসতাম তখন তিনি জীবিত ছিলেন। প্রত্যহ বিকালে তিনি গীতাপাঠ করতেন। ও'র গীতাপাঠ আমরা শুনতে যেতাম। বহু লোকের তখন ওখানে সমাগম হত। তখন বালানন্দজীর আশ্রমের চত্বরের মধ্যে ন'লাখা মন্দির তৈরি হয়নি। এবার গিয়ে ন'লাখা মন্দিরের কথা শুনলাম। কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার চারুশীলা ঘোষ ওই মন্দিরটা তৈরি করে দিয়েছেন। নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সেজন্যই মন্দিরটার নাম ন'লাখা মন্দির।

একদিন আমি ও আমার স্ত্রী মন্দিরটা দেখতে গেলাম। মারবেল-পাথরের মেজে ও লাল পাথরের তৈরি সুন্দর কারুকার্য-করা মন্দির। দেখলে চোখ জুড়োয়, মনে শান্তি আসে। মন্দিরের পাশেই ফুলবাগান। অত্যন্ত যত্নসহকারে বাগানটা সংরক্ষিত। নানারকমের গোলাপ ফুটে রয়েছে। সকালের দিকে আমরা গিয়েছিলাম। ওই শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আমরা বসে রইলাম। আমার স্ত্রী

বলতে লাগল, সত্য ও সুন্দরের এখানে অপূর্ব সম্মিলন হয়েছে। তখন আমাদের মন আনন্দে বিভোর হয়ে গিয়েছে। ওখান থেকে আর কোথাও যাবার আমাদের ইচ্ছা হল না। সুতরাং সেদিন আর আমাদের মোহনানন্দজীকে দেখতে যাওয়া হল না। তিনি আশ্রমের অপর প্রান্তে অবস্থিত তাঁর দোতলা কোঠাবাড়িতে থাকেন। সুতরাং সেদিন ও'কে দর্শন না করেই আমরা চলে এলাম।

ঌ ঌ ঌ

বিকালে আমরা স্টেশনে গিয়ে বসি। আরও অনেকে স্টেশনে আসে। প্রায় সকলের সংগেই আমার স্ত্রীর আলাপ হয়ে গিয়েছে। ওখানে-বসেই ওরা গল্পগুজব করে।

একদিন বিকালে গিয়ে দেখি, স্টেশনে খুব ভিড়। সকলেই অভিজাত পরিবারের লোক। মেয়ে ও পুরুষ অনেক সমবেত হয়েছে। শুনলাম, মোহনানন্দজী কলকাতায় যাচ্ছেন, তাই তাঁর শিষ্যমণ্ডলী তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছে। মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারের বগিটা তখন স্টেশনে দাঁড়িয়ে। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, ফার্স্ট ক্লাসের একটা কামরার জানালার ধারে উনি বসা। শিষ্যরা সেখানেই ভিড় করেছে সবচেয়ে বেশি। ও'কে ভাল করে দেখবার জন্য আমি ও আমার স্ত্রী ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, অত্যন্ত সুন্দর ও সুদর্শন চেহারা। ভিড়ের মধ্যে আমাদের ওপর ও'র নজর পড়ল। আমাদের সংগে ছিল আমাদের মেয়ে। উনি আমার মেয়েকে ডাকলেন। কামরার ভেতরে আসতে বললেন। ও গেল। ওর দু'হাতে উনি দুটো কমলালেবু দিলেন। লেবু দুটো নিয়ে, ও'কে নমস্কার করে ও চলে এল। এর পরই গাড়ি ছেড়ে দিল। সকলেই দুহাত তুলে 'জয়, মোহনানন্দজী কি জয়' ধ্বনি তুলল।

গাড়ি চলে গেলে, আমার স্ত্রী বলল, দ্যাখ সেদিন ন'লাখা মন্দিরে গিয়ে আমরা ও'কে দেখে আসিনি, আজ উনিই আমাদের দর্শন দিলেন!

ঌ ঌ ঌ

সেবার দেওঘরে গিয়ে যখন যা জিনিসের প্রয়োজন হত, সবই 'মন্মথ ভাণ্ডার' থেকে পেতাম। মালিক মন্মথনাথ দাস অত্যন্ত অমায়িক লোক। উনি আমাদের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দেওঘরের এজেন্ট। অফিসের সকলকেই চেনেন। অফিসের যখন যে যায়, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র যশিদির বাড়িতে থাকে, এবং দেওঘরে এসে

মন্মথবাবুর সঙ্গে দেখা করে যায়। প্রথমদিন ও'র দোকানে যেতে, উনি বললেন, তা আপনি আপনাদের যশিদির বাড়িতে রইলেন না কেন? আমি আমার স্ত্রীর কথা বললাম। বললাম, হঠাৎ যদি ডাক্তার বা কোন জরুরী ওষুধের দরকার হয়, যশিদিতে তা তো পাব না, তখন মুশকিলে পড়ব। সেই কারণেই, দেওঘরে এসে 'লক্ষ্মীবাটী'তে উঠেছি। তবে যশিদির বাড়ির ঘরগুলোর চাবি আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

মন্মথবাবু বললেন, আজকের কাগজ আপনি নিয়ে যান, কাল থেকে 'লক্ষ্মী-বাটী'তে আপনার কাগজ পাঠিয়ে দেব। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার লোক 'লক্ষ্মীবাটী' চেনে তো? মন্মথবাবু বললেন, 'লক্ষ্মীবাটী' আর চিনবে না? রঞ্জন-বাবু তো দেওঘরে এসে ওই বাড়িতেই প্রথম ও'র 'গ্র্যান্ড হোটেল' স্থাপন করেছিলেন। সেজন্য সকলেই ওই বাড়িটা চেনে।

চা-বাগানের কেঁইয়াদের দোকানে বা কলকাতার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলিতে যেমন সব জিনিসই পাওয়া যায়, মন্মথবাবুর দোকানেও তেমনই সব জিনিস পাওয়া যায়, কেবল কাপড়-চোপড় আর চাল-ডাল ছাড়া। স্টেশনারী দোকান বলতে তখন দেওঘরে মাত্র একখানা দোকানই ছিল। সেটা মন্মথবাবুর দোকান। তিনিই দেওঘরে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ছিলেন! তাঁর একচেটিয়া রমরমা কারবার। তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র এজেন্ট বলে, সব বাঙালীকেই ওই দোকানে আসতে হয়। তা ছাড়া, তিনি কলকাতার 'গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল'-এর রুটিরও এজেন্ট। কলকাতার চেঞ্জাররা সকলেই ওখানে আসে রুটি কেনবার জন্য।

দেওঘরে তখন আর একখানা দোকানও ছিল, যেখানে বাঙালীদের সমাগম হত। সেটা হচ্ছে তৎকালীন কলকাতার বিখ্যাত মিষ্টান্ন-বিক্রেতা দ্বারিকানাথ ঘোষের দোকান। সমগ্র দেওঘরে মাত্র এই দোকানেই চিনিপাতা মিষ্টি দই পাওয়া যেত। দেওঘরে আগে যে দই পাওয়া যেত, তা হচ্ছে টক দই। এত টক যে, সে দই খেলে হাড়ের জ্বর টেনে বের করে আনত। মিষ্টি দই দেওঘরে দ্বারিক ঘোষের দোকানই প্রথম প্রবর্তন করে।

১১১

সেবার দেওঘরে একটা জিনিস মনে খুব ব্যথা জাগাল। সেটা রাজনারায়ণ বসুর (শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ) পাঠাগারের দুর্দশা। আগেকার দিনে এটাই ছিল দেওঘরের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। একসময় আমি ওখানেই সমস্ত সকালবেলাটা কাটাতাম, নানারকম পত্রপত্রিকা পড়বার জন্য। আমার কাছে ওই পাঠাগারটা

অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কিন্তু সেবার দেওঘরে গিয়ে দেখলাম, ওই পাঠাগারটাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ওরই সংলগ্ন করে ওরই সামনে আর একটা বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। সে বাড়িটার সামনের দিকের মাথায় লেখা রয়েছে 'মালিয়া'দের নাম। ফলে, রাজনারায়ণ বসুর নাম এখন আর লোকের নজরে পড়ে না। একসময় দেওঘরের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালীর অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশী। আর. মিত্রের স্কুল, দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন, রাজনারায়ণ বসুর পাঠাগার প্রভৃতি তার নিদর্শন। কেননা, দেওঘর ছিল বাঙলা-দেশেরই অন্তর্ভুক্ত।



পরের বছরও দেওঘরে গেলাম। আগের বছর এসেছিলাম পূজার বিজয়ার দিন। কেননা, সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে রুগ্না স্ত্রীকে নিয়ে যাবার ওটাই ছিল প্রশস্ত দিন। বিজয়ার দিন খুব কম লোকই কলকাতা ছেড়ে যায়। সেজন্য ভেবে নিয়েছিলাম, ওদিন ট্রেনে খালি কামরা পাওয়া যাবে। পেয়েছিলামও তাই। একখানা কামরা সম্পূর্ণ খালিই পেয়েছিলাম। সেজন্যই সম্ভবপর হয়েছিল সমস্ত পথ স্ত্রীকে কামরায় শুইয়ে নিয়ে আসা।

এবছর স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালই ছিল। সেজন্য ঠিক করলাম পূজার আগেই যাব, দেওঘরেই পূজা-উৎসবের আনন্দের মধ্যে দিনগুলো কাটাতে হবে। কিন্তু দেওঘরে গেলাম খুব বিপত্তির ভেতর দিয়ে। দেওঘরে যাবার জন্য, আগের দিন ব্যাঙ্ক থেকে হাজার টাকা তুলেছিলাম। দশ টাকার নোটের বান্ডিলটা ট্রাউজারের বাঁ-দিকের পকেটে রেখেছিলাম। স্টক একসচেঞ্জ অফিস থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে এসেছিলাম। তারপর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিস থেকে বেরিয়ে সিন্দুরিয়াপটির মোড়ে এসে বাসে উঠেছি। বাসে খুব ভীড়। ওপরের হ্যান্ডেলটা ধরেই দাঁড়িয়েছিলাম। বাসটা শিয়ালদহের মোড়ে এলে, পকেটে হাত দিয়ে অনুভব করলাম পকেটে নোটের বান্ডিলটা ঠিকই আছে। তখনও আমি বাসের মধ্যে দাঁড়িয়েই আছি। বাসে যারা দাঁড়িয়ে যায় তারা সাধারণত বাস যেদিকে ছুটছে সেদিকে মুখ করেই দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু শিয়ালদহের মোড়ে যারা বাসে উঠল, তাদের মধ্যে একজন আমার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। আমি বিস্মিত হলাম, এবং লোকটার মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। লোকটাও আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর কনডাকটর যখন টিকিট কাটতে এল, তখন লোকটার হাত থেকে পয়সাগুলো সব বাসের মধ্যে পড়ে গেল। লোকটা পয়সা

কুড়োতে ব্যস্ত হল। আমি একটু নড়েচড়ে দাঁড়ালাম। লোকটা পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিল। বাসটা ততক্ষণে রাজাবাজারের মোড়ে এসে দাঁড়াল। লোকটা সেখানে নেমে গেল। সংগে সংগে আমার পিছনের সীটে যারা বসে ছিল, তারাও নেমে গেল। আমি তখন পিছনের সীটে বসে পড়লাম। বাসটা তখন সায়েন্স কলেজের সামনে এসে গেছে। আমি সীটে বসবার পর, ওখানে বসেই পকেটে হাত দিয়ে দেখতে গেলাম টাকাটা ঠিক আছে কিনা। বুকটা ধড়াস করে উঠল। দেখলাম টাকাটা নেই। ট্রাউজারের বাইরেতে ইংরেজি 'L' আকারে কাটা। বুঝলাম সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

বাড়িতে এসে পঞ্চানন ঘোষালকে টেলিফোন করলাম। পঞ্চানন ঘোষাল তখন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার। আমার সংগে ওঁর খুব ঘনিষ্ঠতা। ওঁর সংগে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা হয়, উনি যখন শ্যামপুকুর থানার O.C. হয়ে আসেন। সে বহুদিন আগেকার কথা। আমি তখনও বাগবাজারে থাকি। শুনলাম, একজন উচ্চশিক্ষিত লোক O.C. হয়ে এসেছেন। সুতরাং আলাপ করতে গেলাম। দেখলাম, বলিষ্ঠ চেহারা, খুব অমায়িক ব্যবহার। শুনলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস-সি. পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন। শীঘ্রই আলাপ জমে উঠল। থানার ওপরতলায় ওঁর কোয়ার্টারে নিয়ে গেলেন, আপ্যায়ন করবার জন্য। জিজ্ঞাসা করলাম, তা এম.এস-সি.-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে পুলিশ লাইনে এলেন কেন? বললেন, মন টানল। মন কেন টেনেছিল তার পরিচয় পেলাম যখন কিছুদিন পরে উনি 'খ্যাদা' মার্ডার কেস-এর আসামীকে দেওঘরে নালার মধ্যে ফেলে ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করে পাকড়াও করলেন। সেদিন আসামীর হাতে ছিল রিভলবার। এক-বার ছুঁড়লেই পঞ্চাননবাবু সেদিন পঞ্চত্ব পেতেন। কিন্তু পঞ্চাননবাবু তাকে সে সুযোগ দেননি। ধ্বস্তাধ্বস্তি করে আসামীকে ঠিক পাকড়াও করেছিলেন।

পঞ্চাননবাবুর মতো সৎলোক পুলিস লাইনে খুব কম দেখেছি। সেজন্য পকেটমার হওয়ার কথাটা ওঁকেই বললাম। পঞ্চাননবাবুকে ওই কথা বলবার ঘণ্টাখানেক পর থেকে টেলিফোনের পর টেলিফোন আসতে লাগল—আমি বাসে যে পথে এসেছিলাম, সেই পথের দু'ধারের সংলগ্ন অঞ্চলের থানাসমূহের O.C.-দের কাছ থেকে। সকলেই এক কথাই জিজ্ঞাসা করেন, কোথা থেকে বাসে উঠেছিলেন, দাঁড়িয়েছিলেন না বসেছিলেন, টাকাটা কোথায় ছিল, যে লোকটা আপনার দিকে মুখ করে সামনাসামনি দাঁড়িয়েছিল, তাকে দেখতে কিরকম? —ইত্যাদি। টেলিফোনের উত্তর দিতে গিয়ে সমস্ত রাত্তির আর ঘুম হল না। আমার স্ত্রী বলল, যাবার আগে যখন বাধা পড়ল তখন আর দেওঘরে গিয়ে কাজ নেই। বললাম, যখন যাওয়া ঠিক করেছি, তখন যাবই। কাল সকালেই যাব।

ꣲ ꣲ ꣲ

পরের দিন সকালেই দেওঘরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। হাওড়া স্টেশনে এসে দেখি আর এক বিপদ। সব ট্রেনের যাত্রাই বন্ধ! শুনলাম, পথে কোন এক স্টেশনে প্যাসেঞ্জাররা ট্রেন 'লেট' হওয়ার দরুন, ড্রাইভার ও গার্ডকে ধরে মেরেছে, সেজন্য রেলকর্মীরা সব ধর্মঘট করেছে। যা হোক, ট্রেনে গিয়ে বসলাম। সাড়ে ন'টায় ট্রেন ছাড়বার কথা। কিন্তু না আছে ড্রাইভার, না আছে গার্ড। ট্রেন স্থিতিবান অবস্থায় দাঁড়িয়ে, আর আমরা গাড়ির ভেতর বসা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইভাবে কেটে গেল। বেলা তখন সাড়ে তিনটা। কেউ কেউ খবর নিয়ে এল, গাড়ি আজ আর যাবে না। অনেকেই বাড়ি ফিরে যাবার জন্য ট্রেন থেকে নেমে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খুব ফাঁপরের মধ্যে পড়লাম। আমার স্ত্রী বলল, আর বসে থেকে কি করবে, চল আমরাও বাড়ি ফিরে যাই। এমন সময় খবর এল যে রেলকর্মীরা ধর্মঘট তুলে নিয়েছে। ট্রেন এবার চলবে।

বেলা সাড়ে চারটার সময় ট্রেন ছাড়ল। সকালবেলা ট্রেন যদি ঠিক সময়ে ছাড়ত, তা হলে এতক্ষণে আমরা দেওঘরে পৌঁছে যেতাম!

অসময়ে ট্রেন ছেড়েছে। পথে সব জায়গায় লাইন ক্লিয়ার নেই। থামতে থামতে ট্রেন যখন যশিদিতে গিয়ে পৌঁছাল তখন রাত আড়াইটা। ঘণ্টাখানেক পরে ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেন ধরে যখন দেওঘরে গিয়ে পৌঁছালাম তখন রাত সাড়ে তিনটা। এত রাত্রে 'লক্ষ্মীবাটী'র ম্যানেজার সন্তোষবাবুকে ঘুম থেকে তোলা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম না। স্টেশনের প্লাটফরমের ওপরই নিজেদের বেডিং, স্যুটকেস, ট্রাঙ্ক ইত্যাদির ওপর বসে রইলাম। কেননা, দেওঘরে 'ওয়েটিং রুম' নেই, আছে এক মুসাফিরখানা। সেটা যেমন নোংরা, তেমনই অবাঞ্ছিত লোকে ভরতি।

সকাল হতেই 'লক্ষ্মীবাটী'র উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। স্টেশন থেকে 'লক্ষ্মীবাটী' মাত্র এক মিনিটের পথ। ডাকাডাকি করে সন্তোষবাবুকে ঘুম থেকে তুললাম। তিনি তো আমাদের দেখেই অবাক। বললেন, এত ভোরে কোথা থেকে এলেন? আপনাদের তো গতকাল 'তুফান'-এ আসবার কথা ছিল। বললাম, 'তুফান'-এই এসেছি, তবে ট্রেন-বিভ্রাট ঘটেছিল। পরে সব কথা বলব, এখন ঘরের দরজাগুলো খুলে দিন।

ꣲ ꣲ ꣲ

বাজারে গিয়েছি। হঠাৎ পিছনদিক থেকে কে ডাকল, সুরসাহেব! পিছন ফিরে

দেখি, আমাদের স্টক একসচেঞ্জ অফিসের ক্যাশিয়ার ললিত। জিজ্ঞাসা করল, কবে এলেন ? বললাম, এইমাত্র আজ সকালে। কথাপ্রসঙ্গে ললিত বলল, দেওঘরে তো বহুদিন আসছেন-যাচ্ছেন, কখনও বাসকীনাথ গেছেন ? বললাম, না, সে আবার কোথায় ? ললিত বলল, এখান থেকে ৩০ মাইল দূরে স্টেট-বাসে যাওয়া যায়, এক ঘন্টার পথ, একবার বাসকীনাথ ঘুরে আসুন, আনন্দ পাবেন।

আমার স্ত্রী তো বাসকীনাথের নাম শুনে নেচে উঠল। বলল, চল, কাল আমরা বাসকীনাথ ঘুরে আসি।

বেলার দিকে পাণ্ডাজী আসতে তাকে বাসকীনাথের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। পাণ্ডাজী বলল, ওটা বাবার ফৌজদারী আদালত।

তার মানে ? বাবার দুটো আদালত আছে, একটা বৈদ্যনাথধামে, আরেকটা বাসকীনাথে। এখানকার লোকের বিশ্বাস, বৈদ্যনাথধাম বা দেওঘরে বাবার দেওয়ানী আদালত, আর বাসকীনাথে ফৌজদারী আদালত।

—তার মানে ?

—বুঝলেন না, ফৌজদারী আদালতে যেমন মামলার তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি হয়ে যায়, এবং দেওয়ানী আদালতে দেরি হয়, তেমনি দেওঘর-বৈদ্যনাথধামে বাবার কাছে যে যা মানত করে, তার ফল দেরিতে পায়, আর বাসকীনাথে বাবা তাড়াতাড়ি ফল দেন।

এসব কথা শুনে, আমার স্ত্রী তো বাসকীনাথ যাবার জন্য আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠল। পাণ্ডাজীকে বলল, পাণ্ডাজী, কাল আমাদের বাসকীনাথ নিয়ে চলুন। পাণ্ডাজী বলল, তা হলে আমাদের সকাল সাতটার বাসে যেতে হবে, এবং বেলা একটার মধ্যে ফিরে আসতে হবে। আপনারা সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ তৈরি হয়ে থাকবেন আমি ঠিক সময়ে আসব।

ꣽ ꣽ ꣽ

পরের দিন সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বাস-ডিপো বাড়ির কাছেই। বাস-ডিপোয় গিয়ে দেখলাম, বিহারে স্টেট-বাসের ভারী সুন্দর ব্যবস্থা। যেখান থেকে বাস ছাড়ে, সেখানেই বাসের টিকিট-অফিস। সকলকেই বাসে উঠবার আগে টিকিট কিনতে হয়। বাসে যে ক'টা বসবার সীট আছে মাত্র সে-ক'টাই টিকিট বিক্রি হয়, সুতরাং বাসে সকলেই বসে যেতে পারে, কারুকে দাঁড়িয়ে যেতে হয় না। মনে মনে ভাবলাম, বাঙালী মাথায় বেশী বুদ্ধি ধরে বলে দাবী করে, কিন্তু সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থায় বাঙালীকে বিহারের কাছে হার মানতে হবে।

বাস শহর ছেড়ে দুমকার পথ ধরল। শীঘ্রই একটা জিনিস নজরে পড়ল। রাস্তার দু'ধারে যে-সমস্ত পাথরের ঢিবিওলা মাঠ ছিল, তা 'বুলডোজার'-দিয়ে সব সমতলভূমি করে ফেলা হচ্ছে। পরের বছর গিয়ে দেখেছি সে-সব জায়গায় রীতিমতো চাষবাস শুরু হয়ে গেছে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন ভারতের রাষ্ট্রপতি। বিহারের উন্নয়নের জন্য তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন। পাহাড়ী জমি 'বুলডোজার' দিয়ে সমতল করে সেখানে চাষবাস করা, সেই উন্নয়ন পরিকল্পনারই অন্তর্ভুক্ত।

দেখতে দেখতে বাঁ-দিকে এসে পড়ল ত্রিকুট পাহাড়। ত্রিকুটে আগে বহুবার এসেছি। তা সত্ত্বেও আমার স্ত্রী বলল, একদিন আমাদের ত্রিকুটে আসতে হবে। বললাম, ঠিক আছে, তাই হবে।

ত্রিকুট পার হবার পরই এক অতীব মনোরম দৃশ্য চোখে পড়ল। পাহাড়ী দেশ, ঢেউ-খেলানো রাস্তা, বাস একবার রাস্তার ঢেউয়ের ওপরে উঠছে, আবার নীচে নামছে। দু'ধারে পাহাড়। তার মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। অদ্ভুত সৌন্দর্য অনুভব করলাম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা বাসকীনাথে এসে পৌঁছলাম। দেখলাম, জায়গাটা বিহার বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে বাঙলাদেশেরই একটা অংশ। বাঙলাদেশের মতোই আবহাওয়া, বাঙলাদেশের মতোই সব ঘর-বাড়ি। বাঙালীর মতোই ধুতি ও পাঞ্জাবি পরা এক সুদর্শন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের কি পাণ্ডা আছে? বললাম, না। উনি বললেন, তবে আসুন। তারপর তিনি এক পাণ্ডার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। পাণ্ডা সুষ্ঠুভাবে আমাদের পুজো-আস্রার কাজ সমাপন করে, একখানা মোটা খাতায় আমার নাম-ধাম ও ছেলেমেয়েদের নাম লিখে নিল।

তারপর আমরা ঘুরেফিরে জায়গাটা দেখে নিলাম। দেখলাম অন্যান্য দেবস্থানের মতো মন্দিরের সংলগ্ন রয়েছে এক বিরাট জলাশয়। খুব স্বচ্ছ জল। ভারী সুন্দর দেখতে। পাঁচবছর পরের কথা, এই জলাশয়টাই আমাদের মনে দারুণ ভয়ের সঞ্চার করেছিল। তখন ছেলেদের বিয়ে হয়ে গেছে, বউমাদের নিয়ে বাসকীনাথ গিয়েছিলাম। পুজো শেষ করে, একটা খাবারের দোকানে বসে আমরা খাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরেই বড়বউমা হঠাৎ বলে উঠল, খুকু কোথায় গেল? কই খুকুকে তো দেখতে পাচ্ছি না। খুকু আমার নাতনী সুপ্রিয়া। তখন তার বয়স মাত্র দু-তিন বছর। আমরা সকলে ধড়ফড় করে উঠে পড়লাম। চতুর্দিকে খুকুকে খুঁজতে লাগলাম। কোথাও খুকুকে পাওয়া গেল না। তখন আমাদের খুব ভয় হল। ও কি ওই জলাশয় দেখতে গিয়ে জলে ডুবে গেল? সে-সময় আমাদের মনের যে ভাব হল, তা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। তারপর খোঁজাখুজি করতে করতে

আমরা দেখি, ও বাসস্ট্যান্ডের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

১১১

পরের দিন আমাদের ঘরে এলেন দুই পুরুষ ও দুই মহিলা। বললেন, আমরা 'লক্ষ্মীবাটী'র শেষ পার্টে এসে উঠেছি, আমরা এসেছি কালীঘাটের শ্রীমোহন লেন থেকে। শ্রীমোহন লেনের নাম শুনে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি হারাণচন্দ্র চাকলাদারকে চেনেন? তিনি আমার মাস্টারমশাই। তখন ওই দুই ভদ্রলোকের মধ্যে একজন বললেন, তিনি তো আমার ভগিনীপতি হন, তাঁরই সংলগ্ন আমার বাড়ি। আমি স্টক একসচেঞ্জে চাকরি করি শুনে, অপর ভদ্রলোক বললেন, স্টক একসচেঞ্জের কমিটি মেম্বর হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার জ্ঞাতিভাই। ফলে ও'দের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ জমে উঠল।

আমরা সকলে বসে কথা বলছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক আমাদের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, বৈজনাথ ঝুনঝুনওয়ালা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বৈজনাথবাবু দেওঘরের একজন খুব সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তিনি আমার স্টক একসচেঞ্জের অন্যতম প্রভাবশালী কমিটি মেম্বর জগন্নাথ ঝুনঝুনওয়ালার বড়ভাই। সেইসূত্রেই বৈজনাথবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। সুতরাং বৈজনাথবাবু ভদ্রলোককে পাঠিয়েছেন শুনে, আমি ভদ্রলোকের প্রতি মনোযোগী হলাম। ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, আমার স্ত্রী একজন অত্যন্ত সুশিক্ষিতা মহিলা, নানা শাস্ত্রের পাঠসমাপনান্তে কাশী থেকে উপাধি পেয়েছেন। তিনি খুব ভাল ভাগবতপাঠ ও কীর্তন গাইতে পারেন। দেওঘরে যাতে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিতা হতে পারেন, তার জন্য আপনাকে সহায়তা করতে হবে। সেজন্যই আমি আজ আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

কি করি? বৈজনাথবাবুর অনুরোধ। সুতরাং সে অনুরোধ রক্ষা করতেই হবে। ভদ্রমহিলা দেখতে অতি সুন্দরী, এবং সত্যিই ভাল ভাগবতপাঠ ও কীর্তন গান গাইতে পারেন। কয়েক জায়গায় কীর্তন গানের ব্যবস্থা করলাম। টাঙ্গায় করে মাইকের সাহায্যে প্রচারকার্য চালালাম। পুজার মরসুমে দেওঘর তখন বাঙালী চেঞ্জারে পরিপূর্ণ। প্রথমদিন ও'র গান শুনবার জন্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে মুখে মুখে ও'র হয়ে প্রচারকার্য চালালেন। পরবর্তী অনুষ্ঠানে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সুগায়িকারূপে উনি প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগল। টাকা-পয়সার আমদানীও ভাল হল। কয়েকদিন পরে ও'রা দেওঘর থেকে চলে এলেন। যাবার আগে আমাকে ধন্যবাদ

জানিয়ে গেলেন। পরে এই মহিলাই কলকাতায় ক্ষান্তমণি নামে সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনগায়িকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিতা হলেন।

১১১

এদিকে কালীপুজো এসে গেল। কালীপুজোর পরের দিন সকালে ঠিক করলাম রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যাপীঠে যাব। আমাদের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দুর্গেশ-বাবুর ছেলে বিদ্যাপীঠে পড়ে। সেজন্য দুর্গেশবাবু আমাকে অনেক করে বলে দিয়েছিলেন, আমি দেওঘরে থাকাকালীন একদিন যেন বিদ্যাপীঠে গিয়ে ওঁর ছেলে কেমন আছে, তা দেখে আসি। বিদ্যাপীঠে গিয়ে ওখানে কালী মহারাজের সংগে দেখা হল। উনিই তখন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ। আমার পরিচয় পেয়ে তিনি আমাদের খুব সমাদর করলেন। বিদ্যাপীঠের সমস্ত কাজকর্ম ও ব্যবস্থা ঘুরে-ফিরে দেখালেন। এখন যাঁরা বিদ্যাপীঠ দেখেন, তাঁরা অনুমানই করতে পারবেন না, বিদ্যাপীঠের তখন কি অবস্থা ছিল। মাত্র দু'খানা ছোটখাটো দোতলা বাড়ি। তারই একখানার ওপরতলার ঘরে কালী মহারাজ থাকেন। সেখানেই নিয়ে গিয়ে আমাদের বসালেন। দুর্গেশবাবুর ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। ছেলেটি খুব শান্তশিষ্ট। বাবা-মা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করল। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বাবাকে গিয়ে কি বলব? বলল, বলবেন, আমি খুব ভাল আছি।

তারপর কালী মহারাজের সংগে অনেক গল্পগুজব হল। বাগবাজারের উদ্বোধন অফিসের স্বামীজিদের অনেককে আমি চিনি শুনে, উনি তাঁদের কথাও জিজ্ঞাসা করলেন। একসময় কানাই মহারাজ (স্বামী লোকেশ্বরানন্দ) দেওঘর বিদ্যা-পীঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর সংগেও আমার সম্প্রীতি আছে শুনে, তিনি কানাই মহারাজেরও কুশল-সংবাদ নিলেন। তারপর মায়ের প্রসাদ হিসাবে সেরখানেক বোঁদে পাতায় মুড়ে, আমাদের সংগে বিদ্যাপীঠের গেট পর্যন্ত এসে, সেগুলো আমাদের টাংগায় তুলে দিলেন। আমরা নমস্কার করে ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

১১১

রাসযাত্রাও এগিয়ে এল। দূর থেকে মাইকের আওয়াজ আসতে লাগল। 'লক্ষ্মী-বাটী'র মালি ভুখলকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁরে, মাইক বাজছে, কোথায় কি হচ্ছে রে? ভুখল বলল, ও রোহিণীর রাস্তায় কলকাতার বাগবাজারের এক

বাবুর বাড়ি আছে, তিনি ওখানে রাসের মেলা বসিয়েছেন।

ভুখল খুব অনুগত মালি। দেওঘর থেকে ভাগলপুর যাবার পথে পড়ে চানন গ্রাম। সেখানেই ওর বাড়ি। সেখানে ওর মা, বউ, ছেলে ও ছোটভাই থাকে। মাঝে মাঝে তারা দেওঘরে আসে। আমার স্ত্রীর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, সে মানুষকে ছোট-বড় জ্ঞান করত না, সকল মানুষকেই মানুষ বলে ধরে নিত, এবং অতি সহজ ও সরল ভাবে তাদের সঙ্গে মিশে তাদের আপন-জন করে নিতে পারত। ভুখলের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। মাঝে মাঝে ভুখলের মুখ থেকে ওর সুখ-দুঃখের কথা শুনত। আগের বছরে যখন ভুখলের মা দেওঘরে এসেছিল, তখনই সে ভুখলের মাকে আপন-জন করে নিয়েছিল। ভুখলের মায়ের কাছ থেকে ওদের দুঃখের কথা শুনত, এবং নিজের ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় ও পয়সা-কড়ি দিয়ে সাহায্য করত। ভুখলের বউকে এবং ওর বাচ্ছা ছেলেটাকে খুবই ভাল-বাসত। ভুখলের বউ যখন শিশুসন্তানকে রেখে মারা গেল, তখন আমার স্ত্রী খুবই ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। তারপর ভুখল যখন অপর একটা মেয়েকে 'সাংগা' করল, তখন আমার স্ত্রী ওটা খুব ভাল চোখে দেখল না। দ্বিতীয় বছরেই ভুখলের মা এসে আমার স্ত্রীকে বলল, ভুখল 'সাংগা' করবার পর, মাকে ও ওর মাতৃহারা শিশুসন্তান ও ছোটভাই ও ছোট ভাইয়ের স্ত্রী প্রভৃতিকে আর দেখে না, সেজন্য খুবই কষ্ট, জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে, তাই বেচে সংসার চালায়। বলল, যদি আপনি আমার ছোটছেলে মানুকে কলকাতায় আপনার বাড়ি নিয়ে যান, তা হলে খুব উপকার হয়। যদিও আমার কলকাতার বাড়িতে তখন কাজের লোক ছিল, তা সত্ত্বেও ওদের কষ্টের কথা শুনে আমার স্ত্রী কলকাতায় ফেরবার সময় মানুকে সঙ্গে নিয়ে এল। মানু তেরো বছর বয়সে এসেছিল, আর তেত্রিশ বছর বয়সে আমার বাড়ির কাজ ছেড়ে দেশে চাষবাসে মন দেবার জন্য চলে গিয়েছিল। এই বিশ বছর আমার স্ত্রী মানুকে ঠিক নিজের ছেলেদের মতো মানুষ করেছিল। অনেকেরই ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে মানু আমাদের বাড়ির ছেলে।

২ ২ ২

রাসের মেলার কথা বলতে বলতে ভুখলের প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। সেদিনই সন্ধ্যাবেলা আমাদের রাসের মেলায় যাওয়া হল। দেখলাম, বিরাট পরিসর এক কমপাউন্ডের মধ্যে রাসের মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বেশ সুপরিকল্পিতভাবে মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এরকম সুসংগঠিত মেলা দেওঘরে আর পূর্বে কখনও হয়নি। সুতরাং কৌতূহল হল জানবার জন্য, মেলার সংগঠক কে? ভুখল

তো বলেছিল, কলকাতার বাগবাজারের কোন এক বাবু। কে সেই বাবু জানবার জন্য খুব উদ্‌গ্রীব হলাম। একটা স্টলে গিয়ে একটি লোককে জিজ্ঞাসা করায়, সে মাঝখানের একটা গোল মণ্ডপ দেখিয়ে বলল, বাবু ওই ওখানে বসে আছেন। গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম মাঝখানে বসে আছেন আমাদের প্রতিবেশী বিচে-দা। বিচে-দা'ও আমাকে দেখে অবাক! খানিকক্ষণ গল্প করে চলে এলাম।



'লক্ষ্মীবাটী'র শেষের পার্টে যাঁরা কালীঘাট থেকে এসেছিলেন, তাঁরা রোজই আমাদের পার্টে আসেন। বেশ গল্পগুজব করা হয়। একদিন তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কোথায় 'বাহান্ন বিঘা' আছে জানেন? বললাম, হ্যাঁ, জানি। 'বাহান্ন বিঘা'র মালিক চাটুজ্যে মশাইয়ের সঙ্গে আমার আলাপ আছে শুনে, আমাকে অনুরোধ করে বসলেন, কাল সকালে আমাদের ওখানে নিয়ে যাবেন? বললাম, যাব।

পরের দিন সকালে 'বাহান্ন বিঘা'য় যাওয়া হল। 'বাহান্ন বিঘা' হচ্ছে কলকাতার বিখ্যাত ফুল ব্যবসায়ী এস. পি. চ্যাটার্জি'র ফুলের বাগান। খুব যত্ন করে এখানে ফুলের চাষ করা হয়। এক এক খণ্ড লম্বা চৌকা জমিতে এক এক রকমের ফুলের চাষ। গোলাপই যে কত রকমের তার ইয়ত্তা নেই। আমার সহযাত্রীরা সব দেখে অবাক। তা ছাড়া, ওই ফুলবাগানের মধ্যেই আছে এক দেবমন্দির। সুন্দর পাথরের মন্দির। চতুর্দিকে ফুলের পরিবেশের মধ্যে মন্দিরটা মনে স্বর্গীয় ভাব উদ্রেক করে। আমরা ঘুরে ঘুরে ফুলবাগান দেখছি, এমন সময় দেখি, দূর থেকে চাটুজ্যে মশাই আমাকে দেখে সেখানে ছুটে আসছেন। আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালেন ওঁর ঘরে। উনি নিজে থেকেই 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর কথা পাড়লেন। বললেন, এখন কাগজটার খুব উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে প্রশংসা করলেন, আমার আর 'হোমা'র লেখার। বললেন, এ দুটো লেখা আমার কাছে অপূর্ব মনে হয়। আমার সহযাত্রীরা ওঁকে ফুলের বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কত যত্ন নিয়ে এবং কিভাবে ফুলের চাষ করতে হয় সে-সম্বন্ধে তিনি ওঁদের অনেক কথা বললেন। ইতিমধ্যে একজন মালি একটা মস্ত বড় গোলাপের তোড়া নিয়ে এল। বোধ হয় আগে থাকতেই উনি মালিকে আদেশ করে এসেছিলেন। তোড়াটা নিয়ে তিনি আমার মেয়ের হাতে দিয়ে বললেন, এই নাও তোমার কাকাবাবুর উপহার। কাকাবাবুকে মনে রাখবে, এবং যখনই দেওঘরে আসবে, তখনই কাকাবাবুর বাগানে একবার ঘুরে যাবে।

১১১

সেবার দেওঘরে গিয়ে প্রায় দেড়মাসের ওপর ছিলাম। আমাদের ফেরবার সময় হয়ে এল। আমার স্ত্রী বলল, কই ত্রিকূট যাবে বলেছিলে গেলে না ? সুতরাং ত্রিকূট যাওয়া হল। আমাদের সংগে আর একখানা টাংগা করে গেল আমার ছেলের বন্ধু মধু ও মধুর স্ত্রী। মধুর স্ত্রী অধ্যাপক সরোজ বসুর মেয়ে। মধু আগে ত্রিকূটের মাথায় উঠেছিল। উপরে দুই পাহাড়ের মাঝখানে এমন এক সরু বিপজ্জনক পথ আছে, যেটা অতিক্রম করবার সময় বুক ধড়ফড় করে। সেজন্য তার নাম 'ধড়ফড়িয়া'।

ত্রিকূটে পৌঁছে আমার ছেলেরা ও মেয়ে বায়না ধরল যে তারা মধুদার সংগে ত্রিকূটের মাথায় উঠবে। তাদের নিবৃত্ত করতে পারলাম না। আমি ও আমার স্ত্রী সাধুবাবার আশ্রম পর্যন্ত উঠলাম এবং সেখানেই বসে রইলাম। ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদেরই বুক ধড়ফড় করতে লাগল। খানিক বাদে দেখলাম, ওরা ত্রিকূটের মাথার পথ দিয়ে চলেছে। নীচে থেকে ওদের পিঁপড়ের মতো ছোট দেখাচ্ছে। আমাদের খুব ভয় হতে লাগল। বাবা বৈদ্যনাথের নাম স্মরণ করতে লাগলাম। ছটফট করতে লাগলাম। একটু উঠে পায়চারী করে ধাতস্থ হবার চেষ্টা করলাম। পায়চারী করতে উঠে, অন্তরালে গিয়ে দেখলাম একজন তরুণ একখানা মোটা বই নিয়ে খুব নিবিষ্টমনে পড়ছে। কৌতূহল হল। ওর পাশে গিয়ে বসলাম। দেখলাম, বইখানা India's Five Year Plan। জিজ্ঞাসা করলাম, কি কর ?

—কিছুই নয়. মাত্র এবার বি. এ. পাস করেছি। বসে আছি, সেজন্য বইখানা পড়ছি। আচ্ছা, আপনি আমাকে এই শব্দগুলোর মানে বলে দিন তো ? আমার ইংরেজি জ্ঞান খুব কম। সেজন্য সব শব্দের মানে বুঝতে পারছি না।

—তা তুমি তো বি. এ. পাস করেছ বললে, তা এসব সহজ ইংরেজি শব্দের মানে বুঝতে পারছ না ?

—আমি বিহার শরিফ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাস করেছি। ওখানে মোটেই ইংরেজি শেখানো হয় না। আমাদের পড়াশোনা ও পরীক্ষা সব হিন্দিতে হয়। আমি বাড়িতে পড়ে ইংরেজি শিখেছি।

আমি তো শুনে অবাক। এমন সময় আমার ছেলেমেয়েরা নীচে নেমে এল। আমিও বাড়ি ফেরবার জন্য উঠে পড়লাম।

কলকাতায় ফেরবার আগে একবার যশিডি গেলাম। দেখলাম সে আগের যশিডি আর নেই। এখন নির্জন জায়গা। মনে পড়ে গেল ত্রিশ বছর আগের

কথা। তখন ওঙ্কারমল জাঠিয়ার বাড়ির সংগ্রহশালায় সব অদ্ভুত জিনিসগুলো দেখবার জন্য যশিডি লোকে লোকারণ্য হত। এখন সেটা আর নেই। বাড়িটায় এখন মোহনানন্দ স্বামীর লোকেরা থাকে।

১১১

কলকাতায় আবার ফিরে এসেছি। প্রথমেই সুরেশবাবু এসে কুশল সংবাদ নিলেন। প্রস্রাবখানার কাছে দাঁড়িয়ে রোজই সুরেশবাবুর সঙ্গে নানা কথা হয়। মাঝে মাঝে আমার লেখার প্রশংসা করেন। একদিন বললেন, সুটারকিন স্ট্রীটে আমাদের যে নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেটা আপনি দেখে এসেছেন? বললাম, না।

—তবে একদিন আমার সঙ্গে গিয়ে দেখে আসবেন চলুন।

—আচ্ছা যাব।

নিজের ঘরে ফিরে এসে, অনিলেশ্বরবাবুকে কথাটা বললাম। অনিলেশ্বর-বাবু বললেন, আমি গিয়ে দেখে এসেছি। আপনি যাবেন? তা হলে, আপনাকে আপনার স্টক একস্‌চেঞ্জ অফিস থেকে কাল বেলা তিনটার সময় নিয়ে যাব।

তার পরের দিনই তিনটার সময় অনিলেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমাদের সুটারকিন স্ট্রীটের নতুন বাড়িটা দেখে এলাম।

বিকালের দিকে সুরেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে কবে নতুন বাড়ি দেখতে যাবেন? বললাম, আমি দেখে এসেছি।

—কবে গেলেন?

—আজই তিনটার সময়।

শুনে উনি প্রীত হলেন।

আনন্দের মধ্যেই কয়েকমাস কেটে গেল। সকলের মনেই উল্লাস। নতুন বাড়িতে যাবে। এমন সময় বিনামেঘে বজ্রাঘাত হল।

১৩ অগস্ট ১৯৫৪। সকালবেলা কার মুখ দেখে উঠেছিলাম জানি না! সাতটার সময় যখন কাগজ পেলাম, সংবাদ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সুরেশ-চন্দ্র মজুমদার আর ইহজগতে নেই।

আগের দিন ১২ অগস্ট তারিখের সকালবেলা গিয়েছিলেন বাগবাজারে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বাড়িতে মৃণালকান্তি ঘোষ মশাইয়ের শ্রাদ্ধবাসরে। শ্রাদ্ধবাসরের আয়োজন হয়েছিল পাঁচতলার ছাদের ওপরে। ও-বাড়িতে 'লিফট' নেই। সুতরাং সিঁড়ি দিয়েই ওঁকে উঠতে হয়েছিল। ফিরে এসেই হৃৎপিণ্ডের

রোগে আক্রান্ত হলেন। তারপর সব শেষ!

সুরেশবাবুর মৃত্যু আমার জীবনে ঘটালো এক পরিবর্তন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় সুরেশবাবুই ছিলেন আমার অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আমার জীবনে শুরু হল অন্য এক অধ্যায়।

১১১

সুরেশবাবুর জীবনাবসানের পর আনন্দবাজারের কর্ণধার হলেন প্রফুল্লকুমার সরকার মশাইয়ের একমাত্র পুত্র অশোককুমার সরকার। অশোকবাবুর বয়স তখন ৪২ বৎসর। আনন্দবাজারের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে তিনি একজন খুব অভিজ্ঞ ব্যক্তি। দশ বৎসরের অধিককাল তিনি আনন্দবাজারের হিসাববহিসমূহ 'অডিট' করেছেন। যে কোন প্রতিষ্ঠানের হিসাববহিসমূহের মধ্যে নিহিত থাকে সেই প্রতিষ্ঠানের শক্তি-সামর্থ্য ও দুর্বলতার ইতিহাস। সুতরাং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শক্তি ও দুর্বলতা, এই উভয় দিকের সংগেই অশোকবাবুর সম্যক পরিচিতি ছিল। কিন্তু নিজ আসনে অধিষ্ঠিত হবার পর তাঁকে দুই উৎকট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রথম, সুরেশবাবুর উইলের 'প্রবেট' নেওয়া সংক্রান্ত ব্যাপার। সুরেশবাবুর উইলগুলির মর্মার্থ সবই আমার জানা ছিল। বর্মণ স্ট্রীটের অফিসের প্রস্রাবাগারের কাছে দাঁড়িয়ে সুরেশবাবু যখন দিনের পর দিন নানা বিষয়ে আমার সংগে আলোচনা করতেন, তখন উইলগুলির কথাও আমাকে বলেছিলেন। তাঁর প্রথম উইল দ্বারা তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ও স্বার্থের একমাত্র অধিকারী করেছিলেন তাঁর ভাগিনেয় ডাক্তার রবি বসুকে। তারপর এক দুর্ঘটনায় রবির মৃত্যুর পর, তিনি সে উইল নাকচ করে, পুনরায় নতুন উইল করেছিলেন। যদিও আমি তাঁর উইলের বিষয় সবই জানতাম, তা হলেও ওই উইলের 'প্রবেট' মামলায় কোন পক্ষই আমাকে সাক্ষী মানেনি, তার কারণ, কোন পক্ষই জানত না, আমার সাক্ষ্য কার সপক্ষে অথবা কার বিপক্ষে যাবে। সে যাই হোক, দক্ষ আইনবিদদের হাতে উইল 'প্রবেট'-এর ব্যাপারটা ন্যস্ত করে, অশোকবাবু ওদিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

অশোকবাবু দ্বিতীয় যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেটা হচ্ছে এক গুরুতর সমস্যা—'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রচার-সংখ্যার পশ্চাদ্গতি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দীর্ঘ ইতিহাসে এ দুর্ঘটনা একবারই ঘটেছিল। ব্যাপারটা ঘটে দেশবিভাগের পদক্ষেপে। পূর্ব-পাকিস্তান সৃষ্ট হবার পর, হিন্দুরা সেখানে নিরাপত্তার অভাবে দলে দলে পশ্চিমবংগে চলে আসে। এসব শরণার্থীরা

দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। এক শ্রেণীর লোক এখানকার মুসলমানদের সংগে তাদের সম্পত্তি বিনিময় করে, তাদের পূর্ব-পাকিস্তানের সব পাট তুলে দিয়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। আর একদল দু'নৌকায় পা দিয়ে, তাদের পূর্ব-পাকিস্তানের ঘরবাড়ি সম্পত্তি কোন বন্ধু বা বন্ধা আত্মীয় বা আত্মীয়ার জিম্মায় দিয়ে, পশ্চিমবংগে এসে হাজির হয়েছিল শরণার্থীরূপে। এদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি এবং বহু লক্ষ। তারা ধরে নিয়েছিল যে দেশবিভাগের ফলে তাদের দুর্গতির জন্য একমাত্র কংগ্রেসই দায়ী। তাদের বদ্ধমূলে প্রত্যয় হয়েছিল যে একমাত্র গদির লোভের বশীভূত হয়েই কংগ্রেস অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সংগে স্বাধীনতার শর্ত হিসাবে দেশবিভাগে ব্যস্ত হয়েছিল। কংগ্রেসের প্রতি তাদের এই বিরূপতাই প্রতিফলিত হয়েছিল কংগ্রেসপন্থী 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ওপর। ফলে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রচার-সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। আমাদের প্রচার-বিভাগের কর্মকর্তা নগেনবাবুর সংগে আমাদের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। প্রত্যহই তিনি আমাদের বাণিজ্যবিভাগে এসে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পশ্চাদ্গতির দুঃসংবাদ দিতেন।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পশ্চাদ্গতির ফলে, যে শূন্যতা সৃষ্টি হল, সে শূন্যতা দখল করে নিল 'যুগান্তর'। 'যুগান্তর'-এর তখন সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। বিবেকানন্দবাবু তো বরাবরই উত্তপ্ত লেখনীর অধিকারী ছিলেন। এখন তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকায় এমন সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন যে 'যুগান্তর' শরণার্থীমহলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করল।

ঠিক এ-রকম সময়েই অশোকবাবু 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কর্ণধার হলেন। কিন্তু এটা অশোকবাবুর অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচায়ক যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র এই ভাটার স্রোতকে শীঘ্রই তিনি জোয়ারে পরিণত করলেন। মাত্র জোয়ারের স্রোত নয়। তিনি আনন্দবাজারের প্রচারের ক্ষেত্রে আনলেন বানের দুর্নিবার প্রবাহ। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রচার-সংখ্যা লাফাতে লাফাতে এগুতে লাগল, হাজারের হিসাবে নয়, লাখের হিসাবে! তাঁর সমগ্র ত্রিশ বৎসর কাল পরিচালনাধীনে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রচার-সংখ্যা এক লক্ষ থেকে দুই লক্ষ, তিন লক্ষ, চার লক্ষের ওপরে গিয়ে পৌঁছাল।



অশোকবাবুর জীবনাবসান ঘটল খুব অপ্রত্যাশিতভাবে। সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দমনে গিয়েছিলেন 'বইমেলা' পরিদর্শনে। সংগে নিয়ে গিয়েছিলেন এক

পুত্রবধূকে। ওখানে এক অনুষ্ঠানে ও'র ভাষণ দেবার কথা ছিল। ভাষণ দিতে উঠেছেন। প্রথম বাক্য সম্পূর্ণ করবার পূর্বেই লুটিয়ে পড়লেন নিজ আসনে। নিকটস্থ এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু তখন জী দীপ নির্বাপিত।

ꕥ ꕥ ꕥ

শেষের দিকে কয়েক বছর অশোকবাবু তাঁর সংস্থার পরিচালনভার তাঁর তিন ছেলের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। অভীককে দিয়েছিলেন সম্পাদনার পরিচালন-ভার, অরূপকে সংস্থার সামগ্রিক পরিচালন-ভার, আর অধীপকে ব্যবসায়িক বিভাগসমূহের—প্রচার, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির ভার। আজ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংস্থার জয়যাত্রার রথ যে গৌরবময় সাফল্যের পথে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে, তা এ'দের অনন্যসাধারণ কর্মকুশলতার পরিচায়ক।

ꕥ ꕥ ꕥ

অনেকে হয়তো শুনলে আশ্চর্য হবেন যে অশোকবাবুর ত্রিশ বৎসর কাল নিজ আসনে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন, আমি মাত্র তিনবার ও'র ঘরে গিয়েছি, তা-ও নিজের প্রাণরক্ষার জন্য। আমি নিজে ইচ্ছা করেই যেতাম না, পাছে অপরে ভাবে যে আমি আমাদের পুরানো দিনের সখ্যতার সুযোগ নিতে ও'র ঘরে যাই। আমাদের মধ্যে যা কথা হত, তা লিফটে ওঠবার সময় কিংবা লিফট্ থেকে নেমে নীচের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে। যে তিনবার আমি ও'র ঘরে গিয়েছিলাম, তার কারণ মাত্র তিনজন জানে। স্বয়ং অশোকবাবু, আমি ও পশ্চিমবঙ্গের ইনস্পেকটর-জেনারেল অভ্ পুলিশ উপানন্দ মুখোপাধ্যায়।

ꕥ ꕥ ꕥ

অশোকবাবুর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক ছিল তাতে আমি ইচ্ছা করলে 'আনন্দবাজার' থেকে অনেক কিছু সুবিধা সংগ্রহ করতে পারতাম। কিন্তু তা করিনি। কেননা, 'আনন্দবাজার'-এর সেবা করব, এই সংকল্প নিয়েই আমি 'আনন্দবাজার'-এ যোগদান করেছিলাম। দীর্ঘ ৪১ বৎসর আমি নিঃস্বার্থে 'আনন্দবাজার'-এর সেবা করে এসেছি। 'আনন্দবাজার'-এর সঙ্গে আমার কোন

অর্থের সম্পর্ক ছিল না। কখনও 'বেতন' বলে কিছু গ্রহণ করিনি, 'বেতন' বলে কিছু গ্রহণ করিনি বলে আমার কোন প্রভিডেন্ট ফন্ড বা গ্র্যাচুইটিরও ব্যবস্থা ছিল না। যা গ্রহণ করেছি, তার অভিধা ও'রা দিতেন CONTRIBUTION। সেটা অতি সামান্য, আমার নিজ ডিপার্টমেন্টের বেয়ারার বেতন অপেক্ষাও অনেক কম! তাছাড়া, যা কিছু লিখেছি বে-নামীতে 'সিটি এডিটর' অভিধায়, নিজ নাম প্রচারের জন্য নয়।

১১১

মানুষের জীবনে কেন বঞ্চনা আসে, তা মানুষ জানে না। বোধ হয় নিয়তিই এজন্য একমাত্র দায়ী। নিয়তি মানুষকে যে কিভাবে বঞ্চনা করে, তা উপলব্ধি করা যাবে নীচের ঘটনা থেকে।

একদিন স্টক এক্সচেঞ্জ অফিসে নিজের কাজে খুব ব্যস্ত। এমন সময় এক যুবক এসে ঢুকলো আমার ঘরে। অত্যন্ত সুদর্শন চেহারা, রঙ সাহেবদের মতো ফর্সা। বলল, আমি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অভ্ ইন্ডিয়ার অফিসার, ভারতের লেনদেন (balance of payments) সম্বন্ধে গবেষণা করছি, আমার গবেষণা-পদ্ধতিটা আপনাকে দিয়ে একবার অনুমোদন করিয়ে নিতে চাই।

ওর গবেষণা সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলো আমি দেখলুম। বললাম, তা আপনি তো ঠিক পথেই চলেছেন। শুনে ও সন্তুষ্ট হল। তারপর দু'জনে গল্প করতে লাগলাম। কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ পেল, ও কলকাতার একজন বিখ্যাত শিল্পপতির জামাই।

তারপর ও আসে যায়। আমাদের দু'জনের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব হয়েছে। সুখদুঃখের অনেক কথা হয়। বুঝলাম ও'র মনের অন্তস্তলে একটা মর্মবেদনা আছে। কিন্তু সে বেদনাটা কি, তা সে আমাকে বলে না। আমিও জানতে চাই না।

একদিন ও আমার সামনে এসে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে? তখন সে সব কথা আমাকে খুলে বলল। কাহিনীটা অত্যন্ত করুণ। বলল,

—রিসার্চে আর মন দেব কি করে? আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে আমার স্ত্রীকে নিয়ে। ওকে বিয়ে করাটাই আমার ভুল হয়েছে। ও তো বিকালে বেরিয়ে যায়, আর মত্ত অবস্থায় বাড়িতে ফেরে রাত দুটো-আড়াইটার সময়। আমরা অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারের লোক। এটা আমরা সহ্য করি কি করে?

—তা, আপনার শ্বশুরমশাই ও শাশুড়ীঠাকরুনকে একথা বলেন না কেন?

—আমি ওঁদের বাড়ি যাই না। ওঁদের জীবনচর্যাও ওই রকমের। ওই পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছে বলেই তো আমার স্ত্রী এরূপ হয়েছে।

আমি শুনে খুব দুঃখিত হলাম। এর কয়েকদিন পরে, ও আবার আমার অফিসে এসে হাজির! দেখলাম, মুখখানা আরও করুণ হয়ে উঠেছে। এক নিদারুণ ব্যর্থতার ছাপ বহন করছে। আবার কাঁদতে লাগল। বলল, আপনি উপদেশ দিন আমি কি করব?

বললাম, দেখুন, এ পরিস্থিতির মধ্যে থাকলে, আপনি তো মারা যাবেন। আপনি বরং এ পরিস্থিতি থেকে সরে যান। কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে আপনি রিজার্ভ ব্যাংকের বোম্বাই অফিসে চলে যান। আমার মনে হয়, আপনি বোম্বাই চলে গেলে, আপনার স্ত্রী নিজে থেকেই বাপের বাড়ি চলে যাবে, এবং পরে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাবে। তখন আপনিও নিষ্কৃতি পাবেন। পুনরায় বিবাহ করে, আপনি নতুন সংসার পাততে পারবেন। তবে দেখেশুনে বিবাহ করবেন, যাতে সুখী হতে পারেন। আমার শুভেচ্ছা রইল আপনার প্রতি।

যা বলেছিলাম ঠিক তাই ঘটল। ওর দ্বিতীয় দাম্পত্য জীবন সুখেরই হল। কিন্তু আমি মনে মনে ভাবি ওর অসুখকর প্রথম দাম্পত্য জীবনের বঞ্চনা, সবই নিয়তির বিধান! যেমন, আমার ডক্টরেট থিসিসের বিভ্রাট হয়েছিল।

১১১

সেদিন কালীবাবুর কাছ থেকে আমার ডক্টরেট থিসিসের পরিণামের কথা শুনে, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর ওপরতলা থেকে যখন নেমে এসেছি, তখন সিঁড়ির পাশের ঘর থেকে বেরুল দ্বিজেন সান্যাল বা ডি. কে. সান্যাল। দ্বিজেন সান্যাল ছিল একসময় আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমাকে দেখামাত্রই বলে উঠল, এই যে অতুল বাবু, পুরানো বন্ধুদের তো একেবারেই ভুলে গেছেন, বলি আছেন কেমন? আমাকে ওর ঘরে নিয়ে গেল, জিজ্ঞাসা করল, চা খাবেন, না কফি?

তারপর ডি. কে. সান্যাল বলতে শুরু করল, জানেন তো, লড়াইয়ের সময় ইউনিভারসিটিকে দিয়ে একটা 'লেবার ওয়েলফেয়ার' কোর্স শুরু করিয়েছিলাম। যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছি। এখন তো কোন শিল্পসংস্থা আমাদের এখানে পাস-করা ছাত্র ছাড়া, কারুকে 'লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার' নিযুক্ত করে না। 'লেবার ওয়েলফেয়ার' কোর্সটা যেমন এদেশে আমার মাথায় প্রথম ঢুকেছিল, তেমনই একটা নতুন কোর্স চালু করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের

একদল লোকের কাছ থেকে ভীষণ বিরোধিতা পাচ্ছি। একমাত্র ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ই আমার সহায় আছেন।

—তা কোর্স'টা কি ?

—'বিজনেস্ ম্যানেজমেন্ট কোর্স''।

—'বিজনেস্ ম্যানেজমেন্ট কোর্স'' তো ওই একমাত্র আমেরিকায় 'আমেরিকান ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন'ই চালায়। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তো ওই বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না।

—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা তো ও-রকম কোর্সের নামই শোনেনি, সেজন্যই তো ওদের বিরোধিতা।

—তা, আপনি এ-সম্বন্ধে কতদূর এগিয়েছেন ?

—বিশ্ববিদ্যালয় বিরোধিতা করছে দেখে, আমি একটা নতুন সংস্থা গঠন করেছি, নাম দিয়েছি 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অভ্ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস্ ম্যানেজমেন্ট'। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট করেছি। তাঁরই সাহায্যে একখণ্ড জমি পেয়েছি, সেখানেই এই সংস্থার জন্য একটা ইমারত তৈরি করব ঠিক করেছি।

—তা ইমারত তৈরির টাকাটা দেবে কে ?

—কিছু টাকা পাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে, কিছু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে, আর কিছু টাটাদের কাছ থেকে। টাটাদের জে. আর. ডি. টাটা-ই আমাকে বেশি উৎসাহিত করছেন।

—তারপর ?

—তারপর আর কি ? দৈবক্রমে আপনাকে পেয়ে গিয়েছি। সংগঠক হিসাবে তো আপনার যথেষ্ট সুনাম আছে, এখন আপনাকে আমার পাশে দাঁড়াতে হবে।

—ঠিক আছে, যখন যা দরকার হবে আমাকে বলবেন, আপনার পাশে এসে আমি সব সময় নিশ্চয়ই দাঁড়াব।

ইমারতটা যখন উঠতে আরম্ভ করল, বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন কি বিরোধিতা ! এক এক সময় সান্যাল এমন হতবল হয়ে পড়ে যে আশাভঙ্গ হয়ে বলে, আর এগিয়ে দরকার নেই। একমাত্র আমিই ওকে উৎসাহিত করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন সান্যালের পাশে আমি না থাকলে, 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অভ্ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস্ ম্যানেজমেন্ট' কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হত না। অবশ্য, আমি উপলক্ষ মাত্র। কেননা, আমার বিশ্বাস ছিল যে, যে-কোন সৎকাজের ওপর সব সময়েই ভগবানের অসীম করুণা থাকে। সুতরাং আমাদের প্রয়াস যে সার্থক হবে, সে বিশ্বাস আমার ছিল। 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অভ্ সোস্যাল

ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস্ ম্যানেজমেন্ট'-এর সার্থক রূপায়ণের পেছনে আমার যে নিরলস অবদান ছিল, তা সান্যাল মারা যাবার পর যে 'স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে উল্লিখিত আছে।

ইমারতের দোতলা পর্যন্ত তৈরি হবার পরই আমরা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলাম। ঠিক হল যে দুপুরে 'লেবার ওয়েলফেয়ার' ও সন্ধ্যার সময় 'বিজনেস্ ম্যানেজমেন্ট' সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঠিক করলাম যে 'বিজনেস্ ম্যানেজমেন্ট' কোর্সে ভর্তি হবার জন্য প্রার্থীর কোন বাণিজ্যসংস্থাতে ন্যূনপক্ষে তিনবছরের অফিসার পদের অভিজ্ঞতা ও ওই বাণিজ্যসংস্থা কর্তৃক প্রেরিত হওয়া চাই। পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ই নেবে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ই ছাত্রদের ডিপ্লোমা দেবে।

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রথম ক্লাস শুরু হল। ক্লাইভ স্ট্রীটের বিভিন্ন চেম্বারস্ অভ্ কমার্সের সেক্রেটারী ও সহকারী সেক্রেটারীদের শিক্ষক নিযুক্ত করা হল। কিন্তু প্রথম বৎসরের শেষে দেখা গেল যে 'প্রিন্সিপলস্ অভ্ ম্যানেজমেন্ট' এর জ্ঞান না থাকার দরুন তারা সবাই প্রশিক্ষণ কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত। সেজন্য দ্বিতীয় বর্ষে তাদের সকলকে বাতিল করে দেওয়া হল। রইলাম একমাত্র আমি। কেননা, প্রথম বর্ষের ছাত্রমহলে আমার শিক্ষাদান সম্বন্ধে সুনাম হয়েছিল। দ্বিতীয় বর্ষে আমরা ক্লাইভ স্ট্রীটের বিভিন্ন বাণিজ্যসংস্থার 'সিনিয়র বিজনেস্ একজিকিউটিভ'দের আমন্ত্রণ জানালাম, আমাদের কাজে সহায়তা করবার জন্য। ফলে, দ্বিতীয় বর্ষের প্রশিক্ষণ খুব ফলপ্রসূ হল। তখন থেকে আমরা প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে এই পদ্ধতিই অবলম্বন করলাম।

এদিকে আমাদের সাফল্য দেখে, বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউটকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল। বিধান ডাক্তার নিজে তো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হালচাল সবই জানতেন। বিশ্ববিদ্যালয় যখন ইনস্টিটিউটকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল, তিনি তখন এক আইন প্রণয়ন করে ইনস্টিটিউটকে স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পরিণত করলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ থাকার সময় থেকেই আমার কাজ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। প্রশিক্ষণ দেওয়া ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমি পেপারসেটার, হেড্ একজামিনার ইত্যাদি পদে নিযুক্ত হয়েছিলাম। ইনস্টিটিউট ছাড়া, আমার তো অন্য কাজও ছিল,—স্টক একস্‌চেঞ্জের কাজ, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের কাজ, ব্যুরো অভ্ ইনডাস্ট্রিয়াল স্ট্যাটিসটিকসের কাজ, বিলাতের ইনস্টিটিউট অভ্ চার্টার্ড সেক্রেটারিজ, ইনস্টিটিউট অভ্ ইনকরপোরেটেড অ্যাকাউন্টটেন্টস্, ও ইনস্টিটিউট অভ্ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টটেন্টস্ প্রভৃতি সংস্থার স্থানীয় অধ্যাপক, ইত্যাদি হাজার

রকমের কাজ।

সেজন্য একদিন সান্যালকে বললাম, আপনার ইনস্টিটিউট তো দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, এখন আমাকে অব্যাহতি দিন। কিন্তু সংগে সঙ্গেই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে এক ব্যক্তিগত চিঠি পেলাম। উনি লিখলেন, তোমাকে ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হবে।

১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে আমার পর পর দু'বার করোনারি অ্যাটাক হল। তখনও আমি অব্যাহতি পেলাম না। কেবল আমার লেকচার-সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হল। ফলে, আমাকে ভীষণ ক্ষিপ্রতার সংগে লেকচার দিতে হত। কিন্তু ছাত্ররা যখন সান্যালের কাছে অনুযোগ করল যে আমি 'হ্যারিকেন স্পীডে' লেকচার দিই, তাদের আমাকে অনুসরণ করা মুশকিল হচ্ছে, তখন আমাকে 'পুনর্মূষিক ভব' হয়ে 'যথা পূর্বং তথা পরম্' সংখ্যকই লেকচার দিতে হল।

ইতিমধ্যে আমরা ইনস্টিটিউটের কর্মযজ্ঞকে বহুমুখী করে তোলবার চেষ্টা করলাম। একটা রিসার্চ বিভাগ খোলা হল। ও-বিভাগ থেকে আমার দু'একখানা বই বেরুল। তারপর সান্যাল ইনস্টিটিউটের মুখপত্র হিসাবে একখানা পত্রিকা বের করতে চাইল। পত্রিকাটার নামকরণ আমিই করেছিলাম। নামকরণ করা হল SURVEY। সেই নামেই পত্রিকাটা এখনও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে হঠাৎ সান্যালের মৃত্যু ঘটল। ওর মৃত্যুর পর আমিও অব্যাহতি পেয়ে গেলাম। তখন থেকেই আমি ইনস্টিটিউটের সংগে বিযুক্ত হয়ে আছি।

৯ ৯ ৯

১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে। একদিন সান্যালের ওখানে বসে আছি, এমন সময় বিখ্যাত ব্যারিস্টার কে. পি. খৈতান এলেন। কে. পি. খৈতান একসময় অ্যাড্‌ভোকেট-জেনারেল ছিলেন। এখন তিনি সুপ্রিম কোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট। আমাকে দেখেই উনি বলে উঠলেন. এই যে সুরসাহেব (ক্লাইভ স্ট্রীটের ব্যবসামহলে আমি এই নামেই পরিচিত ছিলাম), ক'দিন ধরে আপনার কথাই ভাবছিলাম।

—কেন?

—আপনি তো আন্দোলন করে, মেমোরাণ্ডাম পেশ করে, কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিয়ে, কোম্পানি-আইনের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব সৃষ্টি করলেন। কিন্তু সরকার যে আইনখানা প্রণয়ন করল সেটা দেখেছেন তো। এত বড় আইন তো এদেশে আগে কখনও তৈরি হয়নি। এতে আছে ৬৫৬টা ধারা। তারপর আইনখানার মধ্যে

কোন শৃংখলা নেই। একটা ধারায় একটা বিষয় বলা হয়েছে, আর তার জেরে যে-কথা বলা দরকার সেটা উল্লিখিত হয়েছে দু'শো পাতা পরে। আইনখানা দেখে সকলেরই তো মাথা ঘুরে গেছে। যাঁরা এর আগে 'কোম্পানি আইন' সম্বন্ধে বই লিখে, বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা তো কেউই নতুন আইন সম্বন্ধে বই লিখতে সাহস করছেন না, পাছে কিছু ছুট হয়ে যায়। 'কোম্পানি আইন' সম্বন্ধে আপনার যে গভীর জ্ঞান আছে, তাতে একমাত্র আপনিই এই নতুন আইন সম্বন্ধে একখানা সুসংবদ্ধ বই লিখতে পারেন। সেজন্যই ক'দিন ধরে আপনার কথা ভাবছিলাম। তা, আপনি একখানা বই লিখে ফেলুন। তাতে আমাদের সকলেরই উপকার হবে। আমি উত্তরে বললাম,

—তা, বই তো লেখা হয়ে গেছে।

—কে লিখল? কই দেখিনি তো।

—আমিই লিখে ফেলেছি।

—কত বড় বই করেছেন?

—মাত্র আশি পাতার।

—মাত্র আশি পাতার! বলেন কি? তাতে কি সমস্ত আইনটা আছে?

—হ্যাঁ, মাত্র সমস্ত আইনটাই যে সুসংবদ্ধভাবে লিখেছি তা নয়, তার মধ্যে সমস্ত পুরানো নজিরের উল্লেখ করেছি, এবং যা আজ পর্যন্ত কেউ করেননি তা-ও করেছি, যেখানে কোম্পানি-আইনের সঙ্গে স্টক এক্সচেঞ্জের আইনের বিরোধিতা আছে, তাও উল্লেখ করেছি।

—বলেন কি! সব আশি পাতার মধ্যে করেছেন? আশি পাতার মধ্যে 'কোম্পানি আইন' লেখা, এ তো কোন দেশেই কেউ করতে পারেনি। তা, বইখানা আমাকে দেখাবেন?

—তা দেখুন না। বইখানা তো ছাপা হয়ে গিয়েছে। ছাপা ফরমাগুলো আমার সঙ্গেই আছে।

তারপর আমি আমার ব্রিফকেস্ থেকে ছাপা ফরমাগুলো বের করে ও'র হাতে দিলাম। উনি বইখানা ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখলেন, কোন কোন অংশ মনোযোগ সহকারে পড়লেন, বিশেষ করে যে-সব জায়গায় res judicata সম্পর্কিত ব্যাপার আছে। মনে হল, বইখানা দেখে উনি অবাক হয়ে গেলেন। কেননা, সঙ্গে সঙ্গেই উনি আমাকে বললেন, সুরসাহেব, আপনি তো দেখছি অসাধ্যসাধন করেছেন। এ বইয়ের তারিফ করে আমি একটা 'ফোরওয়ার্ড' লিখব।

১১১

ভগবানের আশীর্বাদে ক্লাইভ স্ট্রীটে গিয়ে আমি কোম্পানি ল'-এ অসাধারণ দখল আয়ত্ত করেছিলাম। কোম্পানি ল'-এর কোন কুটিল ও জটিল প্রশ্ন উঠলে, ক্লাইভ স্ট্রীটে এমন কোন বড় কোম্পানি ছিল না, যার সেক্রেটারীরা তার সমাধানের জন্য আমার কাছে ছুটে আসতেন না। অর ডিগনাম প্রভৃতি বড় বড় সলিসিটারস্ ফার্মের লোকরাও তাই করত। তা ছাড়া, হাইকোর্টে কোম্পানি ল' বিষয়ের মামলাতেও আমাকে বিশেষজ্ঞ সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দিতে হত। একবার প্রশ্ন উঠল, minor বা নাবালক—কোম্পানির শেয়ার হোলডার হতে পারে কিনা। আগেকার যা নজির ছিল, তাতে হতে পারে না। তার বিপক্ষে আমি বললাম, হ্যাঁ, হতে পারে, যদি শেয়ারের নামমূল্য পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হয়। আমার অভিমতই মেনে নেওয়া হল। পরে এটাই হাইকোর্টের নজির হয়ে গেল।

আমার ওই আশিপাতার বইখানা বেরুবার পর, দিল্লি থেকে কোম্পানি ল' বোর্ডের চেয়ারম্যান স্বয়ং কলকাতায় এলেন আমার স্টক একসচেঞ্জ অফিসে, আমাকে তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন জানাবার জন্য। পরে আমি কোম্পানি ল' সম্বন্ধে আর একখানা বিচিত্র বই বের করলাম। নাম A Dictionary of Company Law। সম্পূর্ণ অভিনব বই। জগতের কোন দেশেই এরূপ কোন বই নেই। এসব কারণেই, ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে যখন আমি স্টক একসচেঞ্জ থেকে অবসরগ্রহণ করলাম, তখন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা আমার অবসরগ্রহণ-বার্তায় লিখল: "ডক্টর সুর ইজ অ্যান অথরিটি অন কোম্পানি ল' "। স্টক একসচেঞ্জ থেকে অবসরগ্রহণের পর কিছুদিন শ্রীযুত কমলনাথের 'ইলেকট্রিক্যাল ম্যানুফাকচারিং কোম্পানি'র কোম্পানি-আইন সম্বন্ধে পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেছিলাম। কিন্তু এখন কোম্পানি-আইন-চর্চা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি।

১১২

সেদিন কে. পি. খৈতান চলে যাবার পরই সান্যাল আমাকে বলল, এদেশে 'কোম্পানি ফিনানস্' বা 'বিজনেস্ ফিনানস্' সম্বন্ধে কোন বই নেই। ও-বিষয়ে জ্ঞানও খুব কম লোকের আছে। তা, আপনি তো বিজনেস্ ফিনানস্ পড়াচ্ছেন। ম্যানেজমেন্ট অভ্ বিজনেস্ ফিনানস্ সম্বন্ধে একখানা বই লিখুন না কেন ?

এখন বিজনেস্ ফিনানস্ সম্বন্ধে অনেক বই লেখা হয়েছে। অনেকেই এ-সম্বন্ধে ওস্তাদ হয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই আমার ছাত্র। কিন্তু সান্যাল

যখন আমাকে ওই বিষয়ে বই লিখতে বলেছিল তখন এদেশে কেন, ও-সম্বন্ধে বিদেশেও কোন বই ছিল না। অতীতের বিবর থেকে একজনের লেখা তুলে, আমিই ও বিষয়ের চর্চা শুরু করলাম। ও-সম্বন্ধে আসল বিষয়বস্তু ছিল, কোম্পানির হিসাবপত্রিকা বিশ্লেষণ করে, ওর স্বাস্থ্য ও প্রসার (বা 'গ্রোথ') অনুধাবন করা। ষাটের দশকেই এ-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়। কিন্তু ১৯৫৪ সালেই আমি 'ইনস্টিটিউট অভ্ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস্ ম্যানেজমেন্ট'-এ এ-সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও আলোচনা শুরু করে দিয়েছিলাম। এ-সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেছিলেন দু'জন অর্থনীতিবিদ, এডগার লরেনস্ স্মিথ ও ফ্রেডেরিক ওয়াই. প্রেসলি। এঁদের আলোচনার উৎস ছিল বিশের দশকে লেখা ব্লিস্ নামে একজন হিসাববিদের লেখা। কিন্তু এ সব লেখা ওই বিশের দশকেই বিস্মৃতির অতলতলে চলে গিয়েছিল। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে স্টক একস্চেঞ্জে ঢোকবার পর আমি এগুলিকে খুঁজে বের করি। তারপর ওই বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করে কয়েকটা প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধগুলো 'স্টেটস্ম্যান', 'কমার্স', 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' ও 'নেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ওই সময় আর একটা দিকেও আমি ব্যবসামহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতির ওপর ইনফ্লেশনের প্রভাব। বিলাতের ইনস্টিটিউট অভ্ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টটেন্টস্ সংস্থারও দৃষ্টি এই সমস্যার প্রতি আকর্ষণ করলাম।

সে যাই হোক, সান্যালের কথামতো আমি বিজনেস্ ফিনানস্ সম্বন্ধে একখানা বই লিখে ফেললাম। প্রকাশক হল 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অভ্ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস্ ম্যানেজমেন্ট'। কোম্পানি-ফিনানস্ সম্বন্ধে এ-খানাই এদেশে প্রকাশিত প্রথম বই। এদেশে এ বিষয় সম্বন্ধে প্রথম বই লেখার জন্য ইনস্টিটিউট অভ্ চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্টস্-এর প্রেসিডেন্ট মিস্টার জি. বসু উল্লসিত ও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বইখানার যে 'ফোরওয়ার্ড' লিখে দিলেন, তাতে তিনি আমাকে একেবারে আকাশে তুলে দিলেন! একথাও তিনি বললেন যে কোন চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্টের পক্ষে ও-কাজ করা সম্ভবপর ছিল না। কোম্পানির স্বাস্থ্য নিরূপণ করবার জন্য এতে আমি ১৮টা 'রেশিও'র (ratios) উল্লেখ করেছিলাম। আজ এদেশে এসব 'রেশিও' মুড়ি-মিছরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এদেশে এগুলোর প্রবর্তন আমিই করেছিলাম। এছাড়া, ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে আমি আমার 'STATISTICS—HOW TO HANDLE THEM?' বইয়ে বাজার-দর fore-casting করবার পদ্ধতিও দেখিয়েছিলাম।

১১১

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের কথা বলতে বলতেই আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। ওই সাল-টাই ছিল আমার জীবনের ঘটনাবহুল বছর। নন্দ রিউমেটিক ফিভার থেকে ভাল হয়ে উঠেছে। তারপর আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, তার জেরে আমার স্ত্রী। রক্ত-হীনতার জন্য ডাক্তারের পরামর্শে তাকে দেওঘরে নিয়ে গিয়েছি। তারপর ওই বছরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কালীবাবুর কাছে গিয়ে আমার ডকটরেট থিসিসের বিভ্রাটের কথা শুনেছি। ফেরবার পথে হঠাৎ দ্বিজেন সান্যালের সঙ্গে দেখা এবং ওর কর্মযজ্ঞের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া। আবার ওই ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দেই বের করেছি 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ 'সাপ্লিমেন্ট'—'এগ্রিকালচারাল সাপ্লিমেন্ট'। এরকম নানা ঘটনাপ্রবাহের আবর্তের মধ্যে ওই বছরটায় আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু ওই বছরের একটা ঘটনা আমার মনে চিরকালের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। সে-বছর এক প্রবাসী বাঙালী বিপ্লবীর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

একদিন বিকালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে পৌঁছবার পরই সুধাংশুবাবু ('হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর সম্পাদক সুধাংশুকুমার বসু) আমার ঘরে এসে বললেন, শুনেছেন তো আমেরিকা থেকে ওয়াটুমল ফাউন্ডেশনের সদস্য হিসাবে ডক্টর তারকনাথ দাস ৪৭ বছর পরে ভারতে এসেছেন, আগামী কাল তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে বক্তৃতা দেবেন, আপনাকে ওখানে পৌরোহিত্য করতে হবে।

—তা, আমার পরিবর্তে আপনি পৌরোহিত্য করলেই তো ভাল হয়।

—আমি তো থাকবই, আমার সঙ্গেই আপনাকে যেতে হবে, তবে ওই সভায় আপনাকেই পৌরোহিত্য করতে হবে।

শেষ পর্যন্ত কি ঠিক হয়েছিল, তা আমার মনে নেই। তবে মঞ্চের ওপর তারকনাথ দাসের একপাশে সুধাংশুবাবু বসেছিলেন, আর একপাশে আমি, এবং আমাকেই সেদিন প্রথম বক্তৃতা করতে হয়েছিল। ওঁকে স্বাগত জানিয়ে, আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম সে-সব বাঙালীর প্রতি যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকায় গিয়েছিলেন, যথা তারক দাস, সুধীন্দ্র বসু, শৈলেন ঘোষ, হেমেন্দ্র রক্ষিত, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার প্রমুখ। এঁদের অনেকেরই লেখা আমি যখন রামানন্দবাবুর 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় পড়তাম, তখনই পরম শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে যেত। এঁদের মধ্যে তারক

দাস, সুধীন্দ্র বসু ও বিনয় সরকারের লেখা ঘন ঘন 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় বেরুত। আগেই আমি বিনয় সরকার ও ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে এসেছিলাম ধনগোপাল আমার কাছে এক বিস্ময়কর পুরুষ ছিলেন। কেননা, তিনিই একমাত্র বাঙালীর ছেলে যিনি আমেরিকান সাহিত্যক্ষেত্রে নিজের প্রতিভার ছাপ রেখে গিয়েছেন ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে মর্যাদাপূর্ণ 'নিউবেরি মেডেল' লাভ করে। তাঁর সমস্ত বইগুলিই আমি পড়ে ফেলেছিলাম, যথা 'গে নেক', 'করি দি এলিফ্যান্ট', "দি চীফ অভ্ দি হার্ড", 'কাস্ট অ্যান্ড আউটকাস্ট', 'এ সন্ অভ্ মাদার ইণ্ডিয়া অ্যানসারস্', 'ডিভোশানাল প্যাসেজেস্ অভ্ দি হিন্দু বাইবেল' ইত্যাদি। তাঁরই প্রস্তাবিত ছদ্মনাম 'মানবেন্দ্রনাথ রায়' (আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) গ্রহণ করেছিলেন। ধনগোপালের সান্নিধ্যে আসবার আমার সৌভাগ্য ঘটেছিল ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে উনি যখন দ্বিতীয়বার ভারতে এসেছিলেন। তখন আমি পুরীতে (অধ্যাপক) নির্মলকুমার বসুর সঙ্গে ওঁদের 'সুধাসিন্ধু' নামে বাড়িতে ছিলাম। ধনগোপাল তখন সস্ত্রীক এক বিলাতী হোটেলে এসে উঠেছিলেন। একদিন সমুদ্রতটে ওঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ হল। কথাপ্রসঙ্গে ধনগোপাল সেদিন আমাদের কাছে এক মজার ঘটনা বিবৃত করেছিলেন। ধনগোপাল তখন প্রায়ই মাত্র গেঞ্জি গায়ে দিয়েই হোটেলের মধ্যে চলাফেরা করতেন। একদিন হোটেলের ইংরেজ ম্যানেজার ওঁকে বলল, আপনি এরকমভাবে 'নগ্ন' হয়ে হোটেলের মধ্যে চলাফেরা করবেন না, এখানে বহু ইংরেজ মহিলা আছেন, তাঁরা আপনার এরকমভাবে 'নগ্ন' অবস্থায় চলাফেরা করা আপত্তিকর বলে মনে করবেন। ধনগোপাল সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিয়েছিলেন, চলুন না একবার আমার মার্কিন স্ত্রীর কাছে, সে যদি আমার গেঞ্জিপরায় আপত্তি না করে, তবে আমার মনে হয় না যে অপর কোন মহিলা এটা আপত্তিকর বলে মনে করতে পারে!



পরের বছর (১৯৫৩) কলকাতায় ঘটে গেল এক পৈশাচিক ঘটনা। কলকাতার পুলিস উন্মত্ত পশুর মতো বেপরোয়া আক্রমণ চালাল ২৫জন কর্তব্যরত সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারের ওপর। ঘটনাটা ঘটেছিল ২২ জুলাই ১৯৫৩ তারিখে। ময়দান অঞ্চলে জারি করা হয়েছিল ১৪৪ ধারা। ওই ধারা ভঙ্গ করে ট্রাম-বাস-ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি এক সভা আহ্বান করল মনুমেন্টের (শহীদ মিনারের) তলায়। কিন্তু মনুমেন্ট থেকে অনেক দূরে, বুশ-শার্ট ও প্যান্ট পরিহিত লালবাজার হেড্ কোয়ার্টারের ডেপুটি কমিশনার পি. কে. সেন

একহাজার সাদা পোশাক পরা পুলিসের সহায়তায় এক বর্বরোচিত আক্রমণ চালাল, সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের ওপর। সাংবাদিকদের লাথি ঘুঁষি মেরে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর তাদের টেনে হিঁচড়ে 'প্রিজন ভ্যানে' তুলল। ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরাগুলো ভেঙে দিল, তাদেরও প্রচণ্ড মারধোর করল। ফাউনটেন পেন ও টাকা-পয়সা সব কেড়ে নিল। সাংবাদিকদের মধ্যে 'টাইমস্ অভ্ ইন্ডিয়া'র শ্যামাদাস বসু পিঠের মেরুদণ্ডে গুরুতর আঘাত পেল। 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'র ফটোগ্রাফার তারক দাসের মুখে প্রচণ্ড আঘাতের ফলে রক্ত পড়তে লাগল। 'টাইমস্ অভ্ ইন্ডিয়া'র ড্রাইভার গাড়িতে বসে থাকা সত্ত্বেও, তাকে এমন মার দিল যে অত্যন্ত সংকটজনকভাবে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। মোট কথা, সেদিন কলকাতার পুলিস কাপুরুষের মতো একদল নিরীহ সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারের ওপর এক সুপরিকল্পিত হামলা চালাল। আকাশ-বাতাস নিনাদিত করে রণধ্বনি তুলল 'শালা লোককো মারো'। এই অপকীর্তির জন্য দুঃখপ্রকাশ করা দূরে থাকুক, পুলিসের বড়কর্তা হরিসাধন ঘোষ চৌধুরী বললেন, বে-আইনী সভায় যেই থাকুক, সে-ই বে-আইনী জনতার লোক--- সাংবাদিকরা এর ব্যতিক্রম নয়!

ꣿ ꣿ ꣿ

দু'বছর পরের ঘটনা। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের শেষমুখ। আজ ভারতের ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন ও সোভিয়েট সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ক্রুশ্চেভ কলকাতায় আসছেন। আমরা বেরিয়েছি ওঁদের দেখবার জন্য। স্টক একসচেঞ্জ অফিস থেকে বেরিয়ে দেখি রাস্তা লোকে লোকারণ্য। ট্রাম-বাস সব বন্ধ। সেনট্রাল অ্যাভেন্যু ধরে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। ওঁরা বিবেকানন্দ রোড দিয়ে আসবেন। সেজন্য বিবেকানন্দ রোডে ঢুকলাম। কিন্তু কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। রাস্তার দু'ধারেই জমাট ভিড়। ভিড় এগিয়ে এসেছে রাস্তার মাঝখান পর্যন্ত। পুলিস কিছুতেই তাদের রুখতে পারছে না। কিছুদূর এগিয়ে বার্ড-হিলজারস্-এর ডিরেকটর জি. এল. মেটার বাড়ির সামনে একেবারে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। পিছনে আরও কুড়ি সারি লোক। পিছনের লোকেরা সামনে আসবার চেষ্টা করছে। সামনের দিকে তারা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে। আমরা সামনে আছি বলে, ভিড়ের চাপ আমাদের ওপরে এসে পড়ছে। কিন্তু আমাদের এক পা-ও এগুবার উপায় নেই। দু'ধারের ভিড় রাস্তার মাঝখানে এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে যে, মাত্র মাননীয়

অতিথিদের গাড়ি যাবার মতোই পথ আছে। সেজন্য পুলিস আমাদের রুখে রেখে দিয়েছে। কিন্তু পিছনের চাপ আর সহ্য করতে পারছি না। মাঝে মাঝে জনতার মধ্য থেকে ধ্বনি উঠছে, ওই আসছে! ওই আসছে! সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের চাপও উত্তাল হয়ে উঠছে। এমন সময় সত্যিই মাননীয় অতিথিদের গাড়ি আমাদের সামনে এসে পড়ল। দেখলাম, খুব অভিভূত হয়ে ওঁরা জনতাকে মাথা নত করে হাসিমুখে অভিবাদন জানাচ্ছেন। গাড়িটা যখন আমার সামনে এল, তখন ওঁদের মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রস্ফুটিত হর্ষ দেখে আমি হাতখানা বাড়িয়ে দিলাম ওঁদের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা-ও হাত বাড়ালেন ও খুব উষ্ণতার সঙ্গে করমর্দন করলেন।

পরের দিন বুধবার ৩০ নভেম্বর তারিখে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সমাগত সোভিয়েট নেতৃত্বয়কে জনগণের তরফ থেকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য এক সভা হল। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু স্বয়ং ওই সভায় উপস্থিত হলেন। ওই সভায় যাবার জন্য স্টক একসচেঞ্জ অফিস থেকে বেরিয়ে মানুষের ভিড় কাটিয়ে মাত্র রাজভবন পর্যন্ত যাওয়া সম্ভবপর হল। তারপর ফিরে আসতে হল মনুষ্য-সমাবেশের নিরেট প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে। দেখলাম, ময়দানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মানুষ আর মানুষ! ময়দানে সমবেত আর একদিনের ভিড়ের কথা মনে পড়ল। সেটা দেখেছিলাম ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে যেদিন কলকাতায় সর্বপ্রথম এক বিমান অবতরণ করেছিল। কিন্তু এদিনের ভিড়ের তুলনায় সেদিনের ভিড় কিছুই নয়। পরদিন খবরের কাগজে পড়লাম, ভিড় দেখে জওহরলাল নেহেরু ওই সভায় ঘোষণা করেছিলেন—'ভারতে তো নয়ই, পৃথিবীর আর কোন দেশে কখনও এরূপ জনসমাগম হয়েছে বলে শুনিনি।' আবালবৃদ্ধবনিতা, বালক বালিকা, তরুণ তরুণী, শিশুক্রোড়ে গৃহস্থঘরের সীমন্তিনী রমণী সবাই সেদিন মিশে গিয়েছিল ওই বিশাল জনতার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে।

ง ง ง

স্টক একসচেঞ্জ অফিসে ভীষণ কাজের চাপ। স্টক একসচেঞ্জ-এর রূপ পালটাচ্ছে। এতদিন স্টক একসচেঞ্জ ছিল স্বয়ংশাসিত সংস্থা। এবার স্টক একসচেঞ্জ হবে সরকার-নিয়ন্ত্রিত সংস্থা। এর জন্য সংসদ থেকে প্রণয়ন করা হয়েছে এক আইন। নাম 'সিকিউরিটিজ কনট্র্যাকটস্ রেগুলেশন অ্যাক্ট'। এই আইন প্রণয়নে সরকারী মহল থেকে এল আমার সহায়তার জন্য আহ্বান। অকুণ্ঠ-

চিত্তে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম সহায়তার জন্য। ওই আইনের পদাঙ্কে তৈরি হল 'সিকিউরিটিজ কনট্র্যাকটস্ রেগুলেশন রুলস্'। এর প্রায় সবটাই আমাকে তৈরি করে দিতে হল। নিয়ম হল সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত লাইসেনস্ ব্যতিরেকে কেউ এদেশে স্টক একস্চেঞ্জ সংস্থা স্থাপন করতে পারবে না। লাইসেনস্-প্রাপ্ত স্টক একস্চেঞ্জসমূহকে 'সিকিউরিটিজ কনট্র্যাকটস্ রেগুলেশন অ্যাক্ট'-এর বিধিমতো পরিচালনা করতে হবে। স্বীকৃত স্টক একস্চেঞ্জসমূহের কার্যকলাপ অবেক্ষণ করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ-দপ্তরের অধীনে একটা বিভাগ খোলা হল। তার অফিসার হলেন এম. এস. নাডকরনি। তাঁর অধীনে কলকাতাতেও এক অফিস খোলা হল। তার কর্মকর্তা হলেন ডি. আর. পেন্ড্সে। স্টক একস্চেঞ্জের টেকনিকাল বিষয়সমূহ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্য এঁরা দু'জনেই আমার মুখাপেক্ষী হলেন। ফলে, আমার পরিশ্রম বাড়তে লাগল। তারপর ডি. আর. পেন্ড্সে যখন অন্য কাজে নিযুক্ত হয়ে চলে গেলেন, তখন তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত এন. সি. মৈত্রকে বলে গেলেন যে স্টক একস্চেঞ্জ সংক্রান্ত সমস্ত টেকনিকাল ব্যাপার সম্বন্ধে অবগত হবার জন্য তিনি যেন আমার ওপর নির্ভর করেন। ফলে ডি. আর. পেন্ড্সেকে সব বিষয়ে পারংগম করবার জন্য আমাকে যে পরিশ্রম করতে হয়েছিল, সেটা আবার দ্বিতীয়বার করতে হল।

ঠিক এই মুখেই এল স্টক একস্চেঞ্জের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালনের ঝঞ্ঝাট। ওই সম্পর্কে এক স্মারকগ্রন্থ বের করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন স্টক একস্-চেঞ্জ কমিটি। সে সম্বন্ধে সমস্ত কাজের ভার কমিটি ন্যস্ত করলেন আমার ওপর। এরকম স্মারকগ্রন্থ এদেশে কোন স্টক একস্চেঞ্জ কর্তৃক এর আগে বের করা হয়নি। সুতরাং এ-সম্বন্ধে কোন 'মডেল' আমার সামনে ছিল না। সে-কারণে এর জন্য সমস্ত ভাবনাচিন্তা আমাকেই করতে হল। অসম্ভব পরিশ্রম করতে হল। নিরলসভাবে বিগত পঞ্চাশ বছরের কমিটির মিনিট বই পড়ে, আমাকে স্টক একস্চেঞ্জের একটা ইতিহাস তৈরি করতে হল। দেশের অর্থনীতিতে স্টক একস্চেঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখবার জন্য এদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিজ্ঞ সম্পাদকদের কাছে আবেদন জানাতে হল। সকলেই আমার আবেদনে সাগ্রহে সাড়া দিলেন। প্রসংগক্রমে বলি, এরূপ প্রবন্ধ লেখাবার একটা গুরুতর কারণ ছিল। কয়েক বছর আগে স্টক একস্চেঞ্জের সদস্যগণ জওহরলাল নেহেরুকে সম্বর্ধিত করবার জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। জওহরলাল নেহেরু সেই সম্বর্ধনা-সভায় এসেছিলেন। জওহরলাল নেহেরুকে উপহার দেবার জন্য স্টক একস্চেঞ্জের সদস্যরা পাঁচলাখ টাকা চাঁদা তুললেন। তারপর সেই সভায় ওই পাঁচলাখ টাকার থলিটা ওঁকে উপহার দেওয়া হল। ওই পাঁচলাখ টাকার

থলিটা গ্রহণ করা তিনি অসৎকর্ম বলে মনে করলেন না। কিন্তু তার... বক্তৃতা দিলেন, সেই বক্তৃতায় স্টক একসচেঞ্জকে জুয়াড়ীর আড্ডা ('a gambling den') বলে গালাগালি দিলেন। জুয়াড়ীদের হাত থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ করে, তাঁর বিবেকে একবারও বাধল না তাদের 'জুয়াড়ী' বলে অপমান করতে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই, আমি চিন্তা করে নিয়েছিলাম যে দেশের অর্থনীতিতে স্টক একসচেঞ্জের ভূমিকা সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে 'সুবর্ণ-জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থে' প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত হবে। এতে জওহরলাল নেহেরু সুযোগ পাবেন জানবার যে বিগত একশত বৎসরে ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য মূলধন উত্তোলনে স্টক একসচেঞ্জ কি ভূমিকা পালন করেছে।

যখন 'স্মারকগ্রন্থ'খানা বেরুল, ভারতের বিশিষ্ট সংবাদপত্রসমূহে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে ওখানার প্রশংসা করা হল। আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করলাম, যদিও আগের বছরে পর পর দু'বার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ায়, এই শ্রমের ফলে আমার শরীর ভেঙে পড়ল।

১১১

১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে স্টক একসচেঞ্জের সুবর্ণ-জয়ন্তী পালিত হবার পর, আরও এগারো বৎসর আমি স্টক একসচেঞ্জের কাজে নিযুক্ত ছিলাম। তার ফলে ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে যখন স্টক একসচেঞ্জের হীরক জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়, সেই উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনার ভার আমার ওপরই আবার অর্পিত হল। হীরক-জয়ন্তী উপলক্ষে যে মহতী সভা হল, তাতে পৌরোহিত্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি. এন. সিংহ। ওই সভায় তাঁর সভাপতির ভাষণে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠলেন আমার সম্পাদিত 'হীরক-জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ'-এর প্রশংসায়। পরে তিনি এক ব্যক্তিগত চিঠিতেও আমাকে একথা জানালেন, এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লিখলেন যে, তিনি আমার কোম্পানি-আইন-সংক্রান্ত বইখানার পরবর্তী সংস্করণের উৎকর্ষতার জন্য সাহায্য করবেন।

সুবর্ণ-জয়ন্তী পালনের পর যে এগারো বৎসর স্টক একসচেঞ্জে রইলাম, সেই সময়ের মধ্যে স্টক একসচেঞ্জের ইতিহাসে অনেক কিছু ঘটল। প্রথমেই ঘটল এক অতি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে স্টক একসচেঞ্জের প্রেসিডেন্ট বিশ্বম্ভরনাথ চতুর্বেদীর আকস্মিক মৃত্যুতে স্টক একসচেঞ্জ হারাল তার প্রাণপুরুষকে। সর্বসম্মতিক্রমে দীর্ঘ ষোলো বৎসর (১৯৪৩-১৯৫৯) স্টক একসচেঞ্জের প্রেসিডেন্ট থেকে, তিনি স্টক একসচেঞ্জকে উত্তরণ করিয়েছিলেন এক সঙ্কটময় যুগের ভেতর

দিয়ে। যে-সকল ঘটনা ওই যুগটাকে সংকটময় করে তুলেছিল তার মধ্যে ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, হিন্দু-মুসলমান দাংগার পদাঙ্কে শেয়ার-বাজারের অধঃপতন, কোরিয়ার যুদ্ধ ও কাশ্মীর সমস্যা এবং শেয়ার-বাজারের ওপর তার প্রতিঘাত, সরকার কর্তৃক শেয়ার-বাজার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। বিশ্বম্ভর চতুর্বেদী ছিলেন কর্তব্যপরায়ণতার সাক্ষাৎ প্রতীক। সেজন্য অপরের মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতা গুণ দেখলে, তিনি তার সমাদর করতেন। একটা ঘটনা থেকে এটা বুঝতে পারা যাবে। আগে স্টক একসচেঞ্জের প্রেসিডেন্টের কোন ঘর ছিল না। আমার বসবার ঘরেরই খানিকটা কেটে নিয়ে ওঁর জন্য একটা ছোট ঘর তৈরি করা হয়েছিল। একবার ওঁর ঘরে কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি আসেন। তাঁদের আপ্যায়ন করবার জন্য উনি আমার ঘরে এসে আমাকে অনুরোধ করেন, আমি যদি আমার ঘরটা খানিকক্ষণের জন্য ছেড়ে দিই তো খুব ভাল হয়। উত্তরে আমি বললাম, স্যার, এটা আমার বসবার ঘর, অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য, অতিথি আপ্যায়নের জন্য নয়, সেজন্য আমি দুঃখিত, আমি ঘর ছেড়ে দিতে পারব না। তখন তিনি কমিটি-রুমে গেলেন। কমিটি-রুমের এক কোণে তখন এক সাব-কমিটির মিটিং হচ্ছিল। তাঁরা তো বিশ্বম্ভরবাবুকে খাবার-দাবার-সহ ওই ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক। জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি ? উনি বললেন, ক্যায়া করেংগে ভাই, সুরসাহেব তো উনকা কামরাসে হামকো নিকাল দিয়া, গেস্ট লোগোঁকো তো এনটারটেন করনে হোগা। অন্য কোন ব্যক্তি হলে, আমার রুক্ষ ব্যবহারে অত্যন্ত রুষ্ট হতেন। কিন্তু আমার নিয়মানুবর্তিতা দেখে তিনি আমার প্রতি আরও শ্রদ্ধাবান হলেন।

১১১

বিশ্বম্ভরবাবুর মৃত্যুর পর, আর যে দশ বছর আমি স্টক একসচেঞ্জে ছিলাম, সেই সময়কালের মধ্যে তিনজন প্রেসিডেন্ট এলেন, গেলেন। যথাক্রমে তাঁরা হচ্ছেন চিরঞ্জীলাল ঝুনঝুনওয়ালা (১৯৫৯-১৯৬৫), চণ্ডালাল খাণ্ডেলবাল (১৯৬৫-১৯৬৭), ও শিওকিষেণ বাগলা (১৯৬৭-১৯৬৯)। এঁদের মধ্যে চিরঞ্জীলাল ঝুনঝুনওয়ালা স্টক একসচেঞ্জের কর্মকাণ্ডকে আরও প্রসারিত করলেন, দুটো নতুন বিভাগ খুলে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে জন-সংযোগ ও অপরটা গবেষণা। দুটো বিভাগেরই আমি সেক্রেটারী নিযুক্ত হলাম। সুতরাং আমাকে আবার নতুন করে কর্মোদ্যম শুরু করতে হল। জন-সংযোগ বিভাগ থেকে প্রকাশের জন্য আমাকে ছ'খানা পুস্তিকা রচনা করতে হল। এগুলো ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দিতে প্রকাশিত হল। পুস্তিকাগুলির উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে স্টক একসচেঞ্জের সংগে পরিচিত করিয়ে দেওয়া।

রিসার্চ বিভাগ থেকে একখানা পুস্তিকা বেরিয়েছিল। কিন্তু ওই একখানা পুস্তিকা তৈরির জন্য আমাকে মাসের পর মাস খাটতে হল। যে ১৮খানা শেয়ার স্টক একসচেঞ্জের 'ক্লিয়ারড্ সিকিউরিটিজ' তালিকাভুক্ত ছিল, সেগুলিকে নিয়েই ছিল এই গবেষণা। এই পুস্তিকাখানাকে এককথায় এইসব শেয়ারের কোষ্ঠী-ঠিকুজি বলা যায়। পুস্তিকাগুলো খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। যদিও এক-একখানা দশ হাজার করে ছাপানো হয়েছিল, তাহলেও অতি অল্পকালের মধ্যেই সেগুলি নিঃশেষিত হয়ে গেল। পরে আর সেগুলো ছাপানো হয়নি।

আমি স্টক একসচেঞ্জের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার পদে বৃত ছিলাম। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে আমি চলে আসবার পর ওই পদটা উঠিয়ে দেওয়া হল। পরের বছরে (১৯৭০) যখন এক্জিকিউটিভ ডিরেকটরের পদ সৃষ্ট হল, তখন তিনিই ওইসব কাজ করতে লাগলেন। এখানে একটা কথা বলা দরকার। যদিও স্টক একসচেঞ্জ কমিটি আমার চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছিল, তাহলেও আমি সে সুযোগ না নিয়ে স্বেচ্ছায় স্টক একসচেঞ্জ থেকে অবসরগ্রহণ করেছিলাম। অনুরূপভাবে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকেও ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে আমি স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হলাম।

~ ~ ~

স্টক একসচেঞ্জের 'সুবর্ণ-জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ' বেরুবার কিছু পরেই বোম্বাইয়ের 'টাইমস্ অভ্ ইন্ডিয়া'র অর্থনৈতিক পৃষ্ঠার দুই সম্পাদক লড (Laud) ও পি. এস. হরিহরণ (P. S. Hariharan) একদিন আমার কাছে এলেন পরামর্শ করবার জন্য, ভারতে একখানা পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক দৈনিক পত্রিকার সম্ভাবনা সম্বন্ধে। আমার ইতিবাচক উত্তরেই 'টাইমস্ অভ্ ইন্ডিয়া'কে ওরূপ একখানা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত করল। এই পত্রিকা প্রকাশে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্য এলেন হরিহরণ ও জ্যোতি সেনগুপ্ত। আমার স্টক একসচেঞ্জের ঘরটাই হল এই পত্রিকার সূতিকাগার। বহুদিন ধরে ওঁরা আমার সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন, কাগজখানার কি রূপ দেওয়া হবে, সে-সম্বন্ধে। কাগজখানায় কি যাবে, কি ফীচার থাকবে, কাগজখানার কি নাম হবে, ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে আমাদের মধ্যে বহু আলোচনা হল। ঠিক হল কাগজখানার নাম হবে 'ফিনানসিয়াল টাইমস্'। তারপর চলল কাগজখানার 'ডামি' (dummy) তৈরি করার ব্যাপার। আমার যতটা মনে আছে, ২৮ দিন 'ডামি' পেপার ছাপানো হয়েছিল। কিন্তু কাগজখানা বেরুবে, এরকম সময়ে ঘটে গেল এক বিপত্তি। সংবাদপত্রের নাম অনুমোদন

সম্বন্ধে ভারত সরকারের সিমলায় যে অফিস আছে সেখান থেকে আপত্তি এল 'ফিনানসিয়াল টাইমস্' নামকরণের বিপক্ষে। ও'রা বললেন, যেহেতু ও'দের খাতায় ওই নামের এক পত্রিকার নাম আছে, সেইহেতু ও'রা ওই নাম অনুমোদন করতে পারবেন না। তখন ওর নামকরণ করা হল 'ইকনমিক টাইমস্'। যখন পত্রিকাটা আত্মপ্রকাশ করল তখন ব্যবসায়ী-মহল পত্রিকাটাকে সাদরে গ্রহণ করল।

কাগজখানাতে যে-সকল নতুন ফীচার সংযুক্ত করা হল, তার অন্যতম ছিল প্রতি তিন মাস অন্তর 'নিউ ইস্যু' সম্বন্ধে পরিসংখ্যান দেওয়া। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এ-সম্পর্কে পরিসংখ্যান ইহজগতে মাত্র আমার কাছেই ছিল। আর কারুর কাছে ছিল না। কেননা, কোন্ সূত্র ও কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করে এই পরিসংখ্যান হিসাব করতে হয়, তা এদেশে কেউই জানত না। সেজন্যই শিল্পভিত্তিক তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য যখন ভারত সরকার বিশ্বব্যাংকের কাছে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হল, তখন বিশ্বব্যাঙ্কের এক মিশন ভারতে এল, এ-সম্বন্ধে সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্য। ভারত সরকারের ফিনানস্ ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে তারা চেয়ে বসল, কি পরিমাণ মূলধন ভারতের নিউ ইস্যু মার্কেট থেকে প্রতিবৎসর তোলা হয়, সে-সম্বন্ধে হিসাব ও পরিসংখ্যান। ভারত সরকার দিতে পারল না। রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকেও চেয়ে পাঠানো হল, কিন্তু তারাও দিতে পারল না। সকলেই আমার কাছে ওদের পাঠিয়ে দিল। আমিই তাদের সে পরিসংখ্যান দিলাম। এবং তাদের জন্য এক প্রতিবেদন তৈরি করলাম। সেটার ভিত্তিতেই লিখলাম আমার 'নিউ ইস্যু মার্কেট ইন ইন্ডিয়া' বইখানা, যা ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হল 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অভ্ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজ্‌নেস্ ম্যানেজমেন্ট'-এর পাঁচ-নম্বর গবেষণা গ্রন্থ হিসাবে। এখানে বলা প্রয়োজন যে এখানাই আমার ডি.এস.-সি ডিগ্রির থিসিস্। কিভাবে এই পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও গঠন করতে হয়, তা আমি শিখিয়ে দিলাম 'ইকনমিক টাইমস্'-এর কর্মিবৃন্দকে।

এসময়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতের অর্থনৈতিক পটভূমিকা সম্বন্ধে একখানা বই বের করলেন। বইখানা তৈরি করবার ভার দেওয়া হয়েছিল সেলিনা হারমানের ওপর। ওয়াশিংটন থেকে তিনি ছুটে এলেন তথ্যসংগ্রহের জন্য আমার কাছে। তাঁকে তথ্য সরবরাহ করলাম। বইখানা 'গোপনীয়'। কিন্তু সেলিনা হারমান কর্তৃক উপহৃত একখানা কপি আমার কাছে আছে।

১১১

এবার আমি আবার আমার পারিবারিক প্রসঙ্গে ফিরে আসতে চাই। সেবার (১৯৫৩) দেওঘর থেকে ফেরবার পথে, আমার স্ত্রী বলল, প্রতিবৎসর দেওঘর আসতে আর ভাল লাগে না, সামনের সালে চল আমরা অন্য কোন জায়গায় যাই। 'তথাস্তু' বলে, আমি সঙ্গে সঙ্গেই ওখানে ওর আবেদনে ইতি দিয়ে দিলাম।

সেজন্য সামনের বছর পূজার সময় আমরা পুরী গেলাম। পুরী আমার কাছে অবশ্য নতুন জায়গা নয়। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে পুরীতে যাওয়া-আসা করেছি। প্রথম যখন পুরী যাই, তখন পুরীর চেহারা বোধহয় মহাপ্রভুর ওখানে থাকা-কালীন পুরী থেকে ভিন্ন নয়। শেষবার পুরী যাই ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অতিথি হিসাবে, উন্নয়ন সম্বন্ধে এক অর্থনৈতিক আলোচনা-চক্র বা সেমিনারে যোগ দেবার জন্য। শেষবার গিয়ে পুরীর রূপান্তর দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। পুরী রীতিমতো একটা আধুনিক শহর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন প্রথম পুরী গিয়েছিলাম, তখন শহরের লক্ষণ পুরীর খুব কমই ছিল। ১৯৫৪ সালেও সেই অবস্থাই ছিল। মনে হয়, মহাপ্রভু যখন পুরীতে ছিলেন, তখনও সেই অবস্থা ছিল।

সেবার পুরীতে গিয়ে আমরা উঠেছিলাম ভারত সেবাশ্রমে। ওঁদের উপরের যে সুন্দর ঘরখানা আছে, সেখানাই ওঁরা আমাদের দিয়েছিলেন। ওই ঘরখানাতে বসেই সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাওয়া যায় সমুদ্রের গর্জন। কিন্তু সব সুন্দর হলে কি হবে? আমরা ওই ঘরটাতে এক-বেলার বেশি থাকিনি। উপর থেকে যে সিঁড়িটা নেমে এসেছে, সেটা একেবারে নীচের কুয়োর সংলগ্ন। সিঁড়ি দিয়ে উপর থেকে নামবার সময়, যদি ছেলেপুলেদের কারুর পা ফসকে যায়, তা হলে সে একেবারে কুয়োর ভেতরে গিয়ে পড়বে। সেজন্য দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমার ছেলে বাদ্রুকে পাঠিয়ে দিলাম সোহন-লালবাবুর ধরমশালায়। দুধওয়ালাদের যতগুলো ধরমশালা এদেশে আছে, তার মধ্যে ওঁদের পুরীর ধরমশালাটাই সবচেয়ে ভাল। ধরমশালাটা বড়দাণ্ডের ওপর পুরীর রাজবাড়ির প্রায় সামনাসামনি। মস্ত বড় ত্রিতল ধরমশালা। নীচে মেয়ে ও পুরুষের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক স্নানাগার আছে। আমার পুরী আসবার সময় সোহনলালবাবু অনেক করে বলে দিয়েছিলেন, আমি যেন পুরীতে থাকা-কালীন দু-একদিন ওঁর ধরমশালাতে বাস করে যাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা পুরীতে যতদিন ছিলাম ততদিন আমাদের সোহনলালবাবুর ধরমশালাতেই থাকতে হল।

আমার ছেলে ধরমশালার ম্যানেজারের সংগে কথা বলে, সব ঠিক করে এল। ভারত সেবাশ্রমের মহারাজকে যখন বললাম যে আমরা ধরমশালায় চলে যাচ্ছি, তিনি শুনে খুব দুঃখিত হলেন। কিন্তু আমার শংকার কথা বলাতে, তিনি খানিকটা প্রশান্ত হলেন।

ধরমশালায় এসে দেখলাম, সোহনলালবাবুর ছেলে ও তাঁর পরিবারের লোকরাও সেই সময় ধরমশালায় এসে রয়েছেন। তাঁরা আমাদের খুব খাতির করে অভ্যর্থনা জানালেন।

ঌ ঌ ঌ

পুরীতে যতবার গিয়েছি, ততবারই আমার মনে হয়েছে যে এটা আগে একটা শাক্ততীর্থ ছিল, পরে বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হয়েছে। শাক্ততীর্থের শেষ নিদর্শন হচ্ছে মন্দিরের তলায় বিমলাদেবীর মন্দির। পুরীর মন্দিরের চত্বর থেকে সিঁড়ি দিয়ে অনেকটা নেমে বিমলাদেবীর মন্দিরে যেতে হয়। আর একটা কথা। পুরীর মন্দিরে নিরামিষ ভোগই সারা বৎসর হয়। কিন্তু বৎসরের মধ্যে মাত্র একদিনই পুরীর মন্দিরে আমিষ ঢোকে। সেটা হচ্ছে পুজার মহাষ্টমীর দিন। সেদিন বিমলাদেবীর যে ভোগ রান্না হয় সেটা উপাদেয় আমিষ পোলাও।

পুরীতে দেখবার জিনিস অনেক আছে। পুরীর মন্দির ছাড়া, জগন্নাথের মাসীর বাড়ি বা গুণ্ডিচা বাড়ি, চৈতন্যদেবের মঠ যেখানে মহাপ্রভুর শয্যা এবং তাঁর ব্যবহৃত অন্যান্য জিনিসপত্তর সযত্নে সংরক্ষিত আছে, ভাসুর-ভাদ্দরবউ কুয়ো যার তলায় পাশের সিঁড়ি দিয়ে নামা যায়, ইত্যাদি। ঘুরে ঘুরে এগুলো সব আমার স্ত্রী ও ছেলেপুলেদের দেখালাম। বেশ আনন্দেই পুরীতে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু বিধি বাদ সাধলেন। পুরীর নোনা জল আমার স্ত্রীর সহ্য হল না। তার শরীর আবার খারাপ হল। সেজন্য পনেরো দিন পরে আমরা আবার কলকাতায় ফিরে এলাম।

ঌ ঌ ঌ

কলকাতায় ফেরবার পর আমার স্ত্রীর আবার রক্তহীনতা প্রকাশ পেল। মাঝে মাঝে ফিট্‌ও হতে লাগল। সংসারের কাজকর্ম দেখবার জন্য আমাদের বাড়িতে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় স্ত্রীলোক ছিল না। বদ্রি বড় হয়েছে। আমার স্ত্রী ওর বিয়ে দিতে চাইল। একটা বিয়ের প্রস্তাবও এসে গেল।

বদ্রি তখন বি. কম. পাস করে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট হবার জন্য এচ. পি. খাণ্ডেলবালের ফার্মে আর্টিকেলড্ হয়েছে। খাণ্ডেলবাল তো আমার পুরানো বন্ধু। সুতরাং বদ্রিকে পেয়ে সে খুব খুশি হল।

একদিন বদ্রি অফিস থেকে ফিরে এসে বলল, খাণ্ডেলবাল সাহেব খুব পীড়িত এবং অফিসে আসছেন না। আমি খাণ্ডেলবালকে তাঁর বাড়িতে দেখতে গেলাম। খাণ্ডেলবালের পাশে বসে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করলাম। শুনলাম ডাক্তার বলেছে অসুখটা এমন কিছু ভারী রকমের নয় যে আশংকা করবার কিছু আছে।

কিন্তু এর কয়েকদিন পরেই শুনলাম যে, হঠাৎ হার্টফেল করে খাণ্ডেলবাল মারা গিয়েছেন। মৃত বন্ধুর অফিসে ছেলের কাজ করাটা আমি পছন্দ করলাম না। বদ্রিকে আর ও-অফিসে যেতে দিলাম না।

সুতরাং বদ্রির যখন বিয়ের প্রস্তাব এল, বদ্রি তখন সম্পূর্ণ বেকার। বেকার হলেও বদ্রির সঙ্গে বিয়ে দিতে মেয়ের বাবা ঝুঁকে পড়ল। সামনে মাঘ মাসেই বিয়ের দিন ধার্য হল।

আমার স্ত্রী ও পাশের বাড়ির প্রাণশঙ্করবাবুর স্ত্রী, দুজনে মিলে বিয়ের বাজার করল। কিন্তু আমার স্ত্রী যা-কিছু করল, তা সবই ঝোঁকের মাথায়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য আবার ভেঙে পড়ল। বিয়ের গায়ে-হলুদের দিন আমার স্ত্রীর তো যায়-যায় অবস্থা। বদ্রি গায়ে-হলুদের কাপড়-পরা অবস্থাতেই ডাক্তারবাবুকে ডাকতে ছুটল। আমার মা তো আমার স্ত্রীর গঙ্গালাভ ঘটছে দেখে, আমার স্ত্রীর মুখে গঙ্গাজল দিলেন!

সেদিনের এক করুণ দৃশ্য আমার মনে পড়ে। ঘরের ভেতর বিছানায় আমার স্ত্রী যখন এই অবস্থায় শায়িত, সে-সময় আমার ছোট ছেলে শঙ্কর জানালার বাইরে রেলিং ধরে উঠে তার মায়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে। তার তখন ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা। তখন তার বয়স সাত-আট বছর হবে। সে তার মার এই অবস্থা দেখে সেদিন যে কি অজানা ভবিষ্যতের কথা ভাবছিল, তা একমাত্র ভগবানই জানেন!

যাক, শীঘ্রই ডাক্তারবাবু এসে গেলেন, এবং ইনজেকশন্ করবার পর আমার স্ত্রী জ্ঞান ফিরে পেল। কিন্তু বিয়ের ক'দিন আমার স্ত্রীর গেল যমে-মানুষে টানাটানি অবস্থা। বউভাতের দিন আমার স্ত্রীর অবস্থা এত খারাপ হল যে, সমস্ত রাত্তির ডাক্তারবাবুকে আমার স্ত্রীর পাশে বসে থেকে, তাকে জিইয়ে রাখতে হল, পাছে শুভদিনে কোন বিপত্তি ঘটে। এই বিপদের ভেতর দিয়েই বদ্রির বিয়ে হয়ে গেল।

১১১

আমার বড়ছেলে লক্ষ্মী মারা যাবার পর, বদ্রিই বাড়ির বড়ছেলে। সুতরাং বউমা আসবার পর থেকে আমরা তাকে বড়-বউমা বলে ডাকতে শুরু করলাম।

বড়-বউমার আসার পর থেকে আমাদের সংসারের হাল অনেকটা ভাল হল। আমার স্ত্রী তার সংসারিক কাজকর্মে দোসর পেল। আমার স্ত্রীর অবস্থা দেখে বড়-বউমা আমার স্ত্রীকে বেশি কাজকর্ম করতে দিত না। নিজেই অধিকাংশ কাজ করত। বড়-বউমা ছিল আমার স্ত্রীর মতোই শান্ত, সরল স্বভাবের মেয়ে। আমার স্ত্রীর মতোই তার দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল।

বড়-বউমা আসবার পর আমাদের সংসার সুখী-পরিবারে পরিণত হয়েছিল। বদ্রি আর বেকার বসে রইল না। একদিন একটা চিঠি লিখে তাকে বিড়লা ব্রাদারস্-এর সর্বময় কর্তা বি. এম. বিড়লার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বদ্রি আর বাড়ি ফেরে না। আমরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। সন্ধ্যার সময় সে বাড়ি ফিরল। দেরি হবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে বলল, আমি কি করব বল, তোমার চিঠিটা পড়ে বি এম. বিড়লা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, অফিসে একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি এখানে বসে কাজ কর, সুতরাং ছুটি না হওয়া পর্যন্ত আমাকে অফিসে থাকতে হল।

বদ্রি বিড়লা ব্রাদারস্-এ সাত বছর চাকরি করেছিল। এই সাত বছরের ভেতরেই ছুটির পর পড়াশোনা করে সে এম. কম. ও এল-এল বি পরীক্ষায় পাস করল। এল-এল. বি. পরীক্ষায় পাস করবার পর সে অ্যাডভোকেট হয়ে আইন প্র্যাকটিস্ করতে চাইল। চাকরি ছেড়ে, অজানা ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিতে আমি প্রথম মানা করেছিলাম, কিন্তু পরে রাজী হয়েছিলাম। যখন বিড়লা ব্রাদারস্ ছেড়ে আসে, তখন ও বিড়লা ব্রাদারস্-এর চোদ্দটা কোমপানির 'ইনটারনাল অডিটর' ছিল। ওর কর্মত্যাগে বিড়লা ব্রাদারস্ খুব মর্মাহত হয়েছিল।

তিন বছর পরে বড়-বউমার যখন এক মেয়ে হল, তখন আমার খুব আনন্দ হল। তিনমাস পরে বউমা যখন ওর বাপের বাড়ি থেকে খুকুকে নিয়ে আমাদের বাড়ি এল, তখন আমি খুকুকে আমার পাশে শুইয়ে রেখে, নিজের লেখাপড়ার কাজকর্ম করতাম।

আমার পরের ছেলে দেবনারায়ণ তখনও ডাক্তারী পড়ে। সবেমাত্র প্রিলিমিনারী এম.বি বি.এস. পাস করেছে। আমার স্ত্রী বলল, ছেলের বিয়ে দেব। হাসপাতালে নার্সদের সংস্পর্শে আসতে হয়, বিয়ে না দিলে ছেলে খারাপ হয়ে যাবে।

শীঘ্রই একটা সম্বন্ধ এল। মেয়ের জ্যাঠামশাই ছিলেন আমার পুরানো

বন্ধু। আমরা একই স্কুলে পড়তাম। মেয়ের বাপও তাই। স্কুলে পাঠ্যাবস্থা থেকেই জানতাম, সে মানুষ ভাল নয়। বেশিদূর লেখাপড়াও করতে পারেনি। তারপর কাজ করত এক সওদাগরী অফিসে টাইপিস্টের। সেজন্য ওখানে বিয়ে দিতে আমার মন ছিল না। কেননা, ছেলেমেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে আমার এক সংস্কার ছিল। সে সংস্কার হচ্ছে উভয় পরিবারের 'কালচারাল লেভেল' সমান না থাকলে, বিবাহ-সম্পর্ক কখনও সুখকর হয় না। কিন্তু মেয়ের জ্যাঠামশাই এমন পীড়াপীড়ি করতে লাগল, যে শেষ পর্যন্ত আমাকে রাজী হতে হল। এইভাবে দেবনারায়ণের বিয়ে হয়ে গেল।

দেবনারায়ণের বিয়ের একমাস পরেই আমার পর পর দু'বার করোনারী অ্যাটাক হল। তার কয়েক মাস পরেই আমার পা ভেঙে গেল। প্লাস্টার-বাঁধা অবস্থায় তিনমাস বিছানায় শুয়ে রইলাম। এসব কারণে ওই বিয়েটাকে খুব সুখকর মনে করিনি।



সিঁথিতে বাড়ি করেছি। সিঁথি তখনও জনবিরল জায়গা। মুহূর্তের মধ্যে এ-পাড়ার খবর ও-পাড়ায় ছুটে আসে। কালীপুজার দিন। আমার দ্বিতীয়বার হার্ট-অ্যাটাকের মাত্র কয়েকদিন পরের কথা। বাইরে দুম্‌দাম্‌ পটকার আওয়াজ হচ্ছে। এমন সময় একজন ছুটে এসে খবর দিল, আজ সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে!

—কি হয়েছে?

—দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দিরের পুজারী গুরুদাস ও শিবমন্দিরের পুজারী নন্দদুলাল, দু'জনে একসঙ্গে জলে ডুবে গেছে।

গুরুদাসকে আমি ভালরকম চিনতাম। তার স্ত্রী সন্ধ্যাকেও চিনতাম। গুরুদাসের পরিবারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল আমার মামীশাশুড়ীর (কলকাতার বিখ্যাত ধনী বন্দুক-ব্যবসায়ী কে. সি. বিশ্বাসের পুত্রবধূ) মাধ্যমে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ঘরের সাজশয্যা তিনিই তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। ওই ঘরে এক পাথরের ফলকে তা লেখা আছে। আমি এবং আমার স্ত্রী, আমার মামীশাশুড়ীর সঙ্গে বহুবার ওঁদের বাড়ি গিয়েছি। তা ছাড়া, আমরা তখন প্রতি শনিবারে ও অমাবস্যার দিন নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে পুজো দিতে যেতাম। গুরুদাসের হাতেই পুজার ডালা দিতাম। গুরুদাসই পুজো করিয়ে দিত। গুরুদাসের তখন বয়স আর কত হবে? বোধ হয় বছর আটত্রিশ। তখন তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে।

সুতরাং গুরুদাসের মৃত্যু ঘটেছে শুনে একেবারে চমকে উঠলাম। যে এসে এই দুঃসংবাদটা দিল, তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে এই দুর্ঘটনা ঘটল? একসঙ্গেই দুই মন্দিরের দু'দু'জন পুরোহিত জলে ডুবে গেলেন?

—হ্যাঁ, রাত্তির দশটা নাগাদ গুরুদাস ও নন্দদুলাল, দু'জনে লোকজন নিয়ে মন্দির থেকে ঘাটের দিকে বেরিয়ে গেল। গুরুদাসের মাথায় পিতলের ঘট। ঘাটে নামতে যাবে, এমন সময় কোথা থেকে একটা কুকুর এসে গুরুদাসের পথ আগলাল। পাছে ছোঁয়া লাগে, সেজন্য গুরুদাস পাশ কাটাল। কিন্তু কুকুরটা আবার এসে পথ আগলাল। ঠিক এমন সময় ঘাটের আলো নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গায় এল এক চোরা বান। বানের স্রোতে ভেসে গেল গুরুদাস ও নন্দদুলাল ও তাদের সঙ্গীরা। এদিকে ঢাকঢোলের আওয়াজ ও ভক্তবৃন্দের 'মা, মা' বলে চিৎকারের মধ্যে কেউই তাদের বিপদের কথা শুনতে পেল না। ন'জন ডুবে গেল। সকলকেই পাওয়া গেল। কেবল পাওয়া গেল না গুরুদাস আর নন্দদুলালকে।

—তারপর?

—তারপর, আর কি, সে কুকুরটাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। গুরুদাসের মৃতদেহ ভেসে উঠল আড়িয়াদহে বুড়োশিবতলার ঘাটে, সেই ঘাটে, যে ঘাটে পরমহংসদেবের জননী চন্দ্রমণি দেবীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছিল, এবং যে ঘাট থেকে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চারনক লীলাদেবীকে সতীদাহ থেকে উদ্ধার করে তাকে তাঁর জীবনসঙ্গিনী করেছিলেন।

—তা হলে, কাল মা ভবতারিণীর পুজো কিভাবে হল?

—মন্দির কর্তৃপক্ষ গুরুদাসের মৃত্যু হয়েছে, এই আশঙ্কা করে অশৌচের মধ্যে ওই বংশের আর কারুকে দিয়ে পুজো করালেন না। রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের পুরোহিত দুর্গাদাসই শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী মায়ের পুজো করল।

সব শুনে বললাম, তা হলে ১৮৮৬ সালে ঠাকুর দেহ রাখবার পর, এই প্রথম ঠাকুরের বংশের বাইরের একজন মা ভবতারিণীর পুজো করলেন!

ঌ ঌ ঌ

সিঁথির বাড়িতে আসার পর পনেরো বছর কেটে গেছে। বাড়িটা এখন আমাদের তেতলা হয়েছে। তেতলায় মাত্র দুখানা শোবার ঘর ও একখানা ঠাকুরঘর। ঘর দুটোর একটাতে থাকে আমার ছেলে নন্দ, আর একটাতে শঙ্কর। কে জানত যে আগামীকালে এ-দু'টো ঘরই আমাদের পারিবারিক ইতিহাসে কাল হয়ে দাঁড়াবে!

নন্দ বি. কম. পরীক্ষা দিয়ে নতুন চাকরিতে ঢুকেছে। 'ইন্ডিয়া কারবন'-এর সে অ্যাসিস্টান্ট পারচেজিং অফিসার। শংকর তখনও লেখাপড়া করে। বদ্রি ওকালতি আরম্ভ করেছে। দেবনারায়ণ ডাক্তারী পাস করে হাসপাতালের ডাক্তার হয়েছে। আমার মেয়ে সুষমা সে-বৎসর পি. ইউ. পরীক্ষা দিয়েছে। আমার ইচ্ছা, ও পি. ইউ. পাস করে বি. এ. পড়ে, কিন্তু বাদ সাধল ওর মা। আমার স্ত্রী বলল, মেয়েদের বয়স হলে, তাদের লালিত্য চলে যায়। সেজন্য আমার ওপর চাপ দিতে লাগল, সুষমার বিয়ের জন্য পাত্র সন্ধান কর। প্রথমে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম যে এ-বিষয়ে আমার স্ত্রী নাছোড়বান্দা. তখন আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে এ-বিষয় নিয়ে আর বাক্‌বিতণ্ডা করলাম না।

বদ্রি একদিন ওর মাকে এসে বলল যে ওদের কোর্টের এক উকিল ভদ্রলোকের এক ছেলে আছে। ছেলেটি সম্প্রতি জারমানি থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা করে এসেছে। বদ্রি ওর মাকে বলল, তুমি যদি বল, তা হলে আমি বিয়ের কথাটা পাড়তে পারি। আমার স্ত্রী তো আকাশের চাঁদ হাতে পেল। এটাই তো সে চাই-ছিল। আমার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে তার সম্মতি দিল।

একদিন সন্ধ্যার পর পাত্রের বাবা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। শুনলাম, ওঁদের বাড়ি আমাদের পাড়াতেই, এবং পাত্র নন্দর বন্ধু। লেখাপড়া ছেড়ে বিয়ে করতে হবে শুনে, মেয়েটা তো খুব কাঁদতে লাগল। তবে পাড়ার ভেতরেই বিয়ে হবে, এই ভেবে বোধহয় মনে খানিকটা স্বস্তিবোধ করল। মোট কথা, কাছা-কাছি বিয়ে হলে, বাবা, মা ও ভাইদের সকলকে সব সময় দেখতে পাবে, এই ভেবে মনে খানিকটা সান্ত্বনা পেল।

গরম কাল। জ্যৈষ্ঠ মাস। একদিন গভীর রাত্তিরে সুষমার বিয়ে হয়ে গেল। লগ্নটা ছিল রাত একটার পর। বদ্রি ও দেবনারায়ণের বিয়েতে খুব ধুমধাম করেছিলাম। কিন্তু সুষমার বিয়ের ধুমধাম সকলকে ছাপিয়ে গেল। করপো-রেশনের কাছ থেকে পারমিসন নিয়ে বাড়ির সামনের বড়রাস্তাটা ঘেরা হল। একটা খুব উঁচু নহবতখানা তৈরি হল। সারাদিন ধরে সানাই বাজতে লাগল। চন্দ্র এসে সমস্ত বাড়িটা ফুল দিয়ে মুড়ে দিল। দেড়হাজারের ওপর লোক নিমন্ত্রিত হল। সেদিন বাড়িতে আনন্দ-কোলাহলের ঢেউ বয়ে গেল। কিন্তু তার পরের দিন যখন বিদায়ের পালা এল, তখন সকলের মুখেই দেখা গেল বিষাদের ছায়া।

সুষমার সংগে ছাড়াছাড়ি হওয়ার আঘাতটা সবচেয়ে বেশি হানল আমার স্ত্রীর ওপর। তার ঘন ঘন ফিট হতে লাগল। শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ল। রক্ত-হীনতা প্রকাশ পেল। ডাক্তারবাবু বললেন, শরীরে রক্ত দিতে হবে। তার জন্য ওকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হল। কিন্তু ওর গ্রুপের রক্ত পাওয়া গেল না। যা পাওয়া গেল, তা রক্ত দেবার সময় ও সহ্য করতে পারল না। বেরিবেরি হবার সময় থেকে ওর অর্শের ব্যারাম হয়েছিল। এ সময় অর্শের প্রকোপও বাড়ল। তার ফলে শরীরের রক্ত আরও খানিকটা বেরিয়ে গেল।

রক্ত তো দেওয়াই হল না, উলটে আমার স্ত্রীর শরীর আরও খারাপ হতে লাগল। আমার স্ত্রী হাসপাতালের দেওয়া কিছুই খেত না। সেজন্য শংকর রোজ সকালে হাসপাতালে গিয়ে ওর মাকে দুধ, ফল ইত্যাদি দিয়ে আসত। দুপুরে সুষমার শাশুড়ী ঠাকরুন ভাত নিয়ে গিয়ে আমার স্ত্রীকে খাইয়ে আসতেন। বিকালে আমরা গিয়ে ওকে দেখে আসতাম।

একদিন আমার স্ত্রীর অবস্থা এত খরাপ হল যে ওকে অক্সিজেন টেন্টের মধ্যে রাখতে হল। আমি স্থির করলাম, ওকে আর হাসপাতালে রাখা ঠিক হবে না। ডাক্তারবাবুর সংগে পরামর্শ করলাম। ডাক্তারবাবুও আমার সংগে একমত হলেন। বললেন, রক্ত দেওয়ার জন্যই হাসপাতালে নিয়ে আসা, সেটাই যখন হল না, তখন অযথা হাসপাতালে ফেলে রাখা কাজের কথা নয়। তার চেয়ে বাড়িতে নিয়ে এলে চিকিৎসাটা ভাল হবে।

কিন্তু ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনাই একটা মুশকিলের ব্যাপার হল। তখন আমার স্ত্রীর হার্টের অবস্থা এত খারাপ যে, সামান্য নাড়াচাড়া পেলে যে-কোন মুহূর্তে হার্টফেল করতে পারে। অতি সযত্নে অ্যাম্বুলেন্সে করে ওকে বাড়িতে নিয়ে আসা হল। ডাক্তারবাবু রোজ গ্লুকোজ ও রেড অক্সান্ ইনজেকশন করে যেতে লাগলেন। সুচিকিৎসার ফলে আমার স্ত্রী দু'মাসের মধ্যেই খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠল।

দেওঘরের আবহাওয়াটাই আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে বেশি অনুকূল। সুতরাং এবার কিছু বেশিদিন দেওঘরে থাকা স্থির করলাম। ঠিক হল সেপটেম্বরে গিয়ে ডিসেম্বরে ফিরব।

১১১

সেবার দেওঘরে গিয়ে আমরা উঠেছিলাম যমুনাদের বাড়ি। এই প্রথম আমরা যমুনাদের বাড়ি গেলাম। এর আগে যতবার দেওঘরে গিয়েছি, তখনই আমরা

অন্যান্য বাড়িতে থেকেছি। কিন্তু সেবার অন্য কোন জানা-বাড়ি খালি না থাকায়, যমুনার বাবা কবিরাজ মশাইকে একটা চিঠি লিখলাম। জানতে চাইলাম তাঁদের ওখানে স্থান পাওয়া যাবে কিনা। কবিরাজ মশাইয়ের তরফ থেকে যমুনাই আমাদের আমন্ত্রণ জানাল। যমুনাদের বাড়িতে মোট পাঁচখানা ঘর। তিনখানা ঘর যমুনারা আমাদের ছেড়ে দিল। বাকী দু'খানাতে যমুনারা নিজেরা রইল।

আমাদের পরিবারের মতো যমুনাদের পরিবারও তখন বেশ বড় ও আমাদের মতোই ওদের সুখের সংসার ছিল। যমুনাদের সংসারে তখন ছিলেন কবিরাজ মশাই ও ওঁর স্ত্রী, তাঁর বড় মেয়ে কমলা, মেজ মেয়ে যমুনা, ছোট মেয়ে গঙ্গা, কমলার দুই মেয়ে পদ্মা ও রাধা, ও ছেলে বাবলু। কবিরাজ মশাইয়ের কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। বাড়ির একমাত্র ছেলে ছিল বাবলু। সেজন্য বাবলু সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিল।

কবিরাজ মশাইয়ের স্ত্রী ও আমার স্ত্রীর মধ্যে বেশ আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মনে হত যেন দু'জনে সহোদরা বোন। আমি ওঁকে বলতাম দিদি ও কবিরাজ মশাইকে বলতাম দাদা। আবার ওঁরা দু'জনেই আমাকে দাদা বলেই সম্ভাষণ করতেন। কবিরাজ মশাইয়ের সংসার ছিল খুব সচ্ছল। সংসারে বেশ লক্ষ্মীশ্রী ছিল। এর মূলে ছিল যমুনার মার নিজের ভাগ্য ও অদ্ভুত ধীশক্তি। কবিরাজ মশাই ওটা জানতেন, বুঝতেন ও স্বীকার করতেন। সেজন্য তিনি তাঁর স্ত্রীকে যথেষ্ট সম্মান করতেন।

কবিরাজ মশাইরা ছিলেন মিশ্র ব্রাহ্মণ। কবিরাজ মশাইয়ের কথায় একটু হিন্দি টান ছিল। তিনি বলতেন, দীর্ঘকাল কাশীতে থেকে লেখাপড়া করেছি। তারপর আলিগড়ে গিয়ে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। উত্তর ভারতে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলেই, আমার কথার মধ্যে হিন্দির টান এসে গেছে। সে যাই হোক, লোক হিসাবে তিনি ছিলেন সদাশিব ও সরল প্রকৃতির। গো-সেবায় তিনি খুব আনন্দ পেতেন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই গরু-বাছুরকে খেতে দিতেন ও তাদের পরিচর্যা করতেন। এ ছাড়া, গরুর জন্য খড় কাটতেন। তাঁদের বাড়িতে গৃহদেবতা হিসাবে গোপালের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেজন্য গরু-বাছুর পরিচর্যার কাজ শেষ হলে, তিনি স্নান করে গোপালের পুজোয় নিবিষ্ট হতেন। তারপর সামান্য জলযোগ করে উনি ওঁর ডিসপেনসারিতে চলে যেতেন। ওঁর ডিসপেনসারি ছিল টাউয়ারের কাছে। উনি ছিলেন দেওঘরে সাধনা ঔষধালয়ের একমাত্র এজেন্ট।

কবিরাজ মশাইয়ের মনের এক জায়গায় কিন্তু একটা বেদনা ছিল। সেটা ওঁর বড় মেয়ে কমলাকে নিয়ে। কবিরাজ মশাইয়ের স্ত্রী ছিলেন বর্ধমানের মেয়ে। সেজন্য তিনি নিজের মেয়ের বিয়েও দিয়েছিলেন বর্ধমানে। কিন্তু জামাই ছিল

এক অদ্ভুত প্রকৃতির। এই আছে তো, এই নেই। মাঝে মাঝে কোথায় উধাও হয়ে যেত, সে একমাত্র ভগবানই জানতেন! কমলাকে তখন অসহায় অবস্থায় থাকতে হত। জামাইয়ের এইরকম কাণ্ডকারখানা দেখে, কবিরাজ মশাই কমলাকে দেওঘরে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন। কমলা দেওঘরে আসবার পর জামাই মাঝে মাঝে এসে হাজির হত। কিন্তু কিছুদিন থাকবার পর আবার উধাও হয়ে যেত। নিজের এরকম অসহায় অবস্থা দেখে, কমলা মাস্টারি করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই কারণে, আমরা যখন দেওঘরে গিয়ে পৌঁছালাম, তখন কমলাকে আমরা রোজ সকালে যশিডিতে টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে যেতে দেখতাম। বিকাল পাঁচটার গাড়িতে বাড়ি ফিরত। ওর ছেলে বাবলু তখন দেড় বছরের শিশু। সে দিদিমার কাছে থাকত, এবং দিদিমাকেই মা বলত।

কমলা যতটুকু সময় বাড়িতে থাকত, আমার প্রতি খুব যত্ন নিত। টিচার্স ট্রেনিং স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই কমলার প্রথম প্রশ্ন হত, মেসোমশাইকে (আমাকে ওই নামেই সে ডাকত) চা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে কিনা। যদি শুনত, আমি তখনও চা খাইনি, তা হলে ভীষণ বকাবকি শুরু করত। আর যদি শুনত যে আমাকে চা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে ও আমি চা খেয়েছি, তা হলে আমার কাছে এসে মিষ্টিগলায় বলত, মেসোমশাই, আর একটু চা খান, আমি চা তৈরি করে দিচ্ছি। মোট কথা, আমার কোনদিকেই পরিত্রাণ ছিল না। চা খেলেও নয়, না খেলেও নয়। আমাকে চা তৈরি করে খাওয়ানো, এটা যেন তার একটা মানসিক শান্তির ব্যাপার ছিল। কমলার আমার প্রতি ওই শ্রদ্ধা মনে রেখেই, পরবর্তীকালে কমলা যখন মারা গিয়েছিল, আমি দেওঘরে গেলেই গঙ্গা কিংবা রাধা সকালে উঠে আগে আমাকে চা তৈরি করে দিত।

আমাদের এই উভয় পরিবারের মধ্যে এমন এক হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল, যা ইহজগতে খুব বিরল। আমাদের ওরা আপনজন বলে মনে করত এবং আমরাও ওদের আপনজন বলে মনে করতাম। মনে হয়, কালের দূরান্তরে কোন অজানা অতীতে আমরা একই পরিবারভুক্ত ছিলাম। সেটা বিশেষ করে প্রকাশ পেয়েছিল আমাদের উভয় পরিবারে একই সময়ে একই রকম বিপদ ঘটায়। শঙ্কর যখন মারা যায়, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে কমলার। আবার ভুতোর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় যমুনার মা। আবার আমার স্ত্রীর পরই মারা যান কবিরাজ মশাই।

আমাদের পারিবারিক জীবনে সে-বৎসরটাই ছিল শেষ বৎসর, যে বৎসর আমাদের পরিবারের সকলে একই সঙ্গে যমুনাদের বাড়ি গিয়ে তাদের পরিবারের সকলের সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হয়েছিলাম। পরে কেবল আমি ও আমার স্ত্রী

গিয়েই থাকতাম।

১১১

যমুনাদের বাড়ি ছিল ক্যাস্টর টাউনে, স্টেশনের অতি সন্নিকটে। লেভেল-ক্রসিংটা পার হলেই ডানদিকে পড়ে রায়েদের বাংলোগুলো। তারপরই বড়ালদের বাড়ি। ওর পরেই গেছে শহরের ময়লা জল নিকাশের নালা। নালার ওপরের পুলটা পার হলেই যমুনাদের বাড়ি। আর বাঁ-দিকে লেভেল-ক্রসিংটা পার হলেই প্রথমে পড়ত শিয়ারশোলের রাজবাড়ি। আজ সেটায় রাজারাজড়ারা আর কেউ থাকে না। ওটা মাঝখানে পরিণত হয়েছিল ইস্টার্ন রেলের কর্মচারীদের থাকবার জন্য 'হলিডে হোম'-এ। পরে ওটাকে খণ্ড খণ্ড 'প্লট' করে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। যারা ওইসব প্লট কিনেছে, তারা ওখানে নিজেদের বসবাসের জন্য ইমারত তুলেছে। নালার পরেই বাঁ-দিকে 'পাতার ভেলা' ও 'পর্ণকুটীর' নামে পুরানো যুগের দু'খানা বাড়ি। তারপর যমুনাদের বাড়ির ঠিক সামনে কানোরিয়াদের বিরাট বাড়ি। সেটাও নাকি এখন হাত-বদল হয়েছে।

আমি আর যমুনার মা দু'জনে বসে পুরানো যুগের অনেক গল্পগুজব করতাম। যমুনার মা জানতেন আমি বহুকাল ধরে দেওঘরে যাওয়া-আসা করছি। সেজন্য আমরা পুরানো যুগের অনেক কথা তুলে নিজেদের স্মৃতিশক্তিটাকে ঝালিয়ে নিতাম। পুরানো যুগের কথা আলোচনা করে আমরা দু'জনেই খুব আনন্দ উপভোগ করতাম। আমাদের মধ্যে সাধারণত গল্প হত, যমুনাদের পুরানো ঘরটাকে কেন্দ্র করে।

এখন যমুনাদের কোঠাবাড়ি হয়েছে। কিন্তু আগে ছিল ওদের, এখনকার বসতবাড়ির পাশে, খাপরেলের ঘর। খাপরেলের ঘরের পাশ দিয়েই গিয়েছিল 'লক্ষ্মীবাটী'তে যাবার গলিটা। 'লক্ষ্মীবাটী'তে আমরা তো বহুবার থেকে গিয়েছি। সুতরাং যমুনাদের পুরানো খাপরেলের ঘরের সামনে দিয়েই আমরা যাতায়াত করতাম। সেইসূত্রেই যমুনাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।

'লক্ষ্মীবাটী'তে যাবার গলিটার একদিকে যেমন ছিল যমুনাদের খাপরেলের ঘর, অপরদিকে তেমনই ছিল স্যার আশু মুখুজ্যের বাড়ি। আশু মুখুজ্যে মারা যাবার পর, তাঁর ছেলেরা ওটা বেচে দেন দত্তদের। দত্তরাই ওটাকে দোতলা করে নিয়ে নাম দেয় 'দত্তভবন'।

অবশ্য আশু মুখুজ্যের আমলে যমুনাদের খাপরেলের ঘর ছিল না। ওটা একটা খোলা মাঠ ছিল, আর তার মাঝখানে ছিল একটা ছোট পাহাড়ের ঢিবি।

যমুনাদের বাড়ির সামনে কানোরিয়াদের যে বিশাল ভবন, ওটাও ছিল একটা খোলা মাঠ। একবার আমরা দেওঘরে গিয়ে 'কালীকুটীর'-এ ছিলাম। 'কালীকুটীর'টা ছিল বটকৃষ্ণ পালের বাড়ির আগে। যমুনাদের বাড়ির দিকে আসতে হলে 'কালীকুটীর'-এর পরেই ছিল 'ভাদুড়ী লজ' ও 'মাতৃনিবাস'। সেকালে কানোরিয়া হাউসের অস্তিত্ব ছিল না বলে, 'কালীকুটীর'-এর সাঁকোর ওপর বসে যমুনাদের যেখানে খাপরেলের ঘর, সেখানকার মাঠটা দেখা যেত।

তখনকার দিনে দেওঘরের বাড়িগুলো সব পূজোর সীজনে ভরে যেত। অন্য সময় সেগুলো খালি পড়ে থাকত। সেজন্য যমুনার মা-কে জনশূন্য পরিবেশের মধ্যে একাই খাপরেলের ঘরের মধ্যে থাকতে হত। তখনকার দিনে দেওঘরে চোর-ডাকাতের খুব ভয় ছিল। চিকিৎসক হিসাবে কবিরাজ মশাইয়ের খুব নামডাক ছিল। সেই কারণে অনেক সময় রাত্রিরে ফিরতে ওঁর দেরি হত। তখন কমলা বা যমুনা কেউই জন্মায়নি। সুতরাং কবিরাজ-দিদিকে নির্জন পরিবেশের মধ্যে একাই থাকতে হত। রাত্রিরে অনেক সময় ওঁর খুব ভয় লাগত। পুরানোকালের গল্প বলতে বলতে কবিরাজ-দিদি বলতেন, আমি দরজার ফাঁক দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। পথে সন্দেহজনক লোক দেখলে ভয়ে খুব আড়ষ্ট হয়ে যেতাম। তা ছাড়া, খাপরেলের ঘরে সাপের ভয় ছিল। অনেক সময় আমাকে একাই সাপ মারতে হত। তারপর ছাগল, গরু ও নিজেদের সাংসারিক জীবনের অনেক স্মৃতিকথা তিনি আমাকে শোনাতেন।

সত্তর বছর আগে আমি যখন প্রথম দেওঘরে যাই, তার প্রায় বিশ বছর পরে কবিরাজ মশাই দেওঘরে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। সেজন্য সেকালের অনেক কথা আমি ওঁকে শুনোতাম। ক্যাস্টর টাউনের যেখানে এখন যমুনাদের বাড়ি, সেটা এখন পীচের রাস্তার ওপর। কিন্তু আমি যখন দেওঘরে প্রথম যাই, তখন ওটা ছিল ঢেউখেলানো উঁচুনীচু লাল মাটির রাস্তা। কোথাও রাস্তা একতলা সমান উঁচু, আবার কোথাও কোথাও একেবারে নেমে ভূতলে প্রবেশ করেছিল। সুতরাং রাস্তার এক অংশ থেকে অপর অংশ দেখা যেত না

স্বদেশী যুগের বিপ্লবীনেতা বারীন ঘোষ একসময় তাঁর ছেলেবেলায় এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতেন। হয়ত, তাঁর দাদা অরবিন্দও গেছেন। তখন বারীন ঘোষ তাঁর মস্তিষ্কবিকারগ্রস্তা মা স্বর্ণলতার সঙ্গে রোহিণীর রাস্তায় তাঁর মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর বাড়ি থাকতেন। রাজনারায়ণ বসুও এই পথে যেতেন, লেভেল-ক্রসিং-এর কোণে অবস্থিত ব্রাহ্মসমাজে প্রার্থনা করতে। ব্রাহ্মসমাজটা এখন ভগ্নস্তূপ হয়ে মাটির তলায় চলে গিয়েছে এবং ওর ওপর জঙ্গল গজিয়েছে। তবে ওরই অদূরে স্টেশনের পিছনে রাজনারায়ণ বসুর নামে উৎসর্গীকৃত

সাধারণ পাঠাগারটা আজও তাঁর পুণ্যস্মৃতি বহন করছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ও হাইকোর্টের বিচারপতি আশু মুখুজ্যের বাড়িটা যমুনাদের খাপরেলের ঘরের পাশেই ছিল। সুতরাং আশুবাবু যখন দেওঘরে আসতেন, তখন তিনিও এই রাস্তাতেই পায়চারি করতেন। যমুনাদের বাড়ির অদূরেই সেকালের দেশসেবক পি. মিত্তিরের বাড়ি। তিনিও এ রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতেন। এইরকম কত পুণ্যশ্লোক মহাজনদের পদরেণুতে যমুনাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা অধ্যুষিত ছিল, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আজ তাঁদের পদধূলি একেবারে মুছে গেছে। ঢেউখেলানো রাস্তাটাকে আজ অনেকটা সমতল করা হয়েছে এবং তার ওপর পীচ ঢেলে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া, তখনকার দিনে রাস্তার দু'ধারে ছিল বহু ইউক্যালিপটাস গাছ। আজ তাদের চিহ্নমাত্র নেই।

পুরানো যুগে দেওঘরের অধিকাংশ বাড়িই ছিল বাঙালীর। তার কারণ দেওঘর ছিল বাঙলাদেশের বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত। দেওঘরের মন্দির ও তৎসংলগ্ন সমস্ত অঞ্চলটাই ছিল বর্ধমানের মহারাজার জমিদারিভুক্ত। কালের করাল স্রোতে দেওঘরের কত না পরিবর্তন ঘটেছে! তখন আট-দশটাকা মাসিক ভাড়ায় দেওঘরে বেশ ভাল বাড়ি পাওয়া যেত। এখন একশো টাকা দিলেও একখানা ছোট ঘর ভাড়া পাওয়া যায় না। এখন দেওঘরে চার-পাঁচ টাকাতেও একসের খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না। আর আমি যখন প্রথম দেওঘরে যাই (১৯১৪), তখন দেওঘরে একটাকায় চল্লিশ সের খাঁটি দুধ পাওয়া যেত। খুচরা দু'পয়সা সের ছিল।

আজ যে সুন্দর স্টেশনটা দেওঘরে দেখা যায়, কোথায় ছিল সেটা চল্লিশ বছর আগে? স্টেশন বলতে কিছুই ছিল না। ছিল মাত্র একটা ছোট ঘর। সেই ঘর থেকেই টিকিট দেওয়া হত, সেইখানেই মাল বুক করা হত, সেই ঘরেই বসত স্টেশনমাস্টার, টিকিট কলেক্টর, ট্রেনের গার্ড ও অন্যান্য কর্মচারীরা। প্লাটফরম বলতে কিছুই ছিল না। একেবারে মাটি থেকে ট্রেনে উঠতে হত। যাত্রীদের, বিশেষ করে মেয়েদের ও বুড়োমানুষদের খুব বেগ পেতে হত।

আরও পুরানো যুগে যখন দেওঘরে প্রথম যাই, তখন যশিডি থেকে দেওঘর পর্যন্ত সরু লাইন রেল ছিল মার্টিন কোম্পানির। স্টেশনের নাম ছিল 'দেওঘর'। 'বৈদ্যনাথধাম' নয়। প্রথম যুদ্ধের সময় সেই রেল-লাইনটাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় মেসোপোটেমিয়ায়, যুদ্ধের কারণে সেখানে রেল-লাইন স্থাপনের জন্য। যুদ্ধের পরে ইস্ট ইন্ডিয়া রেল কোম্পানি এটাকে ব্রড-গেজ লাইনে পরিণত করে ও নাম দেয় 'বৈদ্যনাথধাম'। কিন্তু তারপর আরও ত্রিশ বছর কেটে যায় বর্তমান স্টেশনের গোড়াপত্তন হতে।

আজ দেওঘরে যে বাজারটা আছে, সে বাজারটাও তখন ছিল না। ঘড়িওয়ালা যে টাউয়ারটা এখন দেখা যায়, সেটাও তখন দেওঘরে ছিল না। তখনকার দিনে ওরই সন্নিকটে রাস্তার দু'ধারে বাজার বসত। আর একটা বাজার বসত শিবগঙ্গার ধারে। তৃতীয় বাজার ছিল মীনাবাজারে। তবে মীনাবাজারে জন্তু-জানোয়ারই বিক্রি হত।



অনেকক্ষণ ধরেই দেওঘর নিয়ে বকবক করে গেলাম। একটু দেশের দিকে তাকানো যাক। স্বাধীনোত্তর কালের ইতিহাসে ষাটের দশকটাই ছিল খুব চাঞ্চল্যকর যুগ। এই দশকেই ঘটেছিল এক এক করে ভারতীয় সৈন্যের গোয়ায় প্রবেশ, চীন-ভারত যুদ্ধ (১৯৬২), পাক-ভারত যুদ্ধ (১৯৬৫), রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহাপুরুষদের মহাপ্রয়াণ—প্রথম বিধান ডাক্তারের (১৯৬২), তারপর নেহেরুর (১৯৬৪) তারপর লালবাহাদুর শাস্ত্রীর (১৯৬৬), ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দু'দলে বিভক্ত হওয়া (১৯৬৪), নকশাল আন্দোলনের (১৯৬৭-৬৯), অভ্যুত্থান, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকারের পতন (১৯৬৬), সোভিয়েট মহাকাশচারী য়ুরি গ্যাগারিনের (১৯৬২) ও ইংলন্ডেশ্বরী রানী এলিজাবেথের কলকাতায় আগমন (১৯৬১), সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' মামলা (১৯৬৭), আমদানি-রপ্তানির ব্যাপার নিয়ে বিখ্যাত সিরাজুদ্দিন মামলা (১৯৬৭), ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে মাড়বারী সমাজের অত্যাশ্চর্য অগ্রগতি, বাঙালী শিল্পোদ্যমকে কাবু করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অপচেষ্টা ইত্যাদি।

দশকটা শুরু হয়েছিল ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসব পালন নিয়ে। বিশ্বের সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হল। দেশময় সব জায়গায় আয়োজিত হয় নানা অনুষ্ঠান। রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে দেশবাসীকে সম্যক পরিচিত করাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাত্র ৭৫ টাকা নিয়ে পনেরো খণ্ডে 'রবীন্দ্ররচনাবলী' দেবার বন্দোবস্ত করেন।

ওই বৎসরেরই ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় এলেন ইংলন্ডেশ্বরী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। কলকাতার রাজভবনে জানানো হল মহামান্য অতিথিকে সম্বর্ধনা। বছরের শেষের দিকে ডিসেম্বর মাসে ঘটল গোয়ায় ভারতীয় সৈন্যের প্রবেশ! কিছুদিন ধরে ঘটছিল সমুদ্রে ভারতীয় জাহাজ চলাচল ও মাছধরার স্বাভাবিক কাজে গোয়ার পর্তুগীজ সরকারের হস্তক্ষেপ, পর্তুগীজগণ কর্তৃক বারবার আক্রমণাত্মক কার্য এবং গোয়া সীমান্তে ভারতীয় অঞ্চলে হানা, ভারতীয়

নাগরিকদের দৈনন্দিন শান্তিপূর্ণ কাজ চালাবার কালে তাদের ওপর গুলী চালনা ইত্যাদি। ভারত সরকার এর প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু এর উপশম হওয়া দূরের কথা, এইসব আক্রমণাত্মক কাজ বহুগুণে জোরের সংগে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এ সম্বন্ধে ভারতের ধৈর্য চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। অতপর ১৯৬১ সালের ১৮ ডিসেম্বর মাঝরাতে ভারতীয় সৈনাবাহিনী ভারত মহাদেশে উপনিবেশবাদের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলবার এবং গোয়াবাসীদের পর্তুগীজ অত্যাচার হতে মুক্তি দেবার জন্য গোয়ায় প্রবেশ করে ও গোয়া দখল ক'রে নেয়। তারপর থেকেই গোয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ওই ডিসেম্বর মাসের গোড়াতেই ভারতে এলেন সোভিয়েট মহাকাশচারী য়ুরি গ্যাগারিন। কলকাতার নাগরিকরা তাঁকে জানাল বিপুল সম্বর্ধনা এবং নাগরিকদের পক্ষ থেকে মেয়র রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁকে বাংলাভাষায় রচিত মানপত্র অশোকস্তম্ভের একটি ধাতব প্রতিকৃতির মধ্যে করে উপহার দিলেন। এ অনুষ্ঠান হয়েছিল ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। সে-অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি। কিন্তু গ্র্যান্ড হোটেলে যে দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হল, সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে আমি গেলাম এবং বিশ্বের এই প্রথম মহাকাশচারীর সংগে করমর্দন করবার সৌভাগ্যলাভ করলাম।

১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে ঘটল নেফায় চীনের সংগে ভারতের যুদ্ধ। ভারতীয় সৈনা বাহিনী কৃতিত্ব অর্জন করল চীনা বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে। কিন্তু ওই বছরের সবচেয়ে বিষাদময় ঘটনা হচ্ছে পয়লা জুলাই তারিখে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। কিন্তু তাঁর আমলে যে খাদ্য-সংকট ও তার পদাংকে দাংগা-হাংগামা ঘটল, তাতে পুলিসের অত্যাচার ও গুলিবর্ষণ জনসাধারণের মনকে এমনভাবে আঘাত করল যে ১৯৬৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাল।

১৯৬৪ সালে ঘটল জওহরলাল নেহেরুর মহাপ্রয়াণ। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী, কিন্তু ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁর মর্মান্তিক জীবনাবসান হল আকস্মিকভাবে তাসখন্দে, ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরে।

ওই ১৯৬৪ সালে ঘটল ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের পর থেকেই ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে যে আদর্শগত বিভেদ শুরু হয়েছিল, তারই পরিণতিতে ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে সৃষ্ট হল একাধিক কম্যুনিস্ট পার্টি। ওই সালের জুলাই মাসে তেনালির মহাসম্মেলনে ওদের বিবাদ চরমে গিয়ে পৌঁছাল। সেখানে বামপন্থী কম্যুনিস্টরা বলল,

আমরাই কম্যুনিস্ট পার্টি। অন্যদিকে দিল্লিতে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরা বলল, ওরা আবার কে? আমরাই কম্যুনিস্ট পার্টি। তখন থেকেই, আদর্শগত নীতি অনুযায়ী এরা দুই দলে বিভক্ত হল—CPI (M) ও CPI।

১৯৬৫ সালে যুদ্ধ বাধল ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের। আন্তর্জাতিক সীমা রেখা অতিক্রম করে পাকিস্তান জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তের ছামবের শান্তিপূর্ণ ভারতীয় গ্রামগুলির ওপর এক বর্বর আক্রমণ চালাল। কিন্তু ভারতীয় সৈন্য বাহিনী অসীম বীরত্বের সঙ্গে সে আক্রমণ প্রতিহত করল।

১৬০

আমাদের জাতীয় জীবনে যখন এইসকল দুর্ঘটনা ঘটছিল, তখন আমার পারিবারিক জীবনে ঘটল এক হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা এল খুব অতর্কিতে। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দেওঘরে যমুনাদের বাড়ি থেকে আসবার পর আমাদের সংসারে বয়ে গেল আনন্দের ঢেউ। পরের বছরটা (১৯৬৪) ছিল আমাদের পারিবারিক জীবনে সবচেয়ে সুখের বছর। কিন্তু অন্তরালে অঙ্কুরিত হচ্ছিল সে-বৎসরের শেষভাগে আমাদের পারিবারিক জীবনে সুখের অবসান। বৎসরটা ছিল যেন নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের দীপ্তিমান আলোকশিখার মতো। শঙ্কর পাস করে ক্লাস টেন-এ উঠেছে। বড়বউমার মেয়ে খুকুও পাস করে নতুন ক্লাসে উঠল। আমি বিদেশ থেকে cum laude সম্মান সহ ডি. এস-সি. উপাধি পেলাম। আমার এই সম্মানলাভে বহু লোক ও বহু প্রতিষ্ঠান আনন্দ প্রকাশ করে আমাকে অভিনন্দন জানাল। অনেকে আবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আমাকে অনেক উপহার দিল। আমার স্ত্রীরও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটল। ছেলেমেয়েদের সকলের স্বাস্থ্যও সে-বৎসর অটুট রইল। সকলেই খেলাধুলায় মত্ত হল। তবে সে-বৎসর আমরা আর দেওঘরে গেলাম না। গত কয়েক বছর পূজার সময়টা দেওঘরেই কাটিয়ে ছিলাম। সেজন্য এ-বৎসরটা কলকাতাতেই পূজার আনন্দটা উপভোগ করবার বাসনা হল। কালীপূজা ও জগদ্ধাত্রীপূজাও নির্বিঘ্নে কেটে গেল।

আমাদের এক আত্মীয়ার ওপর বাবা তারকনাথের ভর হত। একদিন ভরের সময় তিনি বড়বউমাকে বললেন, সামনের পনেরো দিনের মধ্যে তোমার শ্বশুরের এক ছেলের মৃত্যু ঘটবে। কথাটা শুনে আমি বিশেষ গা করলাম না। কিন্তু পনেরোদিনের মধ্যে দুর্ঘটনাটা ঘটল। শঙ্কর স্কুলে গিয়ে আর বাড়ি ফিরল না।

স্কুলে যাবার আগে সেদিন সকালে শঙ্কর ওদের ক্লাবের খেলার মাঠ পরিষ্কার করেছিল, বিকালে স্কুল থেকে এসে ব্যাডমিনটন খেলবার জন্য। বন্ধুদেরও

বলে গেল, আমি তিনটার মধ্যেই স্কুল থেকে ফিরছি, তোরা তৈরি থাকবি। ফিরে এসে ব্যাডমিনটন খেলব।

কিন্তু কথামতো তিনটার মধ্যে না ফেরায়, ওর বন্ধুরা এবং আমার বাড়ির সকলে উদ্বিগ্ন হল।

পাঁচটার সময় আমি যখন অফিস থেকে ফিরলাম, দেখলাম যে বাড়ির গেটের সামনে সকলেই উদ্বিগ্নচিত্তে দাঁড়িয়ে আছে। আমি এসে শুনলাম যে শঙ্কর বাড়ি ফেরেনি। আমি শঙ্কিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, শংকর এখনও বাড়ি ফেরেনি. তা তোমরা বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কি করছ? এখনও তোমরা ওর সন্ধানে বেরোওনি কেন? মোট কথা, আমি বাড়ি ফেরবার পরই সকলে শংকরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

১১১

শীতকাল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে সকলে বেরুল শংকরের খোঁজে।

প্রথম তারা গেল পাড়ার একজন ছেলের বাড়ি। এ ছেলেটি শংকরের সংগে এক ক্লাসেই পড়ত। সে বলল, শংকর তো স্কুলে গিয়েছিল। তবে ছুটির পর কোথায় গেছে, তা তো জানি না। সে-ও অনুসন্ধানী দলের সংগে যোগ দিল এবং টালায় আর এক ছেলের বাড়ি নিয়ে গেল। সে-ছেলেটিও আগের ছেলেটির মতো একই কথা বলল।

তারপর তারা সকলে গেল শংকরের স্কুলে। স্কুল তখন বন্ধ হয়ে গেছে। স্কুলের দারওয়ান কিছুই বলতে পারল না। স্কুলের দারওয়ানের কাছ থেকে তারা স্কুলের মনিটর-এর বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করল। মনিটরের বাড়ি গিয়ে তারা তার কাছ থেকে শুনল যে শংকর খুব শান্তশিষ্ট প্রকৃতির ছেলে। সে স্কুলে অন্য ছেলেদের সংগে বড় একটা মিশত না। তবে ইদানীং একটি ছেলে শংকরের সংগে খুব অন্তরংগতা করেছিল। মনিটর আরও বলল, শংকর যথাসময়ে আজ স্কুলে এসেছিল এবং স্কুলের মাহিনা বাবদ তাকে পনেরো টাকার নোট দিয়ে তিন টাকা ফেরত নিয়েছিল। স্কুল বসবার অব্যবহিত পূর্বে সে শংকরকে স্কুলের গেটের সামনে ওই ছেলেটির সংগে কথাবার্তা বলতে দেখেছিল। স্কুলের সেদিন দেড়টার সময় ছুটি হয়েছিল। স্কুলের ছুটির সময় পর্যন্ত সে শংকরকে ক্লাসেই দেখেছিল।

শংকর বাড়ি ফেরেনি শুনে মনিটর অনুসন্ধানকারী দলকে নিয়ে উক্ত ছেলেটির

বাড়ি গেল। কিন্তু তাকে বাড়িতে দেখতে পাওয়া গেল না।

তারপর তারা স্কুলের হেডমাস্টারের বাড়ি গেল। হেডমাস্টার বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ির লোকরা বলল, তিনি উল্টাডিঙি গেছেন এবং অনেক রাত্তিরে বাড়ি ফিরবেন। তখন রাত্তির সাড়ে বারোটা। পরদিন অতি প্রত্যূষে হেডমাস্টারের বাড়ি গিয়ে ওরা শুনল যে হেডমাস্টার সকালের গাড়িতেই দেওঘর চলে গেছেন।

সেই রাত্তিরে আমার ছেলেরা বাগবাজারে আমাদের পৈতৃক ভিটাবাড়িতে ওদের ঠাকুরমার কাছেও গেল। কিন্তু কোন জায়গাতেই শঙ্করের খোঁজ পাওয়া গেল না। সমস্ত শহরটা ওরা তোলপাড় করে, রাত্তির দেড়টার সময় বাড়ি ফিরে এল।

এদিকে আমি বাড়ি থেকে প্রতি থানায়, প্রতি হাসপাতালে টেলিফোন করেও কোন খবর পেলাম না।

বাকী রাতটুকু সকলে জেগেই কাটিয়ে দিল। খুব ভোরে আমার ছেলেরা বারাকপুরে ওদের মামার বাড়ি, শ্যামনগরে মাসীর বাড়ি ও ব্যান্ডেলে ওদের মামাতো বোনের বাড়ি খোঁজ করতে গেল।

এর মধ্যে কতকগুলো আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। ভোর চারটের সময় একখানা মোটরগাড়িকে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে জোরে হর্ন বাজিয়ে চলে যেতে শোনা গেল। ওই মোটরগাড়িটার শব্দ শুনে আমার স্ত্রী হঠাৎ শঙ্করের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তারপর সকালে আমার স্ত্রী যখন উপরে ঠাকুরঘরে পুজো করতে যাচ্ছে, তখন একটা দাঁড়কাক আমার স্ত্রীর মাথার ওপর বসে তিনবার কা কা শব্দ করে উড়ে গেল। আমার স্ত্রী এটাকে খুব অমঙ্গলসূচক মনে করে আরও কাঁদতে লাগল।

সকালে আমার ছেলে ভুতো বাড়ি বাড়ি খবর নিতে লাগল, কেউ শঙ্করকে আগের দিন কোথাও দেখেছে কিনা। কেউ কিছুই বলতে পারল না। কেবল পাড়ার চায়ের দোকানের মালিক পাড়ার একজন ইলেকট্রিসিয়ানের নাম করে বলল, শম্ভু বলছিল যে সে গতকাল বিকালে শঙ্করকে দেখেছিল। শম্ভুর বাড়ি গিয়ে ভুতো শুনল যে গতকাল বিকাল পাঁচটার সময় সে শঙ্করকে আর একটা ছেলের সঙ্গে বাগবাজার স্ট্রীটের মোড়ে বাটার জুতোর দোকানের সামনে দেখেছিল। সঙ্গের ছেলেটির আচরণ তার কাছে খুব সন্দেহ-উদ্দীপক বলে মনে হয়েছিল। শম্ভু বলল, শঙ্করের সঙ্গে তার দেখা হওয়ামাত্র শঙ্কর তাকে বলল, শম্ভুদা, কই, রাত্তিরে খেলার জন্য আমাদের খেলার মাঠে ইলেকট্রিক আলোটার ব্যবস্থা করলেন না? আজ কিন্তু করে দেওয়া চাই-ই। তারপর সে শঙ্করকে ওই ছেলেটার সঙ্গে বাগবাজার স্ট্রীটের মধ্যে ঢুকতে দেখেছিল।

বাগবাজার স্ট্রীটে শঙ্করকে যে শেষ দেখেছিল, সে হচ্ছে শ্রীধর। শ্রীধর একজন

নামজাদা ব্যবসায়ী। তার ডেকরেটিং এর বিজনেস্। শ্রীধর সেদিন গিয়েছিল বাগবাজারে শান্তি ঘোষ স্ট্রীটে কিছু পাওনা টাকা আদায় করতে। সে যখন শান্তি ঘোষ স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে বাগবাজার স্ট্রীটে পড়েছে, এমন সময় সে শঙ্করকে একটি ছেলের সঙ্গে যেতে দ্যাখে। ছেলেটিকে দেখে শ্রীধরেরও সন্দেহ হয়েছিল। শ্রীধর শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেছিল, শঙ্কর কোথায় যাচ্ছ? শঙ্কর বলেছিল, ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করতে।

শঙ্করের ঠাকুরমা (তার মানে, আমার মা) আমাদের বাগবাজারের পুরানো ভিটাবাড়িতে থাকতেন। শ্রীধরের সঙ্গে শঙ্করের যেখানে দেখা হয়েছিল, সেখান থেকে আমাদের পুরানো ভিটাবাড়িটা মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ হাত দূরে। তারই পাশের বাড়িতে থাকত শঙ্করকে খুন করার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী।

১১১

তখন সকাল সাড়ে আটটা হবে। শঙ্করের খোঁজে যারা বেরিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল আমার বাড়ির চাকর মানু। তার সঙ্গে গিয়েছিলেন পাশের বাড়ির প্রাণ-শঙ্করবাবু। মানু বাড়ি ফিরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। কিছুই বলল না। পরমুহূর্তে প্রাণশঙ্করবাবু এলেন। তিনি এসে বললেন, শঙ্করকে কারা খুন করে দমদম স্টেশনের উত্তরে উন্মাদ-আশ্রমের কাছে লাইনের ধারে ফেলে দিয়ে গেছে। বাড়িতে ভীষণ কান্নার রোল উঠল। পাড়ার লোকরা ছুটে এল। তারাও কাঁদতে লাগল। কেননা, পাড়ার সকলেই শঙ্করকে খুব ভালবাসত।

ইতিমধ্যে আমার ছেলেরা যারা শঙ্করের খোঁজে বারাকপুর, শ্যামনগর ও ব্যান্ডেলে গিয়েছিল, তারাও ফিরে এল, এবং শঙ্করের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ শুনে কান্নার রোলে ভেঙে পড়ল। প্রাণশঙ্করবাবু তাদের বললেন, তোরা একটু ধৈর্য ধর। আমাদের এখনই ঘটনাস্থলে যেতে হবে, খুনের তদ্বির করবার জন্য।

তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে শুনল যে দমদমের স্টেশনমাস্টার ইতিমধ্যেই পুলিসের কাছে এফ-আই-আর পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং এখনই পুলিস অফিসাররা এসে হাজির হবেন।

ওদের সঙ্গে গিয়েছিল আমাদের পাড়ার ছেলে প্রেস-ফটোগ্রাফার মোনা চৌধুরী। মোনা যে ছবি তুলেছিল, তাতে দেখা গেল, শঙ্কর রেল-লাইনের ধারে শান্তভাবে শুয়ে আছে। তার শার্ট ও ট্রাউজার ঠিকমতো পরা রয়েছে। এমনকি পায়ে স্যান্ডেল দুটোও ঠিক পরা আছে। কেবল কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার

গলার সামনের দিকের নলিটা কেটে দেওয়া হয়েছে।

উল্মত্ত আগুনের মতো এ-খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেদিন অসংখ্য নর-নারীকে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে কাতারে কাতারে যেতে দেখেছিলাম ঘটনাস্থলে শংকরের মৃতদেহ দেখবার জন্য। সোনার তোলা একখানা ছবিতে দেখেছিলাম যে রেল-লাইনের ধারে হাজার হাজার নরনারী দাঁড়িয়ে কাতর নয়নে তাকিয়ে আছে শংকরের নলিকাটা মৃতদেহের দিকে।

ময়না তদন্তে প্রকাশ পেল যে শংকরকে প্রথমে খুঁটিতে কাপড় বা দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল। এটা বুকের ওপর ছ'ইঞ্চি চওড়া ও চব্বিশ ইঞ্চি লম্বা কালসিটার একটা দাগ থেকে প্রকাশ পেল। তারপর তার জিভটা টেনে বের করে, জিভের ডগাটা কেটে দেওয়া হয়েছিল। হাত দুটো তার পাকিয়ে পাকিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল ও নির্দয়ভাবে তাকে প্রহার করা হয়েছিল। মুখে সজোরে ঘুষি মারা হয়েছিল, যার ফলে তার কয়েকটা দাঁত ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। সে ভাঙা দাঁতগুলো কিন্তু ঘটনাস্থলে পাওয়া গেল না। তারপর তার গলার সামনের দিকের নলিটা কেটে দেওয়া হয়েছিল। তার পেট থেকে চার আউন্স পরিমাণ খাদ্য পাওয়া গিয়েছিল। ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রকাশ পেল যে এই খাদ্য মৃত্যুর তিন ঘণ্টা আগে তাকে খাওয়ানো হয়েছিল। ডাক্তারী পরীক্ষায় আরও প্রকাশ পেল যে তার মৃত্যু রাত্রির আটটার পরে ঘটেছিল।

এই মৃত্যু সম্বন্ধে প্রাথমিক তদন্তের ফলে পুলিস পরদিন আসামীকে তার বাগবাজারের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করল। আসামী ছিল অতি দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক। জীবনে সে যে কত খুনজখম করেছিল, তার ইয়ত্তা ছিল না। বরাবরই সে পুলিসকে হাত করে, সে-সব অপরাধ থেকে রেহাই পেয়ে এসেছিল। যদিও মাত্র ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছিল, তবুও সে তার নামের পর ইংরেজি বর্ণমালার কত অক্ষর যে ব্যবহার করত, তার কোন হিসাব ছিল না। তার একমাত্র পেশা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিসমূহ জাল করে, জাল সার্টিফিকেট বেচা। জাল সার্টি-ফিকেট বেচে সে বহু লক্ষ টাকা উপায় করেছিল। তার একটা অদ্ভুত 'কমপ্লেকস্' ছিল। জাল সার্টিফেকেট বেচার অভিযোগে পুলিস যখনই তার বাড়ি হানা দিত, তখনই তার সমস্ত রাগটা এসে পড়ত আমার ওপর। সে ভাবত, আমিই বুঝি পুলিসকে উসকানি দিয়ে তাকে ধরিয়ে দিয়েছি। অবশ্য প্রত্যেকবারেই সে পুলিসের লোককে টাকাপয়সা দিয়ে অব্যাহতি পেত।

শংকরকে খুন করবার দেড় বছর আগে ওইরূপ জাল সার্টিফিকেট বেচার দায়ে সে যখন দিল্লির স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে অভিযুক্ত হল, তখন সে আমাকে অ্যাটর্নির চিঠি দিতে লাগল, এবং আমার ছেলেদের নামে ফৌজদারী মামলা করবে

বলে শাসাতে লাগল।

শঙ্কর মারা যাবার মাস-ছয়েক আগে আসামীর স্ত্রী মারা যায়। প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও আসামী এই মহিলাকে বিবাহ করেছিল। কারণটা ছিল, প্রথম স্ত্রীর নাকে ঘুষি মেরে তার নাক ফাটিয়ে দেওয়া। তার বাপ তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে যায়, আর পাঠায়নি। তখন সে আবার বিয়ে করেছিল। দ্বিতীয় স্ত্রীর তখন দশ-বছর বয়স ছিল। সেজন্য সারদা আইন এড়াবার জন্য ওই আইন বলবৎ হবার আগের দিনেই আসামীর বিবাহ হয়েছিল।

দ্বিতীয় স্ত্রী যখন মারা যায় তখন আসামীর বয়স ষাট বৎসর। কিন্তু বুড়ো হলে কি হবে? শীঘ্রই দেখা গেল যে আবার বিয়ে করবার জন্য সে পাগল হয়ে উঠেছে। কিন্তু ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে কে মেয়ের বিয়ে দেবে? বিফল হয়ে আসামী 'যুগান্তর' পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপন দিল। সে বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল: 'মেয়েটির বয়স ত্রিশ বছর হবে, দেখতে সুন্দরী ও আধুনিক রুচিসম্পন্ন হবে।' পাত্র নিজের বয়স ও গুণাগুণ সম্বন্ধে কোন পরিচয় দিল না। সুতরাং যারা ওই বিজ্ঞাপন দেখে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করল, তারা যখন ওর প্রকৃত বয়স ও পরিচয় পেল, তখন তারা সরে দাঁড়াল। এদিকে আসামীর ধারণা হল, আমিই বুঝি এই বিয়ের প্রতিবন্ধকতা করছি। সেজন্য সে খাপ্পা হয়ে উঠে আমার ছেলে বদ্রির সঙ্গে একই কোর্টে ওকালতী করেন, এমন এক ভদ্রলোককে বলল, যে যেহেতু আমি ওর বিয়ের প্রতিবন্ধকতা করছি, সেইহেতু ও বদ্রিকে খুন করবে। এরপর আমাকে ও বদ্রিকে মারবার জন্য ও বহুবার চেষ্টা করল। আসামীর ছেলে ছিল নিরক্ষর ট্যাক্সি ড্রাইভার। একবার আমি ও বদ্রি যখন বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে আমাদের নিজের গাড়িতে বাড়ি ফিরছিলাম, তখন আসামীর ছেলে তার ট্যাক্সি দিয়ে সামনা-সামনি সংঘর্ষ করবার চেষ্টা করল। ভগবানের কৃপায় আমরা সেদিন বেঁচে গেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে থানায় গিয়ে ডায়েরী করলাম।

বিয়ের সব চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হল, তখন আসামী তার প্রথম স্ত্রীকে বলপূর্বক তার বাপের বাড়ি থেকে ধরে আনবার চেষ্টা করল। সেখানকার পাড়ার লোকের হাতে মার খেয়ে বাড়ি ফিরে এল। আশ্চর্যের বিষয় এবারও সে ভাবল যে এই ঘটনার পিছনে বুঝিবা আমার হাত আছে। সেজন্য আমার ওপর আরও মরিয়া হয়ে উঠল।

পরিস্থিতিটা চরমে উঠল, শঙ্কর খুন হবার চার-পাঁচ দিন আগে। জাল সার্টিফিকেট বেচবার অভিযোগে পুলিস আবার ওর বাড়ি হানা দিল এবং ওকে ধরে নিয়ে গেল। পরের দিন হাজত থেকে বেরিয়ে এসে আসামী আমার মাকে শাসাতে লাগল, এবার আর তোমার ছেলের (আমার) ও তার ছেলেদের নিস্তার

নেই। আমি নিশ্চয়ই তাদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেব।

তার পরের দিন বড়দিন উপলক্ষে আমার স্ত্রী আমাদের বাড়ির চাকর মানুর মারফত আমার মাকে কিছু ফল ও মিষ্টি পাঠিয়ে দিল। মানু যখন আমাদের বাগবাজারের বাড়িতে গিয়ে আমার মাকে ওগুলো দিচ্ছে, এমন সময় আসামী একখানা ছোরা হাতে নিয়ে মানুকে খুন করতে এল, এবং বলল, ব্যাটা তোকে তো খুন করবই, তোর বাবুকে ও তার গুষ্টিকে খুন করব। মানু কোনরকমে ধস্তাধস্তি করে পালিয়ে এসে আর. জি. কর. মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে নিজের আঘাতের স্থানগুলো ব্যান্ডেজ করিয়ে শ্যামপুকুর থানায় গিয়ে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা ডায়েরী করল। এর ঠিক চারদিন পরেই আসামী শংকরকে খুন করল।

শংকরকে খুন করবার জন্য সে আগে থেকেই প্রস্তুতি চালিয়েছিল ও এক চক্রান্ত করেছিল। সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিল শংকরের সহপাঠী একজন ছেলে, যার সম্বন্ধে শংকরের স্কুলের মনিটর বলেছিল যে কিছুদিন যাবৎ একটা ছেলে শংকরের সংগে ঘনিষ্ঠতা করছে।

১১১

শংকর আজ তিনদিন বাড়ি ফেরেনি' বলে আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম, যখন সি-আই ডি বিভাগের ডি-আই-জি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসাররা পরদিন দুপুরবেলা আমার সংগে দেখা করতে এলেন। তাঁরা আমার এই অবস্থা দেখে আমাকে সান্তবনা দিতে লাগলেন। তাঁরা আমাকে আশ্বাস দিলেন যে এই খুনের তাঁরা যথাযথ তদ্বির করবেন। যদিও আসামীর বাড়ি তল্লাসী করে পুলিস অপরাধমূলক অনেক জিনিস উদ্ধার করল, তথাপি আসামী তার পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী পুলিস-হাজত থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য নানারূপ কৌশল অবলম্বন করল।

আগেই বলেছি যে আসামী তার জীবনে কম করে দশ-পনেরোটা খুন করেছে। কিন্তু প্রতিবারই সে কৌশল করে পয়সার জোরে বেরিয়ে এসেছে। এবারেও তাই ঘটতে যাচ্ছিল, কিন্তু আসামীর সে-চেষ্টা বিফল হল আই-জি উপানন্দবাবুর সজাগ দৃষ্টির জন্য। আসামী যখন ধরা পড়ে এবং দু'দিন পরে জামিনে খালাস পেয়ে বেরিয়ে আসে, উপানন্দবাবু তখন কলকাতায় ছিলেন না। তিনি গিয়েছিলেন দুর্গাপুর কংগ্রেসে। সেজন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে কেসটার ওপর নজর রাখতে সক্ষম হননি।

এদিকে জামিনে খালাস পেয়ে আসামী গুণ্ডা নিযুক্ত করল আমাকে এবং আমার ছেলে বদ্রিকে মারবার জন্য। একদিন সন্ধ্যার পর সি-আই-ডি ইনস্পেকটর এসে আমার সংগে কেস্ সম্বন্ধে যখন আলোচনা করছেন, এমন সময় একখানা ট্যাকসি এসে দাঁড়াল আমাদের বাড়ির সামনে। দেখা গেল ট্যাকসিতে বসে আছে পাঁচ-ছ'জন গুণ্ডা। আমি সি-আই-ডি ইনস্পেকটরকে বললাম, আপনি গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, ওরা কারা? এবং কিজন্য এখানে এসেছে? তিনি বেরিয়ে গিয়ে তাদের মধ্যে একজনকে ডেকে নিয়ে এলেন আমাদের বৈঠকখানা ঘরে। কেন যে ওরা এখানে এসেছে তার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারল না। অধিকন্তু সি-আই-ডি ইনস্পেকটরকে যথেষ্ট তড়পাতে লাগল। তারা শহরের একজন নামজাদা দেশসেবকের নাম করল, যার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল গুণ্ডা পোষণ ও তোষণ করা সম্বন্ধে। সি-আই-ডি ইনস্পেকটর যখন নিজের পরিচয় দিল, তখন লোকটা চুপ করল। তারপর সি-আই-ডি ইনস্পেকটরের নির্দেশ অনুযায়ী তারা সেখান থেকে চলে গেল।

পর পর ক'দিন অনেক গুণ্ডার দল এল। এদিকে বরানগর থানার ও-সি ফিরোজ জাহ্ সাহেব আমার সংগে রোজই দেখা করতে আসতেন। তিনি এসব কথা শুনে, আমাদের বাড়ির ভেতর সব সময় থাকবার জন্য চারজন কনস্টেবল পাঠিয়ে দিলেন। বাইরে যাতে নিরাপদে চলাফেরা করতে পারি তার ব্যবস্থাও করলেন। কলকাতার বিখ্যাত ধনী পরিবার বাংগুররাও আমার সংগে সব সময় থাকবার জন্য একজন সশস্ত্র গোরখা দেহরক্ষী দিলেন। সে কয়েকমাস আমাদের বাড়িতে থাকায় আমরা অনেক নিরাপত্তা অনুভব করলাম। এদিকে উপানন্দবাবু দুর্গাপুর থেকে ফিরে এলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব কথা বললাম। উপানন্দবাবু বললেন, তিনি তো আসামীকে বিলক্ষণ চেনেন। তিনি যখন পুলিস কমিশনার ছিলেন, তখন আসামীর বিরুদ্ধে প্রতারণামূলক কার্যকলাপের অভিযোগ প্রায়ই আসত। সে-কারণে তার বাড়ি প্রায়ই খানাতল্লাসী করা হত ও তাকে লালবাজারে ধরে নিয়ে আসা হত। কিন্তু তাকে ধরা পুলিসের এক অসাধ্যসাধন কাজ ছিল। তাকে ধরবার জন্য লালবাজার থেকে প্রায়ই দু 'লরি' পুলিস পাঠাতে হত। উপানন্দবাবু বললেন, আমার কর্মদশায় আমি এরকম অপরাধী খুব কম দেখেছি।

সেজন্য কেস্‌টার ওপর উপানন্দবাবু বিশেষ আগ্রহ দেখালেন ও যত্ন নিলেন। সংগে সংগেই তিনি সি-আই-ডি ডিপার্টমেন্টের ওপর আদেশ দিলেন যে অবিলম্বে যেন চেষ্টা করা হয় আসামীর জামিন নাকচ করবার জন্য।

উপানন্দবাবুর চেষ্টাতেই আসামীর জামিন নাকচ হল। কিন্তু আসামীকে

পুনরায় গ্রেপ্তার করা পুলিসের পক্ষে মুশকিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তাকে কিছুতেই ধরা গেল না। তারপর পুলিস যখন তার নামে ওয়ারেন্ট বের করল, তখন আসামী নিজেই আদালতে আত্মসমর্পণ করল ও পুলিশ হাজতের পরিবর্তে জেল হাজতে থাকবার ব্যবস্থা করে নিল। কিন্তু জেল হাজতে মাত্র দু'তিনদিন থাকবার পর কৌশলে অসুখের ভান করে নিজেকে নীলরতন সরকার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করল। সবই টাকাপয়সার খেলা। হাসপাতালে বসে সে পুলিসের এবং অন্যান্য লোকের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করে চেষ্টা করতে লাগল সমস্ত তদন্ত ভণ্ডুল করবার জন্য।

প্রথম দফায় আসামীর বিচার হয়েছিল শিয়ালদহের ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। ম্যাজিস্ট্রেট ময়না তদন্ত ও সাক্ষীসাবুদের ভিত্তিতে আসামীকে অভিযুক্ত করলেন ও আলিপুরের দায়রা আদালতে বিচারের জন্য পাঠালেন। তিনি মন্তব্য করলেন, 'দেহের আঘাত থেকে বোঝা যায়, শংকরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে'।

দায়রা আদালতে মোট ৪৬ জন লোকের সাক্ষী গ্রহণ করা হল। সরকারপক্ষে সরকারী উকিল শিবনারায়ণ রায়চৌধুরী বিশেষ দক্ষতার সংগে এই মামলা পরিচালনা করলেন। মামলার শেষে জজসাহেব তাঁর রায় মুলতুবী রাখলেন।

দশদিন পরে জজসাহেব তাঁর রায়ে বললেন, "একমাত্র বয়স ছাড়া, আসামীকে কঠোর শাস্তি না দেওয়ার পক্ষে কোন কারণ নেই। অপরাধের বর্বরোচিত ধরন থেকে একথা বলা যায় যে আসামীকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিলেও তা কঠোর হবে না। আসামী দু'মুখো দানবের সামিল। বুড়ো শকুনি এক নিরীহ বালকের রক্তপানের জন্য হত্যাকারী নিয়োগ করতেও দ্বিধা করেনি। তাঁর মতে, দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিলেই বর্তমান মামলার সুবিচার হবে।"

এদিকে আসামী ভেবেছিল যে সে টাকার জোরে মুক্তি পাবে ও মুক্তি পেলে আমাকে উত্তমমধ্যম শিক্ষা দেবে। এই ভেবে সে আগের দিন তার নিজের ছোট-ছেলেকে (এ ছেলেটা খুনের ব্যাপার সব জানত, এবং মামলা চলাকালীন বাপকে শাসাচ্ছিল যে সে আদালতে গিয়ে সব কথা ফাঁস করে দেবে) খুন করে একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। সে পরিকল্পনা করেছিল যে মুক্তি পেলে সেই রাত্তিরেই সে তার ছেলের মৃতদেহটা কোনরকমভাবে আমাদের বাড়ির চৌহদ্দীর মধ্যে ফেলে দিয়ে যাবে ও আমাকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করবে। কিন্তু ভগবান তো আছেন !

তাকে আদালত থেকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়ার সংগে সংগেই, তার বাগবাজারের বসতবাটীর আবদ্ধ ঘর থেকে তার ছোটছেলের মৃতদেহটা পুলিস আবিষ্কার করল। মানুষ একরকম ভাবে, ভগবান আর-একরকম ঘটান।

১১১

অনেকেরই হয়তো কৌতূহল হবে, তারপর আসামীর কি হল ? সেটাই সংক্ষেপে বলে আমি অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই।

আসামীকে আদালত থেকে একেবারে দমদম জেলে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে গিয়ে সে নিজের বড়ছেলেকে (যে ট্যাকসি-ড্রাইভার) নিযুক্ত করল পুলিসকে প্রভাবান্বিত করবার জন্য, যাতে না সে তার ছোটছেলেকে হত্যা করবার নিমিত্ত অভিযুক্ত হয়। পুলিস প্রভাবান্বিত হয়ে ব্যাপারটা একেবারে চাপা দিয়ে দিল।

দমদম জেলে সে দু'বছর ছিল। ছেলের মারফত চক্রান্ত করে সে জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করতে লাগল। হাইকোর্টে আপীল করল। শোনা গেল সে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে সকলকেই প্রভাবান্বিত করছে। হাইকোর্টের জজ, সরকারী উকিলের অনুপস্থিতিতে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে উলটা-পালটা এবং কাল্পনিক কথা বলে ওকে মুক্তি দিল। যে-সব উলটা-পালটা কথা জজ-সাহেব বললেন, তার অন্যতম হচ্ছে, আসামী একজন উচ্চশিক্ষিত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি। সমাজে সে উচ্চ স্থান অধিকার করে। অপরপক্ষে, অতুল সুর একজন সামান্য ব্যক্তি, অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। আর একটা অদ্ভুত কথা তিনি বললেন, সেটা হচ্ছে, শংকর ৭৮-নম্বর বাসে (অথচ ৭৮-নম্বর বাসের কোন টিকিটই তার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি) করে উন্মাদ-আশ্রমের কাছে গিয়েছিল। অথচ দুনিয়ার সকলেই জানে যে ৭৮-নম্বর বাস সোজা বারাকপুর যায়। সিঁথির ভেতর ৭৮ নম্বর বাসের উম্মাদ-আশ্রমের কাছে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। হাইকোর্টে এই নিয়ে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হল। কথাটা ভিজিল্যানস্ কমিটির কানে গেল। পাছে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোয়, এই ভয়ে জজ-সাহেব হঠাৎ পদত্যাগ করে সরে পড়ল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লিগাল রিমেমব্রান্সার আমাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন যে তাঁরা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করছেন। কিন্তু তারপর সবই স্তব্ধ হয়ে গেল ! যেহেতু এটা সরকারী মামলা, আমাদেরও কিছু করবার নেই।

এদিকে বাইরে বেরিয়ে এসে আসামী উপলব্ধি করল যে যতদিন উপানন্দবাবু আছেন, কলকাতায় থাকা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। সেজন্য সে বুড়ো বয়সে একটা মেয়েকে বিয়ে করে, তাকে নিয়ে বেনারসে শাস্ত্রীনগরে গিয়ে বাস করতে লাগল। সেখান থেকেই সে তার নকল সার্টিফিকেট বেচার কারবার পুর্ণোদ্যমে চালাতে

লাগল। এখনও চালাচ্ছে, কেননা 'গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা'য় তার বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছে, দেখি।

১১১

শীঘ্রই সিঁথি নকশালদের দুর্গে পরিণত হল। নকশাল আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে। প্রথম এটা ছিল জোতদার-মালিক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন। কিন্তু পরে এটা উগ্রপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। শত শত সশস্ত্র উগ্রপন্থী পুলিস শিবির আক্রমণ করে। উগ্রপন্থীদের প্রধান অস্ত্রশস্ত্র ছিল তীর, ধনুক, বর্শা ও বল্লম। ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুঠতরাজ ও ডাকাতি হতে থাকে। নকশাল আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদার বললেন, সংসদীয় গণতন্ত্র অচল। তাই তাঁরা এখন দলে দলে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের তাদের অধিকার বুঝাবার জন্য কাজ শুরু করবেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, অন্য কোথাও এ-ধরনের আন্দোলন শুরু করবেন কিনা? উত্তরে তিনি বললেন, 'দিনক্ষণ দেখে আন্দোলন শুরু করা যায় না। অপেক্ষা করুন, দেখতে পাবেন।'

সরকার প্রথম এ আন্দোলন দমন করবার চেষ্টা করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের ছয়জন মন্ত্রী নকশালবাড়িতে ছুটে গিয়েছিলেন। পুলিসবাহিনীও পাঠানো হয়েছিল। স্বয়ং আই-জি ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন, কিন্তু আন্দোলন দমনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

দু'বছরের মধ্যেই এ-আন্দোলন বাঙলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে সিঁথি আন্দোলনকারীদের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম যেদিন আন্দোলনকারীরা কালীচরণ ঘোষ রোডে একজন পুলিস অফিসারকে হত্যা করল সেদিন বুঝতে পারিনি যে আন্দোলনটা সিঁথি পর্যন্ত এসে পেঁছেছে এবং সিঁথি শীঘ্রই সন্ত্রাসবাদের দুর্গ হয়ে দাঁড়াবে। এটা বুঝতে পারলাম সেদিন, যেদিন আমার স্ত্রী বাড়ি থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে আমাকে টেলিফোন করল। জিজ্ঞাসা করলাম, কে বলছ?

—আমি। (গলার স্বরে বুঝতে পারলাম আমার স্ত্রী)

—কি হয়েছে?

—তুমি এখন বাড়ি এস না।

—কেন?

—বাড়ির সামনে খুব গোলমাল হয়েছে। দমকল ও পুলিস-ভ্যানে ভরে

গিয়েছে।

—কেন, কি হয়েছে ?

—আমাদের বাড়ির সামনে মেয়েস্কুলের একখানা বাস পুড়িয়ে দিয়েছে।

—কারা ?

—কারা, কি করে জানব।

—তা, মেয়েগুলোর কি হল ?

—ভয়ে তারা বাস থেকে নেমে আমাদের ও পাশের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। মেয়েগুলো এখনও ভয়ে কাঁপছে ও কাঁদছে।

শুনে ভাবলাম, তবে কি নকশালরা আমাদের সিঁথিতে এসে হামলা শুরু করে দিল ! দু-একদিনের মধ্যেই বুঝলাম, হ্যাঁ তাই।

১১১

সিঁথি ভয়াবহ জায়গা হয়ে দাঁড়াল। ট্যাকসি-ড্রাইভাররা আর সিঁথিতে আসতে চায় না। অফিস থেকে বাড়ি ফেরা মুশকিল হয়ে দাঁড়াল।

লোক আর সিঁথি অঞ্চলে আসে না। অচেনা লোক হলেই নকশালরা তাকে পুলিসের গুপ্তচর অনুমান করে, তাকে ধরে পেছনের মাঠে নিয়ে যায় ও সেখানে তাকে কোতল করে।

আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের আমার বাড়ি আসতে মানা করে দিলাম।

বাসিন্দাদের ওপর মোটা টাকা চাঁদা দেবার জুলুম এল। সবই হাজারের অংকে। লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে সিঁথি থেকে পালাতে আরম্ভ করল। আন্দোলনকারীরা তাদের ঘরবাড়ি দখল করে নিল। জিনিসপত্তর ভেঙেচুরে তছনছ করে দিল।

ফতোয়া জারি হল, যাদের মোটরগাড়ি আছে, তাদের প্রতি গাড়ি পিছু হারে মোটা টাকা দিতে হবে। ছেলের গাড়িখানা রেখে আমি আমার গাড়িখানা জলের দামে বেচে দিলাম।

সন্ত্রাসের রাজত্ব হল। ভয়ে সবাই পালাতে লাগল। আমাদেরও নার্ভ ফেল করতে লাগল। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিয়তির ওপর ভরসা করে রয়ে গেলাম আমি, আমার বাড়ির সামনে বিমল কর (সাহিত্যিক) ও আশেপাশে দু-একঘর।

আমাদের প্রত্যেকের ওপর দাবী এল, রোজ দশগণ্ডা রুটি ও তরকারি দিতে হবে। তাই দিতে হল।

প্রথমে পুলিস তৎপরতা বাড়ল। তারপর পুলিস যখন সামাল দিতে পারল

না, তখন এল খাস মিলিটারী। মিলিটারীরা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সমগ্র এলাকাটা ঘিরে ফেলল। বাড়ি বাড়ি সার্চ করতে লাগল। দেখলাম, লোকের বাড়ির ছাদে উঠে জলের রিজারভয়ারের ডালা খুলে তার ভেতরেও দেখতে লাগল কেউ লুকিয়ে আছে কিনা! এরকম সার্চ রোজই চলতে লাগল। কিন্তু কেন তা জানি না, আমার বাড়িটা একদিনও সার্চ করল না। নকশালরা এটা লক্ষ্য করল, এবং ভাবল এ বাড়িটাই আত্মগোপন করবার সবচেয়ে নিরাপদ স্থান।

কিন্তু সার্চ করে কি করবে? কাকে ধরবে? মনে হয় সরষের ভেতরও যেমন ভূত থাকে, পুলিসের মধ্যেও কিছুসংখ্যক কর্মী নকশাল ছিল। তারাই সার্চের খবর নকশালদের আগে থাকতে জানিয়ে দিত। কেননা, দেখতাম যে সার্চের অব্যবহিত পূর্বেই নকশালরা বাসে করে ও-অঞ্চল থেকে অন্যত্র চলে যেত।

রাত্রে সার্চ হলে বাস পাওয়া যেত না। তখন ওরা সরে পড়বার সুযোগ পেত না। তখন ওরা আমার বাড়ির পেছনের বাগানের মধ্যে এসে আত্মগোপন করত।

আমরা যে কয়ঘর সিঁথিতে শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছিলাম, সন্ধ্যার পর বাড়িতে কেউ আলো জ্বালতাম না। অন্ধকারের মধ্যে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখতাম যে মাঝে মাঝে ওরা আমার বাগানে এসে গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।

একদিন আমার স্ত্রী সকালে উঠে নীচের ঘরে এসে একটু হতভম্ব হয়ে গেল। দেখল নীচের ঘরের মেঝের ওপর আট-দশজন শুয়ে আছে। আমার বাড়ির চাকর মানুর দেশের লোকরা যখনই চাকরির সন্ধানে কলকাতায় আসত, তখনই আমাদের বাড়ি এসে উঠত। ওটাই ছিল ওদের কলকাতার ডেরা। আমার বাড়িতে দু'চারদিন থেকে চাকরি সংগ্রহ করে ওরা চলে যেত।

ঘরের মেঝের ওপর আট-দশজন লোককে শুয়ে থাকতে দেখে, আমার স্ত্রী প্রথম ভেবেছিল যে ওরা বোধ হয় মানুর দেশের লোক, রাত্তিরে এসেছে, মানু ওদের ওখানে শুতে দিয়েছে। এই ভেবে আমার স্ত্রী ওদের জিজ্ঞাসা করল, তোমরা রাত্তিরে কখন এলে? তখন ওদের ভেতর থেকে উত্তর এল, মাসীমা, সকাল কি হয়েছে?

তখন আমার স্ত্রী দেখল, ওদের সকলেরই মাথার কাছে একটা করে রিভলবার রয়েছে। আমার স্ত্রী বলল, হ্যাঁ বাবা, সকাল হয়েছে। তখন ওরা জামা পরে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের পেছনের বাগান দিয়ে সরে পড়ল।

আর একদিন সিঁথির মোড়ে এসে দেখি মিলিটারীরা কালীচরণ ঘোষ রোডের মুখটা বন্ধ করে দিয়েছে। ভেতরে সার্চ চলছে। আমার দুই ছেলে ঢুকতে পারে-নি। সিঁথির মোড়ে তারা আটকে গেছে, এবং তাদের গাড়িতে বসে আছে। আমি ট্যাকসি ওখানেই ছেড়ে দিলাম। তারপর মিলিটারী কমানডেন্টের কাছে গিয়ে

আমার পরিচয় দিলাম ও আইডেনটিটি কার্ড দেখালাম। আমাকে সে ভেতরে যাবার অনুমতি দিল। আমি আমার ছেলেদের কথা বললাম। তারাও ভেতরে যাবার অনুমতি পেল।

এভাবেই এক দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে আমাদের কয়েকমাস কাটাতে হল।

তারপর একদিন সকালে উঠে দেখি এক অদ্ভুত দৃশ্য। নকশালরা যে যেদিকে পারছে, পালাচ্ছে। পাড়ার কয়েকজন ছেলে মিলে নকশালদের ঠ্যাঙাচ্ছে। দু-একজনকে মেরেও ফেলেছে। এভাবেই আমাদের দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটল।

৯ ৯ ৯

শংকরের মামলার যবনিকাপতন ঘটেছিল বটে, কিন্তু শংকরের মৃত্যু চিরকালের মতো আমাদের মনে দাগ দিয়ে গেছে।

আজ বিশ বছর কেটে গেছে, কিন্তু শংকরকে এখনও পর্যন্ত আমরা ভুলিনি। অবশ্য ভোলবার কথা নয়। স্বাভাবিক মৃত্যু হলে হয়তো ভুলে যেতাম। কিন্তু যখনই শংকরের ময়না তদন্তের রিপোর্টটা পড়ি, তখনই শিউরে উঠি ভেবে যে শংকর তার মৃত্যুর সময় কি নিদারুণ যন্ত্রণা না পেয়েছিল! তাকে যখন পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছিল সে বাপ-মায়ের উদ্দেশ্যে কত না আর্তনাদ করেছে! আগে মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারে মনে হত যে শংকর আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নের মধ্যে শংকরকে দেখে চমকেও উঠি। স্বপ্নের মধ্যে আমার বড়ছেলে লক্ষ্মীকে এখনও দেখি।

শংকরের মৃত্যুর আটবছর পরে আমি আমার জীবনের তৃতীয় আঘাত পেলাম ভুতোর মৃত্যুতে। আবার তার দু'বছর পরে জীবনের চরম আঘাত, স্ত্রীর মৃত্যু। শংকরকে মেরেছিল এক দুশমন, আর ভুতোকে ও আমার স্ত্রীকে মারল শূকর-শাবক ডাক্তাররা।

৯ ৯ ৯

শংকর মারা যাবার ঠিক একমাস আগে ভুতো (নন্দ) আমার মেয়ে-জামাই ও তাদের বন্ধুদের সংগে শিমুলতলায় যায়। শিমুলতলা খুব ছোট জায়গা। দু'চার দিন এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবার পর ওদের খুব একঘেয়েমি-জনিত বিরক্তি বোধ হল। ভুতো প্রস্তাব করল, কাল সকালে আমরা সকলে লাটটু পাহাড় যাব।

যথাযথভাবে পরদিন ওরা লাটটু পাহাড় গেল। ভুতো ছেলেবেলা থেকেই

খুব দুর্ধর্ষ টাইপের ছেলে ছিল। আগে আগে সে-ই এগুতে লাগল। বাকী সকলে তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

লাটটু পাহাড়ের মাথায় উঠে ওরা এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। কারা সেখানে চারটে মাটির ঘট স্থাপন করে গেছে। প্রতিটি ঘট থেকে উঠেছে একটা করে লাল রঙের কাপড়ের নিশান। আর সমস্ত জায়গাটাকে বেষ্টন করা হয়েছে লাল রঙের কাপড় দিয়ে।

ভুতো ছাড়া বাকী সকলেই ওটা দেখামাত্র বলে উঠল, ওরে কারা তুকগুণ করে গেছে, ওদিকে কেউ যাসনি।

ভুতোর মাথায় কিন্তু কি এক ভূত চাপল। সে বলে উঠল, তোর তুকগুণের নিকুচি করেছে! এই কথা বলেই নিমেষের মধ্যে সে লাথি মেরে ঘট চারটে ভেঙে দিল। ঘটের টুকরোগুলো চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। সকলে ভুতোর এই কান্ড দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ল। কিন্তু শঙ্কা করা তখন বৃথা। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। সকলেরই মনে এক ভীষণ ভয়ের সঞ্চার হল। সকলেই ভাবতে লাগল, না জানি কি অমঙ্গল ভুতোকে স্পর্শ করল! লাটটু পাহাড়ে ওঠার সমস্ত আনন্দ তখন নিরানন্দে পরিণত হল।

সকলেই মনমরা অবস্থায় বাসায় ফিরে এল।

এই ঘটনা সকলের মনকে এমনভাবে বিচলিত করল যে পরদিনই সকলে কলকাতা অভিমুখে রওনা হল। কিন্তু কলকাতায় ফিরে এসে এই ঘটনার কথা কেউই আমাদের বলল না।

শিমুলতলা থেকে ওরা ফিরে আসবার একমাস পরেই শঙ্কর খুন হল। তারপর ভুতো নিজে পীড়িত হয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে হাঁটুতে বেদনা হয়। ভুতো বিছানায় শুয়ে থাকে।

ভুতো কিন্তু এসব ভ্রূক্ষেপের মধ্যেই আনল না। কেননা ভুতো সহজে কাবু হবার ছেলে ছিল না। তার মনটা ছিল ভীষণ সবল। সেই সবল মনকে সম্বল করে ভুতো অফিস যেতে লাগল এবং শঙ্করের মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেড় বছর আমার সংগে সংগে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করল।

ইতিমধ্যে আমার চোখে ছানি পড়ল। আমি প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধ হয়েই গেলাম। ভুতোই আমাকে হাত ধরে অফিসে নিয়ে যেত ও আমার সমস্ত কাজগুলো ও নিজেই করত। পীড়িত হলেও সে আমাকে জানতে দিত না সে পীড়িত।

আমার ওপর ভুতোর একটা অসাধারণ ভালবাসার টান ছিল। অফিসে আমার জন্য টিফিন সে নিজেই আনাত এবং আমি যদি অন্য ঘরে ব্যস্ত থাকতাম, তা হলে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কখনও নিজে টিফিন স্পর্শ করত না। এর

ফলে চা ও টিফিন অনেক সময়ই ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

ভুতোর মতো মনের বল আমি খুব কম ছেলের মধ্যেই দেখেছি। ভুতো তখন তিন-চার বছর পীড়িত। একদিন অফিস থেকে ফেরবার সময় টেরেটিবাজারে আমি একটা ট্যাকসিতে উঠতে যাব, এমন সময় এক পকেটমার আমার অলক্ষ্যে পকেট থেকে দামী কলমটা তুলে নিল। আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু ভুতোর নজর এড়ায়নি। ভুতো 'পকেটমার' 'পকেটমার' বলে চিৎকার করতে করতে তার পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল। আমি তখন নিজের পকেটে হাত দিয়ে বুঝতে পারলাম যে আমার কলমটা পকেটমার হয়েছে।

পকেটমারটা ছুটতে ছুটতে কাছাকাছি গুণ্ডা অধ্যুষিত একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভুতোও তার পিছনে পিছনে ধাওয়া করল। আমি জানতাম যে ওই গলিটায় নামজাদা গুণ্ডারা বাস করে। আমার তখন একটা চোখের ছানি কাটানো হয়ে গেছে। তখন একটা চোখেই আমি বেশ দেখতে পাই। ভুতোকে ওই গুণ্ডার আড্ডার গলির মধ্যে ঢুকতে দেখে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। আমিও ছুটতে আরম্ভ করলাম। গলিটার মুখে ঢুকেই আমি দেখলাম যে ভুতো লোকটাকে ধরে রাস্তায় ফেলে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে আসছে। পীড়িত অবস্থাতেও ভুতোর শরীরে এরূপ অসীম শক্তি ও বল ছিল। এইজন্যই ভুতো কোনদিন তার মনে স্থান দেয়নি যে শিমুলতলার ওই ঘটনার সঙ্গে তার পীড়ার কোন সম্বন্ধ আছে।

ভুতো কলকাতার বাইরে যেতে খুব ভালবাসত। পীড়িত অবস্থাতেই বন্ধুদের সঙ্গে দার্জিলিং ঘুরে এল। তারপর মুর্শিদাবাদ ঘুরে এল। তারপর চিন্ময়-এর (সিনেমা-অ্যাকটর, ভুতোর বিশেষ বন্ধু) বোনের বিয়েতে দিল্লী গেল। চিন্ময়ের দাদা আমেরিকান অ্যামবেসিতে চাকরি করত ও দিল্লীর চাণক্য পুরীতে থাকত। যদিও চিন্ময় আমাদের পাড়াতেই থাকত, তা হলেও ওর বোনের বিয়েটা দিল্লীতে ওর দাদার ওখান থেকেই হয়েছিল। বিয়ের খাওয়ানো-দাওয়ানোটা হয়েছিল দিল্লীর নামজাদা হোটেলে। ভুতোর ওপর ভার পড়েছিল অতিথি অভ্যর্থনা করবার। সেই উপলক্ষে ভুতোর দিল্লীর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ভুতো দিল্লী থেকে ফিরে এসে আমাকে বলল, অশ্বিনী গুপ্ত ও দিল্লীর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল।

ভুতো লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে খুব ভালবাসত। বন্ধুরা ছিল ভুতোর প্রাণ। বাড়ির কাছে কানাইয়ের চায়ের দোকানে ওরা সকলে সন্ধ্যার পর একসঙ্গে মিলিত হত। চা খাবার খরচটা ভুতো একাই বহন করত। সেজন্য বন্ধুমহলে ভুতোর ডাকনাম ছিল 'শেঠজী'। এছাড়া কানাইকে ভুতো তার ছেলেদের

পরীক্ষার ফী, স্কুল-কলেজের মাহিনা ইত্যাদি দিয়ে অনেক সময় সাহায্য করত।

টাকাপয়সা খরচ সম্বন্ধে ভুতোর হাতটা ছিল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ও মনটা ছিল উদার। বন্ধুদের সে অকাতরে সাহায্য করত। চিন্ময় সিনেমায় নামবার জন্য যখন প্রথম ইনটারভিউতে যায়, তখন তো সে ভুতোর টেরেলিন শার্ট পরেই ইনটারভিউ দিতে গিয়েছিল এবং বোম্বাই পর্যন্ত তার রাহাখরচটা ভুতোই দিয়েছিল।

এভাবে ভুতো পীড়িত হবার পর থেকে তিন-চার বছর কেটে গেল। কিন্তু শিমুলতলার সেই কাল্পনিক তুক ক্রমশ প্রকোপ বিস্তার করতে লাগল। হাঁটুতে বাত ছাড়া ভুতোর ডায়াবেটিস হল। হার্ট ডাইলেটেড্ হল। ভুতো ক্রমশ কাবু হয়ে পড়ল।

এতদিন পর এই প্রথম ভুতো আমাকে বলল, সে আর অফিস যেতে পারছে না। আমার নির্দেশমতো সে অফিসের কাজে ইস্তফা দিল।

ভুতো আর বাড়ির বাইরে যেতে পারে না। তেতলার ঘরে একলা শুয়ে থাকে। অফিসে এয়ার-কনডিশনড্ ঘরে বসে কাজ করত বলে গরমকালে বাড়িতে সে খুব কষ্ট অনুভব করতে লাগল। সেজন্য আমি ভুতোর ঘরটা এয়ার-কনডিশনড্ করে দিলাম। কিন্তু ভুতোর বিবেকশক্তি ছিল অদ্ভুত। পাছে ইলেকট্রিক বিলের বোঝাটা আমার ঘাড়ে বেশি পরিমাণে চাপে, সেজন্য ভুতো সবসময় এয়ার-কনডিশনড্ মেশিনটা চালাত না। গরম অসহ্য হলেই চালাত।

বাড়িতে আবদ্ধ হয়ে পড়বার পরও ভুতো বন্ধুদের চা-খাবার টাকাটা তিন-চার মাস কানাইয়ের দোকানে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারপর আমার ছেলে বদ্রি একদিন ভুতোর বন্ধুদের ডেকে বলল, ভুতো যখন আর চায়ের দোকানে যায় না, টাকাটা নিতে এসে তোমরা ভুল করছ।

আগে ছুটির দিনে ভুতোর বন্ধুরা আমাদের বাড়ি এসে ভুতোর সঙ্গে বেশ জমাটি আড্ডা দিত ও তাস খেলত। এখন ভুতোর বন্ধুরা কেউ আর আমাদের বাড়ি আসে না। তারা তাকে সম্পূর্ণ পরিহার করল। তাদের এই আচরণ ভুতোর প্রাণে খুব ব্যথা দিল। ভুতোর ব্যথা পাবার তো কথাই। যে ভুতো বন্ধুদের ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারত না, সেই ভুতো আজ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। নিজের কক্ষে একাকী বসে থেকে সে অনেক কিছুই ভাবত। বাড়ির লোকদের সে সঙ্গ পেত না, কেননা সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকত। একমাত্র বড়-বউমা প্রথম প্রথম তাকে চা দিতে যেত এবং তার সহানুভূতিও ভুতোর ওপর সম্পূর্ণ ছিল। ভুতোকে বড়-বউমা খুবই স্নেহ করত এবং ভুতোও বড়-বউমাকে মাতৃবৎ ভক্তি করত। আমি সকালের দিকে নিজ কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম। সুতরাং সকালের

দিকে ভুতোকে সঙ্গ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

ভুতো সারাদিন সন্ধ্যার সময় আমার অফিস থেকে ফেরবার প্রতীক্ষায় থাকত। আমার ফিরতে দেরি হলে ভুতো খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ত ও অফিসে টেলিফোন করে খবর নিত আমার দেরি হচ্ছে কেন।

আমি অফিস থেকে ফিরে এলে ভুতো আমার ঘরে নেমে আসত ও আমার সঙ্গে গল্পগুজব করত। এ ছাড়া, ভুতো ও আমি দুবেলাই একসঙ্গে বসে খেতাম।

নির্জন কক্ষটাই ভুতোর কাল হয়ে দাঁড়াল। সারাদিন তার একমাত্র সাথী ছিল 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'দেশ'। এ-দুটো কাগজ ভুতো এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পড়ত যে এ-দুটো পত্রিকার অভ্যন্তরস্থ আধেয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পরীক্ষা হলে, এ-দুটো পত্রিকার সম্পাদকদেরও বোধহয় হার মানতে হত।

এ ছাড়া, ভুতো সময় কাটাত 'রীডারস্ ডাইজেস্ট,' 'টাইম' ম্যাগাজিন প্রভৃতি পড়ে। আমার এক সেট 'রবীন্দ্ররচনাবলী' ছিল। ভুতো এক-একখানা করে নিয়ে সেগুলোও পড়ে ফেলেছিল। এ ছাড়া, তার আর একখানা প্রিয় বই ছিল। সেখানা হচ্ছে রাজশেখর বসুর 'মহাভারত'। ওখানা ভুতো সবসময়ই হাতের কাছে রাখত ও পড়ত।

নিঃসঙ্গ অবস্থায় একলা ঘরে শুয়ে থেকে, ভুতোর মনে জীবনের ব্যর্থতার একটা ভাবাবেশ এসেছিল। যে ভুতো একসময় আনন্দের খনি ছিল, সর্বদা যার মুখে প্রফুল্লতা বিরাজ করত, সেই ভুতোর মুখে ক্লান্তি ও কষ্টের ছাপ পড়তে লাগল। তার মনের অন্তঃপুরের বেদনা বাইরের জগৎ বুঝল না। একটু সান্ত্বনা ও সহানুভূতি পেলে, ভুতো বোধহয় তার নিজের মেজাজটাকে ভাল রাখতে সক্ষম হত। কিন্তু সান্ত্বনা ও সহানুভূতির অভাবে মেজাজটা তার ক্রমশ বিগড়ে যেতে লাগল। সামান্য বিষয় নিয়ে ভুতো রেগে যেতে লাগল। এমনকি রেগে গিয়ে মাঝে মাঝে দু-তিন দিন খাওয়া বন্ধ করে দিত। তখন আমি আমার মেয়ে সুষমাকে খবর পাঠাতাম। সুষমাই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভুতোকে শান্ত করে আবার খাওয়া-দাওয়া শুরু করাত। সুষমার কথা ভুতো শুনত এবং ওর সঙ্গ পেলে ভুতোর খুব আনন্দ হত। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি থেকে রোজ আসা তো ওর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তবে সুষমা যখনই আসত, ভুতোর কাছেই অধিক সময় কাটাত। ভুতোর কাছে বাড়ির কেউ বসে না, তার প্রতি কেউ সহানুভূতি দেখাত না, এই নিয়ে ভুতো সুষমার কাছে আক্ষেপ করত ও অনেক সময় কেঁদেও ফেলত।

ভুতো ক্রমশ কক্ষ-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ল। জানালা-দরজা দিনের বেলা বন্ধ করে

রাখত। বলত, বাইরের আলো ও বাতাস আর ভাল লাগছে না। ভুতোর এই মানসিক অবস্থা দেখে আমি প্রায়ই পীড়াপীড়ি করে বলতাম, ভুতো, চল্ সন্ধ্যার পর আমরা ট্যাকসি করে শহরটায় বেড়িয়ে আসি। তুই বিছানায় শুয়ে পড়বার পর শহরটার কতটা পরিবর্তন হয়েছে, চল্ দেখে আসি। কিন্তু কারুরও সাধ্য ছিল না, ভুতোকে বাড়ির বাইরে বের করে।

এইভাবে ভুতো পাঁচ বছর বাতের যন্ত্রণা, ডায়েবেটিস ও হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা নিয়ে অসীম সাহসের সঙ্গে তার জীবনের দিনগুলো কাটাতে লাগল।

এর মধ্যেই একদিন দেওঘর থেকে যমুনারা এল। যমুনার মা ভুতোর ঘরে গিয়ে ভুতোকে দেখে কেঁদে ফেলল। কোথায় গেল ভুতোর সেই সুঠাম দেহ! শীর্ণ ভুতো বিছানার সঙ্গে মিশে রয়েছে। মুখে একগাল গোঁফ-দাড়ি, মাথায় রুমাল দিয়ে এক ফেট্টি বাঁধা। যমুনার মা বললেন, ভুতো, তোর এ দশা হল কি করে? ভুতো কেঁদে ফেলল। যমুনার মা ভুতোকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। বললেন, ভুতো, তুই আমার সঙ্গে দেওঘরে চল্, আমি তোকে সুস্থ করে তুলব। ভুতো বলল, মাসীমা, এখন আমার শরীর খুব দুর্বল। এখন আমি যেতে পারব না! একটু শক্তি পেলেই যাব।

মৃত্যুর ছ'মাস আগে মনে হল যে, ব্যাধির সঙ্গে দুর্দমনীয় লড়াই করে ভুতো বুঝি এবার ভাল হয়ে আসছে। কিন্তু কে জানত যে সেটা হচ্ছে নির্বাপিত হবার আগে প্রদীপের শেষ দীপ্তশিখা।

পুজার সময় থেকে ভুতোর আচরণে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা গেল। যে ভুতোকে পাঁচ বছর ধরে কেউ বাড়ির বাইরে বের করতে সক্ষম হয়নি, সেই ভুতো ভাল কাপড়-জামা পরে স্বেচ্ছায় বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিমা-বিসর্জনের শোভাযাত্রা দেখতে লাগল। ভুতো যে নেমে গেছে, আমি প্রথম তা টের পাইনি। আমি টের পেলাম, যখন আমি উপরের ঘর থেকে রাস্তায় ভুতোর গলা শুনতে পেলাম। আমি জানালার ধারে এসে দেখলাম যে ভুতো গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর একদল বন্ধু তাকে বলছে, কি রে ভুতো, কেমন আছিস? চল্, ঠাকুর দেখতে যাবি চল্। আমি শুনলাম, ভুতো তাদের উত্তর দিচ্ছে, 'ভুতো সুসময়ের বন্ধুদের সঙ্গে কোন সংসর্গ রাখে না। ভুতো যখন বন্ধুমহলে দু'হাতে টাকা-পয়সা ছড়াতে পারত, তখন ভুতোর অনেক বন্ধু ছিল, আজ ভুতোর সে-ক্ষমতা আর নেই। ভুতোর আজ অসময়। ভুতো তোমাদের সঙ্গে যাবে না।' সারা জীবন ভুতো এরকম স্পষ্টবাদী ছিল। অপ্রিয় সত্যকে শর্করার আবরণ দিয়ে, কথা বলতে জানত না। এজন্য ভুতোর সঙ্গে বাড়ির কারুর বনিবনা হত না।

পুজা কেটে গেল। আমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী হঠাৎ পীড়িত হয়ে পড়ল।

একদিন সন্ধ্যার পর আমি যখন অফিস থেকে ফিরেছি, দেখলাম ভুতো তার দৈনিক অভ্যাস অনুযায়ী, নীচের ঘরে নেমে এসে আমাকে বলল, বাবা, ছোট কাকীমার অসুখ শুনছি, আমি একবার দেখতে যাব। আমি ভুতোর এই চিত্ত-পরিবর্তন দেখে খুশি হলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিলাম। ভুতো তার মাকে সঙ্গে নিয়ে ওর কাকীমাকে দেখতে গেল।

এর কয়েক সপ্তাহ পরে ভুতো একদিন আমাকে বলল, সোনা (আমার জামাইয়ের নাম) ধর্মতলায় এক নতুন ফ্ল্যাটে উঠে গেছে, আমি তোমার সঙ্গে একদিন গিয়ে ওদের ফ্ল্যাটটা দেখে আসব। সামনেই বড়দিন ছিল, আমি বললাম, চল্, আমরা বড়দিনের ছুটিতে ওদের ফ্ল্যাটটা দেখে আসি। সঙ্গে সঙ্গে শহরে বড়দিনের আলোর শোভাও দেখব।

তারপর একদিন সন্ধ্যার পর ভুতো আমার সঙ্গে সোনাদের ফ্ল্যাটে গেল। ভুতো খুব খুশি। সেখানে সে রেকর্ড বাজাল, আনন্দ করল ও সামান্য খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ি ফিরে এল। ভুতোর গানের সখ অত্যন্ত প্রবল ছিল। এমন কোন নামজাদা আর্টিস্ট নেই, যার গানের রেকর্ড ভুতোর ছিল না। মাঝে মাঝে তার নিঃসঙ্গ জীবনে আনন্দ পাবার জন্য ভুতো তার রেকর্ড-প্লেয়ারে এইসকল রেকর্ড বাজাত।

ইদানীং আমার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছিল। ভুতো সেটা লক্ষ্য করে আমাকে বলল, তুমি মাসখানেক দেওঘরে যমুনাদের ওখানে ঘুরে এস। আমি বললাম, তুইও আমার সঙ্গে চল্। ভুতো বলল, আমি পরে শেষের দিকে যাব ও তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসব। ওদিকে দেওঘর থেকে গঙ্গা ও রাধাও ভুতোকে আমন্ত্রণ জানাল।

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি আমি ও আমার স্ত্রী দেওঘর গেলাম। ভুতো নিয়মিতভাবে আমাকে রোজ একখানা করে চিঠি লিখত। একখানা চিঠি পড়ে আমি একটু বিস্মিত হলাম। ভুতো লিখেছে, কাল আমি বারাকপুরে দিদিমাকে দেখতে গিয়েছিলাম। মাকে বোলো, দিদিমা ভাল আছে।

চিঠিটা পড়ে আমি ভাবলাম, যাক, ভুতোর এবার একটা মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে। সে এবার এক এক করে, সব আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি যাওয়া শুরু করেছে। কিন্তু সেবার দেওঘরে অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়ায় ভুতোর আর শেষ পর্যন্ত দেওঘর যাওয়া হল না।

আমি যেদিন দেওঘর থেকে ফিরে এলাম, ভুতোর আর আনন্দ ধরে না। আমাদের সঙ্গে অনেক লটবহর ছিল। সেগুলো ভুতো নিজেই ট্যাকসি থেকে নামিয়ে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এল।

দেওঘর থেকে আসবার পর আমি লক্ষ্য করলাম যে আমার অনুপস্থিতিতে কে বা কারা ভুতোকে ভীষণভাবে উত্তেজিত করেছে, বাড়ির অন্যান্য সকলের বিরুদ্ধে। কয়েকদিন পরে কি একটা সামান্য কারণে ভুতো আমাকে বলল, সে আর সংসারের রান্না খাবে না। নিজে আলাদা রান্না করে খাবে। এরকম সে আগেও দু এক-বার করেছে। সেজন্য আমি ভাবলাম যে আবার কিছুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এই আলাদা রান্নার ব্যাপারে একদিন বাড়ির কে কি-একটা মন্তব্য করায়, ভুতো বাড়িতে রান্না করে খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিল। বাড়ির চাকর মানুর মারফত হোটেল থেকে ভাত-ডাল কিনে এনে খেতে লাগল। আমি অনেক বোঝা-লাম। সুষমাও এসে অনেক বোঝাল। কিন্তু তাকে এ-সিদ্ধান্ত থেকে কিছুতেই কেউ নিরস্ত করতে পারল না।

ভুতোর মৃত্যুর দশ-বারো দিন আগে, ভুতোর মা একদিন পূজা সেরে ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গেয়ে উঠল—

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল,
সকলই ফুরায়ে যায় মা।"

শোনামাত্রই ভুতো ঐকতানে ওই দুটো লাইন গাইতে লাগল! সেদিন কে জানত, যে এর মধ্যে নিহিত আছে এক নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী। দশদিন পরে সবই ফুরায়ে যাবে!

১১১

বিধাতা ঘটনাপ্রবাহ এমনভাবে সৃষ্টি করেন যে নিয়তির বিধান অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। ভুতো বাড়িতে খায় না। এর জন্য আমার স্ত্রীর মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার স্ত্রী সেজন্য বাপের বাড়ি, বোনের বাড়ি ইত্যাদি করে বেড়াতে লাগল। আমার স্ত্রী যে কোথায় আছে, কখন কোথায় তার ফিট হচ্ছে, তার কোন সঠিক খবর না পেয়ে ভুতোর ও আমার খুব উদ্বেগ হল। তারপর একদিন শ্যামনগরে ওর বোনের বাড়ি থেকে আমার স্ত্রী ফিরল। এদিকে আমার একটা অদ্ভুত রোগ প্রকাশ পেল। আমার মুখের চোয়াল দুটো বন্ধ হয়ে গেল। আমি আর কিছু খেতে পারি না। কথা কওয়ার মধ্যেও ভীষণ জড়তা এল।

সেদিন মঙ্গলবার। আমার ডাক্তার ছেলে আমাকে কয়েকজন সার্জনের কাছে নিয়ে গেল। তাঁরা সন্দেহ করলেন, আমার টিটেনাস্ হয়েছে এবং আমার ছেলেকে বললেন, অবিলম্বে যেন বেলেঘাটার আই-ডি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে একবার

পরীক্ষা করে দেখা হয়। তখন অনেক রাত্তির হয়ে গেছে। পাছে বাড়ির লোকরা চিন্তিত হয়, সেজন্য আমার ছেলে বাড়িতে টেলিফোন করে জানিয়ে দিল যে বাবা-কে বেলেঘাটার আই-ডি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভুতো টেলিফোনের কাছেই বসে ছিল। সে টেলিফোন পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। বাবাকে আই-ডি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন—এ সে বুঝতে পারল না।

যাই হোক, আই-ডি হাসপাতালে পরীক্ষার পর যখন সাব্যস্ত হল যে টিটেনাস্ নয়, তখন আমার ডাক্তার ছেলে বাড়িতে আবার টেলিফোন করে জানিয়ে দিল যে বাবাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভুতো তাতে আশ্বস্ত হল। নিকটে আমার স্ত্রী বসে ছিল। সে আমার স্ত্রীকে বলল, মা, বাবা বাড়ি ফিরে আসছে, ভাবনার কোন কারণ নেই।

ওর মায়ের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সেদিন রাত্তিরে ভুতো বলল, মা, আমি দিন-কতক বাইরে বেড়িয়ে আসতে চাই। ওর মা বলল, গরম পড়ে গেছে, কোথায় আর যাবি ? তা, দিনকতক দার্জিলিং ঘুরে আয়।

ভুতো বলল, না, আমি শিমুলতলায় যাব। বোধহয় এতদিন পরে লাট্টু পাহাড়ের সেই ঘটনার জন্য ভুতোর মনে অনুতাপ এসেছিল !

আমি বাড়ি ফিরলাম। ভুতোর খুব আনন্দ। সুষমাও সেদিন আমাদের বাড়ি এসেছিল। আমাকে দেখবার পর, সে আমার জামাইয়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরে গেল।

আমি যখন ফিরে এলাম, ভুতো তখন আমার ঘরেই বসে ছিল। তারপর আমার আর দুই ছেলে এল। আমার অসুখটা কি, তাই নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। আমি বললাম, এটা গভীর দুশ্চিন্তার জন্য হয়েছে। পারিবারিক অশান্তির জন্য যে আমার গভীর দুশ্চিন্তা, সে কথাই আমি বললাম। (আসলে রোগটা আমার 'ফেসিয়াল প্যারালিসিস্', কিন্তু ভুতো সেটা শুনে যায়নি)। আমার পারিবারিক অশান্তির জন্য দুশ্চিন্তা, এ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে ভুতো উপরে তার নিজের ঘরে উঠে গেল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ল। সে-রাত্রে সে আর কিছু খেল না। মাঝে মাঝে না খেয়ে সে এরকম শুয়ে পড়ত। সেজন্য সে-রাত্তিরে কেউ আর তাকে খেতে ডাকল না।

পরদিন ভুতোকে তার ঘরে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গেল। সমস্ত রাত্তির ধরে সে কেঁদেছিল। চোখের জল তার গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল। চোখ দুটো লাল জবাফুল হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল। কয়েক ঘন্টা পরেই তার জ্ঞান এল। পরের দিন বৃহস্পতি-বার সকালে আমি ও আমার স্ত্রী ভুতোকে হাসপাতালে দেখতে গেলাম। ভুতোর যদিও জ্ঞান ফিরে এসেছিল, তা হলেও তখনও তার ঘোর ছিল। আমরা যে তাকে

দেখতে গেছি, তা সে বুঝতেও পারেনি। কেননা, বেলার দিকে যখন আমার মেয়ে সুষমা তাকে দেখতে গেল, তখন সে তাকে প্রশ্ন করল, 'কই, বাবা ও মা আমাকে দেখতে এলেন না ?' সুষমা বলল, 'কেন, বাবা ও মা তো সকালে এসেছিলেন, তুই টের পাসনি ?' ভুতো বলল, 'কই আমি তো টের পাইনি।'

বিকালে আমি ও আমার স্ত্রী আবার ভুতোকে দেখতে গেলাম। ভুতো জিজ্ঞাসা করল, আমার চোয়ালের জন্য একস্-রে করা হয়েছে কিনা।

শুক্রবার দিন ভুতোর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা। ভুতো বলল যে গরমে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। সে বাড়িতে তার এয়ার-কনডিশনড্ ঘরে ফিরে যেতে চায়। (মেডিকেল কলেজের 'ইমারজেন্সি ডিপার্টমেন্ট'টা একটা নরককুণ্ড বিশেষ)। আমি সিদ্ধান্ত করলাম যে পরদিন শনিবার ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হবে। সেদিন ভুতোর টেমপারেচার ছিল ৯৮ ও ব্লাড-প্রেসার ৮০/১৪০।

হঠাৎ শনিবার ভুতোর জ্বর প্রকাশ পেল। ভুতো আমাদের কাছে অনুযোগ করে বলল, দ্যাখ, আমার পাশের বেডের লোকটা আজ দু'দিন মারা গেছে। কিন্তু তাকে কিছু চাপা না দিয়ে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে। জানি না, এর কোন প্রতিক্রিয়া ভুতোর মনের ওপর হয়েছিল কিনা।

রবিবার সকালে আমি ও আমার স্ত্রী যখন ভুতোকে দেখতে গেলাম, তখন ভুতো আমাদের কাছে অনুযোগ করল যে সমস্ত রাত্তির জ্বর অবস্থায় তাকে ভিজে অয়েল-ক্লথের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছিল। ফলে, সমস্ত রাত্তির সে ঠাণ্ডায় ও শীতে কেঁপেছে ও সেই কারণে তার জ্বরমাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

জ্বরটার কারণ জানবার জন্য আর-পি'কে ডেকে আনা হল। আর-পি ভুতোকে দেখতে এসে আবিষ্কার করলেন যে যদিও জ্বরের জন্য আগের দিন দুটো ক্যাপসুল ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু সিসটার মাত্র একটা ক্যাপসুল দিয়েছিল। আর-পি বকাবকি করায় সিসটার আর একটা ক্যাপসুল দিল। (পরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রিপোর্টার প্রকাশ করেছিলেন যে, ওই সময় মেডিকেল কলেজের ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে রোগীদের যে স্যালাইন দেওয়া হয়েছিল, তা দূষিত স্যালাইন এবং তার ফলে রোগীদের মৃত্যু ঘটছিল।)

বেলা ১২টা পর্যন্ত আমি ও আমার স্ত্রী ভুতোর কাছে রইলাম। ভুতো আমাদের বলল, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে, তোমরা বাড়ি গিয়ে স্নানাহার করগে, আবার বিকালে এস।' আসবার সময় ভুতোর সম্পূর্ণ জ্ঞান ও স্বাভাবিক অবস্থা দেখে এলাম।

বেলা দেড়টার সময় সুষমা ও আমার জামাই ভুতোকে শান্তভাবে ঘুমুতে দেখে এল।

বেলা দুটোর সময় আমি ও আমার স্ত্রী যখন হাসপাতালে গেলাম, তখন দেখলাম যে ভুতোর নাভিশ্বাস উঠেছে। ২০।২৫ মিনিট পরেই ভুতো মারা গেল।

১১১

সত্তরের দশকের গোড়ায় ভুতো যখন রোগশয্যায় শায়িত, তখন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পূর্ব-পাকিস্তানে ঘটল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করল, এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দেওয়া 'বাংলাদেশ' নামে পরিচিত হল। যে ঘটনাবলীর অনুক্রমণে 'বাংলাদেশ' স্বাধীনতা লাভ করল, তা এখানে বিবৃত করা প্রয়োজন মনে করি।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতালাভের শর্ত হিসাবেই পূর্ব-পাকিস্তান হয়েছিল। সৃষ্ট হবার পর থেকেই পূর্ব-পাকিস্তান পশ্চিম-পাকিস্তান কর্তৃক শোষিত হতে লাগল। পূর্ব-পাকিস্তান, পশ্চিম-পাকিস্তানীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল। জাতি, সংস্কৃতি ও ভাষার পার্থক্য হেতু এই প্রক্রিয়া পূর্ব-বাঙলার লোকদের মনে বিদ্বেষ সঞ্চার করল। বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেতে লাগল, যখন তারা দেখল যে, বে-সামরিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, সৈন্য, নৌ ও বিমান বিভাগে তাদের নিযুক্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পশ্চিম-পাকিস্তানী ধনিকরাই প্রাধান্য লাভ করতে লাগল। এসবের ফলে, পূর্ব-বাঙলার লোকদের মনে এক নৈরাশ্যের ভাব সৃষ্টি করল।

পরিস্থিতি উৎকট আকার ধারণ করল, যখন বাংলার পরিবর্তে উর্দুভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দিয়ে, তা কায়েম করবার চেষ্টা হল। বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল। কিন্তু বন্দুকের গুলির দ্বারা তাদের প্রতিবাদ স্তব্ধ করা হল। এর প্রতিক্রিয়ায় যে ঘোরতর আন্দোলন শুরু হল, তার ফলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে তত্ত্বগতভাবে উর্দুর পাশে স্থান দিল।

এদিকে ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম লীগ সরকারের পরিবর্তে আওয়ামী লীগের প্রাধান্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার স্থাপিত হল। কিন্তু ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে জেনারেল আয়ুব-খান যখন প্রতিষ্ঠিত সরকারকে প্রতিহত করে সামরিক শাসন প্রবর্তন করল, তখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনের অবসান ঘটল।

১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে আয়ুব খান ভারতের সংগে যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন কচ্ছের রণের স্বত্বাধিকার নিয়ে। পনেরো দিন যাবৎ ঘোরতর যুদ্ধ হল। তারপর U.N.-এর নির্দেশে যুদ্ধবিরতি ঘটল। ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সোভিয়েট

রাশিয়ার মধ্যস্থতায় শান্তিস্থাপনের জন্য তাসখেন্টে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এর পরের মাসেই আওয়ামি লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান স্বয়ংশাসিত পূর্ব-বাঙলা গঠনের জন্য এক ছয়-দফা সনদ পেশ করলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে আয়ুব খান মুজিবর রহমানকে বন্দী করলেন।

১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২৫ মার্চ তারিখে আয়ুব খানকে গদিচ্যুত করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হলেন।

১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব-বাঙলায় এক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই নির্বাচনে আওয়ামি লীগ সর্বাত্মকভাবে বিজয়ী হল। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের ২৫ মার্চ তারিখে ইয়াহিয়া খান মুজিবর রহমানের সঙ্গে আলোচনার ছল করে ঢাকা এসে মুজিবর রহমানকে বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেলেন। এর ফলে পূর্ব-পাকিস্তানে বিদ্বেষের বহ্নি জ্বলে উঠল। ইয়াহিয়া খানের আদেশে মাত্র এক রাত্রিতেই ১০,০০০ লোককে নিহত করা হল। সন্ত্রস্ত হয়ে প্রায় এক কোটি লোক পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করল।

এরই পদাঙ্কে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু করল। স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা পাক-সৈন্যের কবল থেকে অঞ্চলের পর অঞ্চল উদ্ধার করল। এদিকে পাক-সামরিক বাহিনী ভারতের সীমান্ত অঞ্চলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করল। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর তারিখে পাকিস্তানী বিমানবাহিনী চব্বিশ পরগনার বয়ড়ায় আক্রমণ চালাল। পশ্চিম পাকিস্তানের সংলগ্ন ছ'টি ভারতীয় রাজ্যের ওপরও তারা বিমান আক্রমণ করল। গত্যন্তর না দেখে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ১৪ দিন ঘোরতর যুদ্ধ চলল। পাক সামরিক বাহিনী পদে পদে পরাহত হল। ১৪ ডিসেম্বর তারিখে পূর্ব-পাকিস্তানে পাক-সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করল। পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হল। নতুন রাষ্ট্রের নাম হল 'বাংলাদেশ', এবং ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের ১০ জানুয়ারী তারিখে শেখ মুজিবর রহমান নতুন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ঘোষিত হলেন।

১১১

শূকরশাবকদের ভুলে যে ভৃত্যের মৃত্যু ঘটল সে-বিষয় কোন সন্দেহ নেই। ভৃত্যের হার্টের গণ্ডগোল ছিল। তা সত্ত্বেও বেলা দেড়টার সময় তাকে মরফিয়া ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল। যাদের হার্টের গণ্ডগোল আছে বা শ্বাসকষ্ট হয়, তাদের মরফিয়া ইনজেকশন দিলে এরূপ শোচনীয়ভাবেই মৃত্যু ঘটে।

শংকরকে মেরেছিল দুশমন, আর ভুতোকে মারল হাসপাতালের ডাক্তার।

১১১

হাসপাতালের জঘন্য অবস্থা, নিছক অবহেলা ও ডাক্তারের অজ্ঞতায় ভুতোর অপ্রত্যাশিত মৃত্যু আমার স্ত্রীকে চরম আঘাত হানল। হানবার তো কথাই। মাত্র দু'ঘন্টা আগে যে ছেলেকে জলজ্যান্ত ও স্বাভাবিক অবস্থায় দেখে নিশ্চিন্ত মনে বাড়িতে স্নানাহার করতে এসেছে, দু'ঘন্টা পরে গিয়ে তাকে মৃত্যুর সংগে লড়াই করতে দেখবে ও কয়েক মিনিট পরে তার জীবনাবসান ঘটবে, এ তো একটা নিদারুণ মর্মন্তুদ ব্যাপার। এরকম পরিস্থিতিতে যে কোন লোকের পক্ষে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন, বিশেষ করে মায়ের পক্ষে। আমার স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। বাড়িতে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। যেদিকে তাকায়, সেদিকেই ভুতোর স্মৃতির সংগে বিজড়িত দ্রব্যসামগ্রী দেখে। এ সময় আর একটা দুঃসংবাদ এল দেওঘর থেকে। যেদিন এখানে ভুতোর মৃত্যু ঘটল, সেদিনই অপ্রত্যাশিতভাবে এবং ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার ফলে দেওঘরে মৃত্যু ঘটল যমুনার মায়ের। আমি আগেই বলেছি যে মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে এই এক অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। যেদিন শংকর মারা গিয়েছিল, সেদিন ঘটেছিল দেওঘরে কমলার মৃত্যু। আবার যেদিন ভুতোর মৃত্যু ঘটল, সেদিন ঘটল যমুনার মায়ের। যমুনার মায়ের মৃত্যুও আমার স্ত্রীকে শোকে অভিভূত করল। কেননা, এদের দুজনের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল ঠিক সহোদরা বোনের মতো।

আমার স্ত্রীর মনটাকে কোনরকমে ভোলাবার জন্য আমি রামায়ণী ও ভাগবত গানের ব্যবস্থা করলাম। কেননা, একসময় আমরা যখন বাগবাজারের বাড়িতে থাকতাম, তখন আমাদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত রামায়ণী গানের প্রতি আমার স্ত্রীর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। এতে কিছুদিন কাজ হল বটে, কিন্তু পরে তার আকর্ষণটা কেটে গেল। তার আবার ঘন ঘন ফিট হতে লাগল। তারই মাঝখানে একদিন বলল, আমি দেওঘরে যাব, মাতৃহারা যমুনা ও গংগাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। ভাবলাম, দেওঘরে গেলে হয়তো মানসিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। এই ভেবে দেওঘরে নিয়ে গেলাম। কিন্তু নিয়ে যাবার পরের দিন রাত্তিরে সে এমন ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল যে আমি নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করলাম। তৎক্ষণাৎ বিশুকে খবর পাঠালাম।

দেওঘরে বিশুই আমার সহায়। বিশুদের সংগে পরিচয় হয় ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে যখন দেওঘরে যাই। পরিচয়টা প্রথম হয়েছিল ঠিক বিশুর সংগে নয়,

গোঁসাই-মালপাড়ায় আমার গুরুদেবের বাড়ি গেল। আমার গুরুদেব বহুদিন দেহ রেখেছেন। বেঁচে আছেন গুরুমা। তিনি আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করেন। সেই স্নেহের বন্ধনের আকর্ষণেই ওরা গোঁসাই-মালপাড়া গেল। কয়েকদিন সেখানে থেকে আবার বাড়ি ফিরে এল।

১১১

গোঁসাই-মালপাড়া থেকে ফেরবার কয়েকদিন পরেই আমাদের সিঁথির শীতলাতলার সেবাইতদের বাড়ির গিন্নী এসে আমার স্ত্রীর কাছে এক নিবেদন জানাল। বলল, মায়ের মন্দিরটা বহুদিন সংস্কারের অভাবে পড়ে যাচ্ছে। ছাদ সম্পূর্ণ ফুটো হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টির সময় ওই ফুটো দিয়ে জল পড়ে মায়ের সর্বাঙ্গ ভেসে যায়। মন্দিরটা আপনাকে সংস্কার করে দিতে হবে।

মায়ের দুর্দশার কথা শুনে আমার স্ত্রী অভিভূত হয়ে পড়ল। আমাকে বলল, তুমি মন্দিরটা সংস্কার করে দাও। আমি জানতাম, ওই মন্দিরের সেবাইতগণের মধ্যে খুব ভাল মিল নেই। পাছে, মন্দিরের সংস্কারের কাজ হাতে নেবার পর, কোন সেবাইতপক্ষ তার বিরোধিতা করে, সেজন্য আমি সেবাইতদের সকলকে ডাকলাম ও সঙ্গে করে ওই মন্দিরের দলিলপত্রাদি নিয়ে আসতে বললাম। আমার কথামতো ওরা সকলে এল। দলিল দেখে বুঝলাম ওখানে শীতলামায়ের অধিষ্ঠান হয়েছিল প্রায় তিন-চারশো বছর পূর্বে। প্রথমে মায়ের আশ্রয় ছিল একটা চালা-ঘরের ভেতর। বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় চিৎপুর-কাশীপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানের সহৃদয়তায় সেবাইতরা ওখানে মায়ের এক পাকা-মন্দির করবার অনুমতি পায়। তখন দালান-স্থাপত্যরীতিতে ওখানে মায়ের জন্য এক মন্দির নির্মিত হয়। মধ্যে একবার স্থানীয় অধিবাসী ও কলকাতার বিখ্যাত তুলাদণ্ড-ব্যবসায়ী গিরীশচন্দ্র ঘোষ মন্দিরটির একবার সংস্কার করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে বহুদিন আগেকার ব্যাপার। তারপর আর কেউ সংস্কার করবার জন্য অগ্রসর হননি। কারণ, স্থানীয় এক জনশ্রুতি, যে ব্যক্তি মন্দিরের সংস্কারের কাজে হাত দেন তাঁরই পরিবারে নাকি একটা হানি ঘটে। আমি চিন্তা করে দেখলাম, মন্দিরটির তো মাত্র একবারই সংস্কার হয়েছিল, তাতে গিরীশ ঘোষ মশাইয়ের পরিবারের যদি কোন হানি ঘটে থাকে, তা থেকে কোন এক সাধারণ সিদ্ধান্ত (generalization) করা ঠিক হবে না। আমার বিশেষ করে মনে পড়ল এক ইংরেজি প্রবাদবাক্য : 'One swallow does not make a summer'।

মন্দির-সংস্কারের কাজে হাত দিলাম। সেবাইতরা বলল, সামনে অক্ষয়তৃতীয়ার

দিন নতুন মন্দিরের উদ্বোধন করা হবে। ওদের ইচ্ছাই যাতে পূর্ণ হয়, তার জন্য আমি যথোপযুক্ত মিস্ত্রি ও মজুরের ব্যবস্থা করলাম। সকালের দিকে আমি নিজে কাজ দেখি, কিন্তু বিকালে এসে দেখি কাজ বিশেষ অগ্রসর হয়নি। দুপুরবেলা আমার অনুপস্থিতিতে মিস্ত্রিরা কোন কাজই করে না। সেজন্য দুপুরবেলা প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রী মিস্ত্রিদের কাজ দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে একদিন কাজ দেখবার সময় আমি অসাবধানতাবশত, আমার পিছনে একটা কুকুর শুয়ে আছে, তা না দেখতে পেয়ে, কুকুরটার ওপরই পা দিয়ে বসলাম। কুকুরটা আমাকে কামড়ে দিল। ক'দিন আমার স্ত্রী ছুটোছুটি করতে লাগল টোটকা ওষুধের সন্ধানে। এসব বিপত্তির মধ্য দিয়েই দশ হাজার টাকা ব্যয়ে আমরা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে কাজটা শেষ করলাম। ঠিক হল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ নতুন মন্দিরটির উদ্বোধন করবেন। কিন্তু রাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে আটকে পড়ায় তরুণকান্তি ঘোষের আসা সম্ভবপর হল না। তখন প্রধান অতিথি রাজ্যের অপর মন্ত্রী ভোলানাথ সেন মন্দিরটির উদ্বোধন করলেন। ওদিন মন্দিরে একটা খুব বড় রকমের উৎসব হল। কিন্তু যার ঐকান্তিক ইচ্ছায় আমি মন্দির-সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলাম, তার পক্ষে এ উৎসবে যোগদান করা কঠিন হল। সে তখন রোগশয্যায় শায়িত। ইনভ্যালিড চেয়ারে করে এনে, তাকে নতুন মন্দিরটি একবার দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। বিহ্বলবদনে সে কেবল মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

১১১

কেন এরকম ঘটল, সে ইতিহাসটাই এখন বলব। মন্দির-সংস্কারের কাজ দেখতে-দেখতেই একদিন আমার স্ত্রী বলল, অনেকদিন আমি শ্যামনগরে আমার দিদির বাড়ি যাইনি, একবার দিদির বাড়ি ঘুরে আসি। শ্যামনগরে গেল। কিন্তু তার পরের দিনই আমি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে একটা টেলিফোন পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে বলছ ?

—আমি শ্যামনগর থেকে খোকন বলছি।

—কি হয়েছে ?

—মাসীমা খুব গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে পড়েছে। বহুবার পায়খানা ও বমি করেছে ; ডাক্তার বলছে, ওর অবস্থা খুব খারাপ, ওর ছেলেপুলেদের খবর দাও।

তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরে, আমি আমার ডাক্তার ছেলেকে নিয়ে ওর গাড়িতেই শ্যামনগর গেলাম। গিয়ে দেখলাম ওর অবস্থা খুবই খারাপ। নাড়ি অত্যন্ত

ক্ষীণ। কিন্তু তারই মধ্যে ও বাড়ি যেতে চাইল। আমরা অতি সযত্নে ওকে বাড়িতে নিয়ে এলাম। তারপর চিকিৎসার ফলে, কয়েকদিনের মধ্যেই ও সুস্থ হয়ে উঠল। সুস্থ হয়ে বলল, কালুর কি আক্কেল বল তো, শ্যামনগর থেকে আমাকে নিয়ে এল, তোমার কাছ থেকে পেট্রলের দাম নিল! আমি বললাম, আমি যখন উপস্থিত রয়েছি তখন আমি দেব না তো, ও দেবে কেন? তা, ওই নিয়ে তুমি কিছু মনে কোরো না।

ঌ ঌ ঌ

পারিবারিক কলহ বাড়িতে লেগেই আছে। অসুস্থ শরীর বলে আমার স্ত্রী আর রান্নাঘরে যেতে পারে না। একবেলা বড়-বউমা (বদ্রির স্ত্রী) রান্না করে, আর একবেলা করে সেজ-বউমা (কালুর স্ত্রী)। কিন্তু বড়-বউমা হঠাৎ পীড়িত হয়ে পড়ল। অসুস্থ শরীরেই আমার স্ত্রীকে রান্নাঘরে যেতে হল। বাড়ির দু'বউয়ের মধ্যে রেষারেষি। আমার স্ত্রী বড়-বউমার কাজটা করছে বলে, অপর বউমা রান্নাঘরে যাওয়া বন্ধ করে দিল। ফলে, অসুস্থ শরীরেই আমার স্ত্রীকে দু'বেলা রান্না করতে হল। এই নিয়ে আমার স্ত্রী কি বলায়, শাশুড়ী-বউয়ে লাগল তুমুল ঝগড়া। ঝগড়ার মুখে শাশুড়ীকে অভিশাপ দিতে লাগল, 'কাল সকালেই তুই বিছানায় পড়বি, তোকে আর বিছানা থেকে উঠতে হবে না'। আমার স্ত্রী ছিল অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির। সে সব চুপ করে শুনল। কিন্তু এজন্য সে পেল ভীষণ মানসিক আঘাত। তার পরের দিনই আমার স্ত্রী বিছানায় পড়ল। সেটাই হল তার মৃত্যুশয্যা। সব জিনিসটাই ঘটে গেল কাকতালীয়ভাবে।

ঌ ঌ ঌ

ছ'মাস আমার স্ত্রী বিছানায় পড়ে রইল। এই ছ'মাসের মধ্যে প্রকাশ পেল, আমাদের দেশের ডাক্তাররা কতটা আনাড়ি। এ ছ'মাসের মধ্যে আমার ডাক্তার ছেলে যে কত বড় বড় ডাক্তার নিয়ে এল, তার ইয়ত্তা নেই। ঘরটা হাসপাতালের কেবিন-এ পরিণত হল। একজন অ্যাটেনডেন্ট ও একজন সিস্টার সব সময়েই মোতায়েন। খাটের ছত্রি থেকে ঝুলতে লাগল গ্লুকোজের বোতল। শয্যার পাশেই অক্সিজেন সিলিন্ডার। ছ'মাসে ওষুধপত্তরেই কিনলাম প্রায় বিশ হাজার টাকার। কিন্তু সবই বৃথায় গেল। প্রথম একদল ডাক্তার বললেন ক্যানসার। কিন্তু রক্তপরীক্ষায় ক্যানসারের বিন্দুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পেল না। কলকাতার শ্রেষ্ঠ

ক্যানসার-বিশেষজ্ঞ ডাঃ পি. কে. চ্যাটার্জি এসে ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন, এটা কিছুতেই ক্যানসার নয়, তবে একটা mysterious disease। কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন ডাক্তার তাকে ক্যানসারের ইনজেকশন দিল। আমি জানতাম না যে যদি ক্যানসার না হয়, তাহলে ওই ইনজেকশনে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। হলও তাই। আমরা যখন আশা করছিলাম যে এবার ও সেরে উঠবে ওই ইনজেকশনের ফলে, সেই মুখেই ওর মৃত্যু ঘটল। তারিখটা হচ্ছে ১৬ সেপটেম্বর ১৯৭০।

তবে আমার স্ত্রী মরণ বরণ করেছিল চরম মানসিক বেদনার ভেতর দিয়ে। ছ'মাস বিছানায় পড়ে ছিল। এ ছ'মাস বাড়ির কেউই নিমেষের জন্যও তার ঘরে আসত না। একজন অ্যাটেনডেন্ট, একজন 'সিস্টার' নার্স ছাড়া, আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে অবিশ্রান্তভাবে ও বিনিদ্র অবস্থায় তাকে সঙ্গ দিয়েছি। যে ছেলে-বউ-নাতিনাতনীরা তার প্রাণ ছিল, তারা সকলেই তাকে বর্জন করল। সকলেরই এক ভয়। কি জানি কি রোগ, হয়তো আমাদের সংক্রমণ করবে। মুখে একদিনও বলেনি, কিন্তু মনে মনে সে নিশ্চয়ই ভাবত, ইহলোকে ভালবাসার কি এই প্রতিমূল্য ?

১১১

আমার স্ত্রীর মৃত্যুটা 'মৃত্যু' নয়। ওটা অপমৃত্যু। বিলাত ফেরত ক্যালকাটা হসপিটালের এক ডাক্তারের অজ্ঞতায় ঘটেছিল তার অপমৃত্যু। এঁদের অজ্ঞতা যে কতটা গভীর, তা প্রমাণ হয়ে গেল দু'মাস পরে। সেটাই এখানে সংক্ষেপে বলে নিতে চাই।

অসুস্থ হয়ে শ্যামনগর থেকে ফেরবার পর, আমার স্ত্রীকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার দিদির বাড়ি গিয়ে হঠাৎ যে তোমার ওখানে অত পায়খানা ও বমি হল, তা তুমি খেয়েছিল কি ?

—আমি মৌরলা মাছ ভালবাসি বলে, ওরা ওদের পুকুরে জাল ফেলে মৌরলা মাছ ধরল। আমি ওই মৌরলা মাছ ও মাত্র একখানা রুটি খেয়েছিলাম।

এসব কথা ওর মৃত্যুর পর আমার মনে পড়ল। আরও মনে পড়ল ক্যানসার-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পি. কে. চ্যাটার্জির কথা। তিনি তো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আধ ঘন্টা ধরে ওকে পরীক্ষা করেছিলেন। রক্ত-পরীক্ষার রিপোর্টগুলোও ভাল করে 'স্টাডি' করেছিলেন। তিনি তো বলেছিলেন, এটা ক্যানসার নয়, অন্য কোন 'মিস্টিরিয়াস' ব্যাধি।

এজন্য ওর মৃত্যুর পর আমার মনে হল যে ওই মৌরলা মাছের সঙ্গে এই 'মিস্টিরিয়াস' ব্যাধির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে, কেননা ওদের পুকুরে তো দুষ্কৃত-কারীরা অনবরতই pesticides ফেলে দিয়ে যায়, ওদের পুকুরের মাছগুলো মেরে ওদের জব্দ করবার জন্য। আমি pesticides সম্বন্ধে অনেকগুলো বই পড়ে ফেললাম। দেখলাম pesticides সেইসব মাছকে বেশি পরিমাণে বিষাক্ত করে তোলে, সেসব মাছে phosphorus আছে। মৌরলা মাছ তো ওই জাতেরই মাছ।

একখানা চিঠি লিখলাম প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে। তাঁকে জানালাম আদ্যোপান্ত আমার করুণ কাহিনী। অনুরোধ করলাম দিল্লীতে দেশবিদেশের pesticides expert-দের এক কনফারেনস্ আহ্বান করবার জন্য। আমার অনুরোধে তিনি সাড়া দিলেন। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক pesticides expert দের এক কনফারেনস্। Pesticides-এর বিষ মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তারই বিশদ ব্যাখ্যা করলেন ওঁরা ক'দিন ধরে। খবরের কাগজে তার বিস্তারিত প্রতিবেদন বেরুল। দেখলাম যেসব লক্ষণ তাঁরা বললেন, হুবহু সেইসব লক্ষণই আমার স্ত্রীর প্রকাশ পেয়েছিল। আমার সংশয় সত্যে পরিণত হল। রক্তপরীক্ষা যে মিথ্যা নয়, তা প্রমাণিত হল।



আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পরের দিনই খবরের কাগজে ছাপা হয় তার মৃত্যু-সংবাদ। টেলিফোনে ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী আমায় জানালেন যে 'বউদি'র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান তিনিই সম্পাদন করবেন। পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী আমাকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন। সেই সূত্রেই ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী আমাকে 'দাদা' বলেন। সে-সময় তাঁর বারাণসীতে ও শান্তিনিকেতনে কতকগুলো জরুরী কমিটি-মিটিং ছিল। সেগুলো তিনি বাতিল করে আমার স্ত্রীর শ্রাদ্ধকর্মাদি সম্পন্ন করলেন। শ্রাদ্ধান্তে তিনি একনিঃশ্বাসে 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র আদ্যন্ত পাঠ করলেন। গীতার যে কপিখানি তিনি পাঠ করলেন, স্মারক হিসাবে সেখানি তিনি আমাকে উপহার দিলেন। সেখানার মলাটের ভেতর লিখলেন—'বৌদির শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত গীতার এই কপিখানি আমার শ্রদ্ধেয় দাদা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর মহোদয়কে অর্পণ করলাম।'



ইদানীং কয়েক বছর যাবৎ আমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই একটা বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ হত। আমি বলতাম, আমার মৃত্যু আগে হবে। আমার স্ত্রী বলত, ও আশীর্বাদ আর আমায় কোরো না। তুমি বেঁচে থাকলে, তুমি আমার শ্রাদ্ধাদি রাজকীয়ভাবে করবে—আর আমি যদি শেষে মরি, তা হলে পারিবারিক যা পরিস্থিতি তাতে, আমার শ্রাদ্ধ আঁস্তাকুড়ে হবে, হয়তো আঁস্তাকুড়ের চেয়েও কোন অধম জায়গায়।

ওর এই কথার যথার্থতা উপলব্ধি করলাম, ওর মৃত্যুর পর। আমি নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করতে লাগলাম। ওর মৃত্যুর পরই প্রকাশিত হল আমার 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস'। বইখানা ওকেই উৎসর্গ করেছিলাম। উৎসর্গপত্রে লিখলাম মাত্র একটি বাক্য—'তোমার অভাবে আজ আমি রিক্ত।' আমি যে সত্যই রিক্ত হয়ে গেছি, তা আমাকে জানালেন শান্তিনিকেতন থেকে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন ও বাঁকুড়া থেকে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির পুত্র মুনীন্দ্রকুমার রায়।

আমার স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমার ছেলেমেয়েরা দাবী করল, আমাদের মায়ের সমস্ত গহনা আমাদের ভাগ করে দাও। এককালে আমার স্ত্রীর অনেক গহনা ছিল। তার অধিকাংশই সে দান করে গিয়েছিল। অবশিষ্ট ছিল মাত্র ৪৪ ভরি সোনার গহনা। সেটাই সমান অংশে দুই ছেলে ও মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিলাম।

তারপর দুই ছেলের কাছ থেকে চাপ এল, বসতবাড়িটা আমাদের দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দাও। তাইই দিলাম। তেতলা বাড়ির মাত্র একদিকেই সিঁড়ি ও বাথরুম। দু'দিকে ঘরের সংখ্যাও এক নয়। সেজন্য যে অংশটা আমার ডাক্তার ছেলের অংশে পড়ল, ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে তিনতলা পর্যন্ত তার সিঁড়ি, দোতলা ও তিনতলায় দুখানা অতিরিক্ত ঘর ও ছাদের ওপর একটু ঠাকুরঘর তৈরি করে দিলাম। মেয়ে সুষমাকে বসতবাড়ির কিছু অংশ দিলাম না বলে তাকে দু'কাঠা জমি ও বাড়ি করবার জন্য নগদ টাকা দিলাম। যেখানে জমি কিনে দিলাম, আজ সেখানে জমির দর একলাখ আশি হাজার টাকা করে কাঠা। আর যে নগদ টাকা দিলাম, সেটা চক্রবৃদ্ধিহারে আজ চতুর্গুণের ওপর হয়েছে।

তার পর? তারপর আর কি? নিজে সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে গেলাম। না রইল নিজের বাস করবার মতো কোন নিজস্ব ঘরবাড়ি, না রইল আর কিছু। সর্বহারা হয়ে আজ সুখেই আছি, কেননা ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়!

ՏՏՏ

কেন সুখে আছি, সে-কথা পরে বলব। এখন দেশের কথা কিছু বলতে চাই। মাত্র পশ্চিমবঙ্গেরই কথা বলি। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের পয়লা জুলাই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মারা যান। তারপর প্রফুল্লচন্দ্র সেন এক নতুন কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কিন্তু তাঁর অনুসৃত খাদ্যনীতি জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ায়, ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে তিনি পরাহত হন। তখন অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে এক যুক্ত-ফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী হওয়ায়, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু তা-ও স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। তখন ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অজয় মুখার্জির অধিনায়কত্বে এক বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু মাত্র এক বছরের বেশি এ সরকার স্থায়ী হয় না। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের ১৯ মার্চ তারিখে আবার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে এক ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। কিন্তু ছ'মাস পরে তা ভেঙে পড়ে। তখন আবার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৭০-এর মার্চ মাসে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে এক কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে 'বামফ্রন্ট' দল সাফল্য অর্জন করাতে জ্যোতি বসু 'বামফ্রন্ট' সরকার গঠন করেন। 'বামফ্রন্ট' সরকারই এখনও পর্যন্ত ক্ষমতাসীন আছে।

বামফ্রন্ট সরকার গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনকে আবার চাঙ্গা করে তুলেছে। সেচের উন্নতির জন্য নানা ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তড়িৎশক্তি উৎপাদনের জন্য নতুন শক্তিকেন্দ্রসমূহ স্থাপন করেছে, কিন্তু তড়িৎশক্তির নিষ্ক্রিয়তার ফলে তার সুফল কৃষক বা জনগণ কেউই পাচ্ছে না। হলদিয়ায় নতুন বন্দর নির্মিত হয়েছে। কিন্তু কলকাতা বন্দরের হাল ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। হুগলি নদীর ওপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। কলকাতাকে বেষ্টন করবার জন্য চক্ররেল চালু করা হয়েছে। পাতাল-রেলেও লোক-চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া, ক্রীড়ামোদীদের সুবিধার্থে ইডেন গার্ডেন ও সল্টলেকে স্টেডিয়াম নির্মিত হয়েছে।

কিন্তু এসব বৈষয়িক সম্পদ-বৃদ্ধির অন্তরালে ঘটেছে শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতি, রাজনৈতিক দলাদলি, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, দুষ্কৃতকারীদের কার্যকলাপ, পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা ও নির্যাতন, মধ্যবিত্ত সমাজের অবলুপ্তি, শিক্ষার সংকট, বাঙলায় অবাঙালীর অবারিত আগমন ও কর্মসংস্থানের ওপর তার প্রতিঘাত, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলতা ও নৈতিক শৈথিল্য প্রকাশ। তা ছাড়া, বাঙালির মানবিক সত্তা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। বধূনির্যাতনের ক্রমবৃদ্ধিহার

তার দৃষ্টান্ত। বস্তুত সমকালীন সামাজিক বিশৃঙ্খলতা, মানবিক সত্তার হ্রাস ও নৈতিক শৈথিল্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে বাঙালীর জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির স্বকীয়তা অবক্ষয়ের পথে চলেছে কিনা। অশনে-বসনে, আচার-ব্যবহারে বাঙালী যেমন নিজেকে বহুরূপী করে তুলেছে, তেমনই বর্ণ-চোরা করেছে তার সংস্কৃতিকে। অতীতের গৌরবময় সংস্কৃতির পরিবর্তে এক জারজ সংস্কৃতির প্রাবল্যই লক্ষিত হচ্ছে।

১১১

তখন স্টক একস্‌চেঞ্জে আমার কর্মকাল বছর দশেক হয়েছে। আমার ঘরে এলেন স্টক একস্‌চেঞ্জ কমিটির একজন প্রভাবশালী সদস্য, এরিক গ্রেগরী। তিনি ছিলেন স্টক একস্‌চেঞ্জের ট্রেজারার। আমার ওপর তাঁর অগাধ আস্থা ও অসীম শ্রদ্ধা। এসে বললেন, সুর, অতিরিক্ত বিষয়বস্তু হিসাবে তুমি তো নৃতত্ত্বে এম. এ. পাস করেছিলে? বললাম, হ্যাঁ।

—তবে, তোমাকে আমায় সাহায্য করতে হবে।

—কি বলুন, আপনাকে সাহায্য করবার জন্য আমি সব সময়ই প্রস্তুত।

—স্টক একস্‌চেঞ্জের দু'একজন মেম্বর আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, আমি নাকি ইওরোপীয়ান নই, আরমেনিয়ান, সেজন্য কমিটির সদস্যপদ থেকে আমাকে নামিয়ে দেওয়া উচিত। নৃতাত্ত্বিক তথ্য দিয়ে তোমাকে কমিটির কাছে প্রমাণ করতে হবে যে আমি ইওরোপীয়ান।

যে সময়ের কথা বলছি সে-সময় স্টক একস্‌চেঞ্জ কমিটি গঠিত হত ১৬ জন সদস্য নিয়ে, ৪ জন ইওরোপীয়ান, ৪ জন বাঙালী, ৪ জন মাড়বারী ও ৪ জন অন্যান্য ভারতীয় সম্প্রদায়ের লোক। এরিক গ্রেগরী ছিলেন ৪ জন ইওরোপীয় সদস্যের একজন।

গ্রেগরীকে আমি বললাম, আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনারা আমাকে কমিটির সামনে ডাকলে, আমি এ-সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য পেশ করব।

যথাদিনে আমাকে কমিটির সামনে ডাকা হল। বিশ্বম্ভরনাথ চতুর্বেদী তখন স্টক একস্‌চেঞ্জের প্রেসিডেন্ট। তিনিই আমাকে প্রশ্ন করলেন।

—সুর সাহেব, আপনি তো নৃতত্ত্বের এম. এ., আপনি আমাদের বলুন তো আরমেনিয়ানরা ইওরোপীয়ান, না এসিয়াটিক?

—স্যার, আরমেনিয়া একটা মিথুন দেশ, এর খানিকটা ইওরোপে, খানিকটা এসিয়ায়। সুতরাং কোন ব্যক্তি-বিশেষের নাম না করলে, আমি বলতে পারব না।

তিনি ইওরোপীয়ান, কি এসিয়াটিক।

—এই ধরুন না আমাদের গ্রেগরী সাহেব। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে উনি যখন প্রথম স্টক একসচেঞ্জের সদস্য হন, তখন তালিকাভুক্তির খাতায় উনি ইওরোপীয়ান বলে লেখা আছে। এখন কয়েকজন সদস্য চ্যালেঞ্জ করেছেন যে উনি ইওরোপীয়ান নন।

—তা, পঁচিশ-ত্রিশ বছর পূর্বে স্টক একসচেঞ্জ তো ইওরোপীয়ানগণ কর্তৃক পরিচালিত হত। তাঁরা যখন সে-সময় ইওরোপীয়ান বলে ওঁকে মেনে নিয়েছিলেন তখন এতকাল পরে ও-প্রশ্ন তোলবার কোন মানে হয় না।

—না, সুর সাহেব, আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই, নৃতত্ত্ব এ-সম্বন্ধে কি বলে।

—দেখুন, উনি ইওরোপীয়ান কি এসিয়াটিক, এটা তো মোটেই নৃতাত্ত্বিক প্রশ্ন নয়। এটা সম্পূর্ণ ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ব্যাপার।

—কি রকম ?

—দেখুন নৃতত্ত্বে ইওরোপীয়ান বা এসিয়াটিক বলে কোন জাত নেই। যারা বংশানুক্রমে ইওরোপে বাস করে এসেছে, তারাই ইওরোপীয়ান, আর যারা এসিয়ার অধিবাসী তারা এসিয়াটিক, তা তাঁরা যে-কোন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর (race) লোক হন না কেন। পুরুষানুক্রমে গ্রেগরী সাহেবের পরিবার যখন ইংলন্ডে বাস করে এসেছেন এবং এখনও বাস করছেন, তখন ওঁরা তো ইওরোপীয়ানই হবেন।

—আপনি কোন একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের মনের সংশয় দূর করতে পারেন ?

—হ্যাঁ, তা পারব না কেন। এই ধরুন না, আইনস্টিন-এর কথা। আইনস্টিন তো ইহুদী। ইহুদীদের তো মাতৃভূমি এসিয়ায়। তা আইনস্টিনকে আপনারা কি এসিয়াটিক বলবেন ?

আমার কথা শুনে, কমিটির সদস্যগণ সহর্ষে হাততালি দিয়ে 'সাবাস্' বলে উঠলেন। গ্রেগরীর সেদিন হল জয়জয়কার। পরে আমার ঘরে এসে উনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে, করমর্দন করে গেলেন।

গ্রেগরীর বিপক্ষে অভিযোগটা মাত্র স্টক একসচেঞ্জের গন্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। ক্লাইভ স্ট্রীটের সাহেবমহলেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সকলেই বলতে লাগল, এজন্যই চ্যাপমান মর্টিমার সাহেব বলতেন যে ক্লাইভ স্ট্রীটের চারজন চালাক লোকের মধ্যে এ. কে. সুর একজন।

১১১

এর পর হল আমার বিপদ। ক্লাইভ স্ট্রীটের সাহেবরা আমার কাছে নিয়ে আসতে লাগলেন এক একটা নৃতাত্ত্বিক প্রশ্ন। একবার বার্ড-হিলজারস্-এর দুই সাহেবের মধ্যে হয়েছে ভীষণ তর্ক—পৃথিবীতে আবির্ভাবের সময় মনুষ্যসমাজে অজাচার (sexual promiscuity) ছিল কিনা। আমি বললাম, না। তখন ও'দের মধ্যেএকজন বললেন, আপনি কি মরগ্যান, ম্যাকলেনান প্রমুখদের বই পড়েননি ? ও'রা তো বলেছেন যে গোড়ার দিকে মনুষ্যসমাজে প্রাণিজগতের অন্যান্য জীবের ন্যায় অজাচারই প্রচলিত ছিল। বললাম, নৃতত্ত্বের ছাত্র হিসাবে ওসব বই-ই আমার পড়া আছে। ও'দের মতবাদ যে ভুল, তা ওয়েস্টারমারকের 'হিস্ট্রি অভ্ হিউম্যান ম্যারেজ' বইখানা পড়লেই বুঝতে পারবেন। আমাদের মহাকাব্য মহাভারতেও উল্লিখিত আছে যে মানুষ গোড়া থেকেই পরিবার গঠন করে বাস করত। তারপর ওই 'পরিবার'কে সামাজিক স্বীকৃতি দেবার জন্য শ্বেতকেতু বিবাহপ্রথার উদ্ভাবন করেন।

সাহেবরা অন্য কাজে নিয়তই আমার কাছে আসেন, এবং কাজ শেষ হয়ে গেলে আমার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

১১১

প্রায় পনেরো বছর পরেকার কথা। বন্ধুবর অধ্যাপক নির্মল বসু তখন ভারতের নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষার অধিকর্তা হয়েছেন। সমীক্ষার একখানা সরকারী মুখপত্র আছে, নাম 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া'। নির্মল বসু আমাকে অনুরোধ করলেন, আমার 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া'র জন্য আপনি আমাকে 'Sex and Marriage in the Age of the Mahabharata' সম্বন্ধে একটা নিবন্ধ দিন। একটা দীর্ঘ নিবন্ধ লিখলাম। সেটা 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া'য় ছাপা হল। প্রবন্ধটা সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। স্পেন থেকে একজন নৃতত্ত্ববিদ অনুরোধ করে পাঠালেন, আমাকে ওটা স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করতে দিলে আমি বাধিত হব। অনুরূপ অনুরোধ এল ইটালি থেকে, ওটা ইটালিয়ান ভাষায় অনুবাদ করবার জন্য। এদিকে নির্মলবাবুকে অনুরোধ করায়, নির্মলবাবু ওই প্রবন্ধের ৫০ খানা offprint দিলেন। সেগুলো আমি আমার ক্লাইভ স্ট্রীটের বন্ধুমহলে বিতরণ করলাম। প্রবন্ধটা পড়ে সকলেই মুগ্ধ হয়ে আমাকে চাপ দিল, আমি যেন ভারতের হিন্দু, মুসলিম ও আদিবাসী সমাজের বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে একখানা পূর্ণাঙ্গ বই লিখি, কেননা এ-সম্বন্ধে কোন ভাষায় কোন বই নেই। সকলকেই বললাম, দেখছেন তো, উপস্থিত আমি আমার ছেলের খুনের মামলায় বিব্রত আছি। মামলা চুকলেই আমাকে স্টক একসচেঞ্জের

হীরক-জয়ন্তীর স্মারকগ্রন্থ লেখার কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। তারপর আমি স্টক একস্‌চেঞ্জ থেকে অবসরগ্রহণ করব। তখন আমি সময় পাব ও-রকম একখানা বই লেখবার।

১১১

স্টক একস্‌চেঞ্জ থেকে অবসরগ্রহণের পরই আমি আমার 'Sex and Marriage in India : An Ethnohistorical Survey' বইখানা লিখলাম। বইখানা লেখা শেষ হলে, সিদ্ধান্ত করলাম যে ভারতের কোন বিশিষ্ট প্রকাশককে দিয়ে ওখানা প্রকাশ করাব। তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রকাশন-সংস্থা ছিল বোম্বাইয়ের 'এসিয়া পাবলিশিং কোম্পানি'। তাঁদের কাছেই পাণ্ডুলিপিটা পাঠিয়ে দিলাম। ও'রা সঙ্গে সঙ্গেই বইখানা ছাপার কাজ শুরু করে দিলেন। ছয়-সাত ফরমার প্রুফ যখন দেখা হয়ে গিয়েছে, তখন একটা সংবাদ শুনে মনটা খুব অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। সংবাদ পেলাম যে এসিয়া পাবলিশিং এক জটিল আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছে। একটা অছিলা করে, ওদের বাকী পাণ্ডুলিপি কম্পোজ করতে মানা করে দিলাম। তখন বোম্বাইয়ের অকস্‌ফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস ও দিল্লীর অ্যালায়েডপ াবলিশার্সকে লিখলাম, ও'রা ও রকম কোন বই ছাপবেন কিনা। অ্যালায়েড-এর কাছ থেকেই প্রথম ইতিবাচক উত্তর পেলাম। সুতরাং ওদের দেওয়াই সাব্যস্ত করলাম। কিন্তু 'এসিয়ার' সঙ্গে তো আমার কনট্রাকট্ রয়েছে, সুতরাং 'অ্যালায়েড'-এর সঙ্গে দ্বিতীয়বার কনট্রাকট্ করি কি করে? খুব মোলায়েম ভাষায় 'এসিয়া'কে এক চিঠি লিখলাম। জানালাম যে তাঁদের আর্থিক দুর্যোগের কথা আমি শুনেছি, সুতরাং আমার সঙ্গে কনট্রাকট্ পালন করা যদি তাঁদের পক্ষে embarrassing হয়, তো তাঁরা কনট্রাকট্‌টা নাকচ করে দিতে পারেন। তাঁরা আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেন। আমিও মুক্তি পেয়ে গেলাম। 'অ্যালায়েড'-এর সঙ্গে নতুন কনট্রাকট্ করলাম। যেহেতু আমি কলকাতায় থাকি, প্রুফ পড়ার সুবিধা হবে বলে ও'রা পাণ্ডুলিপিটা ও'দের কলকাতা অফিসের ম্যানেজার শ্রীযুত মানেক-তালার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, এখানকার কোন ছাপাখানাকে দিয়ে ছাপাবার জন্য। এখানে বলে নিই, দিল্লীতে 'অ্যালায়েড'-এর নিজের বিরাট ছাপাখানা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার সুবিধার জন্য ও'রা বইটা কলকাতায় ছাপাবার ব্যবস্থা করলেন।

ছাপাবার ব্যবস্থা হল কলকাতার এক বিশিষ্ট মুদ্রণ-সংস্থার সঙ্গে। নাম 'দি ইস্ট-এন্ড প্রিন্টারস্'। তা দেখে আমি খুব সন্তুষ্ট হলাম। কেননা, ইস্ট-

এন্ড প্রিনটারস্‌-এর মালিক পি. কে. ঘোষ ছিলেন একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি। তিনি আগে এক কলেজের কৃতী ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। পরে অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চিন্তা করলাম, তাঁর ছাপাখানায় বইখানা যে মাত্র নির্ভুল ছাপা হবে, তা নয়, যদি কোন জায়গায় ইংরেজি ভাষার কোন আড়ষ্টতা থাকে, তাহলে তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। হলও ঠিক তাই। সম্পূর্ণ কমপোজ্‌ করা বইখানা হাতে করে একদিন পি. কে. ঘোষ আমার 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে এসে হাজির হলেন। প্রথমেই আমাকে অভিনন্দন জানালেন, ও-রকম একখানা বই লেখবার জন্য। তারপর বইখানার দু'-এক জায়গার ভাষা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। আমি দেখলাম, উনি ঠিকই ধরেছেন। দু'-একটা শব্দ ওইসব জায়গায় যোগ করে দিলে, বক্তব্য ভাবটা আরও সরল হয়। আমি তাই করে দিলাম।

বইখানা সাগ্রহে গ্রহণ করল দেশবিদেশের পাঠক। কলকাতার 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা বইখানার প্রশংসা-মুখরিত সমালোচনায় লিখল : 'The beauty of the book is its language'। হুইহুই করে বইখানা বিক্রি হতে লাগল, বিশেষ করে বিদেশে।

আমার বাঙালী বন্ধুরা ধরে বসল, ওই বইখানার ভিত্তিতে একখানা বাংলা বই লেখার জন্য। সঙ্গে সঙ্গেই লিখে ফেললাম। নাম দিলাম 'ভারতে বিবাহের ইতিহাস'। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কানাইলাল সরকারের নির্দেশে মনোরঞ্জন মজুমদার বইখানা প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন 'রূপা'কে দিয়ে। ইংরেজি বইখানা প্রকাশের সময় যে বিভ্রাট ঘটেছিল, এখানারও তাই হল। 'রূপা' যখন বইখানার দু'তিন ফরমা ছেপে ফেলেছে, তখন 'আনন্দ পাবলিশারস্‌' এর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। বইখানা ও'রা ছাপতে চান। মনোরঞ্জনবাবুর শরণাপন্ন হলাম। মনোরঞ্জনবাবু 'রূপা'র মালিক মেহেরাকে অনুরোধ করে বইখানা ও'দের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন। কিন্তু 'আনন্দ পাবলিশারস্‌' অযথা বইখানা ছ'মাস যাবৎ ফেলে রাখায়, আমি পাণ্ডুলিপিটা ফেরত চাইলাম। এ-সময় মনোরঞ্জনবাবু নিজে একটা প্রকাশন সংস্থা স্থাপন করলেন, নাম 'শঙ্খ প্রকাশন'। 'শঙ্খ প্রকাশন'ই বইখানা প্রকাশ করল। ছ'মাসের মধ্যে বইখানার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে গেল। প্রথম প্রকাশের সময় থেকে এগারো মাসের মাথায় বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুল। তারপর বইখানা অমুদ্রিত অবস্থাতেই পড়ে ছিল। এদিকে কলেজ স্ট্রীটের বইওয়ালারা আমার ওপর চাপ দিতে লাগল, বইখানার তৃতীয় সংস্করণ বের করবার জন্য। অনেকগুলো নতুন অধ্যায় যোগ করে বইখানার একটা পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ তৈরি করলাম। সেখানা এখন 'আনন্দ

শতাব্দীর প্রতিধ্বনি

পাবলিশার্স'ই ছাপছে।

১১১

এরই মধ্যে (১৯৭০) সংস্পর্শে এলাম এক উদ্যোগী প্রকাশকের সঙ্গে। 'ইন্ডিয়ান পাবলিকেশনস্'-এর শঙ্কর সেনগুপ্তের সঙ্গে। উনি খুবই আগ্রহী আমার বই ছাপবার জন্য। শঙ্করবাবু আমার দু'খানা বই বের করলেন। ১৯৭০ সালে 'Dynamics of Synthesis in Hindu Culture' ও ১৯৭০ সালে 'Folk Elements in Bengali Life'। আন্তর্জাতিক নৃতাত্ত্বিক মহলে বই দু'খানা বিশেষ সমাদর লাভ করল।

ইতিমধ্যে একখানা বাংলা বই-ও বের করলাম, নাম 'কালের কড়চা'। বইখানা 'শতাব্দীর প্রতিধ্বনি'রই অগ্রদূত। কলকাতার এক পুস্তক-বিপনন-সংস্থা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে বই সরবরাহ করে। তারা একখানা চিঠি লিখে আমাকে জানাল যে ইওরোপের বারোটা বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে বাংলাভাষার পঠন-পাঠন হয়, তারা আমার বইখানা কিনেছে। বাংলায় লিখিত বইয়ের এটা সৌভাগ্য বলেই মনে করলাম। ঠিক এই সময়েই আমার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটল।

১১২

আমি আগেই বলেছি যে-বৎসর আমার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটল, তার আগের বছরেই (১৯৭০) দেওঘরে গিয়ে আমার স্ত্রী অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছিল। সুতরাং সে-বৎসর দেওঘরে আমার মনটা ছিল খুব ভাল। সেজন্য শান্তিনিকেতনের আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন কর্তৃক অনুরুদ্ধ একটা কাজ শেষ করবার সিদ্ধান্ত নিলাম। যে বইখানা লিখতে আরম্ভ করলাম, তার নাম 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস'। ওই বইখানার ভূমিকাতেই বইখানার ইতিহাস দিয়েছি। সেই ইতিহাসের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাবার জন্য, আমি ওটা এখানে উদ্ধৃত করছি। "১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে আমি ইংরেজিতে 'বাঙলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি' নামে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করি। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর এক কৃতী ছাত্রকে বইখানির বাংলা অনুবাদ করতে অনুরোধ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সে অনুরোধ রক্ষিত হয়নি। পরে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার রীডার ডক্টর নীলরতন সেন মহাশয় আমাকেই এ-কাজটা সম্পন্ন করতে বলেন। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে আমি যখন দেওঘরে

ছিলাম, সে সময় বইখানির সাংস্কৃতিক অধ্যায়সমূহ অবলম্বনে বর্তমান গ্রন্থখানি রচনা করি।”

কিন্তু দেওঘর থেকে আসবার পর পারিবারিক ঝঞ্ঝাট ও পরে স্ত্রীর অসুখে বিব্রত হয়ে পড়ায় বইখানির পাণ্ডুলিপির আর কোন সদ্গতি হয়নি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সঙ্কল্প করেছিলাম, আর সাংসারিক আবর্তের মধ্যে জড়িয়ে থাকব না। আমার তো সবই শেষ হয়ে গেল, এবার আমি সংসার থেকে বিদায়গ্রহণ করব। মৃত্যুর পূর্বে আমার স্ত্রীরও সেই সঙ্কল্প ছিল। আমরা ঠিক করেছিলাম, আমরা সংসার থেকে দূরে বাইরে কোন জায়গায় গিয়ে বসবাস করব। কিন্তু নিয়তির বিধান কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না। সেজনাই ইংরেজিতে বলা হয় : Man proposes God disposes। আমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। সাংসারিক নরককুণ্ডের মধ্যে আর থাকব না, এই সিদ্ধান্ত করেই আমার কর্মস্থল ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ অফিসে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। কথাটা কোনক্রমে অশোকবাবুর কানে গেল। তিনি একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমি গেলাম। আমাকে অনেক বুঝিয়ে আবার অফিসে আসতে বললেন। সেখানে বসা ছিল সন্তোষ ঘোষ, নীরেন চক্রবর্তী ও নিখিল সরকার। ওদের সম্বোধন করে উনি বললেন, আমার ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ অফিসে অতুলবাবুর মতো পণ্ডিতলোক আর দ্বিতীয় নেই। ‘রবিবাসর’-এর সম্পাদক সন্তোষ দে-ও একবার আমাকে বলেছিল যে, ‘রবিবাসর’-এর অধিবেশনেও তিনি প্রায় এ-কথা বলতেন।

যাই হোক, ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ অফিসে আবার যেতে আরম্ভ করলাম। সকলের চেয়ে বেশি খুশী হল নকুল চট্টোপাধ্যায় ও হামদি বে। এদের কথা আমি পরে বলব। উপস্থিত ‘বাঙলার সামাজিক ইতিহাস’ প্রকাশের কথা বলি।

১১১

‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ অফিসে আবার আসা-যাওয়া করছি। একদিন চারতলার করিডরে মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে দেখা হল। এতদিন স্ত্রীর মৃত্যুশোকের প্রতিঘাতে ‘বাঙলার সামাজিক ইতিহাস’-এর পাণ্ডুলিপির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। মনোরঞ্জনবাবুকে দেখে সেটা মনে পড়ল। ওটার প্রকাশ সম্বন্ধে মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে কথা বললাম। মনোরঞ্জনবাবু বললেন, ও-জাতের বই কলেজ স্ট্রীটে মাত্র একজন প্রকাশকই বের করেন, আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। মনোরঞ্জনবাবু তাঁর নাম-ঠিকানা দিলেন : ‘শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড, জিজ্ঞাসা, ১১ কলেজ রো’। বললেন, তবে দেখা করতে যাবেন দুটোর পরে। দুটোর আগে উনি দোকানে আসেন না।

তার পরের দিনই গেলাম। তিনতলায় ও'র দোকান-ঘরে ঢুকেই বাঁ-দিকের একটা ছোট ভাঙা টেবিলে একজন ৬০/৬৫ বছর বয়সের লোককে দেখলাম। ও'কে দোকানের কোন কর্মচারী ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, শ্রীশবাবু কোথায় বসেন? আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

তিনি বললেন, আমার নামই শ্রীশকুমার কুণ্ড। আপনার কি দরকার বলুন।

ও'র হাতে পাণ্ডুলিপিটা দিয়ে বললাম, আমি এই বইখানা আপনার সংস্থা থেকে বের করতে চাই। পাণ্ডুলিপির ওপর আমার নামটা দেখেই উনি আমার মুখের দিকে একবার তাকালেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিই কি অতুল-বাবু?

হ্যাঁ।

—আপনি তো অনেক বই লিখেছেন?

—হ্যাঁ।

তারপর উনি আমাকে বললেন, আমি পাণ্ডুলিপিটা একবার পড়ে দেখি। সামনের সপ্তাহে আপনি একবার অনুগ্রহ করে আসবেন, আপনাকে জানাব, আমরা বইখানা প্রকাশ করব কিনা।

তিনদিনের দিন সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ফিরে বিশ্রাম করছি, টেলিফোনটা বেজে উঠল।

—কে বলছেন?

—আমি শ্রীশকুমার কুণ্ড বলছি।

—বলুন, কি সংবাদ।

—আপনার বইটা আমরাই বের করব। আপনি একবার সুবিধামতো সময়ে আমার সঙ্গে এসে দেখা করবেন।

পরের দিনই 'জিজ্ঞাসা' অফিসে গেলাম। আমাকে দেখেই শ্রীশবাবু ও'র আসন থেকে উঠে আমার পায়ের ধুলো নিলেন। বাধা দিতে গেলাম, বললাম, এ কি করছেন! বললেন, এতদিন আপনার নামই শুনে আসছিলাম, আপনি যে এত-বড় পণ্ডিত তা আমার ধারণাই ছিল না, আপনার সংস্পর্শে এসে আমি কৃতার্থ বোধ করছি, আমি ধন্য।

বইখানা 'জিজ্ঞাসা' থেকেই বেরুল। চতুর্দিক থেকে সমাদর পেলাম। সংবাদ-পত্রসমূহে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরুল। বইখানা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হল। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। ও'রা সমাজতত্ত্বভিত্তিক একখানা বই প্রকাশ করছেন, তাতে পূর্ণস্বীকৃতির সঙ্গে আমার 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস'-এর একটা অধ্যায় সংযুক্ত করতে চান, সে কারণে অনুমতির জন্য।

বইখানা পড়ে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় মুগ্ধ হলেন। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাকে টেলিফোন করলেন। বহুকাল পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। উনি তখন ন্যাশনাল লাইব্রেরির ডিরেকটর। ওখানে একদিন আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। গেলাম। তিনি আমাকে পেয়ে অভিভূত। বহুদিনের পুঞ্জীভূত ভাবনা-চিন্তার আদান-প্রদান হল। আন্তরিক হৃদ্যতার সঙ্গে আপ্যায়ন করলেন। তারপর একখানা ট্যাকসি ডাকিয়ে আমার সঙ্গে জাতীয় গ্রন্থাগারের সিঁড়ি দিয়ে রাস্তা পর্যন্ত নেমে এলেন, আমাকে ট্যাকসিতে তুলে দেবার জন্য।

একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটল। এত শিগ্‌গির কি করে ডাকে চিঠি এল, বুঝতে পারলাম না। পরের দিন সকালেই বাড়িতে একখানা চিঠি পেলাম। নীহারের লেখা চিঠি। নীহার লিখেছেন—

প্রিয়বরেষু

বহুদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হলো; শুধু দেখা নয়, নিজেদের সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ স্মৃতিরোমন্থন করার সুযোগ হলো। পুরানো দিনের স্মৃতিভারে কিছুটা মন্থরতা উপভোগ করলাম আপনি চলে যাবার পরও বেশ কিছুক্ষণ।

কিন্তু অবাক্ মেনেছি আপনার নিষ্ঠায়, আপনার বুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চার সততায়। যে-ভাবেই হোক, যে-কারণেই হোক, আমাদের সমপর্যায়ের সমগোত্রীয় হওয়া সত্ত্বেও আপনি শিক্ষা ও গবেষণার পথে পা বাড়াননি, যেমন প্রবোধ ও আমি করেছিলাম। আপনি গিয়েছিলেন সাংবাদিকতার পথে; আমিও গিয়েছিলাম সেই পথে, এবং দীর্ঘ আট বৎসর সেই পথে বিচরণ করেছিলাম। কিন্তু তা একান্তই দ্বিতীয় আশ্রয় হিসাবে; শিক্ষকতা ও গবেষণার কাজটাই ছিল মুখ্য। আপনি পুরোপুরি, সূচনায় এবং পরিণতিতেও সাংবাদিক। অথচ সাংবাদিকতার একান্ত সাময়িকতার কেন্দ্রে বসেও আপনি সর্বদা পরম নিষ্ঠায় নিয়মিতভাবে নিজস্ব নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে গভীর অভিনিবেশে লেখাপড়া গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন, আজও যাচ্ছেন। পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই, আত্মপ্রচার নেই, নীরবে বাঙলা দেশ ও বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস আপনি উদ্ঘাটিত করে চলেছেন, নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্বের আলোকে। এমন নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়, এমন সততা ও অভিনিবেশ বড় একটা দেখা যায় না। আপনি আমার মত অনেকেরই শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন, আপনার কর্মের দ্বারা।

সম্প্রতি আপনার 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' ও 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস' বই দুখানা পড়লাম। খুব ভালো লাগল একথা বললে কিছুই বলা হলো না। প্রথম বইখানা ছোটো, কিন্তু এই স্বল্পপরিসরে আপনি বাঙালীর যে নৃতাত্ত্বিক পরিচয় তুলে ধরেছেন, সে পরিচয় আমি আর কোথাও পাইনি। আপনার বস্তুভিত্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, সহজ প্রাঞ্জল ভাষা, অধীত বিদ্যার প্রসার ও বক্তব্যের সুস্পষ্টতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। এ-বই পড়লে শুধু ছাত্ররাই নন্, পণ্ডিতেরাও উপকৃত হবেন।

আপনি সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকুন, এই প্রার্থনা করি।

প্রীত্যভিবাদনান্তে ইতি --

প্রীতিবন্ধ
নীহাররঞ্জন রায়

এদিকে শান্তিনিকেতন থেকে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন লিখলেন—

প্রীতিভাজনেষু

...আপনাকে আমার আন্তরিক আনন্দ, অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর কামনা করছি আপনার সুদীর্ঘ ও সুস্থ কর্মজীবন। আপনি আপনার অনলস জীবনে যে কীর্তি অর্জন করেছেন, আমাদের দেশে তার তুলনা নেই বলা চলে, থাকলেও অতি বিরল। আপনার কর্মক্ষেত্রও সুবিস্তৃত। আপনার জ্ঞানচর্চার বিষয়ও বিচিত্র। এত বিভিন্ন বিষয়ে আপনার সমান অধিকার দেখে আমার বিস্ময় বোধ হয়। সব বিষয়ে আপনার এমন ক্ষিপ্র লিপিদক্ষতাও কম বিস্ময়কর নয়। ইংরেজি ও বাংলায় আপনার লেখনী চালনার সমান অধিকার দেখে আপনাকে 'সাহিত্যের সব্যসাচী' নামে অভিহিত করা চলে।

...যখন আপনার যে বই পড়ি, তাতেই বিস্ময় বোধ করি। সব সময় সে কথা আপনাকে জানাবার সুযোগ পাই না। তাতে মনে গ্লানিবোধও হয়। কিন্তু নিরুপায় হয়ে সে গ্লানিও সয়ে যেতে হয়। আমার একটা ক্ষোভের বিষয় এই যে, আপনি তো অবিরাম কাজ করেই চলেছেন, কিন্তু আপনার প্রতিভার এখনও যথেষ্ট খ্যাতি হয়নি। আমি জানি আপনি খ্যাতির কাঙাল নন। হবেনই বা কেন ? কিন্তু তাতে তো দেশেরই ক্ষতি। অমূল্য ধন হাতে পেয়েও যে তার মূল্য বোঝে না, ক্ষতি তো তারই। দেশের এই ক্ষতিটা অবশ্যই শোচনীয়। আপনার কাছে আমার একটা প্রত্যাশা বা অনুরোধও আছে। বাংলাদেশের একটা প্রাগৈতিহাসিক বিবরণ চাই আপনার কাছ থেকে। আপনি ছাড়া, আর কে করবে এই কাজ ? আর কার আছে এতখানি দক্ষতা ও অধিকার ?

এবার বিদায় নেবার সময় হয়েছে। তাই কর্মের জাল গুটিয়ে আনবার চেষ্টা করছি। আর কামনা করছি বন্ধু ও বন্ধু সকলের প্রীতি। তাই হবে আমার মহাযাত্রার পাথেয়। আবার জানাচ্ছি আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভকামনা।

ইতি—

প্রীতিমুগ্ধ

প্রবোধচন্দ্র সেন

এসব চিঠি পড়ে, মনে জেগে উঠল আমাদের ছাত্রজীবনের কথা। মনে হল, আমরা আবার চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার দিনে ফিরে গিয়েছি!

একবার একখানা চিঠিতে উনি লিখলেন 'আমার অনেক গুরু, তাঁদের মধ্যে বোধ হয় আপনার স্থানই সর্বোচ্চে'।

১১১

'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস' এর অসাধারণ সাফল্য শ্রীশবাবুর মনে দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করল যে যদিও উনি এপর্যন্ত দু-তিনশো নিবন্ধের বই প্রকাশ করেছেন, তা হলেও ওঁর 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনকে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্য আমার লেখা বই প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীশবাবুর ওখানে আমি যাই-আসি। আমাদের উভয়ের মধ্যে এক নিবিড় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে। আমার প্রতি ওঁর পরম আস্থা, পরম শ্রদ্ধা। ওঁর সান্নিধ্যে এসে আমিও উপলব্ধি করেছি যে, চারিত্রিক গুণের দিক দিয়ে শ্রীশবাবুর মতো লোক জগতে খুব বিরল। শিষ্টতা, সরলতা ও সততার তিনি ছিলেন একজন মূর্ত প্রতীক। আমার জীবনকালের মধ্যে আমি যে ক'জন অতি বিরল মুখোস-হীন লোকের সংস্পর্শে এসেছি, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর, শোকসন্তপ্ত মানসিক অবস্থার মধ্যে এরকম একজন মহাজনের সংস্পর্শে এসে আমি পরম সুখ লাভ করলাম। শ্রীশবাবু আমার সঙ্গে যে মাত্র ওঁর দোকানপাটের বিষয়েই আলোচনা করেন, তা নয়। তিনি তাঁর পারিবারিক জীবনের অনেক জটিল সমস্যার বিষয়ে নিয়েও আলোচনা করেন। এক কথায়, আমরা দু'জনে এক মন এক প্রাণ হয়ে উঠলাম। পরবর্তীকালে তিনি যখন অসুস্থ অবস্থায় দু'বার হরিদ্বারে গিয়ে বাস করেছিলেন, এবং আরও পরে কলকাতার মিলিটারী হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন তিনি আমাকে সে-সব জায়গা থেকে যে-সব চিঠি লিখতেন, সেগুলিই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মুখোসধারী মানুষ কর্তৃক অধিকৃত এই জগতেও কোন কোন ব্যক্তি যে কত বড়, কত মহৎ হতে

পারে, তার প্রমাণস্বরূপ আমি তাঁর লিখিত এইসব পত্রগুলি সযত্নে সংরক্ষণ করেছি।

১১১

একদিন শ্রীশবাবু কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'বিশ্বভারতী' কর্তৃক প্রকাশিত আপনার 'টাকার বাজার' বইখানা তো বহুদিন যাবৎ অমুদ্রিত অবস্থায় রয়েছে, অথচ বইখানা তো এযাবৎকাল বি. কম.-এর ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হয়ে চলেছে। তা ছাত্রসমাজের উপকারার্থে বইখানার পুনর্মুদ্রণ বা দ্বিতীয় সংস্করণ বের করলে কি রকম হয়? ও'রা যদি না ছাপেন, আমি ও'দের কাছ থেকে অনুমতি সংগ্রহ করে বইখানা ছাপতে পারি। আমি বললাম,

—বইখানা, শ্রীশবাবু, ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর টাকার বাজারের এমন আমূল পরিবর্তন ঘটেছে যে বইখানার পুনর্মুদ্রণ একটা হাস্যকর ব্যাপার হবে। বইখানা এখন বের করতে হলে, ওখানা নতুন করে লিখতে হবে। কিন্তু নতুন করে লেখবার মতো সামর্থ্য আমার এখন নেই। কেননা 'টাকার বাজার' ৭৪ পৃষ্ঠার বই হলেও, ওটা লেখবার জন্য আমাকে আড়াই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে।

—কি রকম?

ওই বইখানাতে টাকার বাজারের কর্মপ্রণালীর বর্ণনা দেবার জন্য, আমাকে দেশী ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের ম্যানেজারদের অনুমতি নিয়ে প্রতি ব্যাংক-কর্মীর পাশে প্রত্যহ দু-একঘণ্টা করে বসে, কি-ভাবে ব্যাংকের প্রতিটি কার্য সমাধা হয়, তা নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে। তা ছাড়া, মুহূর্তের মধ্যে কি-ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্কের চেক 'ক্লিয়ারড্' হয়, তার বর্ণনা দেবার জন্য আমাকে দিনের পর দিন তৎকালীন কলকাতার দুই ক্লিয়ারিং সংস্থার—ক্যালকাটা ক্লিয়ারিং হাউস ও মেট্রোপলিটান ক্লিয়ারিং হাউস—ক্লিয়ারিং-হলে বসে ওদের কার্যপ্রণালী দেখতে হয়েছে। বইখানার নতুন সংস্করণ বের করতে হলে, এসবই আমাকে পুনরায় করতে হবে। সে-সময়কার শক্তি এ-বুড়ো-বয়সে আমার আর নেই।

—তা, বিকল্প আর কোন বই লেখার কথা ভেবেছেন?

—হ্যাঁ, ভেবেছি। বর্তমানে আমাদের দেশে শিল্পোদ্যম যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পোদ্যম রূপায়ণের জন্য মূলধনের বাজার থেকে কি-ভাবে অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে 'ভারতে মূলধনের বাজার' সম্বন্ধে একখানা বই লেখবার ইচ্ছা আছে।

—তবে তাই লিখে ফেলুন। আমি কিছুদিন যাবৎ ভাবছি যে বিশ্বভারতীর 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' সিরিজের প্রকাশনে তো একটা মন্থরতা এসেছে, আমি 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশন সংস্থা থেকে ও-রকম একটা সিরিজ বের করব।

সেদিন এ-সম্বন্ধে আর বেশি কথা হল না, কেননা আকাশ কালো ঘনমেঘে ঢেকে গিয়েছে—বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখে, আমি বেরিয়ে পড়লাম।



ও-সম্বন্ধে দ্বিতীয় দিনের কথা। ঠিক করা হল ওই সিরিজের নাম দেওয়া হবে—'বিচিত্রবিদ্যা গ্রন্থমালা'। নামটা অনুমোদন করলেন আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন ও ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। শ্রীশবাবু বললেন, আপনার 'ভারতে মূলধনের বাজার' দিয়েই ওই গ্রন্থমালার পত্তন করা হবে। আমি বললাম, আপনার ব্যবসায়িক স্বার্থের দিক থেকে সেটা ঠিক হবে না। আপনি সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু দিয়ে গ্রন্থমালাটার গোড়াপত্তন করুন। সুনীতিবাবু, সুকুমারবাবু প্রমুখদের পূর্ব-প্রকাশিত লেখার পুনর্মুদ্রণ করে নতুন নাম দিয়ে গ্রন্থমালাটা শুরু করুন। আমার লেখা তো আছেই, ও পরে বেরুবে।

ইতিমধ্যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে আমার সহকর্মী কানাইলাল বসু তার কাছে সংরক্ষিত আমার লেখা এক বইয়ের একখানা কপি আমাকে প্রত্যর্পণ করল। কোন্ মান্ধাতার আমলে বইখানা লিখেছিলাম, আমি নিজেই ভুলে গিয়েছিলাম। বইখানার নাম 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়'। শ্রীশবাবু তো বই-খানা পেয়ে খুব খুশী। বললেন, আপনার এই বইখানাই আমি 'বিচিত্রবিদ্যা গ্রন্থমালা'য় আগে বের করব।

'বিচিত্রবিদ্যা গ্রন্থমালা' প্রকাশ শুরু হয়ে গেল। প্রথম বই বেরুল সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সংস্কৃতি-শিল্প-ইতিহাস', দ্বিতীয় প্রবাসজীবন চৌধুরীর 'ঈশ্বর সন্ধানে', তৃতীয় আমার 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়', চতুর্থ সুকুমার সেনের 'রামকথার প্রাক্-ইতিহাস' ও পঞ্চম ভবতোষ দত্তের 'অর্থনীতির পথে'। প্রথম পাঁচখানা বই বেরুবার পর শ্রীশবাবু বইগুলি সমালোচনার জন্য সংবাদপত্রে পাঠালেন। সমালোচনা করতে গিয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার দাস বললেন, গ্রন্থমালার বইগুলি সব এক আদর্শে রচিত হয়নি এবং ওই গ্রন্থমালার আদর্শ হওয়া উচিত অতুল সুরের 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়'। 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়'-এর যে গুণ ডক্টর শিশিরকুমার দাসকে আকৃষ্ট করেছিল, ঠিক সেই গুণেই বইখানাকে আকৃষ্ট করল বঙ্গীয় পাঠকসমাজের

কাছে। আজ পর্যন্ত 'বিচিত্রবিদ্যা গ্রন্থমালা'য় চৌত্রিশ খানা বই বেরিয়েছে, কিন্তু আমার বইখানিই একমাত্র বই যার তিনটা সংস্করণ হয়েছে, এবং প্রতি সংস্করণেই প্রথম সংস্করণের দ্বিগুণ-সংখ্যক বই ছাপা হয়েছে। তা ছাড়া, আমিই একমাত্র লেখক যার চারখানা বই ওই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও, ওই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের বইয়ের ভূমিকাও আমি লিখেছি। 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' ছাড়া, আমার যে-সব বই ওই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে—'ভারতে মূলধনের বাজার', 'বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর' ও 'সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও অবদান'। সব বইগুলিই অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তার মধ্যে 'বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়ে গেছে, এবং অন্যগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ অপেক্ষমাণ। এখানে একটা কথা বলে নিই। আমার বই ছাড়া, 'বিচিত্রবিদ্যা গ্রন্থমালা'য় আর কোন বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ এখনও বেরোয়নি।

'বিচিত্রবিদ্যা গ্রন্থমালা'র পরিকল্পনায় শ্রীশবাবুর দূরদর্শিতা সম্বন্ধে একটা কথা এখানে বলতে চাই। ১৯৭০ সালের কথা। আমি দেওঘর যাচ্ছি। যাবার আগে একবার শ্রীশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেছি। শ্রীশবাবু বললেন, আগামী বছর তো বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর পূর্তি হচ্ছে, তা ওই উপলক্ষে আমাদের 'বিচিত্রবিদ্যা গ্রন্থমালা'র জন্য বাংলা মুদ্রণের দুশো বছরের একখানা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখুন না। দেওঘর যাচ্ছেন, হাতে সময় তো পাচ্ছেন। তা দেওঘরে বসে একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি করুন না।

দেওঘর থেকে ফিরে, পাণ্ডুলিপিটা শ্রীশবাবুকে দিলাম। উনি ওখানা তৎক্ষণাৎ প্রেসে পাঠিয়ে দিলেন। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকেই 'বিচিত্রবিদ্যা গ্রন্থমালা'য় 'বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর' বেরিয়ে গেল। হইহই করে বইখানা বিক্রি হয়ে গেল। কেননা, বাংলা মুদ্রণের দুশো বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস—হালহেডের সময় থেকে P. T. S. পর্যন্ত—আমিই প্রথম বিবৃত করলাম। ইংরেজি বা বাংলায় এ-সম্বন্ধে কোন বই-ই ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। বইখানা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে লেখা। মুদ্রণ এবং তার আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধেই বইখানাতে বর্ণনা দিলাম। এটা বইখানার সূচীপত্র থেকেই বুঝতে পারা যাবে। পর পর যে-সব অধ্যায় বইখানাতে আছে, তা হচ্ছে—বাংলা হরফের বিবর্তনের ধারা; মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার; ছাপার কাগজ ও কালি; গ্রন্থ ও প্রকাশন; বাংলা বইয়ের সংগ্রহ; বাংলা সাময়িকপত্র; বইপাড়া কলেজ স্ট্রীট; বিশিষ্ট লেখক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকগণের পরিচয়; বাংলা সাহিত্যের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বইয়ের তালিকা. প্রথম প্রকাশের তারিখ সমেত।

বলা বাহুল্য, বইখানার ব্যবহারিক কার্যকারিতার জন্যই বইখানা এত জনপ্রিয় হয়েছে এবং বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে। এদিকে, 'জিজ্ঞাসা' আমার 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস'-এরও দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেছে। এটা শ্রীশবাবু জীবিত থাকাকালীনই বের করেছিলেন।

শ্রীশবাবুর মৃত্যু খুবই অপ্রত্যাশিত। ও'র মতো কর্মঠ লোকের জীবনাবসান যে এত তাড়াতাড়ি ঘটবে তা আমার কল্পনার বাইরেই ছিল। আমার চেয়ে উনি বয়সে ষোলো বছর ছোট ছিলেন। কিন্তু তা হলেও উনি আমার অসাধারণ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সেজন্যই আমি আমার 'বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর' বইখানার উৎসর্গপত্রে লিখেছি—'বাংলা নিবন্ধসাহিত্য প্রচারক্ষেত্রের দুঃসাহসিক অভিযাত্রী শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু'।

১১১

এখানে ছাপাখানা সম্বন্ধে একটা মজার কথা বলে নিতে চাই। গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে ছাপাখানার ক্ষেত্রে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে যে লোক কল্পনা করতে পারবে না, পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে কলকাতার দৈনিক পত্রিকাসমূহে ছবি ছাপার জন্য কাঠের ব্লক ব্যবহৃত হত। ফলে বোঝা যেত না, ছবিটা মহাত্মা গান্ধীর না কমলা নেহেরুর। ছবি ছাপা নিয়ে একবার এক দৈনিক পত্রিকায় (যা এখনও জীবিত আছে) এক বিভ্রাট ঘটেছিল। সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা ছাপা হচ্ছে। তিন ইঞ্চি space শূন্য রয়ে গিয়েছে। সম্পাদক গেলী প্রুফের পাশে লিখে দিয়েছেন: 'সরোজিনী নাইডুর মাঝখান ফাঁক করিয়া ব্লক গুঁজিয়া দাও'। ছাপাখানার লোকেরা ভুল বুঝল। পরের দিন দেখা গেল, ব্লক তো ছাপা হয়নি, ছাপা হয়েছে: 'সরোজিনী নাইডুর মাঝখান ফাঁক করিয়া ব্লক গুঁজিয়া দাও'। পাঠকসমাজ হেসে গড়াগড়ি দিল।

১১১

একটু মুখ বদলাতে চাই। সেজন্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে ফিরে আসছি। একদিন অভীকবাবুর ঘরে গিয়ে ও'কে বললাম, আমার কাজের সুবিধার জন্য 'Statistical Abstract of India' বইখানা চাই। অভীকবাবু বললেন— নকুলকে বলুন।

—কে নকুল?

—আমাদের নতুন লাইব্রেরিয়ান, আপনি চেনেন না ?

—না।

—আচ্ছা, আমিই বইখানা কিনতে ওকে বলে দেব'খন।

আমি আমার ঘরে এসে বসেছি। সঙ্গে সঙ্গেই একজন সুদর্শন যুবক এসে হাজির হল। বলল,

—দাদা, আমি নকুল, নকুল চট্টোপাধ্যায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র লাইব্রেরিয়ান।

—এইমাত্র তো অভীকবাবু আপনার কথা বলছিলেন।

—হ্যাঁ। আমাকেও তো উনি ডেকে বললেন, ডক্টর সুরের কি কি বই দরকার জেনে নিয়ে, আনিয়ে দিন।

নকুলের সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ। তারপর দু'জনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। আমাদের দু'জনেরই এক interest, ফলিত জ্যোতিষ। জ্যোতিষের চর্চা আমি পঞ্চাশ বছরের ওপর করছি। আমার এই জ্যোতিষের চর্চার কথা শুনেই দেবেশ দাশ মশাই আমার কাছে জানতে এসেছিলেন, সে বৎসর ও'র স্ত্রী কমলা দাশের কোষ্ঠীতে 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কার লাভের কোন যোগ আছে কিনা। এই বলে উনি কোষ্ঠীটা আমার সামনে খুলে ধরলেন। কোষ্ঠীটা দেখে আমি বললাম,

—হ্যাঁ, এ বছর উনি নিশ্চয় 'আকাদেমি পুরস্কার'টা পাবেন।

—আপনি ভাল করে দেখেছেন তো ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ভাল করেই দেখেছি।

—তবে, কলকাতার বিশিষ্ট জ্যোতিষীরা যে বলেন, ও'র কোষ্ঠীতে ওরকম কোন যোগ নেই।

—ও'রা কি বলেছেন, না বলেছেন সেটা আমার বিচার্য নয়, তবে আমি বলছি উনি পাবেন।

—ঠিক বলছেন তো ?

—ফলেন পরিচীয়তে।

কিছুদিন পরে একদিন কাগজে পড়লাম, 'সাহিত্য আকাদেমি'র পুরস্কার এ-বৎসর কমলা দাশকে দেওয়া হয়েছে তাঁর 'অমৃতস্য পুত্রী' বইখানার জন্য।

নকুলের কথা বলতে বলতে দেবেশ দাশ ও কমলা দাশের কথায় চলে গিয়েছিলাম। নকুলের সঙ্গে সুখ-দুঃখের অনেক কথাই হয়। নকুল আমার পরম ভক্ত। নকুল বলে, দাদা, জীবনে তো অনেক বই লিখলেন। আপনি নিজে তো আত্মপ্রচার-বিমুখ ব্যক্তি। তা, আমি যদি আপনার বইয়ের একটা bibliography তৈরি করি,

আপনার কোন আপত্তি আছে ? আমি চুপ করেই রইলাম।

তারপর নকুল তলে তলে কি করল জানি না। নকুল আমার বইয়ের একখানা bibliography তৈরি করে নিজের পয়সাতেই ছাপাল। সেখানার নাম দিল A Select Bibliography of Works of Dr. A. K. Sur by Nakul Chatterjee। ওখানা বের করে, ও যেন মানসিক শান্তি পেল। ওর একগাদা কপি সে বগলে করে নিয়ে অফিসের প্রত্যেক ঘরে ঘরে গিয়ে প্রত্যেককে একখানা করে দিয়ে এল।

সব কাজেই নকুলের উৎসাহ। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-লাইব্রেরির বর্তমান রূপটা নকুলই দিয়ে গিয়েছিল। নকুলই বিষয়বস্তু অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধভাবে কাগজের clippings-এর ফাইল তৈরি করেছিল। আলমারির মধ্যে বন্ধ বই-গুলোকে বের করে steel rack-এ সাজিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেছিল। নকুলই সকলের পড়বার সুবিধার জন্য লাইব্রেরিতে দু'খানা বড় টেবিল স্থাপন করেছিল। কে জানত, ওই দু'খানা টেবিলের একখানা নকুলের জীবনের শেষশয্যা হবে।

নকুলের মৃত্যু শুধু অকালে নয়, একেবারে আপতিকভাবে।

নকুলের সঙ্গে এত ভাব, কিন্তু ওর মনের একটা কথা আমি কোনদিনই টেনে বের করতে পারিনি। ওর মনের অন্তরালে এক গুরুতর বেদনা ছিল। সেটা কি, তা নকুল কোনদিনই বলল না। সেটাকে চাপা দেবার জন্যই নকুল ইদানীং মদ ধরেছিল।

তারিখটা বোধ হয় ১৯৭০ সালের ১৬ জুলাই হবে। আমি অফিসে গিয়েছি। লিফটে উঠছি। আমার পাশেই এক ভদ্রমহিলা খুব কাঁদছে। লিফটম্যান তিনতলায় গিয়ে আমাকে নামাবার জন্য লিফটের দরজা খুলে দিল। সামনেই হামদি বে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই হামদি বলে উঠল, স্যর, আই অ্যাম ওয়েটিং ফর ইউ. নকুল ইজ নো মোর ! আমি ভেবেছি-াম, হামদি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। কেননা, ঠিক তার দু'দিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। লাইব্রেরিতে আমি নকুলের সঙ্গে বসে গল্প করছি, এমন সময় নকুল একটা টেলিফোন পেল, হামদি মারা গিয়েছে। এই নিয়ে নকুল ও আমি অফিসে হইচই লাগিয়ে দিলাম। আমাদের 'বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড' ডিপার্টমেন্টের নিখিলবাবুর সঙ্গে হামদির খুব দহরম-মহরম। নিখিলবাবুকেই পাঠিয়ে দিলাম হামদির বাড়িতে। নিখিলবাবু খবর নিয়ে এল হামদি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে জীবিত। বুঝলাম, কেউ দুষ্টামি করে আমাদের ওই ভুল খবরটা দিয়েছিল।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে হামদি যখন আমাকে বলল যে, নকুল আর নেই, আমি ভাবলাম হামদি ও-দিনের পাল্টা নিয়ে ঠাট্টা করছে। কিন্তু তারপর হামদি যখন

আমাকে জোর করে লাইব্রেরিতে নিয়ে গেল, দেখলাম যে নকুলকে লাইব্রেরির পাঠকদের টেবিলে শুইয়ে একখানা সাদা কাপড় চাপা দেওয়া হয়েছে, তখন আমি কেঁদে ফেললাম। দৃশ্য দেখে এক মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিলাম যে, যে মহিলা লিফটে আমার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল সে-ই নকুলের স্ত্রী।

লাইব্রেরির কর্মচারী নিরঞ্জনের কাছ থেকে শুনলাম অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিনও সকালে নকুল অফিসে এসে নিরঞ্জনকে খাবার জল আনতে বলেছিল। নিরঞ্জন জল আনতে গেলে, নকুল ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে পটাসিয়াম সায়নাইড যোগাড় করেছিল। তারপর নিজ চেয়ারে এসে সেটা খেয়েছিল। নিরঞ্জন যখন জল নিয়ে ফিরে এল, তখন সব শেষ! নকুলের দেহ চেয়ারের একপাশে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে।

ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে নকুল গেল। রইল হামদি বে। ভারী মজার মানুষ। একটু খাওয়া-দাওয়া করতে ভালবাসে। প্রায়ই আমায় বলে, চল খেয়ে আসি। আমি সৌজন্যের সংগে প্রত্যাখ্যান করি। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা ছাড়া, রবিবারের পুস্তক-সমালোচনার পাতাটা সম্পাদন করার ভার ওর ওপর ন্যস্ত ছিল। অধিকাংশ সমালোচনা আমি লিখে দিই। নানা বিষয়ের বই আসে। আমি বৈচারিক সমালোচনা লিখি। আবার পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য মাঝে মাঝে রসাল প্রবন্ধ লিখি। হামদি বলে, Sur, you are a wonderful man। কিন্তু কিছুকাল পরে হামদি-ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর চাকরি ছেড়ে চলে গেল। তখন সম্পূর্ণ নিঃসংগতা বোধ করতে লাগলাম। সে নৈরাশ্যের ভাবটা কেটে গেল যখন কয়েকমাস পরে নকুলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি এলেন। তিনি চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১১

সেটা ১৯৭৪ সাল হবে। একদিন আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন, আমার সহকর্মীদের মধ্যে দুই মহারথী। একজন আমাদের বার্তা-সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী ও অপর-জন আমাদের রবিবাসরীয়ের সম্পাদক রমাপদ চৌধুরী। হঠাৎ এ-দুই চৌধুরীকে আমার ঘরে ঢুকতে দেখে আমি প্রথম ভেবেছিলাম যে, বোধহয় এঁরা কোন কোম্পানির শেয়ারে কিছু টাকা লগ্নি করবেন, তাই আমার পরামর্শ নিতে এসে-ছেন। সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই এরকম আসেন। কিন্তু ওঁরা দুজন যখন বললেন যে, অশোকবাবু (অশোক সরকার) ওঁদের পাঠিয়েছেন, তখন আমি খুব বিস্মিত হয়ে ওঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অমিতাভবাবুই বলতে শুরু

করলেন,

—রবিবাসরীয় পৃষ্ঠার উৎকর্ষতা-সাধন সম্বন্ধে অশোকবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সেখানে কানাই সরকার মশাইও উপস্থিত ছিলেন। অশোকবাবু বললেন, আপনারা রবিবাসরীয়ের জন্য আমাদের অতুল সুর মশাইকে দিয়ে কিছু লেখাচ্ছেন না কেন? ও'র লেখা পড়লে পাঠকসমাজ খুব মুগ্ধ হবে, এবং আমাদের রবিবাসরীয় খুব জনপ্রিয় হবে।

—তা উনি তো ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে লেখেন।

—আপনারা জানেন না, ও'র চেয়ে বড় পণ্ডিত লোক আমাদের সমগ্র 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' স্টাফে আর দ্বিতীয় নেই। উনি জানেন না এমন কোন বিষয় নেই। আমি ও'কে ছেলেবেলা থেকেই চিনি। তবে উনি আত্মপ্রচারে বিমুখ ব্যক্তি। ও'কে অনুরোধ না করলে আপনারা ও'র কাছ থেকে কোন লেখা পাবেন না। অশোকবাবু আপনার সম্বন্ধে বলে চলেছেন, এমন সময় কানাই সরকার মশাই বললেন, এককালে যখন 'দেশ' ও বাণিজ্য-বিভাগ এক ঘরে ছিল, তখন উনি আমাদের কাছে ও'র মহেঞ্জোদারোর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে গল্প শুনাতেন, তা আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে শুনতাম। কানাই সরকার মশাই মহেঞ্জোদারোর কথা বলাতে আমরা ও'কে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি তো বাণিজ্যের লোক, তা ও'র মহেঞ্জোদারোর অভিজ্ঞতার কথা কি বলছেন? কানাই সরকার মশাই আমাদের বললেন, সে অনেক কথা, একসময় উনি মহেঞ্জোদারোর উৎখননের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তা আপনারা ও'র কাছে গিয়ে অনুরোধ করুন না, ও'র মহেঞ্জোদারোর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লেখবার জন্য। সে-কারণেই আমরা উভয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি আগামী রবিবারের জন্য মহেঞ্জোদারো সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ দিন।

—তা আজ তো বৃহস্পতিবার। আপনারা প্রবন্ধটা কবে চান?

—আগামী কাল শুক্রবার দুপুরে।

—আচ্ছা, দেব।

যথাসময়ে শুক্রবার লেখাটা দিলাম, এবং রবিবার ওটা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবাসরীয়তে বেরুল। প্রসঙ্গত বলি, 'রবিবাসরীয়' তখন এখনকার মতো চার-পাতার ক্রোড়পত্র ছিল না। সম্পাদকীয় পাতাটায় রবিবারে কোন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরুত না, এবং ওই পাতাটাতেই কয়েকটি প্রবন্ধ ছেপে 'রবিবাসরীয়' তৈরি করা হত।

আমার প্রবন্ধটার নাম দিয়েছিলাম 'আমি তখন মহেঞ্জোদারোয়'। প্রবন্ধটা বিপুল সম্বর্ধনা পেল। আমাদের সহকর্মী প্রখ্যাত সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র

আমার ঘরে এলেন আমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য। তাঁর হাতেই কাগজখানা ছিল। অংশবিশেষ তিনি পড়তে লাগলেন। যথা: "চতুর্দিকে জনহীন প্রান্তর। অদূরে সেই রহস্যময়ী নগরীর কঙ্কাল। তাঁবুতে আশ্রয় নিলাম। প্রথম রাতের অভিজ্ঞতা আমাকে বেশ ভয়ার্ত করে তুলল। চতুর্দিকে জমাট অন্ধকার। গভীর নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে কানে আসতে লাগল, নানারূপ জন্তু জানোয়ারের সম্ভাষণ। রাত্রে তো ঘুমই হল না। ভোরের দিকে সবেমাত্র তন্দ্রা এসেছে, তন্দ্রা ভেঙে গেল টাইপরাইটারের শব্দে। উঠে দেখি ডরোথি ম্যাকে টাইপ করতে লেগে গেছেন তাঁর স্বামীর পূর্বদিনের খননকার্যের বিবরণী।"

আবার অপর একটা অংশ পড়তে লাগলেন—

"ম্যাকের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' স্মরণ করে সাড়ে চার হাজার বছর আগের নরনারীর কলরব ও কর্মব্যস্ততার স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।··· প্রতি বাড়ির প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকলেই সামনে পড়ত বাড়ির প্রাঙ্গণ। প্রবেশপথের নিকট প্রাঙ্গণের একপাশে থাকত বাড়ির কূপ। স্নানের সময় আবরু রক্ষার জন্য কূপগুলিকে দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত করা হত। রাজপথের দিকে বাড়ির যে দোকানঘরগুলি ছিল, তার অনেকগুলির সামনে আমরা আবিষ্কার করেছিলাম ইঁটের গাঁথা পাটাতন। বোধহয় এই পাটাতনগুলির ওপর বিক্রেতারা দিনের বেলা পণ্যসম্ভার সাজিয়ে রাখত, এবং রাত্রিকালে সেগুলিকে দোকানঘরে তুলে রাখত। ছোট ছোট যে-সব দ্রব্যসামগ্রী আমরা সে-বৎসর পেয়েছিলাম, তার মধ্যে ছিল মেয়েদের মাথার কাঁটা। তা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করেছিলাম যে, মেয়েরা খোঁপা বাঁধত ও খোঁপায় কাঁটা গুঁজত। তবে মেয়েরা যে বেণী ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াত, তার প্রমাণও আমরা পেয়েছিলাম।"

পড়া শেষ হলে, নরেনবাবু বললেন, আপনি যে এত ভাল বাংলা লেখেন, তা জানতাম না। অপূর্ব আপনার বর্ণনা। পাঠককে এক স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায়।

এরপরই রমাপদবাবু ছুটিতে চলে গেলেন। রমাপদবাবুর কাজ দেখতে লাগলেন নীরেন চক্রবর্তী। একদিন নীরেনবাবু আমার ঘরে এসে বললেন, রমাপদবাবু ছুটিতে গেছেন, ওঁর কাজ আমি দেখছি। আপনি আমাকে শেয়ার-বাজারের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ সামনের রবিবারের জন্য দিন। কথায় কথায়, শহরে যে একসময় জুয়ার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল, সে-সম্বন্ধেও কথা হল। তখন নীরেনবাবু বললেন, ও-সম্বন্ধেও পরে আমাকে একটা লেখা দেবেন।

পর পর দুটি প্রবন্ধ লিখলাম। প্রথমটা 'আমি যখন শেয়ার বাজারে', আর দ্বিতীয়টা 'শহরে তখন জুয়ার ঢেউ'। দুটি প্রবন্ধই পরবর্তীকালে আমার 'বাঙলা ও বাঙালী'-সংজ্ঞক বইয়ে পুনরমুদ্রিত হয়েছে। অনেকেই বলেন যে

অসামান্য বর্ণনাভঙ্গীর জন্য এ দু'টো প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

রমাপদবাবু ফিরে এসেছেন। আমার ঘরের সামনে দিয়েই প্রস্রাবাগারে যান। ফেরবার সময় প্রতিদিনই আমার ঘরে ঢোকেন ও লেখার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমিও লেখা দিই, ও'রা তা ছাপেন। যে লেখাগুলো লিখলাম, তার মধ্যে যেগুলো অবিস্মরণীয় হয়ে আছে, সেগুলো হচ্ছে—'পঞ্চকন্যা নিত্যস্মরণীয়া কেন?', 'শিব বড় না বিষ্ণু বড়?', 'চল যাই গাজনতলায়', 'ঘরের ছেলে শিব ঠাকুর', 'কলকাতার বেগম', 'চৌরঙ্গীর জঙ্গলের রানী', 'কলকাতার ফাইটিং কক', 'কলকাতার শেষ পাঠশালা', 'প্রথম বিদ্রোহী নারী', 'ঘোষপাড়ার সতীমা', ইত্যাদি।

এসব লেখা বেরুবার পরই 'রবিবাসরীয়' দাঁড়িয়ে গেল। 'রবিবাসরীয়' দাঁড়িয়ে গেছে দেখে, রমাপদবাবু আর লেখার জন্য বিরক্ত করেন না। আমিও লিখি না। কেননা, বিনা অনুরোধে লেখা আমার নীতি নয়। রমাপদবাবুর শেষ অনুরোধ যা আমি রক্ষা করেছি, তা হচ্ছে ১৯৭০ সালে 'আমার ছেলেবেলা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখে।

'রবিবাসরীয়'তে যা বেরুত, সেগুলো সবই রম্যরচনা, সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য। শারদীয়া সংখ্যা ও বার্ষিক সংখ্যার জন্য আমাকে 'সিরিয়াস' বিষয় দিলেন। কয়েক বছরের ওই দুই সংখ্যার জন্য কয়েকটা প্রবন্ধ লিখলাম। সেগুলো পুনরমুদ্রিত হয়েছে আমার 'হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' বইয়ে। ওই প্রবন্ধগুলো একত্রিত পুস্তকাকারে পড়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তো বিস্মিত। তিনি 'দেশ' পত্রিকায় বই-খানা সমালোচনা করতে গিয়ে লিখলেন—'সব মিলিয়ে মনে হয় এটি একটি উচ্চ-মানের গ্রন্থ। লেখক মৌলিক চিন্তা করবার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা নবীন গবেষকদের অনুসরণযোগ্য। তাঁর প্রবন্ধগুলি শুধু কৌতূহল উদ্দীপিত করে না, মনকে ভাবতে শেখায়।' ('দেশ', ১২ ডিসেম্বর ১৯৭০)।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডক্টর নীলরতন সেন লিখলেন—'আপনি একেবারেই আত্মপ্রচারে বিমুখ বলে এতদিন প্রাপ্য খ্যাতি থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। স্বাধীন হলেও মানসিকতায় আমরা এখনো পুরানো ভাবধারার গোলামী করছি। নইলে আপনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই অনন্যসাধারণ কাজের স্বীকৃতি-স্বরূপ সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি (ডি. লিট.) লাভ করতেন। সরকারের কর্তব্য ছিল আপনাকে ভালো বৃত্তি দিয়ে শুধুমাত্র গবেষণার কাজে আত্ম-নিয়োগের সুবিধা করে দেওয়া।"

কিন্তু এইসব প্রশংসা আমাকে এক মহাবিপদে ফেলল। যারা 'লিটল

ম্যাগাজিন' বের করে, তারা সকলেই আমাকে লিখল, প্রতিষ্ঠিত লেখকরা সকলেই আমাদের অবহেলা করেন, তাঁরা লেখা দিয়ে কখনই আমাদের সংগে সহযোগিতা করেন না। আপনার সহৃদয়তার কথা আমরা শুনেছি। সেজন্য আশা রাখি আমরা আপনার সহযোগিতা পাব। সেজন্য যখনই যে-কোন 'লিটল্ ম্যাগাজিন' আমার কাছ থেকে লেখা চেয়েছে, তখনই তাদের লেখা দিয়েছি। অবশ্য যা-তা লেখা দিইনি। তাদের কাগজে প্রকাশিত আমার লেখাগুলি সংবাদপত্রের সমালোচনায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে। আজ এই ৮৩ বছর বয়সে যখনই যে-কোন 'ম্যাগাজিন' লেখা চায়, তখনই তাদের লেখা পাঠিয়ে দিই, এমনকি ঢাকা ও চট্টগ্রামেও। এটা আমার শ্লাঘার বিষয় যে 'বাংলাদেশ'-এর পাঠকরা আমাকে আন্তরিকতার সংগে ভালবাসে।

ᔕ ᔕ ᔕ

এছাড়া, সত্তরের দশকে আমি 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় ভারতের আদিবাসীদের সমস্যা ও তার সমাধান সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধগুলি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এ-সময় রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তা সম্বন্ধেও একটা প্রবন্ধ লিখি। মনে হয় এটাই এ-বিষয়ে এক মাত্র প্রবন্ধ।

ᔕ ᔕ ᔕ

কলকাতার কোন এক সমিতির আমি সভাপতি ছিলাম। একদিন ও'দের মিটিং-এ পৌরোহিত্য করতে গেছি। সিঁড়ির কাছে সমিতির সম্পাদক দাঁড়িয়ে। আমাকে অভ্যর্থনা করেই, তিনি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোকের সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। অত্যন্ত সাদাসিধে ও unimpressive চেহারা। সম্পাদক বললেন, এ'র নাম নেপালচন্দ্র ঘোষ, আমাদের সমিতির ছাপার কাজ করেন, ইনি আপনার সংগে পরিচিত হবার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। আলাপ হল।

তার পরের রবিবার সকালে নেপালবাবু আমার সিঁথির বাড়িতে এসে হাজির। দেখলাম হাতে একখানা ফাইল। ফাইলটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, আপনাকে আমার একটু উপকার করতে হবে। আপনাকে এই লেখাগুলো দেখে, পরামর্শ দিতে হবে, আমি এটা ছাপব কিনা।

ফাইলটা নিয়ে দেখলাম, ওটাতে রয়েছে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মশাইয়ের কতকগুলো প্রকাশিত লেখার হাতে-লেখা অনুলিপি।

আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনি ছাপতে পারেন। তবে নিবন্ধের বই ছাপবার আপনার অভিজ্ঞতা কতখানি ?

—আমি তো এযাবৎকাল উপন্যাসই ছেপে এসেছি। আজ পর্যন্ত পনের-কুড়িখানা উপন্যাস প্রকাশ করেছি।

—তা, কি রকম সাফল্য অর্জন করেছেন ?

—বিশেষ কিছু নয়।

—তবে নিবন্ধের বই ছাপবার সখ হল কেন ? নিবন্ধ সাহিত্য প্রকাশের ক্ষেত্র অত্যন্ত কঠিন। এ লাইনে যিনি বিশেষজ্ঞ, সেই শ্রীশকুমার কুণ্ড মশাইয়ের কাছ থেকেই একথা শুনেছি। তবে ইদানীং উনি কিছু সাফল্য অর্জন করেছেন, আমার নিবন্ধের বইগুলো প্রকাশ করে।

—আমাকে, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মশাইয়ের ছেলে শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ বলেছেন যে এই বইখানার আপনি যদি একটা বড় করে ভূমিকা লিখে দেন, তা হলে এ বইটা চলতে পারে।

—আমি নয় আপনাকে একটা ভূমিকা লিখে দিলাম। তারপর সবই আপনার অদৃষ্ট। আপনি ভাববেন না যে আমার নামের সংগে এমন কোন যাদুমন্ত্র জড়িত আছে যে আমার লেখা ভূমিকা দেখলেই পাঠকসমাজ ছুটে আসবে আপনার বই কেনবার জন্য।

—না, আপনি ভূমিকা লিখে দিলেই হল। তা হলেই আমি অনুগৃহীত হব।

একটা ভূমিকা লিখে দিলাম। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মশাইয়ের লেখার মধ্যে যাকিছু স্খলন ঘটেছিল, সেগুলো দূর করলাম। যা-কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল, সে-সব পূরণ করে দিলাম।

বইখানার নাম দেওয়া হল 'বাঙলার প্রথম'। বইখানা বেরুবার পর সংবাদপত্রে বিদগ্ধ সমালোচকরা আমার লিখিত ভূমিকার খুব প্রশংসা করল। বইখানা ভালই বিক্রি হল। নেপালবাবু খুব খুশি। উনি উপলব্ধি করলেন যে বইখানার সাফল্য ঘটল, বইখানার সংগে আমার নাম জড়িত থাকার দরুন। সরকারী 'নির্বাচিত বই'য়ের যে তালিকা বেরুল, তাতে আমার নামই সংযুক্ত দেখা গেল বইখানার সঙ্গে।

শীঘ্রই বুঝতে পারলাম যে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের প্রবন্ধের বই ছাপা নেপালবাবুর একটা ছুতো মাত্র, ওঁর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার প্রবন্ধের বই ছাপা। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের বইয়ের সংগে আমার নাম যুক্ত থাকায় বইখানা যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করল, তা নেপালবাবু সহজেই বুঝতে পারলেন। এতে নেপালবাবু আরও আগ্রহী হয়ে উঠলেন তাড়াতাড়ি আমার একখানা প্রবন্ধের বই

ছাপবার জন্য।

একদিন উনি আমাকে বললেন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'রবিবাসরীয়'তে প্রকাশিত আপনার প্রবন্ধগুলো আমি ছাপতে চাই, আপনি কিছু প্রবন্ধ বাছাই করে দিন। কতকগুলো প্রবন্ধ বাছাই করে দিলাম। বইখানার নাম দেওয়া হল 'বাঙলা ও বাঙালী'। বইখানা বিপুল সম্বর্ধনা পেল। সংবাদপত্রসমূহ বইখানার প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠল। শ্রীশকুণ্ড মশাইয়ের মতো অভিজ্ঞ নিবন্ধসাহিত্য প্রকাশকও বললেন, বইখানা 'অপূর্ব'।

এসব সম্বর্ধনা ও প্রশংসা মানে আমার ঝামেলা বাড়া। নেপালবাবু বললেন, আমি 'সাহিত্যলোক' থেকে আপনার আর একখানা বই বের করতে চাই, আপনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পূজা ও বার্ষিক সংখ্যায় যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলো থেকে কিছু প্রবন্ধ বাছাই করে দিন। বাছাই করে দিলাম, এবং সেগুলো নিয়ে আর একখানা বই তৈরি হল, নাম 'হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য'। এখানা পাঠকসমাজে আরও বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করল। শীঘ্রই এর দ্বিতীয় সংস্করণও বেরিয়ে গেল। 'দেশ' পত্রিকায় বইখানা সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় যা বললেন, তা আমি একটু আগেই উদ্ধৃত করেছি।

তারপর এক এক করে নেপালবাবুর প্রকাশন সংস্থা 'সাহিত্যলোক' ছাপল আমার 'কলকাতার চালচিত্র', 'আমরা গরীব কেন ?', 'প্রসংগ পঞ্চবিংশতি', 'আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী' ও 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন' ইত্যাদি। 'কলকাতার চালচিত্র' বইখানা সমালোচনা করতে গিয়ে 'যুগান্তর' লিখল— 'দীর্ঘকাল ধরে কলকাতার জানা-অজানা ইতিহাসে ডক্টর অতুল সুর নূতনতর আলোকপাত করে চলেছেন—কলকাতা সম্বন্ধে একাধিক গ্রন্থ তার অভিজ্ঞান। আত্মস্মৃতির বিশ্বস্ততা লেগে আছে বলেই রচনাগুলি ইতিহাসের তথ্যভার অতিক্রম করে রসভারে বিনম্র হয়েছে।' 'দৈনিক বসুমতী' লিখল—'আলোচ্য ও বিবেচ্য 'কলকাতার চালচিত্র'-এ এমন অনেক তথ্য আছে যা কলকাতা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত কোন ইংরেজি বা বাংলা বইয়ে নেই।' 'আজকাল' পত্রিকা লিখল—'অতুলবাবুর পাণ্ডিত্য অনস্বীকার্য : কিন্তু তা এ গ্রন্থে সযত্নে অবদমিত। এজন্য তিনি প্রশংসনীয়।'

আবার 'আমরা গরীব কেন ?' বইখানার সমালোচনা করতে গিয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন একজিকিউটিভ ডিরেকটর বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ অনিলকুমার বসু লিখলেন—'ডক্টর সুর বিচক্ষণতার সংগে ভাবালুতাকে বর্জন করে নানা তথ্য ও পরিসংখ্যান-এর সাহায্যে আমাদের দারিদ্র্যের নগ্নরূপের প্রতি

তর্জনী সংকেত করেছেন। বহুদিন আগে প্রকাশিত কতগুলি প্রবন্ধে তিনি যে অশুভ লক্ষণগুলির সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন তা পরবর্তীকালে সত্যই দেখা দিয়েছিল। এদিক দিয়ে লেখকের অর্থনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে।' 'যুগান্তর' পত্রিকা লিখল—'গরিবি হটাও ধুয়ো জনপ্রিয় হওয়ার অনেক আগে থেকেই যে এই প্রশ্নটি লেখককে পীড়িত করেছে, তা তাঁর অর্থনৈতিক দূরদর্শিতারই প্রমাণ। স্বাধীনতা-লাভের উন্মাদনা যখন পুরোপুরি কাটেনি, জওহরলাল নেহেরু যখন দোর্দণ্ড প্রতাপে বৈষয়িক সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি বিতরণ করে চলেছেন, সেই পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই ডক্টর সুর দেখতে পান ঋদ্ধির আড়ালে দৈন্য। এদেশে উন্নয়ন যোজনা রচনার দায়িত্ব যাঁদের হাতে ন্যস্ত, তাঁরা তো ননই, দেশের সব অর্থনীতিবিদও এই কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না।'

'প্রসঙ্গ পঞ্চবিংশতি' বইখানা 'দেশ' পত্রিকায় সমালোচনা করতে গিয়ে শান্তিনিকেতনের সুদক্ষ ও বিচক্ষণ অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য মুগ্ধ হয়ে লিখলেন—'আমরা অতুলবাবুর আরও প্রবন্ধের পুনরমুদ্রণ চাই।'

'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন' বইখানার সমালোচনা করতে গিয়ে 'বর্তমান' পত্রিকায় বামপন্থী লেখকগোষ্ঠীর পুরোধা নারায়ণ চৌধুরী মশাই লিখলেন—'এই একখানা মাত্র গ্রন্থের সাক্ষ্য থেকেই বোঝা যায় ডক্টর অতুল সুর মহাশয় কত বড় দুর্ধর্ষ পণ্ডিত, তাঁর বিচরণের ক্ষেত্র কত বিশাল। এই বইটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অমূল্য সংযোজনরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, এ বইয়ের জন্য তাঁকে কোন না কোন প্রকার বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় সম্মানে সম্মানিত করা উচিত। এমন বই অনাদৃত থাকলে বুঝতে হবে আমাদের বর্তমান সমাজ সত্যিকারের প্রতিভার কোন সমাদর করতে জানে না।' ইনস্টিটুট অভ্ হিস্টরিক্যাল স্টাডিজ-এর অধ্যক্ষ প্রবীণ ঈতিহাসবিদ অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় 'আজকাল' পত্রিকায় বললেন—'এরকম একটি পূর্ণাঙ্গ বইয়ের মাধ্যমে বাঙলার ইতিহাস এতদিন পরিবেশিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। খাঁটি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তিনি তা পরিবেশন করেছেন।' 'যুগান্তর' পত্রিকায় বিদগ্ধ সমালোচক কৃষ্ণ ধর বললেন—'ডক্টর সুরের গ্রন্থটি আমাদের কাছে মূল্যবান এই কারণে যে তিনি বাঙালি সমাজ সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটা সর্বাঙ্গীণ রূপ এতে দেবার চেষ্টা করেছেন।' কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার ডক্টর নীলরতন সেন 'কলেজ স্ট্রীট' মাসিক পত্রে লিখলেন—'একটি অখণ্ড বইতে প্রাচীনতমকাল থেকে আধুনিকতম কাল পর্যন্ত, সমগ্র বাঙলা ও বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজবিন্যাস, লোকাচার প্রভৃতির বিবর্তনধারা তা পরিচয় সংগ্রথিত করবার চেষ্টা কেউই এযাবৎ সঠিকভাবে করেনি। বর্তমানে রয়েছে তাঁর

কাজটা সহজসাধ্য নয়। প্রবীণ ঐতিহাসিক ডক্টর অতুল সুর সুদীর্ঘকালের ব্যাপক অধ্যয়ন এবং গবেষণালব্ধ মৌলিক চিন্তাভাবনার আলোকে সেই দুর্লভ দক্ষতা অর্জন করেছেন বলেই এমন একটি অনন্যসাধারণ গ্রন্থ রচনায় সফল হয়েছেন। এতদিনে বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস পঠন-পাঠনের উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ (অখণ্ড) গ্রন্থ হাতে পাওয়া গেল। এমন একখানি মূল্যবান গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ হলে, বাংলা ভাষাভাষী সমাজের বাইরেও তার যোগ্য সমাদর হবে মনে করি।'

১১১

এসব বই ছাড়া, ইতিমধ্যে বেরিয়ে গিয়েছিল 'জেনারেল প্রিনটারস্' থেকে আমার 'কলকাতা : এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস' ও 'স্বপ্নদীপ' থেকে 'দেবলোকের যৌন জীবন'। দুখানা বইয়েরই দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়ে গেছে। শেষোক্ত বইখানা অনেক মাস ধরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'বেস্ট সেলারস্' তালিকায় স্থান পেয়েছিল। তা ছাড়া, বইখানার বহু অনুকরণ বেরিয়ে গেছে।

'কলকাতা : এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস' বইখানার একটা ইতিহাস আছে, সেটাই এখানে বলতে চাই। কলকাতা সম্বন্ধে আমার চর্চা ষাট বছরের ওপর কালের। কলকাতার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমি প্রথম প্রকাশ করি ১৯২১-২২ খ্রীস্টাব্দে 'স্কটিশ চার্চেস্ কলেজ ম্যাগাজিন'-এ। তখন থেকেই কলকাতার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার কৌতূহল। আমার উৎসাহ বেড়ে গেল যখন আমার প্রতিবেশী পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর মশাই বাগবাজারের ইতিহাস রচনা করলেন।

কলকাতা সম্বন্ধে যখনই যা কিছু নতুন তথ্য পাই, একখানা খাতায় লিখে রাখি। কলকাতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করি একালের ও সেকালের পত্র-পত্রিকা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যবিবরণী ও নথিপত্র, কলকাতা কালেকটরেটের রেকর্ডস্, বিলাতের ইন্ডিয়া হাউসে সংরক্ষিত নথিপত্রের নকল, কলকাতার অভিজাত পরিবারের কুলজী ও বহু বই থেকে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর অনেক বিষয় সম্বন্ধে শুনি আমার পিতা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল সুরের (১৮৪০-১৯৩৭) মুখ থেকে। তা ছাড়া, আমি আমার (১৯০৪-) নিজের চোখেও দেখেছি কলকাতার বহু ঘটনা। এইসব তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন দেওঘরে অবস্থান করি, সে সময় সেখানে বসে বইখানার সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি তৈরি করি। কলকাতায় ফিরেই আমি পাণ্ডুলিপিটা দিই ভিকটোরিয়া মেমো-রিয়ালের অধ্যক্ষ অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় মহাশয়কে পরীক্ষা করবার জন্য।

পরীক্ষান্তে সন্তুষ্ট হয়ে তিনিই বইখানার প্রকাশের ভার ন্যস্ত করেন জেনারেল প্রিনটারস্-এর ম্যানেজিং ডিরেকটর শ্রীসুরজিৎ দাসের ওপর। অনেকেই বলেন বইখানা মাত্র 'গবেষণাভিত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে লেখা কলকাতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস' নয়, এখানা 'সুসাহিত্যের একখানা অভিজ্ঞানও'।

ડડ ડ

ক্লাইভ স্ট্রীটে আমি যশ, মান ও খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিলাম। এখন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমাদর পেলাম। হাজার হাজার বাঙালী পাঠকদের (এমন কি সুদূর আমেরিকা থেকেও) কাছ থেকে যে-সব চিঠিপত্র পেয়েছি (এবং এখনও পাচ্ছি) তা থেকে বুঝতে পারলাম, ইহজগতে আমি একেবারে নিঃসঙ্গ নই: আমার বহু গুণমুগ্ধ ও শুভানুধ্যায়ী পাঠক-বন্ধু আছে। অপরের চিত্তকে জয় করে, তাঁদের সন্তোষবিধান করতে পেরেছি, সে আনন্দই আমার জীবনের পরম আনন্দ। তা না হলে আমার জীবন অত্যন্ত বিষাদময়। আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেলাম যেদিন 'কলেজ স্ট্রীট' মাসিক পত্রিকায় পড়লাম এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ। সাক্ষাৎকারটা হয়েছিল শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের সঙ্গে সুসাহিত্যিক সমরেশ বসুর। শঙ্করলাল সমরেশ বসুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কার বই আপনার পড়তে ভাল লাগে? নির্দ্বিধায় সমরেশ বসু বলেছিলেন, অতুল সুরের। আর একজন আমার লেখার অত্যন্ত গুণমুগ্ধ পাঠক ছিলেন। তিনি হচ্ছেন সন্তোষকুমার ঘোষ। তিনি প্রায়ই নিখিল সরকার মশাইদের ঘরে এসে আমার লেখার সশ্রদ্ধ প্রশংসা করতেন।

বাঙলার অদ্বিতীয় কথাশিল্পী বিমল মিত্রও তাঁর একখানা বই আমাকে উৎসর্গ করেছেন। আরও উৎসর্গ করেছেন ডক্টর নীলরতন সেন ও অধ্যাপক বঙ্কবিহারী চক্রবর্তী তাঁদের বই।

ડડ ડ

১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে 'ক্রিটিকস্ সারকল্ অভ্ ইন্ডিয়া' আমাকে CCI AWARD দিল। এটা এক অতি মর্যাদাপূর্ণ ও নিরপেক্ষ সম্মান। এই উপলক্ষে দিল্লীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। এরই পদক্ষেপে 'কলা সংস্কৃতি পরিষদ' আমাকে সম্বর্ধনা জানাল মানপত্র ও ফলক দিয়ে। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে 'বঙ্গীয় পণ্ডিত সভা'ও এগিয়ে এল আমাকে সম্মানিত

করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে। অভিধাও পেয়েছি 'প্রাচ্যবিদ্যা মহোপাধ্যায়'।

কিন্তু এরই মধ্যে ঘটল দুই বিপরীত ঘটনা। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কর্ণধার অশোককুমার সরকার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, আমাকে 'আনন্দ পুরস্কার' দেবার জন্য। কিন্তু সেখানে ঘটল এক অশোভন সংঘর্ষ। ওই সভার সভাপতি প্রতুল গুপ্ত মশাই ওই সংঘর্ষটা মেটাতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি বলে উঠলেন, অতুল সুর নামে কোন লেখককে তো আমি জানি না। অথচ উনি যখন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, তখন তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল অফিসার আমার ছেলের দ্বারা নিয়মিত চিকিৎসিত হতেন এবং যখনই আমার ছেলের সঙ্গে দেখা হত, তখনই জিজ্ঞাসা করতেন, আপনার বাবা কেমন আছেন?

অনুরূপ ঘটনা ঘটল ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দে, যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার' দেবার জন্য বিচারকমণ্ডলীর সভা আহ্বান করলেন। ওই পুরস্কার দেবার জন্য দেশের বিদগ্ধজনের কাছ থেকে যে মতামত চেয়ে পাঠানো হয়েছিল, তাঁদের ভোট অনুযায়ী আমার নাম তালিকার শীর্ষদেশেই ছিল। ওই সভায় আহূত অন্যতম বিচারক বিমল মিত্র বললেন, ওই পুরস্কারের জন্য অতুল সুরই যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষ বললেন, অতুল সুরের তো কোন প্রকাশিত বই নেই, উনি তো মাত্র মাঝে মাঝে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রবন্ধ লেখেন। অথচ যখন তিনি এই মন্তব্য করলেন তখন আমার প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ১৩২। তার প্রেক্ষিতে রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর উক্তি সেদিন খুব বিস্ময়কর বলেই মনে হয়েছিল।

এসব পুরস্কার কাদের দেওয়া হয় তা কিছুকাল আগে ভারতীয় সংসদে (পার্লামেন্টে) ফাঁস করে দিয়েছিলেন খুশবন্ত সিং। 'সাহিত্য আকাদেমি'র পুরস্কার সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'আমি এমন একজন পুরস্কার-বিজয়ীকে দেখতে চাই, যিনি সামনে এসে বলতে পারেন যে তিনি বিনা ধরাধরিতে পুরস্কার লাভ করেছেন।' বলা বাহুল্য, তাঁর এই চ্যালেঞ্জের প্রতিবাদে কোন পুরস্কার-বিজয়ীই এগিয়ে আসেননি।

যাঁরা আমাকে চেনেন, তাঁরা জানেন যে ধরাধরি করাটা আমি আমার জীবনে এক অতি জঘন্য ও ঘৃণ্য বৃত্তি বলে মনে করি। সুতরাং কোন পুরস্কার-প্রাপ্তি আমার জীবনে কখনই ঘটবে না, যদিও এ বিষয়ে আমি ক্ষুব্ধও নই, লোভীও নই। কেন ঘটবে না, তার উত্তর দিয়েছেন বিমল মিত্র মশাই তাঁর 'রাতের কলকাতা' বইয়ে (পৃষ্ঠা ১০৯)।

১১১

এতক্ষণ নিজের কথাই বলে এসেছি। এবার দেশের কথা কিছু বলি। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় আমি আমার 'WHEN HITLER FALLS' প্রবন্ধে যা বলেছিলাম, তাই আজ ফলেছে। দেশে দুর্দান্ত মূল্যস্ফীতি ঘটেছে। সাধারণ লোকের ক্লেশ ক্রমাগতই বেড়ে গিয়েছে। স্বাধীনতা লাভের মুহূর্তে জওহরলাল নেহেরু এক স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেদিন আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্র থেকে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বলেছিলেন—'আজ আমাদের দেশের লোকের খাদ্য, বসন ও নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর অভাব রয়েছে। আমরা মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির নাগপাশে বন্ধ হয়েছি। আমরা বিচক্ষণতার সঙ্গে এসব সমস্যার মোকাবিলা করতে চাই, যাতে সাধারণ লোকের ক্লেশের বোঝা হ্রাস পায় ও তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।' নেহেরুর সে স্বপ্ন আজ স্বপ্নবিলাসে পরিণত হয়েছে। সে স্বপ্ন সফল করবার জন্য ছটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও তিনটা বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়িত করা হয়েছে। সেগুলোর পেছনে খরচ করা হয়েছে ২৫৪,৬৯২ কোটি টাকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও নেহেরুর স্বপ্ন সফল হয়নি। সফল হয়েছে মাত্র আমার সেই ১৯৪৪ সালের ভবিষ্যদ্বাণী। দেশের সাধারণ লোক যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। সাধারণ লোক, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজ আজ আরও গরীব হয়ে পড়েছে। মাত্র বড়লোকরাই আরও বড় হয়েছে।

আজ আকাশচুম্বী দ্রব্যমূল্যের দিকে তাকিয়ে ভাবি, আগেকার দিনে আমরা কোন্ স্বপ্নরাজ্যে বাস করতাম! তখনকার দিনে জিনিসপত্তর কত সস্তা ছিল। মনে পড়ে ১৯২১-২২ ও ১৯৩০-৩১-এর কথা। এ দু'বছরে এক কিলো ওজনের প্রমাণ সাইজের ইলিশ মাছ কলকাতায় বিক্রি হয়েছে টাকায় দশ-বারোটা করে, বড় ল্যাংড়া আমের ঝুড়ি (৮০টা আম) বারো আনা-চৌদ্দ আনায়। আমরা জু-গার্ডেনে যাচ্ছি—জন্তু-জানোয়ারদের খাওয়াবার জন্য দু'ঝুড়ি আম দেড় টাকায় কিনে নিয়েছি কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে।

১১২

আর্থিক দুর্গতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সংহতিতে ধরেছে ফাটল। সর্বত্রই ঠাণ্ডা লড়াই, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, আর পুলিসের গুলি। শিখ উগ্রপন্থীরাই প্রথম দেশের সংহতির বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করে। যদিও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দৃঢ়হস্তে তা বিনষ্ট করবার প্রয়াস করেছিলেন, কিন্তু তার বিনিময়ে তাঁকে দিতে হয়েছে তাঁর

নিজের প্রাণ, নিজেরই দেহরক্ষীর হাতে এবং নিজের বাসভবনের প্রাঙ্গণে। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর দেশের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিভেদনীতি আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দেই আমি আমার 'হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে দেশের বাস্তব পরিস্থিতির একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছিলাম। সে পরিস্থিতিটাই আজ চলমান হয়ে উঠেছে। অনেকেরেই হয়তো কৌতূহল হতে পারে জানবার জন্য, আমি কি বলেছিলাম। সেজন্য ওই গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশটা (পৃষ্ঠা ১৪-১৬) আমি নীচে উদ্ধৃত করছি :

"আমরা প্রায়ই ভারতের ঐক্যের (unity) কথা বলি। এ ঐক্যটা কিসের ? নৃতাত্ত্বিক, না সামাজিক, না সাংস্কৃতিক, না ধর্মীয়, না ভাষাগত, না রাষ্ট্রীয় ? প্রথম, ভাষার দিক থেকেই বিচার করা যাক। ভারতের লোকরা মোটামুটি ৭২৩টা ভাষায় কথা বলে। মোটামুটি এগুলি আর্য, দ্রাবিড় ও মুন্ডারী ভাষা-গোষ্ঠীভুক্ত। এদের সকলেরই মধ্যে phonetics, etymology, morphology, syntax ও semantics-এর পার্থক্য লক্ষিত হয়। উত্তর ভারতের বর্ণমালাসমূহের সহিত দক্ষিণ ভারতের বর্ণমালাসমূহের রূপগত বৈষম্য লক্ষিত হয়। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের কোন ভাষাগত ঐক্য নেই। ইংরেজ আমলে ইংরেজি ভাষার দ্বারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু তা উচ্চকোটির লোকদের (elites) মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তারপর ইংরেজ চলে যাবার পর, স্বাধীন সরকার এক বিশেষ আঞ্চলিক ভাষাকে (হিন্দী) রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিয়ে ওই ঐক্যসাধনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু ভাষাভিত্তিক নতুন নতুন রাজ্য গঠন, তাঁদের সে চেষ্টাকে ব্যর্থ করেছে।

"একই ভাবে বিফল হয়েছে অতীতকালে রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনের চেষ্টা। মৌর্য-সম্রাট অশোক, গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, পালসম্রাট ধর্মপাল, মোগলসম্রাট আকবর প্রভৃতির আমলে কিছু পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু তা সাময়িক মাত্র। ইংরেজ আমলেই পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল, যার ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতবাসীর মনে nationhood সম্বন্ধে একটা সচেতনতা জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু সে nationhood-এর 'ধ্যান' স্বাধীন ভারত রক্ষা করতে সক্ষম হচ্ছে না। বিভিন্ন প্রদেশে অসন্তোষ, বিদ্বেষ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ তার ইঙ্গিত দেয়।

"যদি এই ঐক্য ভাষাগত ও রাষ্ট্রীয় না হয়, তবে কি এটা নৃতাত্ত্বিক বা সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় ? এ ঐক্য যে নৃতাত্ত্বিক নয়, তা আগেই বলেছি। এখন দেখা যাক, এটা সামাজিক কিনা। আগেই বলেছি মূলগতভাবে সমাজের ন্যূনতম সংস্থা হচ্ছে পরিবার ও পরিবারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় বিবাহ দ্বারা। আমি আমার 'ভারতে বিবাহের ইতিহাস' গ্রন্থে দেখিয়েছি যে ভারতে যত

জাতি আছে, তার চেয়ে বেশি রকমের বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। সর্বত্রই এবং সকল জাতির মধ্যেই 'বিবাহ' এক সুনির্দিষ্ট বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু একের বিধির সঙ্গে অপরের মিল নেই। উত্তর ভারতে মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ হয় না। এটা বিধি-বিগর্হিত ব্যাপার। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় এটাই বাঞ্ছনীয় বিবাহ। সেখানে মামা-ভাগ্নীর মধ্যে বিবাহও বিধিসম্মত বিবাহ। উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে বধূর সিঁথিতে সিন্দুরদানই বিবাহের মূল অনুষ্ঠান এবং এটাই সধবা রমণীর চিহ্ন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে সিন্দুরদান প্রথা নেই। সেখানে সধবা মেয়েরা সিঁথিতে সিঁদুর পরে না। সেখানে কণ্ঠে 'তালিবন্ধন'ই বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান এবং এটাই সধবা স্ত্রীলোকের চিহ্ন। আবার আদিবাসীদের মধ্যেও নানারকম বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রেও উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কোন সাদৃশ্য নেই। আবার উত্তর-পূর্ব সীমান্তের আদিবাসীদের মধ্যে বিধবা শাশুড়ী ও বিধবা বিমাতাকে বিবাহ করার প্রথা প্রচলিত আছে। কেরলের নায়ারদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। বহুপতিক বিবাহ দক্ষিণ ভারতে টোডাদের মধ্যে ও উত্তর ভারতে হিমালয়ের পাদদেশস্থ অঞ্চলসমূহে দৃষ্ট হয়। অন্যত্র কিন্তু তা নেই। আছে কোন কোন জায়গায় 'দেবরণ' প্রথা। এছাড়া, বিবাহে মাঙ্গলিক আচার (যাকে আমরা স্ত্রী-আচার বলি) তা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন রকমের। এমনকি, একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে, এ বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

"ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অশন-বসনের বৈচিত্রতাও আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে, জনগণের জীবনযাত্রা-প্রণালীর অনৈক্য। বাঙলা, আসাম, ওড়িশা ও পূর্ব উপকূলের জাতিসমূহের প্রধান খাদ্য চাউল। উত্তর ভারত, পঞ্জাব, হরিয়ানা ও অন্যত্র প্রধান খাদ্য গম। পশ্চিম উপকূলস্থ অনেক জাতির প্রধান খাদ্য বজরা ও রাগি। বাঙলা, আসাম, ওড়িশা ও আরও দু-এক প্রদেশের লোকরা মাছ খায়। অন্যত্র মাছ খায় না, কিন্তু মাংস খায়। প্রাচ্য প্রদেশসমূহের লোকরা সরিষার তৈল দিয়ে রন্ধনক্রিয়া সম্পন্ন করে। উত্তরপ্রদেশের লোকরা কিন্তু ঘি ব্যবহার করে। পশ্চিম ভারতের লোকরা তিলের তেল ও দক্ষিণ ভারতের লোকরা নারিকেল তৈল ব্যবহার করে। শুধু খাদ্যের দিক দিয়ে নয়, বসন ভূষণের দিক দিয়েও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এ বৈচিত্রতা দৃষ্ট হয়। পশ্চিম বাঙলার মেয়েরা (বিধবা ছাড়া) পাড়-বিশিষ্ট শাড়ি পরে। বিহার ও উত্তর প্রদেশের মেয়েরাও তাই। তার মানে, তারা সেলাইবিহীন বস্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু রাজস্থান ও পঞ্জাবের মেয়েরা সেলাইবিশিষ্ট বসন পরে। রাজস্থানের মেয়েরা বর্ণাঢ্য ঘাঘরা পরে, পঞ্জাবের মেয়েরা পাজামা পরে। পশ্চিম ভারতের মেয়েরা কাছা দেয়। অন্য

জায়গায় মেয়েরা কাছা দেয় না। পুরুষদের ধুতিও নানা জায়গায় নানা কায়দায় পরা হয়। বাঙলায় চটিজুতা ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। কিন্তু উত্তর ভারতের লোকরা গোড়ালিবিশিষ্ট জুতা পরে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভারতে সামাজিক ও জীবনযাত্রা প্রণালীরও কোন ঐক্য নেই।

"তবে কি ভারতের ঐক্যটা সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় ঐক্য? সেক্ষেত্রেও আমরা নানারূপ বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করি। দুর্গাপূজো, দশেরা, দীপাবলী, দেওয়ালী, হোলি, দোলযাত্রা প্রভৃতি উৎসবগুলিকে আমরা 'জাতীয়' উৎসব বলি। কিন্তু এগুলির অনুষ্ঠানের রূপ ও সময়কাল দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের। যদিও বাঙালী আজ যেখানেই গেছে, সেখানেই দুর্গাপূজো করছে, তা হলেও মূলগত-ভাবে এটা বাঙলাদেশেরই উৎসব। দশেরা উৎসবকে দুর্গাপূজার সমগোত্রে ফেলা হলেও, যারা এই উৎসব দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে মূলগতভাবে এটা স্বতন্ত্র উৎসব, যদিও দুর্গাপূজো ও দশেরা সমকালেই অনুষ্ঠিত হয়। আবার দেখা যাবে যে, উত্তর ভারতের দশেরা উৎসবের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে পালিত দশেরা উৎসবের একটা মূলগত পার্থক্য আছে। বস্তুত হিন্দুর এসব উৎসবের রূপ দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের। আবার উৎসব-পালনের সময়কালও ভিন্ন। যেমন বাঙলাদেশে হোলি বা দোলযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিনই বাঙলার জনগণ পরস্পর পরস্পরের গায়ে রঙ দেয়। কিন্তু বিহার থেকে আরম্ভ করে সমগ্র উত্তর ভারতে পূর্ণিমা ছেড়ে গেলে রঙ দেওয়া হয়। উৎসবের মর্যাদার দিক থেকেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য হয়। বাঙলার শ্রেষ্ঠ উৎসব হল দুর্গোৎসব। কিন্তু সংলগ্ন বিহার প্রদেশে তা নয়। সেখানে কার্তিকী ষষ্ঠীতে অনুষ্ঠিত 'ছট্' পরবই বছরের শ্রেষ্ঠ উৎসব। উত্তর ভারতে দশেরার তুলনায় 'হোলি'ই বোধহয় শ্রেষ্ঠ উৎসব। পশ্চিম ভারতে দীপাবলীই শ্রেষ্ঠ উৎসব। এ তো গেল সমষ্টির ব্যাপার। ব্যষ্টির দিক থেকেও ধর্মীয় বিভেদ অসাধারণ। কেহ বৈষ্ণব, কেহ শাক্ত, কেহ সৌর, কেহ গাণপত্য, কেহ শৈব, কেহ লিঙ্গায়েত, কেহ তান্ত্রিক ইত্যাদি। আবার এসব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অসংখ্য সম্প্রদায় আছে। এক কথায়, ভারত সর্ববিষয়েই বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার দেশ।" সেটাই যদি আজ জাতীয় সংহতি বিনাশের জন্য আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই!

১১১

সেদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসের লাইব্রেরীতে বসে নানা কথা ভাবছিলাম। দেশের কথা, দশের কথা, ব্যষ্টির কথা। ভাবছিলাম কোথায় গেল সেই 'সোনার

বাঙলা', যৌথ পরিবার ছিল যার পারিবারিক সংহতি-নাশের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। সেটা ভেঙে পড়ল যখন ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘর্ষ বাধল, যার এক বিশ্বস্ত ছবি আঁকলেন শতাব্দীর গোড়ার দিকে শরৎচন্দ্র তাঁর 'বিরাজ বউ'-তে। ভাবছিলাম, কোথায় গেল আমাদের ছেলেবেলার মানুষের সেই দেবদ্বিজে ভক্তি, যা মানুষের মনে সঞ্চার করত পাপপুণ্যের বিশ্বাস। এখনও লোক ঠাকুরঘরে যায়, যেমন নিয়মিত যেত শিবপ্রসাদ গুপ্ত। সে-সবই লোকদেখানো ব্যাপার। তার আসল রূপটা দেখতে পাওয়া যায় যখন তার মুখোসটা খুলে ফেলে দেওয়া হয়। মুখোস খুললে দেখা যাবে, তার না আছে মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস, না আছে মমতা ও প্রীতি। মানুষ আজ দুর্নীতি ও দুরাচারের নাগপাশে বন্ধ হয়ে গেছে।

এসব কথাই ভাবছি, এমন সময় আমার সামনে এসে দাঁড়াল আমাদেরই সমবয়সী একজন লোক। লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, লোকটার রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ, চোখ দুটো জ্বলছে যেন রোষ ও উম্মত্ততার প্রদীপের মতো। প্রথম-দৃষ্টিতে ভেবেছিলাম লোকটা হয় উম্মাদ, নয় সাহায্যপ্রার্থী কেউ। কিন্তু চমকে উঠলাম, যখন সে ঘনিষ্ঠতার সুরে আমাকে সম্বোধন করে বলল, অতুল, আমায় চিনতে পারছ ? বললাম, না।

—আমি সুমন্ত, তোমার সংগে স্কটিশ চার্চেস্ কলেজে পড়তাম।

—আমাদের সংগে তো দুজন সুমন্ত পড়ত, একজন কলা বিভাগের ছাত্র, আর একজন বিজ্ঞান বিভাগের। আমাদের দুই বিভাগের ইংরেজি ও বাংলার যে যুক্ত ক্লাস হত, বিজ্ঞান বিভাগের সুমন্তই তো আমার পাশে এসে বসত, তার সংগেই তো ছিল আমার বেশি সৌহার্দ্য। তা তুমি কোন্ সুমন্ত ?

—আমিই সেই বিজ্ঞান বিভাগের সুমন্ত।

—তা, তুমি তো শুনেছিলাম আই. এস-সি. পাস করে শিবপুরে ভর্তি হয়েছিলে, পরে বি. ই. পাস করে বিলাত গিয়েছিলে, এবং সেখান থেকে চাটার্ড ইঞ্জিনীয়ার হয়ে কলকাতায় ফিরে এসে খুব প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলে, অনেক বড় বড় নতুন বাড়ির গায়ে দেখেছি তোমার সাইনবোর্ড ঝুলত। নিজের জন্যও তো তুমি একটা প্রাসাদতুল্য বাড়ি তৈরি করেছিলে। সে বাড়িটাও তো আমি দেখেছিলাম যখন আমাদের কলেজের সেই পুরানো বন্ধু অতীনের সংগে একদিন ট্যাকসি করে রাসবিহারী অ্যাভেনু দিয়ে আসছিলাম। ইলেকট্রিক আলোয় ঝলমল করা বাড়ি, সমস্ত বাড়িটাই বহন করছিল সমৃদ্ধির সমারোহ। তা তোমার এ-দশা হল কি করে ?

—হ্যাঁ ভাই, সত্যই সমৃদ্ধির সুখ ও সমারোহের মধ্যেই হাবুডুবু খেতাম। কিন্তু আমার সে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি সব বানের জলে ভেসে চলে গেল আমার

স্ত্রীর মৃত্যুর পর।

—কি রকম ?

—ভাই, আমার মাত্র একই ছেলে। আমি তাকে চার্টার্ড ইঞ্জিনীয়ার করলাম, তারই হাতে ছেড়ে দিলাম আমার বিজনেস্। সেই আমার ব্যবসা দেখতে লাগল। তারপর আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমার স্ত্রীর যাবতীয় অলংকারসমূহ সে হস্তগত করল, ও আমার ঘরবাড়ি, বিজনেস্ সব নিজের নামে লিখিয়ে নিল। ছেলে হয়ে যে সে আমার সংগে প্রবঞ্চনা করবে, তা তো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

—তার পর ?

—তুমি যে বাড়িটা আলোয় ঝলমল করতে দেখে এসেছিলে, সেটা আজ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বলে, আলো জ্বাললে ইলেকট্রিকের খরচ বাড়বে। সমস্ত বাড়ি অন্ধকার করে রাখে। মাত্র নিজের ঘরে আলো জ্বালায়, ফ্যান চালায়, টি. ভি. দ্যাখে। আমার ঘরের ফ্যানটা পর্যন্ত বন্ধ করে দিল, গরমে আমি ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগলাম। তারপর একদিন বাতিটা কমিয়ে দিল, যাতে না পড়াশোনা করতে পারি। নিজের ছেলেদের নিয়ে আমার ওপর হামলা করল। বলল, তুমি কেবল আমার ক্ষতিই করছ, তোমাকে আমরা মেরেই ফেলব। সে কুৎসিত দৃশ্য দেখে পাড়ার লোক স্তম্ভিত হল। তাতে ওদের তো কোন লজ্জাঘেন্না নেই। কিন্তু আমার তো আছে। লজ্জায় আমি গৃহত্যাগ করলাম।

সুমন্তর কথা শুনে খুব দুঃখিত হলাম। বললাম, বলি তোমার ছেলেটা মানুষ না জানোয়ার ? তা, তুমি এখন আছ কোথায় ?

—কালীঘাট পার্কের বেঞ্চির ওপর রাত্তিরে শুয়ে থাকি, এক পাঞ্জাবীর হোটেলে খাই, আর দিনের বেলাটা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করে কাটাই। সেখানে বসে আজ গ্রীক বিয়োগান্ত নাটক-লেখক সফোক্লিসের জীবনী পড়ছিলাম। তাঁর সমসাময়িক প্রতিভাবান নাটক-লেখক ছিলেন ইসকাইলাস। কিন্তু বছরের পর বছর ইসকাইলাসকে পরাহত করে সফোক্লিস সমস্ত পুরস্কার জয় করেছিলেন। তারপর একদিন সফোক্লিসের ছেলেগুলো রাজার কাছে গিয়ে বাপের নামে নালিশ করল। বলল, আমরা সারাদিন ধরে মাঠে খেটে মরি, আর এই লোকটা দিনরাত কেবল কী মাথামুণ্ডু লেখে, আর আমাদের পরিশ্রমলব্ধ অন্ন ধ্বংস করে। আপনি এর একটা সুবিচার করুন। রাজা যা বললেন, তাতে ছেলেগুলো লজ্জায় মাথা নত করে বাড়ি ফিরে গেল। ওই কাহিনীটা পড়তে পড়তে তোমার কথা মনে পড়ল। তুমি তো কলা বিভাগে গ্রীক হিস্ট্রি পড়েছিলে। মনে পড়ল, তুমিও একদিন আমাকে সফোক্লিসের গল্পটা বলেছিলে। তোমার কথা স্মরণ হওয়াতেই আজ তোমার কাছে এলাম। আচ্ছা, আজকের দিনে, আমরা কি এরকম সুবিচার পাব না ?

—না, পাবে না। রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন'-এ ধৃতরাষ্ট্রের মুখে কি শোন নাই : 'আজি ধর্ম পরাজিত'। তা না হলে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতাম : 'ধর্ম তারে করিবে শাসন। ধর্মেরে যে লঙ্ঘন করেছে—আমি পিতা—'। আজ ভাই, ধর্ম নেই, আছে মাত্র মুখোস-পরা ধর্মের উপচ্ছায়া। সেটাই আজ ঘরে ঘরে দেখতে পাবে। যারা বুদ্ধিমান, তারা বলে, বাবা এখন আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন, সেজন্য এক আশ্রমে গিয়ে বাস করছে। আর যারা নির্বোধ ও বোকা, তারা এটাকে প্রকাশ্যে এনে লোকসমাজে নিজেদের হেয় করে। তবে তোমাকে একটা সান্ত্বনা দিতে পারি, তুমি মারা গেলে, মহালয়ার তর্পণের দিন তোমার ওই পুত্রই ধর্মের উপচ্ছায়ায় অন্য এক মুখোস পরে উদাত্তকণ্ঠে বলবে,

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ, পিতা হি পরমং তপঃ"
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ।"

তুমি তখন অলক্ষ্যে থেকে অট্টহাস্য হাসবে। কেমন, তাই না?

—তা, তুমি ভেবনা যে আমার ছেলে কোনদিন মহালয়ার দিন পিতৃতর্পণ করবে। রাষ্ট্র তখন এটা নিষেধ করে দেবে।

—রাষ্ট্র নিষেধ করবে? এটা কি বলছ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, গঙ্গার জল যেরকম দূষিত হয়ে পড়ছে, রাষ্ট্রই বলবে ওই জলে পিতৃতর্পণ করলে পিতার আত্মার টি. বি. বা ক্যানসার বা কলেরা হবে। সেজন্য তোমরা কেউ পিতৃতর্পণ কোরো না।

সুনন্ত আর রইল না। বলল, ভাই, আজ আসি।

কথাশেষ

গড়িয়ে গড়িয়ে বয়স ৮৩ হল। এবার যাবার পালা। এই দীর্ঘজীবনে উপলব্ধি করলাম, মানুষের প্রতি মানুষের আচরণের সুপ্রিম কোর্ট ইহলোকে নয়, পরলোকে। সেখানে চিত্রগুপ্ত সবই লিখে রাখছেন। সেজন্য আজ কারুর বিরুদ্ধে কোন দ্বেষ, বিদ্বেষ ও অভিমান নেই। সকলের প্রতি আছে কেবল অফুরন্ত ভালবাসা। এই ভালবাসা নিয়েই কর্মের জাল গুটিয়ে আনছি, আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঐকতানে গাইছি—

'আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে ;
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবনমাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরানে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়পদ্মদলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।'

—